১ উপবেশনরত যোগীপুরুষ (যোগ-মূর্তি-বিশ্বরূপ)—মহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত চিত্রফলক

ভারতসংস্কৃতিতে ভগবান কৃষ্ণ

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সা হি ত্য লো ক
৩২/৭ বি ড ন স্ট্রী ট। ক লি কা তা ৬

২ ছু'দিকে উপাসনার ভঙ্গীতে দাঁড়ানো, মাথার উপরে নাগফণায় আচ্ছাদিত ছুটি মানুষের মাঝখানে যোগসন্নদ্ধ উপবেশনরত মূর্তি—স্টিয়েটাইটের ফলক, মহেঞ্জোদড়ো

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৯৬ / আগস্ট ১৯৮৯

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যালোক । ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট । কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স । ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন । কলিকাতা ৬

৩-৪ পোড়ামাটির বিভিন্ন আকৃতির দুইটি নারীমূর্তি—মহেঞ্জোদড়ো

গ্রন্থকারের নিবেদন

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত চেতনা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এক অনন্য-সাধারণ উপলব্ধি। নৈষ্ঠিকভাবে যাঁরা কৃষ্ণানুরাগী তাঁরা ছাড়াও জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে এই ভারতভূখণ্ডের তাবৎ জনমণ্ডলীর মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত আকর্ষণ ফল্গুধারার মতো সঞ্চরমাণ। শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণেই মানসলোকে প্রতিভাত হয় এক চিরন্তন শিশু বা লীলাপ্রবণ এক নবীনকিশোর সত্তা। গভীর অনুরাগের আধার এই শিশু-কিশোরই আবার সন্ধানীচিত্তে পরিমূর্ত হয় দুশ্চর পথের দিশারী জাগ্রত চেতনার রূপ-প্রকল্প বাসুদেব-বিগ্রহে। ভারতবাসীর নিকট কৃষ্ণ-বাসুদেবের প্রতি এই অনুরাগ প্রায় স্বতঃ-সমুপস্থিত বলে গণ্য হয়ে থাকলেও, কখন কিভাবে আসমুদ্র ভারতভূমিতে এই আকর্ষণ সঞ্চারিত হয়েছে এবং কোন্ প্রক্রিয়ায় এই চেতনা মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করেছে, এ-রহস্য বৈদেশিক সন্ধানীদের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে এক পরমবিস্ময়কর ঘটনারূপে। এদেশে ঔপনিবেশিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় যাঁদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল তাঁদের মধ্যে দু'-একজন এদেশের সংস্কৃতির প্রতি সংবেদনশীলতার পরিচয় দিতে গিয়ে এই কৃষ্ণ-বাসুদেব-চেতনার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী চার্লস উইলকিন্স-কৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদের কথা (১৭৮৫ খ্রীঃ)। এদেশে তখনও ছাপাখানার প্রচলন না থাকায় এই অনুবাদ-গ্রন্থ লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়, যার ভূমিকায় ওয়ারেন হেস্টিংস গীতাগ্রন্থে সমাবিষ্ট জ্ঞান-প্রজ্ঞার প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন। এর পরেই উল্লেখ করা চলে, স্যর উইলিয়াম জোন্স-কৃত জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের অত্যন্ত আবেগ এবং অনুভূতির সঙ্গে রচিত অনুবাদের কথা। বৃটিশ শাসনের সেই প্রারম্ভিক যুগে কৃষ্ণ-বাসুদেব চেতনার প্রতি অনুরূপ গভীর আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায় সংস্কৃতভাষায় প্রভূত পাণ্ডিত্যখ্যাতির অধিকারী হোরেস হেমান উইলসন-কৃত বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদ এবং সেইসঙ্গে প্রদত্ত ভগবান কৃষ্ণ বিষয়ে বিস্তৃত ভূমিকায়।

উইলকিন্স, হেস্টিংস, উইলিয়াম জোন্স এবং উইলসনের কৃষ্ণ-বাসুদেব সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা এবং উপলব্ধিতে সন্নিবিষ্ট আবেগ এবং আকর্ষণের অভিব্যক্তি প্রচারলাভ করবার ফলে পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে গভীর আলোড়ন এবং প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব ঘটতে বিলম্ব হয় নাই। পাশ্চাত্য জনমণ্ডলীর চিত্তপটে

৫ চতুর্ভুজ বাসুদেব-বিষ্ণু মূর্তি—তক্ষশিলা, খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দী

দৈবীপ্রেরণায় সম্প্রবুদ্ধ একটি ব্যক্তিসত্তার স্থানই ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিহীন। এই ব্যক্তি-সত্তার আবির্ভাব তাঁর জীবন ও মতবাদের প্রচার প্রায় সমসাময়িক কাল থেকেই ছিল সুপরিচিত। ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটার পরে বহুবিস্মৃত অতীতের এক অজ্ঞাত পরিবেশে উদ্ভূত অনুরূপ এক দৈবীসত্তার গভীর প্রভাবের অস্তিত্ব স্বকীয় সংস্কৃতির সম্প্রসারণকামীদের মধ্যে বিশেষ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছিল। ওয়ার্ড এবং উইলিয়াম কেরীর আমল থেকে গস্‌পেলের আশ্রয়ে ভারতীয় জন-মণ্ডলীর আত্মার মুক্তিবিধানের প্রয়াস প্রবল কৃষ্ণচেতনার প্রভাবের দ্বারা প্রতি-রুদ্ধ হলে, সেই মহলে কৃষ্ণ-বাসুদেব-চেতনার অনুসন্ধান এবং মূলোৎপাটনের চেষ্টার সূত্রপাত হয়। অন্যদিকে ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক জগতে শ্লেগেল-কৃত গীতার ল্যাটিন অনুবাদ, শ্রেডারের জার্মান অনুবাদ ও বুর্নফের ফরাসি অনুবাদ ও অনুরূপ বহু গ্রন্থে ভগবদ্গীতায় সন্নিবিষ্ট জ্ঞান-প্রজ্ঞার প্রভূত স্বীকৃতি প্রসারলাভ করতে থাকলে, তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতেও বিলম্ব হয় নাই। যখন নানা লেখক গীতাকে খ্রীস্টীয় প্রভাবপ্রসূত বলে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করছিলেন তখনই প্রখ্যাত জার্মান সংস্কৃতবিদ্ আলব্রেথ্‌ট ওয়েবার ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান অবলম্বন কৃষ্ণচেতনার উপর খ্রীস্টীয় উপলব্ধির প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করে পাশ্চাত্যের ভারতবিদ্যার অনুশীলনের পরিমণ্ডলে তাৎক্ষণিক স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে বাসুদেবের উল্লেখ ওয়েবারের দৃষ্টি-গোচর থাকলেও কৃষ্ণচেতনার অন্তর্নিহিত ভক্তিবাদের খ্রীস্টীয় ভিত্তিকেই তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; মহাভারতের রচনাকাল খ্রীস্ট-পরবর্তী যুগে টেনে নামাতেও তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না। অবশ্য ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ভূপালের সন্নিকটবর্তী বেসনগরে তক্ষশিলার গ্রীক অধিপতি অ্যান্টিআলকি-ডাসের দ্বারা শুঙ্গ-সম্রাট কাশিপুত্র ভাগভদ্রের রাজসভায় প্রেরিত দূত হেলিয়ো-ডোরের দ্বারা খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের কোন সময়ে প্রতিষ্ঠিত, গরুড়ধ্বজ আখ্যায় অভিহিত একটি শিলাস্তম্ভে দেবদেব-বাসুদেবের উল্লেখ এবং হেলিয়ো-ডোরের নিজেকে ভাগবত নামে অভিহিত করায় শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেবের আশ্রয়ে উদ্ভূত ভক্তিমূলক ভাগবত সাধনার উপর খ্রীস্টীয় প্রভাব সম্পর্কিত তত্ত্বের যথাযোগ্য সমাধি ঘটেছে। ভগবান বাসুদেব সম্পর্কে এই প্রত্নভিত্তিক পাথুরে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলেও গোপজন-পরিবেশ-সম্ভূত গোবিন্দ-কৃষ্ণ সম্পর্কে চটুল দ্বিধার অবসান হয় নাই। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে জার্মানীর স্ট্রাসবুর্গ থেকে

৬ বাসুদেব-বিষ্ণু মূর্তি—হাঁকড়াইল, বাংলা দেশ। আনুমানিক খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী

প্রকাশিত পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার রচিত Vaishnavism, Saivism and Minor Religious Systems নামীয় গ্রন্থে পুরাণ-বর্ণিত গোপাল-কৃষ্ণ-চরিত্রকে ওয়েবারের দ্বারা প্রচলিত তত্ত্বের অনুসরণে খ্রীষ্টীয় প্রভাব-সম্ভূত বলে নির্দেশ করা হয়েছে। দেবকীগর্ভজাত সন্তানের নিধনে কৃতসংকল্প কংসের চরিত্রকে পুরাণকারেরা গস্‌পেলে বর্ণিত রোমক শাসনকর্তা হেরডের আদর্শেই সৃষ্টি করেছিলেন, ওয়েবার অতি যত্নের সঙ্গে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পতঞ্জলি রচিত মহাভাষ্যে দুষ্টমাতুল আখ্যায় কংসের উল্লেখ এবং কংসবধের কাহিনী নিয়ে লোক-নাট্যের অভিনয়ের উল্লেখ থাকায় ওয়েবারের এই তত্ত্বও যে একান্তভাবেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল, এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা চলে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ যুগ যুগ ধরে যতদিন সংসারবন্ধন অতিক্রম করবার উপায়রূপে কৃষ্ণ-ভাবনা-সম্ভূত বাৎসল্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদনের উপলব্ধিতে পরিতৃপ্ত এবং সমাহিত ছিল ততদিন বিশ্লেষণাত্মক কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসার কোন প্রয়োজন ঘটে নাই। শিখিচূড়া-সজ্জিত গোপবেশধারীকৃষ্ণ (বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ—মেঘদূতম্, ১৫) অথবা গদাচক্রধর বাসুদেবরূপী (কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ—গীতা, ১১, ১৭) পরমসম্পদ সম্পর্কিত চেতনায় আত্মসমাহিত জনমণ্ডলী কে কি বলল সে-সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ দৃক্‌পাতহীন। পূর্বজগৎ সম্পর্কে স্পর্শকাতর ইউরোপীয় মানস ভারতসংস্কৃতির ভিত্তিস্বরূপ এই উপলব্ধিকে বিচারবিশ্লেষণ এবং আক্রমণের দ্বারা অবমূল্যায়নের চেষ্টায় অগ্রসর হলে, ভারতীয় মানসেও চাঞ্চল্যের উদ্ভব হয়। এই চাঞ্চল্যেরই ফলশ্রুতি বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রে, কাশিরাম তেলাঙের গীতার অনুবাদের ভূমিকায়, কোশাম্বীর মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিতে গীতার সমালোচনায়, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, সুশীল দে, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, বিমানবিহারী মজুমদার প্রমুখ পণ্ডিতের দ্বারা কৃষ্ণ-বাসুদেবকে ইতিহাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে। (প্রথম অধ্যায়)। বৈদেশিক বা ভারতীয় নির্বিশেষে যিনি যেভাবেই কৃষ্ণচেতনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে থাকুন না কেন, কারো পক্ষেই ভারতসংস্কৃতিতে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত উপলব্ধির গভীর অন্তস্থল স্পর্শ করা সম্ভব হয় নাই।

ভারতসমাজে শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেবের আবির্ভাবের কালটিকে অনেকেই সুনির্দিষ্ট করবার চেষ্টা করেছেন। এই পুস্তকে ইতিহাসের সন-তারিখের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। ভারতবর্ষের ইতিহাসচেতনা পরম্পরাভিত্তিক ; সন-তারিখ ছুটি কথাই বহিরাগত। বস্তুত শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেবের আবির্ভাবকালের

৭ গিরিগোবর্ধনধারী কৃষ্ণমূর্তি, মথুরা। আনুমানিক খ্রীস্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দী

বহুপূর্ব থেকেই ভারতের সংস্কৃতির পারম্পর্য নানাভাবে রক্ষিত হয়েছে বৈদিক গ্রন্থসমূহে, রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ সাহিত্যে। সাধারণভাবে এই পারম্পর্যের আরম্ভ পৌরাণিক সাহিত্যে বৈদিকসমাজের আদিপুরুষরূপে প্রতিষ্ঠিত বর্তমান প্রকল্পের প্রবর্তক বৈবস্বত মনুর আবির্ভাবকাল থেকে। কিন্তু ঋগ্বেদে এই মনুর জন্মদাতারূপে উল্লিখিত বিবস্বান এবং বিবস্বান-পত্নী সরণ্যুর পিতা ত্বষ্টৃর উল্লেখ সন্নিবিষ্ট থাকায় এই মনুর পূর্বেও সমাজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রায় বিংশৎসংখ্যক মন্ত্রে মনুর উল্লেখ পাওয়া যায়, যার কোথাও তাঁকে বলা হয়েছে বিবস্বানের পুত্র (মনু-বিবস্বত), কোথাও তাঁর উল্লেখ 'আমাদের পিতা' এই আখ্যায় (ঋ ২।৩৩:১৩)। তিনি বেদবিহিত যজ্ঞকাণ্ডের প্রবর্তক (ঋ ১।৪৪:১২ ; ১।৭৬:৩)। ঋগ্বেদে বিবস্বানের উদ্দেশে রচিত কোন সম্পূর্ণ মন্ত্র না থাকলেও প্রায় ত্রিশটি মন্ত্রে বিবস্বত নামে তাঁর উল্লেখ আছে। এই তিনজনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল ত্বষ্টৃর, যাঁর উল্লেখ ষাটটিরও বেশী মন্ত্রে পাওয়া যায়। সকল কিছুর স্রষ্টা, কুশলী কারুবিদ ইত্যাদি নানা আখ্যায় অভিহিত ত্বষ্টৃর যে পরিচয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সেখানে তাঁকে বলা হয়েছে 'বিশ্বরূপ'। বিশ্বরূপ ছাড়া ত্বষ্টৃকে সবিতার সঙ্গে অভিন্নরূপে দেবতা আখ্যায়ও অভিহিত করা হয়েছে। (দেবস্ ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ—ঋ ৩।৫৫:১৯ ; ১০।১০:৫)। ত্বষ্টৃর যেমন বিশ্বরূপ আখ্যায় পরিচিতি ছিল তেমনি ত্বষ্টৃর 'বিশ্বরূপ' নামে এক পুত্র ছিল, ঋগ্বেদে এই তথ্যেরও উল্লেখ আছে। এখানে লক্ষণীয় যে, ত্বষ্টৃর দেবতারূপে পরিচয় থাকলেও, ত্বষ্টৃপুত্র বিশ্বরূপকে অভিহিত করা হয়েছে ত্রি-শির এবং অসুর আখ্যায়। ত্বাষ্ট্র-বিশ্বরূপকে নিয়ে ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে অথর্ববেদে, কোন কোন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে, মহাভারতে এবং কয়েকটি পুরাণেও একটি কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ত্রিশির-বিশ্বরূপ ছিলেন মহাতপস্বী ; ইন্দ্র প্রভৃত ঈর্ষাপরবশ হয়ে সেই বিশ্বরূপকে হত্যা করেন।

ঋগ্বেদে দৈবীসত্তারূপে বহু আরাধ্যের উদ্দেশ্যে রচিত মন্ত্রের সমাবেশ থাকলেও ইন্দ্রই ছিলেন ঋগ্বেদীয় সমাজের মূল আশ্রয়। ইন্দ্রের এই প্রাধান্যলাভের মূলে ছিল প্রবল শক্তির অধিকারী দানব এবং অহি নামে পরিচিত বৃত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ভাগবতপুরাণে উল্লেখ আছে—ইন্দ্র ত্রি-শির বিশ্বরূপকে হত্যা করলে পুত্রের নিধনে শোকগ্রস্ত ত্বষ্টৃ ইন্দ্রের শাস্তিবিধানের জন্য মহাভয়ঙ্কর বৃত্রকে সৃষ্টি করেন। মহাভারতের মতে বৃত্র এবং বিশ্বরূপ এক ও অভিন্ন। ত্বষ্টৃর
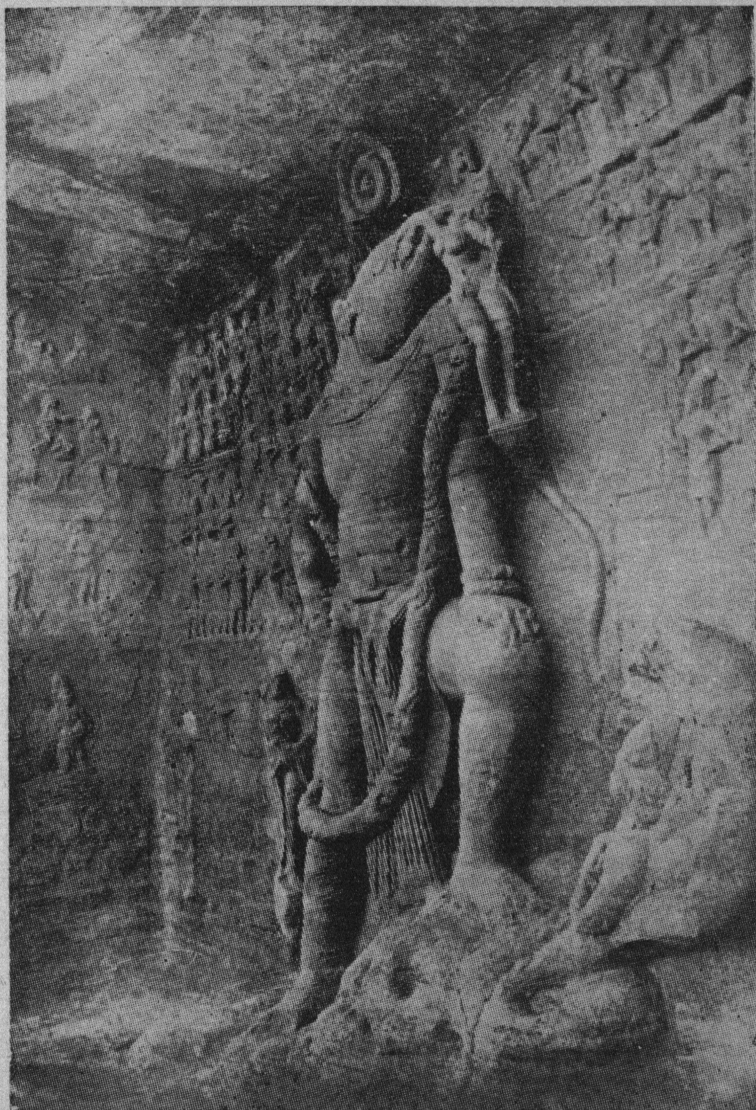
৮ মধ্যপ্রদেশ ভূপালের সন্নিকটবর্তী উদয়গিরিতে পর্বতগাত্রে খোদিত বিপুলকায় বরাহ-মূর্তি, আনুমানিক খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী

সঙ্গে ইন্দ্রের যে একসময়ে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল ঋগ্বেদে তার যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে। ঋগ্বেদের কয়েকটি মন্ত্রেই উল্লেখ আছে যে, ত্বষ্টৃ-ই ইন্দ্রের বজ্রনির্মাণ করে দিয়েছিলেন (ঋ ৫।৩১:৪)। একটি মন্ত্রে এমন উল্লেখ আছে যে, ইন্দ্রের পিতাই ছিলেন তাঁর বজ্রের নির্মাতা (ঋ ২।১৭:৬)। এইসব নানা ইঙ্গিতগর্ভ তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে ত্বষ্টৃর অব্যবহিত পরে ইন্দ্র এবং বিশ্বরূপ/বৃত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সুপ্রাচীনকাল থেকে বিবর্তিত এক জনগোষ্ঠী দ্বিধাবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এই মূল জনগোষ্ঠীতে তাবৎ সৃষ্টির অধিকর্তারূপে পরিকল্পিত ছিলেন 'বিশ্বরূপ'। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের অষ্টত্রিংশৎ সূক্তে অসুর আখ্যায় অভিহিত অতি কুশলী কারুবিদ এই 'বিশ্বরূপ' সবিতা এবং 'পুরুষ' নামেও পরিচিত। ত্বষ্টৃ এই সবিতা-বিশ্বরূপেরই উপাসক ছিলেন এবং সেই উপাস্যের নামের অনুসরণেই ত্বষ্টৃপুত্রের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'বিশ্বরূপ' আখ্যায়, এইসব তথ্য থেকে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা কিছু অযৌক্তিক নয়। ঋগ্বেদানুগামী সমাজ সর্বপ্রযত্নে বিশ্বরূপ-চেতনাকে অস্বীকার করেছিল এবং বিশ্বরূপ-অনুরাগী সমাজের সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক বজায় রেখেই বিবর্তিত হয়েছিল। ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী সেই জনমণ্ডলী যে বিস্তীর্ণ সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলে অধিষ্ঠিত ছিল, ঋগ্বেদের এই তথ্য নানা ইঙ্গিত-প্রমাণের উপর নির্ভরশীল থাকলেও সেই সিন্ধুপ্রবাহের বিস্তৃত সানুদেশে অসংখ্য, বহুসম্পদে সমৃদ্ধ নগরসংস্থানের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের পরে সেই পটভূমি স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন ইতিহাস-সন্ধানীর নিকট আর দুর্জ্ঞেয় নয়।

ঋগ্বেদে বর্ণিত দিবোদাস-সম্বর সংঘর্ষকাল পর্যন্ত এই উভয় সমাজ, কিছু পরিমাণে বৈবাহিক আদান-প্রদানের সম্পর্ক ছাড়া, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক চেতনার দিক থেকে পরস্পর যথেষ্ট পরিমাণে বিচ্ছিন্নই থেকে গিয়েছিল। পরে কালের নির্দেশে উভয় জনমণ্ডলীকেই বিস্তৃত গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চলে নূতন আশ্রয়ের সন্ধানে এসে পরস্পরের নিকট-সান্নিধ্যে বসতি প্রতিষ্ঠা করতে হয়। এই সময়েই বিশেষভাবে প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল পরস্পরের মধ্যে বিরোধের অবসানের এবং সামঞ্জস্য ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠার। ইতিমধ্যে উভয় সমাজেই অনেক সাংস্কৃতিক বিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল, ঋগ্বেদোত্তর সাহিত্যে সেই তথ্যের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। বৃত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইন্দ্র যে-দেবতার সহায়তা বিশেষভাবে চেয়েছিলেন, তিনি ছিলেন বিষ্ণু। ইন্দ্রের দ্বারা বিশেষ আশ্রয়স্থল বলে
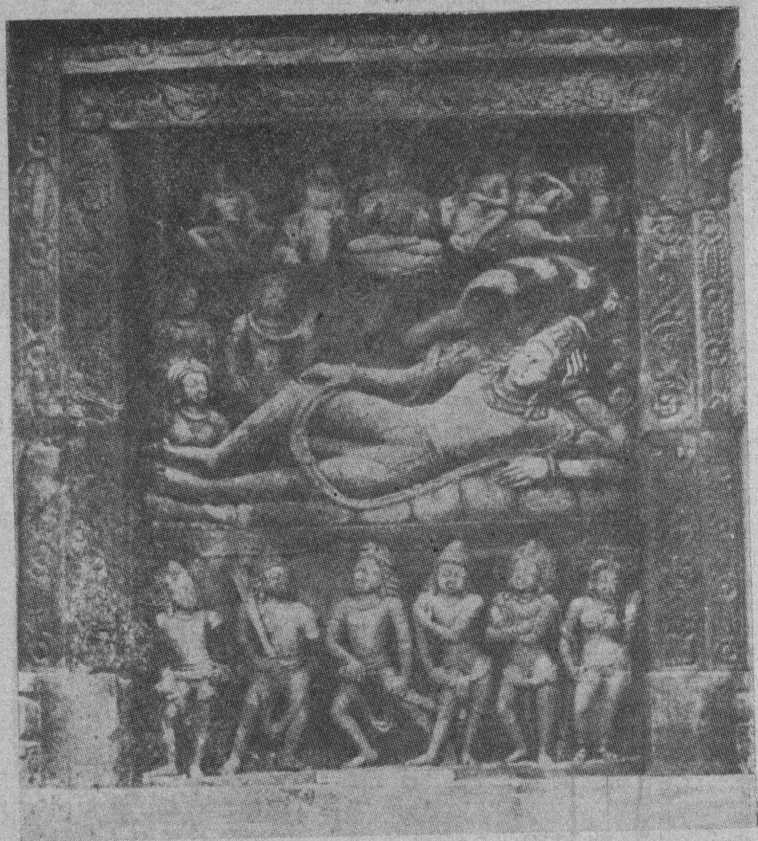
৯ মধ্যপ্রদেশের দেওগড়ে অবস্থিত দশাবতার মন্দিরের অনন্তশায়ী নারায়ণ-মূর্তি, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী

বিবেচিত হলেও ঋগ্বেদে বিষ্ণুর উল্লেখ খুবই সীমিত। পরবর্তী ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, মহাভারত এবং পৌরাণিক সাহিত্যে বিষ্ণু এক উত্তুঙ্গ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত (**Vishnu, though a deity of capital importance in the mythology of the Brahmanas occupies a subordinate position in the Rigveda. —Macdonell**)। বিষ্ণুচেতনার এই অভাবনীয় প্রসারের কারণ নির্দেশ করতে না পেরে কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বিষ্ণুকে আর্যেতর কোন সমাজ থেকে গৃহীত বলে মন্তব্য করতে দ্বিধা করেন নাই। ঋগ্বেদানুগামী সমাজে বিষ্ণু যেমন প্রসার ও প্রাধান্য অর্জন করেছিলেন তেমনি অন্য কিছু জনমণ্ডলীতে ঋগ্বেদে স্বল্প উল্লিখিত রুদ্র প্রভূত প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অথর্বসংহিতাকে এই রুদ্রানুগামী সমাজেরই প্রধান আকর বলে ধার্য করা চলে এবং অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, সিন্ধু-উপত্যকা থেকে নিষ্ক্রান্ত জনমণ্ডলীতেই রুদ্রদেবতার এই মাহাত্ম্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। (দ্বিতীয় থেকে নবম অধ্যায়)

পরস্পর প্রবল দ্বন্দ্ব-বিরোধে বিচ্ছিন্ন ভারত উপমহাদেশের এই দুই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে পরস্পর আদান-প্রদান, নৈকট্য এবং সাদৃশ্যের অভাব না থাকলেও প্রকৃত মিলন প্রতিষ্ঠায় প্রভূত প্রতিবন্ধকতা ছিল। এই সামঞ্জস্য এবং মিলনসাধনের প্রয়াস যখন বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, সেই সংকটক্ষণেই ভগবান কৃষ্ণ-বাসুদেবের আবির্ভাব ঘটে। এই কৃষ্ণচেতনার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির অবলম্বনরূপে কোন একটি আকরগ্রন্থ, জীবনী, উপদেশ বা রীতি নির্দেশের অন্বেষণ বিডম্বনা মাত্র। মহাভারত এবং হরিবংশ মিলিয়ে সামগ্রিকভাবে ভগবান কৃষ্ণ-বাসুদেবকে উপস্থিত করবার প্রয়াস কৃষ্ণজীবনকালের বহু পরবর্তী। মানুষ তার সৃষ্টির আদিকাল থেকেই উৎপীড়িত হয়েছে বহুবিধ সমস্যায়, খুঁজেছে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, চেষ্টা করেছে সৃষ্টির অন্তর্নিহিত রহস্য সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণার উদ্ভব ঘটাতে, নির্দিষ্ট করতে জীবনের উদ্দেশ্য, এবং অগ্রসর হতে সেই উদ্দিষ্টের পথে। এইসব জিজ্ঞাসার নিরাকরণের প্রয়াস ভারতে ঋগ্বেদের আমল থেকেই ক্রিয়াশীল ছিল লক্ষ্য করা যায়। এই প্রতিবীক্ষণের ইঙ্গিত বিধৃত আছে সূর্যদেবতার নিকট একটি প্রার্থনামন্ত্রে—চক্ষুর্নো ধেহিচক্ষুষে/চক্ষুর্বিখ্যৈ তনুভ্যঃ সং চেদং বিপশ্যেম/সু সংদৃশং ত্বা বয়ং প্রতিপশ্যেম সূর্য বিপশ্যেম নৃ চক্ষুষাঃ (ঋ ১০।১৫৮:৪-৫)। এই মহাবিশ্বের অন্তর্নিহিত অপ্রমেয় রহস্যের উপলব্ধির জন্য অন্তর্দৃষ্টিলাভের এই প্রার্থনা স্বভাবতই

১০ দেওগড় দশাবতার মন্দিরের অন্য এক প্রাচীরের গাত্রের গজেন্দ্র-মোক্ষ দৃশ্যচিত্র

স্মরণ করিয়ে দেয় গীতায় বর্ণিত কৃষ্ণ-বাসুদেব কর্তৃক অর্জুনকে দিব্যচক্ষুদানের প্রসঙ্গ (ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা / দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।)। এই দিব্যদৃষ্টি কিজন্য ? ভগবান কৃষ্ণ-বাসুদেবের প্রকৃত মৌলিক সত্তা 'বিশ্বরূপ' প্রত্যক্ষ করবার জন্য। এই বিশ্বরূপচেতনার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের সেই অষ্টত্রিংশৎ সূক্তে—অতিষ্ঠন্তং পরিবিশ্বে অভূষচ্ছিয়ো বাসাংনশ্চরতি স্বরোচিঃ/মহত্তদ্বৃষো অসুরস্য নামা বিশ্বরূপো অমৃতানি অস্থৌ ॥ এই মূলরূপই সকলরূপের উৎস এই উপলব্ধিও ঋগ্বেদেই লক্ষ্য করা যায়, যেখানে বলা হয়েছে—রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব/তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়—(৬।৪৭:১৮)। রক্ষণশীল বৈদিক সমাজ দীর্ঘকাল এই বিশ্বরূপকে আড়ালে রেখে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে থাকলেও, মহান ভারতসংস্কৃতির পূর্ণতা অর্জনে এই পুরুষ-সবিতা-বিশ্বরূপ উপলব্ধির নিশ্চিত প্রয়োজনীয়তা ঋগ্বেদ-সংকলনের শেষ পর্যায়েই (দশম মণ্ডলের পুরুষ সূক্ত বিবেচ্য) বিশেষ স্বীকৃতিলাভ করেছিল। ভগবান কৃষ্ণ-বাসুদেব কেবলমাত্র এই 'বিশ্বরূপ' পরিকল্পনাকে সুনিশ্চিতভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন নাই, সুদূর অতীতের বিস্মৃতির গর্ভ থেকে জ্ঞান-প্রজ্ঞারও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন (ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ / বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ)। এইভাবে দ্বন্দ্ববিরোধের অবসান ঘটিয়ে ভারতসংস্কৃতিতে উদ্ভূত সমস্ত অন্বেষণ এবং উপলব্ধিকে সমীকৃত এবং ঘনীভূত করে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে রূপায়িত করা হয়েছে—যে মহাবিগ্রহের প্রতিষ্ঠায় মহাভারত এবং পুরাণে বিধৃত কৃষ্ণজীবনকথার ভূমিকা ছিল প্রতিমা-বিগ্রহে মৃত্তিকা এবং বর্ণের প্রলেপদানের মতো। কৃষ্ণপ্রবাহের বহু উজানে কুহেলিকাচ্ছন্ন যে-সব মৌলিক উপলব্ধিকে রূপদানের মানসে ভারতের প্রজ্ঞাচিত্ত আত্মানুসন্ধানের পথে এগিয়ে চলেছিল তারই ফলশ্রুতি একসময়ে বেদ-নিরপেক্ষ নারায়ণের সঙ্গে বৈদিক বিষ্ণুচেতনার সংযোজনে ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণ মহাবিগ্রহে রূপগ্রহণ করেছিল (নারায়ণ-বাসুদেব-বিষ্ণু—তৈত্তিরীয় আরণ্যক)। ঐতিহাসিক যুগে পরমভাগবত পরিচয়ে আখ্যাত গুপ্তরাজন্যবর্গের শাসনকালে এই বাসুদেব-কৃষ্ণচেতনা এক কল্পবৃক্ষের স্বরূপ গ্রহণ করেছিল, যার পরিচয় আছে ৪৬১ বিক্রমসংবতের একটি শিলালিপিতে—ত্রিদশোদার ফলদং স্বর্গস্ত্রীচারুপল্লবম্/বিমানানেক বিটপং তোয়দাম্বু মধুস্রবম্/বাসুদেবং জগদ্বাসমপ্রমেয়মজং বিভুম। এই যুগে কৃষ্ণ-বাসুদেব-চেতনার রূপবিগ্রহ পূর্ণতালাভ করে থাকলেও সেই বিগ্রহ সেখানেই স্থির বা সীমিত

১১ দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় আবিষ্কৃত খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর বিষ্ণু-বাসুদেব মূর্তি

হয়ে থাকে নাই ; ভারতমানসে শ্রীকৃষ্ণ-রূপচেতনার নব নব বিকাশ ও উপলব্ধির কখনও বিরাম ঘটে নাই। ধ্যানদৃষ্টিসম্পন্ন কলাবিদেরা রচনা করেছেন বৈচিত্র্য-পূর্ণ নানা রূপ-বিগ্রহের। রচিত হয়েছে কত অসংখ্য গীত, কাব্য, গাথা, কাহিনী ; জাতির জীবনের এক মহাসঙ্কটলগ্নে পত্নী পদ্মাবতীকে সঙ্গে নিয়ে কবি জয়দেব সরস্বতী আসমুদ্র ভারতভূখণ্ড পরিক্রমা করে বহিরাগত এক বিপর্যয়কর সংস্কৃতির প্রতিরোধে আচার-অনুষ্ঠান-নিরপেক্ষ কৃষ্ণভক্তিচেতনার স্রোতকে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন। অদ্বৈতবাদী শংকর পরিবেশন করেছিলেন গোবিন্দানুরাগের অমৃত-ধারা। রামানুজ থেকে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সৃষ্টি করেছিলেন নূতন নূতন রূপের কৃষ্ণ-বিগ্রহ, যার ফলে উত্তুঙ্গ আকাশস্পর্শী মন্দির ভূলুণ্ঠিত হলেও ভগবান কৃষ্ণ এসে অধিষ্ঠিত হয়েছেন প্রতি মানুষের হৃদয়মন্দিরে—

> ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।
> ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ (গীতা, ১৮/৬১)

ভারতসংস্কৃতির সুবিস্তীর্ণ প্রেক্ষামঞ্চে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের রূপপ্রকল্প নির্ধারণের প্রয়াস যে এক অতি দুষ্কর অভিলাষ, এবিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। এই প্রচেষ্টায় ব্রতী হওয়ার পূর্বে এই কাজ যে কত দুঃসাধ্য হয়ে উঠতে পারে সে-সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হওয়া যায় নাই। লেখক না প্রকৃত ভক্ত, না আছে তার কৃষ্ণচেতনা-সমাকীর্ণ অন্তহীন অর্ণবস্বরূপ সাহিত্য বা শিল্পসম্পদের সামান্য অংশের সঙ্গেও পরিচয়। ফলে, রচনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পদে পদে ঐ সম্বন্ধে অনধিকারের উপলব্ধি ঘটেছে। অচিন্তনীয় কৃষ্ণবিগ্রহ গড়ে তুলতে গিয়ে প্রয়োজনানুরূপ উপকরণের যোগান সংগ্রহ করে ওঠা সম্ভব হয় নাই। ফলে, রচনায় সন্নিবদ্ধ বহু ত্রুটিতে বিদগ্ধ এবং ভক্তজনের প্রভূত বিরক্তি ঘটবার সম্ভাবনা রয়ে গিয়েছে, যার জন্য লেখক মার্জনাপ্রার্থী।

কিছুদিন পূর্বে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পরম শ্রদ্ধাভাজন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজের আশীর্বাদানুকূল্যে ঐ মঠে শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেব সম্পর্কে কিছু বলবার দুর্লভ সুযোগ ঘটেছিল। সেই বক্তব্যের কিয়দংশ মঠের মুখপত্র 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশিত হয়। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুকূল্যে রাজস্থানের সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ আসে। এই বক্তৃতা রচনাসূত্রে প্রবল সামরিক ঐতিহ্যসম্পন্ন রাজপুত জনমণ্ডলীর মধ্যে ভগবান কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ যে কী গভীরভাবে প্রচলিত রয়েছে সে-সম্বন্ধে পরিচয় ঘটে। এইভাবেই ভগবান

১২ যোগ-মূর্তি বাসুদেব-বিষ্ণু— মথুরা

কৃষ্ণ সম্পর্কে আলোচনার উৎসাহ জাগ্রত হয়। এই সময়ে 'সাহিত্যলোক' প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। বহু বিদগ্ধ পণ্ডিতজনের রচনা প্রকাশ করে শ্রীযুক্ত ঘোষ ব্যবসায়িক প্রেরণাকে অতিক্রম করে সংস্কৃতিচেতনার প্রসারে তাঁর দুঃসাহসের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমার রচনা সম্পর্কে নিজের যে দ্বিধা ছিল, তাকে আমল না দিয়ে তিনি এগিয়ে না এলে, এ গ্রন্থ রচনা সম্ভব হত না। সুষ্ঠুভাবে এই গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন তিনি, তার জন্য আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন করেছেন শ্রীদাশরথি মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীদেবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ-গ্রন্থগারিক শ্রীশান্তিপদ ভট্টাচার্য নাম সূচী প্রস্তুত করার কাজে সহায়তা করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষার কলিকাতা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ড° শচীন্দ্রশেখর বিশ্বাস প্রাক্তন শিক্ষকের প্রতি নানাভাবে তাঁর অনুরাগের পরিচয় দিয়ে থাকেন। এই গ্রন্থরচনায় উৎসাহ দিয়ে এবং তাঁর দপ্তর থেকে কয়েকটি মূর্তি প্রতিমার প্রতিরূপায়ণ প্রকাশেব অনুমতি এবং সেইসব মূর্তির ফোটো সরবরাহ করে তিনি অনেক সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমার আশীর্বাদ জ্ঞাপন করছি।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে অনুশীলনের কিছু প্রবণতা যে বর্তমানে দেখা দিয়েছে, সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি পুস্তকে এই তথ্য লক্ষ্য করা যায়। নানা বিচ্ছিন্নতায় জর্জরিত ভারতীয় জনসমাজের সম্মুখে সঙ্কটের যে মহার্ণব আবর্তিত তাতে শ্রীকৃষ্ণ উপলব্ধিকে কাণ্ডারীরূপে গ্রহণ করবার প্রয়াস ইতিহাস-নির্দিষ্ট বলেই মনে হতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রচলিত উপলব্ধি থেকে কিছু স্বতন্ত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-বিশ্বরূপ মহাবিগ্রহের পটভূমিকায় ভারতসংস্কৃতির বিবর্তনের যে রূপ-রেখা লেখকের মানসদৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয়েছে, তারই কিছু এই রচনায় পরিবেশনের দুঃসাহসিক প্রয়াস করা হয়েছে। অনেকের নিকট নানা ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ বলে গণ্য হলেও, যাঁরা ধৈর্য নিয়ে এই রচনা পাঠ করবেন তাঁদের আগাম শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করা হল।

ওঁ তৎ সৎ ॥ শ্রীকৃষ্ণায়ার্পণমস্তু।

৫৬-ই কাঁকুলিয়া রোড
কলিকাতা ৭০০০২৯
শ্রাবণ ১৩৯৬

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সূচীপত্র

১

কৃষ্ণ জিজ্ঞাসার ভূমিকা

কৃষ্ণচেতনা আসমুদ্র ভারতের এক অপ্রমেয় সম্পদ, ভারত সংস্কৃতির এক অবর্ণনীয় ঐশ্বর্য। উত্তরে উত্তুঙ্গ হিমালয়-সন্ধিতে প্রখ্যাত বদরিকাক্ষেত্র, দক্ষিণে কেরালায় গুরুভাযুর, পশ্চিমের সাগবকুক্ষিতে দ্বারকা, পূবে সাগববেলায় নীলাচল জগন্নাথ-তীর্থ, এই আসমুদ্র প্রসারিত ভারত ভূখণ্ড ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র। যে ধর্মে কোন ক্ষমতা-কেন্দ্রিক সংগঠন নাই, যে সংস্কৃতিব প্রচাবে কখনও কোন নির্মমতা বা প্রলোভনেব প্রয়োগ হয়নি, সেই ভাবতসংস্কৃতিব নিবেদিতচিত্ত প্রাণ-পুরুষ কৃষ্ণ ভগবান কত যুগ থেকেই না অগণিত মানুষেব জীবনের দিশারীরূপে এই মহাদেশ ভাবতভূমির মানসসত্তাকে প্রোদ্ভাসিত করে এসেছেন। ভাবত তার চেতনায়, চিন্তায়, জ্ঞানে ও উপলব্ধিতে ভগবান কৃষ্ণকে একান্ত প্রাণস্বরূপে আত্মস্থ কবে থাকলেও অভারতীয় ভারত-অনুসন্ধিৎসুদেব কাছে কৃষ্ণ এক পরম রহস্যসমাকুল এবং সমস্যাপূর্ণ, বিস্ময়কর অস্তিত্ব বলে পবিগণিত হয়ে এসেছেন। আমরা ভাবতবাসীবা এই কৃষ্ণচেতনায় এত নিমগ্ন যে কৃষ্ণ সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসা, কোন সমস্যা বা বিস্ময আমাদের উদ্বিগ্ন করে না। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানবাদী, বিশ্লেষণপন্থী ঐতিহাসিকেরা কিন্তু এক অপরিসীম বিস্ময় ও কৌতূহলের দৃষ্টিতে এই কৃষ্ণচরিত্র ও কৃষ্ণচেতনার প্রসার সম্পর্কে ব্যাপক জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছে লক্ষ্য কবা যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ধারণা স্বভাবতই খ্রীস্টভিত্তিক চেতনা-গণ্ডীব দ্বারা সীমিত। তাই তাঁরা মনে কবেন কোন ধর্মপ্রচারকের পক্ষে ছাড়া এই ধরনেব স্বীকৃতিলাভ করা, যেমন খ্রীষ্টীয় ধর্মের ক্ষেত্রে যীশুখ্রীস্টের বা ইসলামীয় ধর্মের বেলায় মহম্মদেব পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, তেমনটি কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু একান্ত বিস্ময়ের সঙ্গে তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো তেমন কোন নূতন ধর্মের প্রচার করেননি, সৃষ্টি কবেননি তেমন নূতন কোন সম্প্রদায়েব। তা সত্ত্বেও কি করে এই কৃষ্ণচেতনা ভারত উপমহাদেশে এমন ব্যাপক বিস্তৃতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল তার অনুধাবনে এইসব বৈদেশিক জিজ্ঞাসুদের মনে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার ঘটেছিল লক্ষ্য করা যায়। অনেকের মনে সন্দেহের সঞ্চার হয়েছে, কৃষ্ণ কি সত্যই কোন ঐতিহাসিক মানুষ-

রূপে বর্তমান ছিলেন—যদি তাই হয়ে থাকে তবে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল ইতিহাসের কোন্ যুগে ? কবে, কিভাবে তিনি উপাস্য দেবতায় উন্নীত হয়েছিলেন—কি করে তিনি পুরুষোত্তম পূর্ণব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, এমনি কত জিজ্ঞাসা। এইসব নানা গূঢ় জিজ্ঞাসা দ্বারা প্রণোদিত হয়েই তাঁরা যেমন কৃষ্ণসত্তার অনুসরণে ব্রতী হয়েছেন তেমনি এইসব নূতন প্রবণতার প্রভাবে ভারতবাসীর মনেও এই ধরনের নানা জিজ্ঞাসার সঞ্চার ঘটেছে। ফলে এই পরমরহস্যপুরুষ ভগবান কৃষ্ণকে অবলম্বন করে নানা আলোচনা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা সিদ্ধান্তেরও উদ্ভব ঘটেছে দেখা যায়।

অভারতীয় দৃষ্টিতে কৃষ্ণ

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে ইউরোপীয় প্রভাব ক্রমে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। সেই থেকেই সম্ভবত শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বিস্তৃত চেতনা তাদের কৌতূহল জাগায়। খ্রীষ্টীয় মিশনারিরা তাদের ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হলে, ভারতীয় মানসে, বিশেষ করে বাংলায় এই কৃষ্ণ বিষয়ে অনুরাগকে তাদের প্রচারের প্রথম অন্তরায় বলে লক্ষ্য করেছিল। অন্যদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বলে প্রচলিত অপরিসীম জনপ্রিয়তার আধার অলৌকিক জ্ঞানগর্ভ মহাগ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই সর্বপ্রথম এই পাশ্চাত্য অনুসন্ধিৎসু কোন কোন জিজ্ঞাসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বলে লক্ষ্য করা যায়। ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির করণিক, পরে নাইট উপাধিতে ভূষিত ও ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের সভ্যপদে নির্বাচিত চার্লস উইলকিনস ইংরাজীতে গীতার একখানি অনুবাদ করেন। ভারতে ছাপাখানা না থাকায় এই অনুবাদ গ্রন্থটি লণ্ডন সহরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। গীতার এই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্যভাষার অনুবাদের সঙ্গে ভারতে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কিছু ইতিহাস জড়িত আছে। এদেশে ঔপনিবেশিক শাসন প্রসারের সেটা ছিল এক প্রারম্ভিক কাল। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর আম্রকাননে এক যুদ্ধের প্রহসনের মাধ্যমে ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্যচক্রের বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটলেও ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে বাংলার নবাব মীরকাশিম, অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা ও দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলম সম্মিলিত শক্তি নিয়ে ইংরাজ সম্প্রসারণবাদকে প্রতিহত করবার চেষ্টা করেছিলেন। বিহারে অবস্থিত বক্সারের সন্নিকটে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সংঘটিত সংগ্রামে এই

প্রতিরোধ ব্যর্থকাম হলে নিশ্চিতভাবে ভারতে বৃটিশ উপনিবেশ বিস্তার ও প্রসারের পথ উন্মোচিত হয়ে যায়। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে, ক্রমবর্ধমান ইংরাজশক্তির উপর নির্ভরশীল বাদশাহ শাহ আলম, বিজেতা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানির সনদ দান করলে এই বিস্তৃত অঞ্চলের উপর ইংরাজের আধিপত্য প্রকৃত স্বীকৃতি লাভ করল এবং সেই থেকেই ইংরাজ শক্তি ভারত সমাজের নিকট-সান্নিধ্যে আসতে আরম্ভ করল। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে ভারতীয় সমাজের সঙ্গে ইংরাজদের ঘনিষ্ঠতায় আসার প্রয়াস রূপ গ্রহণ করতে থাকে, এবং শাসিত সম্প্রদায়ের ভাষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাদের অনুসন্ধিৎসা দেখা দেয়। কোম্পানির করণিক উইলকিনসকে এই সময়েই হেস্টিংস কার্য-উপলক্ষ্যে বারাণসীতে প্রেরণ করেছিলেন। সেখানে উইলকিনস স্থানীয় পণ্ডিত শ্রেণীর সংস্পর্শে এসে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তাঁর এই সংস্কৃতচর্চা এবং ভারত-সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর আগ্রহই তাঁকে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার অনুবাদে প্রবুদ্ধ করেছিল। এছাড়া তিনি মহাভারত গ্রন্থেরও একখানি অনুবাদ রচনা করেছিলেন যার হস্তলিখিত *পাণ্ডুলিপিটি এখনও* কলকাতার *এশিয়াটিক সোসাইটিতে* সংরক্ষিত আছে। ভারতের মৌলিক সংস্কৃতি ও চিন্তা সম্পর্কে এই অনুসন্ধিৎসা থেকে উইলকিনসের মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। পরে এই উইলকিনসের উদ্যোগে বাংলায় হরফ প্রস্তুত ও ছাপাখানারও প্রবর্তন হয়েছিল। তবে এই উদ্যোগ অপেক্ষাও গীতার অনুবাদেই উইলকিনসের বৈশিষ্ট্য বেশি লক্ষ করা যায়। গীতার অনুবাদ মুদ্রণের কোন সুযোগ তখন কলকাতায় না থাকায় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি লণ্ডনে প্রেরিত হয়। সেখানে এই পুস্তকখানি মুদ্রিত করে দেবার অনুরোধ জানিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস তৎকালীন কোম্পানির লণ্ডনস্থ অধিকর্তাকে যে পত্রখানি প্রেরণ করেছিলেন মুদ্রিত গীতার সঙ্গে সেই পত্রখানিকে এই অনুবাদ গ্রন্থের মুখবন্ধরূপে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছিল। গীতার এই প্রথম ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় হেস্টিংস যে মন্তব্য করেছিলেন, গীতা তথা কৃষ্ণচর্চার নববিবর্তনের ক্ষেত্রে তার মূল্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া হয়ত একান্তভাবেই বাঞ্ছনীয়।

হেস্টিংস লিখেছিলেন "গীতার প্রাচীনত্ব এবং যে পূজা উহা বহুশতাব্দী যাবৎ মনুষ্যজাতির এক বৃহৎ অংশের নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছে তাহার দ্বারা

গীতা সাহিত্য-জগতে এক অভূতপূর্ব বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। উহার সাহিত্যিক গুণাবলী জগতে অননুকরণীয়। গীতা পাঠে শুধু ইংরাজগণ কেন, সমগ্র বিশ্ববাসী উপকৃত হইবেন। গীতাধর্মের অনুশীলনে মানব-জীবন শান্তিধামে পরিণত হইবে। ...যদিও ইউরোপের সভ্যতা, ধর্মাচরণ ও নৈতিক ব্যবহার গীতোক্ত শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তথাপি উহা আমাদের ধর্মসাধনে ও নৈতিক কর্তব্যপালনে বিশেষ সহায়ক হইবে। ...গীতার মৌলিকত্ব, ভাবের গভীরতা ও অভিনবত্ব, দার্শনিক-তত্ত্বের উচ্চতা, বলিষ্ঠ যুক্তিতর্ক ও ব্যাখ্যা-কৌশল অপূর্ব ও অসাধারণ। গীতার উপদেশে খ্রীস্টানধর্মের মূলসূত্রগুলির প্রকৃত ও সরল ব্যাখ্যা পাওয়া যায়" [উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত শ্রীমদ্ভগবদগীতার ভূমিকায় স্বামী জগদীশ্বরানন্দ-কর্তৃক প্রদত্ত অনুবাদ]। ভারতসংস্কৃতির সঙ্গে সংস্পর্শের প্রাথমিক অবস্থায় দুর্বার সাম্রাজ্য-প্রসারকারী শাসকের লেখনীতে ভারত সংস্কৃতির মৌলিক প্রতি-বেদন এই ভগবদ্গীতা নামক মহাগ্রন্থ সম্পর্কে যে প্রভূত বিস্ময় ও শ্রদ্ধার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, পরে অনেক ক্ষেত্রেই সেই দৃষ্টিভঙ্গী আর রক্ষিত হয়নি। এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের সঙ্গে ভারতের প্রচলিত সংস্কৃতি ও সাধনা সম্পর্কে পাশ্চাত্য ভারত-জিজ্ঞাসুদের আচরণের যে পরিবর্তন প্রকাশ পেয়েছে তাও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়।

কৃষ্ণ সম্পর্কে আগ্রহের পরিচয় এরপরে লক্ষ্য করা যায় স্যার উইলিয়ম জোন্স রচিত প্রাচীন বাংলার সুবিখ্যাত কবি-সাধক জয়দেব গোস্বামীর প্রখ্যাত গীতগোবিন্দ কাব্যের অনুবাদে। প্রভূত প্রতিভার অধিকারী, বহুভাষাবিদ উইলিয়াম জোন্স তৎকালীন সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিরূপে ভারতে আসেন। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হলে জোন্সকে এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মনোনীত করা হয়। ইংরাজশাসকদের মধ্যে উপলব্ধিসম্পন্ন কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি যে ভারতসংস্কৃতি সম্বন্ধে সেই সময়ে বেশ উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন, এশিয়াটিক সোসাইটির এক অধিবেশনে উইলিয়াম জোন্সের প্রদত্ত একটি ভাষণে তার পরিচয় বিধৃত আছে। সংস্কৃতভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জোন্স এই ভাষণে বলেছিলেন : The Sanskrit Language, whatever be its antiquity is of a wonderful structure. More perfect than the Greek, more copious than the Latin and more exquisitely refined than either, yet bearing to both a close affinity, in the roots of verbs and the

forms of grammar, than could possibly have been produced by accident that no philologer could examine them all three, without believing them to have sprung form some common source, which perhaps no longer exists— ।[১] শাসক সমাজের অত্যন্ত উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত এবং সাংস্কৃতিক বিদগ্ধতায় সমাহিত হয়েও জোন্স শাসিত জাতির সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে উপলব্ধি ও সহানুভূতির পরিচয় রেখেছেন, উপরে উদ্ধৃত উক্তিতেই শুধু তার পরিচয় পাওয়া যায় না ; জয়দেব-কৃত গীতগোবিন্দের অন্তর্নিহিত মর্ম ও রসানুসন্ধানের প্রয়াসেও তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। এই গীতগোবিন্দ কাব্যে কৃষ্ণ-চেতনাকে অবলম্বন করে একটা যুগসন্ধি অতিক্রমণের যে দিকনির্দেশ ছিল তার পূর্ণ মূল্যায়ন এখনও হয়নি। তবে জোন্স তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনুভূতি ও প্রজ্ঞার সাহায্যে গোস্বামী জয়দেব পরিবেশিত শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করে ভক্তিসাধনার গভীর রসকে যে অত্যন্ত নিবিড়ভাবেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর রচিত গীতগোবিন্দের একান্ত দরদপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী অনুবাদ থেকে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

কৃষ্ণ সম্বন্ধে এই অনুরাগ ও উপলব্ধির প্রয়াস কিন্তু শাসকসমাজে বা পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহলে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বস্তুত ভারতসংস্কৃতির বিস্তৃত ও মৌলিক রূপ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসাও যে ক্রমে সবিশেষ পরিবর্তন লাভ করেছিল তার পরিচয় ভারতে নিযুক্ত অনেক ইংরাজ শাসক-কর্মচারীর এদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অনুশীলনের ফলে যে অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছিল তা থেকে উপলব্ধি করা যায়। ভারতে ইংরাজশাসন প্রসারলাভের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যে ভারতের সংস্কৃতি, বিশেষ করে সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে অত্যন্ত ব্যাপক আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। এই সূত্রেই প্রতীয়মান হয়েছিল যে ইউরোপীয় ভাষাসমূহের সঙ্গে সংস্কৃতের এক আশ্চর্য সাদৃশ্য বর্তমান রয়েছে। এই সাদৃশ্যের কারণ-সম্পর্কে তাদের মনে গুরুতর প্রশ্ন জাগে যা তাদের গভীরভাবে ভাবিত করে তোলে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপে সংস্কৃতচর্চা বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করেছিল এবং ইংলণ্ড ছাড়া ফরাসী ও জার্মান দেশেও সংস্কৃত সম্পর্কে ব্যাপক ঔৎসুক্য দেখা দেয়। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে জার্মান পণ্ডিত এ. ডব্লিউ. শ্লেগেল (১৭৬৭-১৮৪৫) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন। গীতার এই ল্যাটিন অনুবাদ ইউরোপের বিদগ্ধ সমাজে গীতাকে বিশেষ জনপ্রিয় করে তুলেছিল। শ্লেগেলের রচিত গীতার

অনুবাদ পড়ে সে যুগের একজন বিখ্যাত জার্মান মনীষী উইলহেলম্ ফন্ হামবোল্ড মন্তব্য করেছিলেন যে, "গীতার মত সুললিত, সত্য ও সুগভীর তত্ত্বপূর্ণ পদ্যগ্রন্থ সম্ভবত পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় নাই।"

কৃষ্ণসম্পর্কে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা

এর পর কলকাতার টাঁকশালের তদানীন্তন অধিকর্তা হোরেস হেম্যান উইলসনের (১৭৮৬-১৮৬০) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। উইলসন ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় আসেন এবং অচিরকালের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সময় সংস্কৃতচর্চার জন্য Boden Professorship নামে একটি অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয়। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে উইলসন দেশে ফিরে বোডেন অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং দীর্ঘকাল এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে ইংলণ্ডে সংস্কৃতচর্চার প্রসার সাধন করেছিলেন। অত্যন্ত কর্মতৎপরতার সঙ্গে নানা গ্রন্থ রচনা করে অধ্যাপক উইলসন ভারত-সংস্কৃতির বহু দিগন্ত সম্পর্কে পাশ্চাত্যরীতির অনুসন্ধিৎসার ব্যাপক পরিচয় দিয়েছেন। একক প্রয়াসে সমগ্র ঋগ্বেদের যে অনুবাদ তিনি ইংরাজী ভাষায় করেছিলেন, ম্যাক্সমুলার কৃত ঋগ্বেদের অনুবাদের মত তেমন প্রচারলাভ না করলেও সেই অনুবাদের সরলতা পাশ্চাত্যে বেদসাহিত্য প্রচারে যথেষ্ট ফলবতী হয়েছিল সন্দেহ নাই। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে উইলসন কৃষ্ণচর্চা তথা ভাগবত ধর্মবিষয়ক আকর-গ্রন্থ বিষ্ণুপুরাণের বিস্তৃত ভূমিকা সম্বলিত একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি Sketches of Religious Sects of the Hindus নামক ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়সমূহের উপর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থটি প্রকাশ করে ভারতীয় সাধনধারাসমূহ সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক আগ্রহ ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। বস্তুত বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদের ভূমিকা ও Sketches of Religious Sects of the Hindus গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট বৈষ্ণবসম্প্রদায় সম্পর্কিত আলোচনাতেই আধুনিক কৃষ্ণবিষয়ক আলোচনার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উইলসনই প্রথম ভারত-মানসের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও প্রগাঢ় ভক্তির পাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস করেন, যার ফলে ভারতসংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহশীল ও জিজ্ঞাসুদের মনে কৃষ্ণ-বাসুদেব সম্পর্কে এক রহস্যঘন অনুসন্ধিৎসার উদ্ভব ঘটেছিল।

এই অনুসন্ধিৎসার ফলেই দেখা যায় যে, ভারত-মানসের অন্য এক আদর্শপুরুষ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জীবনালেখ্য রামায়ণ মহাকাব্যে সামগ্রিকভাবে পাওয়া গেলেও কোন একটি আকরগ্রন্থে ভগবান কৃষ্ণ-বাসুদেবের সমগ্র জীবনালেখ্য সন্নিবিষ্ট পাওয়া যায় না। বাসুদেব-কৃষ্ণের পরিণত জীবনের বিস্তৃত কর্মকাহিনীর প্রধান আকরগ্রন্থ অবশ্য মহাভারত। পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলার কৈলানগ্রামে আবিষ্কৃত শ্রীধরণরাতের তাম্রশাসনে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে একটি উক্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যা এখানে বিশেষ যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয়। আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতে সমতট অঞ্চলের আধিপত্যে সমাসীন রাজা শ্রীধরণরাত নিজেকে পুরুষোত্তমের ভক্ত উপাসক বলে অভিহিত করেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে অভিহিত করেছেন 'মহাভারত-তন্ত্রধার' এই আখ্যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন :

'যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সবভাবেন ভারত॥' (১৫।১৯)

পুরুষোত্তমরূপে অভিহিত এই রহস্য-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে 'মহাভারত-তন্ত্রধার' আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে তা যে একান্তই যুক্তিযুক্ত হয়েছে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই পুরুষোত্তম এবং 'মহাভারত-তন্ত্রধার' 'বাসুদেব' কৃষ্ণই ধীরে ধীরে 'মহাভারত' গ্রন্থের বর্ণনার মধ্যে পরিপূর্ণ ব্রহ্মসত্তায় সম্প্রতিষ্ঠিত হয়ে পরম শরণাগতবৎসল ভক্তিবিগ্রহ, সকল সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিয়ামক, পরমারাধ্য দেবতারূপে গণ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এই কৃষ্ণ-জীবনালেখ্যের সন্ধানীদের নিকট স্বভাবতই প্রতীয়মান হয়েছিল যে ঐ বিপুল মহাভারত গ্রন্থেও কৃষ্ণ-ভগবানের সমগ্র জীবনকাহিনী বিধৃত নাই। মহাভারতের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণের প্রথম উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় পাঞ্চালরাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সমাবেশ উপলক্ষ্যে; এই উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণনা প্রসঙ্গে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সমাগত অসংখ্য রাজন্য ও ক্ষত্রিয় বীরদের উপস্থিতির উল্লেখ করা হয়েছে। আছেন বৃষ্ণিবীর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ। যখন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরে অর্জুন শরসন্ধানে লক্ষ্যভেদ করলেন তখন সেই সমাবেশে বিপুল উত্তেজনা দেখা দিল। পরে মাল্যপ্রদানকারী পাঞ্চালনন্দিনী দ্রৌপদীকে গ্রহণ করে সভাপরিত্যাগ করবার উদ্যোগ করলে অন্যান্য ক্ষত্রিয় বীরেরা ব্রাহ্মণ বেশধারী পাণ্ডবদের বাধা দিতে চেষ্টা করেন। সম্মিলিত সেই প্রতিবন্ধক ব্যর্থ করে পাণ্ডবভ্রাতারা নির্বিঘ্নে

নিষ্ক্রান্ত হয়ে যেতে সক্ষম হন। এই বিস্ময়কর বীরত্ব লক্ষ্য করে কৃষ্ণই সেই লক্ষ্যভেদকারীকে অর্জুন ও তাঁর সঙ্গীদের পাণ্ডব ভ্রাতৃবৃন্দ বলে চিনতে পেরেছিলেন।[২]

মহাভারতের বর্ণনায় সেই প্রথম আবির্ভাব থেকে যদুবংশ ধ্বংসের পর জরা নামক ব্যাধের নিক্ষিপ্ত বাণে নিহত হয়ে জীবনাবসান পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণজীবনলীলাই মহাভারত গ্রন্থের মূল এবং প্রধান অবলম্বন। এই গ্রন্থে কৃষ্ণজীবনের বিস্তৃত বর্ণনা থাকলেও জন্মকাল থেকে সেই যৌবনাবস্থা পর্যন্ত জীবনকাহিনীর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এখানে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাল থেকে প্রারম্ভিক জীবনের অনুল্লেখ একান্তই রহস্যজনক বলে প্রতীয়মান হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। এই পরিদৃশ্যমান ত্রুটির অপনোদনের জন্যই যেন শ্রীকৃষ্ণের প্রারম্ভিক জীবনালেখ্যের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত কাহিনীর অবলম্বনরূপে মহাভারতের 'খিল' বা উপসংহার হিসেবে হরিবংশ পুরাণ রচিত হয়েছিল।

হরিবংশ পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন সম্পর্কিত বিস্তৃত জীবনলীলার ভূমিকা হিসেবে শ্রীহরি নামে অভিহিত ভগবান বিষ্ণুর নানা কীর্তি-কাহিনীর বর্ণনাও এই গ্রন্থে গ্রথিত করা হয়। এই বিবরণ প্রসঙ্গেই বিষ্ণুর কংস কারাগারে দেবকীগর্ভে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হওয়ার উল্লেখ এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিষ্ণু-কৃষ্ণের অভিন্নত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে দেখা যায়। কৃষ্ণজীবনের এই প্রারম্ভিক কাহিনী, যা মহাভারতে অনুল্লিখিত, তার বিবরণ হরিবংশ ছাড়াও বিষ্ণু, বায়ু, ভাগবত ইত্যাদি অন্যান্য কতিপয় পুরাণেও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত রয়েছে দেখা যায়। বিস্তৃত এই পুরাণ-সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণের এই প্রারম্ভিক জীবনের বর্ণনায় মৌলিক সাদৃশ্য থাকলেও বিভিন্ন বর্ণনায় বেশকিছু বৈসাদৃশ্য এবং অভিনবত্বও দেখা দিয়েছিল। কৃষ্ণজীবনের এই লীলা-বৈচিত্র্যের বিবর্তনে বিশ্লেষণ-পারদর্শী পণ্ডিতেরা সংস্কৃতিধারার নানা কৌশলপূর্ণ সংযোজন ও পরিবর্ধনের পরিচয় লক্ষ্য করেছেন এবং কৃষ্ণসাধনার মধ্যেও নানা বৈচিত্র্য ও বৈলক্ষণ্য খুঁজে পেয়েছেন। আর এইসব অন্বেষণ-বিশ্লেষণ নিয়েই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অনুশীলন ও চর্চার ক্রম-বিবর্তন ঘটেছে।

অধ্যাপক উইলসন ভারতীয় ধর্মসাধনা নিয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন সেই প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেই তৎপদানুবর্তী ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন-সন্ধানীদের অনেকেই ভারতসংস্কৃতিতে কৃষ্ণবিষয়ক সমস্যা নিয়ে অনুশীলনে

প্রবৃত্ত হয়েছেন। সেই অবধি কৃষ্ণ জিজ্ঞাসায় নানা পণ্ডিতের দ্বারা বহুবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিমতও আত্মপ্রকাশ করেছে দেখা যায়। প্রথমেই সমস্যা দেখা দিয়েছে শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিকত্ব এবং তাঁর আবির্ভাবের কাল নিয়ে। এরপর যে-সব সমস্যা এই অনুসন্ধিৎসুদের বিব্রত করেছে তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় এবং তিনি কি করে মানুষ হয়েও দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এইসবই প্রধান। এই ধরনের নানা সমস্যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা জটিল সমস্যা দাঁড়িয়েছে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত যদুবংশীয় ক্ষণজন্মা পুরুষ বাসুদেবের সঙ্গে বৃন্দাবনের গোপসমাজে লালিত, ভাগবতে বর্ণিত গোপিনী মনোমোহন, এবং জয়দেবের কাব্যে সমুদ্বেলিত, রাধাপ্রেমে অভিসিঞ্চিত শ্রীকৃষ্ণের সমন্বয়ের সমস্যা। বস্তুত দীর্ঘকালব্যাপী অত্যন্ত গভীর ও বহুবিস্তৃত অন্বেষণ, বিশ্লেষণ, অনুশীলনের ফলশ্রুতিস্বরূপ বহু মন্তব্য এবং নানা বিচিত্র সিদ্ধান্তের অবতারণা হয়ে থাকলেও বাসুদেব-কৃষ্ণ সম্পর্কিত নানা সমস্যার এবং বহু রহস্যের এখনও উপযুক্ত সমাধান হয়েছে বলে মনে হয় না।

এইসব সমস্যাঘন প্রতিবেদনের মধ্যে কয়েকটি ক্রান্তিবিন্দু অনুধাবন না করলে বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ কৃষ্ণরস-প্রবাহকে সমীক্ষণ করা সম্ভবপর নয়। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ নামের প্রয়োগ, ব্যবহার ও উল্লেখ ব্যাপকভাবেই হয়ে থাকলেও তাঁর ঐশীসত্তার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'বাসুদেব' এই নামের অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস অত্যন্ত স্পষ্ট। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব নামক অংশে সন্নিবিষ্ট অষ্টাদশ-অধ্যায়যুক্ত উপনিষৎ নামে অভিহিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপ-দর্শন নামক একাদশ অধ্যায়ে ভগবান কৃষ্ণ আদিদেব, পুরাণপুরুষ, মহাযোগেশ্বর হরি এবং বিষ্ণু এইসব আখ্যায় অভিহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত 'চতুর্ভুজ বাসুদেব'রূপে অর্জুনকে স্বকীয় রূপ প্রদর্শন করেছিলেন এই বিবরণ বিধৃত আছে। অদৃষ্টপূর্ব, অতিভয়-সমাকীর্ণ বিশ্বরূপ দর্শনে হতবুদ্ধি অর্জুন হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা এই সম্বোধনান্তর পরমপুরুষের দেবরূপ দর্শন করতে চাইলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বসুদেব-গৃহজাত তাঁর চতুর্ভুজ বিশিষ্ট স্বকীয় রূপে দর্শন দিয়েছিলেন :

> কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
> তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥...
> ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
> আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥"

সঞ্জয় এখানে কৃষ্ণের যে 'স্বকং রূপং' বা স্বকীয় রূপের উল্লেখ করেছেন তা শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেব রূপ। এই প্রসঙ্গে হয়ত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সদ্যোজাত শিশু কংস কারাগারে আবদ্ধ পিতামাতাকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধৃত চতুর্ভুজ রূপ প্রদর্শন করেছিলেন, এই ঘটনার উল্লেখ হরিবংশ পুরাণেও দেখা যায়। এই রূপদৃষ্টে ভীত বসুদেবকে নবজাতক ঐ রূপ সম্বরণ করে তাকে নন্দগোপগৃহে রেখে আসবার অনুজ্ঞা করেছিলেন :

শ্রীবৎসলক্ষণং দৃষ্ট্বা যুতং দিব্যৈশ্চ লক্ষণৈঃ।
উবাচ বসুদেবস্তু রূপং সংহর বৈ প্রভো॥...
বসুদেববচঃ শ্রুত্বা রূপং চাহরদচ্যুতঃ।
অনুজ্ঞাপ্য পিতৃত্বেন নন্দগোপং গৃহং নয়॥[৩]

বিষ্ণুপুরাণেও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম উপলক্ষ্যে অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যায় :

ফুল্লেন্দীবরপত্রাভং চতুর্বাহুমুদীক্ষ্য তম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং জাতং তুষ্টাবানকদুন্দুভিঃ॥[৪]

গীতার এই অংশ, হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণের উপর নির্ভর করে দেবকীর অষ্টম-গর্ভজাত বসুদেবের সন্তান যে সহজাত চতুর্ভুজ রূপ নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন এই বিশ্বাস বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল তা উপলব্ধি করা যায়। এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই যে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-হস্ত চতুর্ভুজ বাসুদেব বিষ্ণুমূর্তির পরিকল্পনা হয়েছিল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুব অন্যায় নয়। পদ্মতন্ত্র নামে পরিচিত একটি পাঞ্চরাত্র-গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে বসুদেবের পুত্রের মূর্তি বাসুদেব মূর্তির মত হবে। স্বভাবতই উপলব্ধি করা যায় যে পাঞ্চরাত্র-পন্থীরা দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত বসুদেবপুত্রের শ্রীবৎসচিহ্নসহ ও চতুর্ভুজ আকৃতিতে প্রকট হওয়ার প্রচলিত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই তাঁদের প্রতিমা বা অর্চার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। বহু প্রাচীনকাল থেকেই বিষ্ণুপূজায় 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত হয়ে আসছে।

কৃষ্ণচর্চার প্রারম্ভকাল থেকেই বাসুদেবতত্ত্ব নিয়ে অতি জটিল সমস্যার উদ্ভব ঘটেছিল লক্ষ্য করা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩/১৭) ঋষি ঘোর আঙ্গিরসের নামের সঙ্গে সূর্যের উপাসক দেবকীর পুত্র এক কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। এই ঋষি

ঘোর আঙ্গিরসের নাম ও তাঁর দুই পুত্র কণ্ব ও প্রকণ্বের উল্লেখ ঋগ্বেদেও দেখা যায়। অনেকে ছান্দোগ্যের এই কৃষ্ণ এবং বাসুদেব কৃষ্ণকে অভিন্ন বলে মনে করলেও প্রত্যক্ষভাবে বাসুদেব এই নামের উল্লেখ বোধহয় পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতেই প্রথম দেখা যায়। এখানে বাসুদেব নাম অর্জুন নামের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে (বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন—৪।৩।৯৮)। অন্য ক্ষত্রিয়নামের সঙ্গে ভিন্ন প্রত্যয়ের ব্যবহার থাকলেও বিশেষ করে বাসুদেব ও অর্জুনের ক্ষেত্রে কেন বুন্ প্রত্যয়ের ব্যবহার হবে তার ব্যাখ্যা দিতে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্যকার পতঞ্জলি বলেছেন যে এই বাসুদেব ও অর্জুন, এঁরা সাধারণ ক্ষত্রিয় নন ; এঁরা একান্তই পূজনীয় দেবপদবাচ্য। এই সূত্রে বলা যায় যে বাসুদেব এবং অর্জুন পাণিনির আবির্ভাবকালেই দেবতা বলে গণ্য হয়েছিলেন। পাণিনি বাসুদেবের মত বলদেব নামের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন, পাণিনির এই সূত্রে এমনি একটি লক্ষণীয় ইঙ্গিত আছে।[৫] পতঞ্জলি এই সূত্র অনুসারে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব ও বলদেব নাম থেকে বাসুদেব ও বলদেব নাম সম্পন্ন হয়। এইসব প্রাচীন গ্রন্থে গোপাল কৃষ্ণের কোন উল্লেখ না থাকায় পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার পাণিনি সূত্রের বাসুদেবকে পূর্বোক্ত দেবকীপুত্র কৃষ্ণ থেকে স্বতন্ত্র বলে ধরে নিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের বাইরে, বিশেষত ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আগ্রহ জাগবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, জ্ঞান ও উপলব্ধি সম্পর্কে তখন যে সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার ভাব জেগেছিল তা কিন্তু বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। এদিকে ভারতেও ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত ব্রিটিশ আমলা কর্মচারীদের মধ্যে ক্রমে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি অনুকম্পামিশ্রিত তাচ্ছিল্যের ভাব আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এই পর্যায়েই দেখা যায় যে ওয়ার্ড এবং উইলিয়াম কেরীর ভারতীয় সংস্কৃতির আলোচনায় ব্রাহ্মণ্য চিন্তা ও উপলব্ধির ত্রুটি-বিচ্যুতি ও নানা দুর্বলতাকেই প্রাধান্য দেওয়া হতে থাকে। তবে এই পর্যায়েও যেসব ইংরাজ সরকারী কর্মচারী ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে সবিশেষ সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কর্নেল জেমস্ টডের নাম উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে। টড ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগে রাজস্থানের বিভিন্ন রাজপুত রাজ্যে কোম্পানির প্রতিনিধিরূপে জীবনের বহু বৎসর অতিবাহিত করে ভারতসংস্কৃতি ও রাজপুত জীবনপ্রবাহ সম্পর্কে যে গভীর

অনুরাগ লাভ করেছিলেন, তাঁর রচিত 'Annals and Antiquities of Rajasthan' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে তাব পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত ভারত-বর্ষের কোন একটি অঞ্চল ও সেখানকার জনমানস সম্পর্কে বিস্তৃত এবং বিশ্লেষণধর্মী অনুরূপ আলোচনা টডের পূর্বে আর কেউ করেননি। কিন্তু ভারতসংস্কৃতি ও রাজপুত জাতির প্রতি এই অনুরাগ টডের কর্মজীবনের পক্ষে সুখকর হয়নি। সম্ভবত এই ভারতানুরাগের ফলেই তাঁকে শাসন কর্তৃপক্ষের নিকট অপ্রীতিভাজন হতে হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত পূর্ণ কার্যকাল সমাপ্তির পূর্বেই তাঁকে অবসর গ্রহণ করতে হয়েছিল।

রাজস্থানের সংস্কৃতির বিবরণ প্রসঙ্গেই টড কৃষ্ণ-সাধনা ও রাজপুত সমাজে কৃষ্ণানুরাগজনিত প্রভাবেব কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা কবে গিয়েছেন। তিনি লক্ষ্য কবেছিলেন যে রাজপুত সমাজে, বিশেষ করে মেবারে পূর্বে শৈব-সাধনারই প্রভাব ছিল প্রবল। পরে সেখানে কৃষ্ণসাধনাব প্রবর্তন হয়। কালক্রমে মেবার ছাড়া প্রাচীন কচ্ছপঘাত বা চলতি কাছোয়া শাসিত অম্বরে (জয়পুর), রাঠোর শাসিত যোধপুর ও বিকানীরে এবং এদেরই উপরাষ্ট্র কিষেণগড় ইত্যাদি রাজ্যে, প্রাচীন চাহমান (চৌহান) বংশের উত্তরাধিকারী কোটা ও বুন্দি রাজ্যে এবং প্রাচীন যাদববংশের উত্তরাধিকারিত্বের দাবীদার জয়শলমেরের ভট্টি-শাসকদের মধ্যে এই কৃষ্ণানুরাগের গভীর অনুপ্রবেশ টডকে বিশেষভাবে বিস্ময়ান্বিত করেছিল। রাজপুতরা এক প্রবল সামরিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী; তাঁদের ইতিহাস প্রভূত বীর্যবত্তা, সাহসিকতা, আত্মসম্মান ও কুল-রমণীর সম্মান রক্ষায় কৃতসংকল্পতা এবং প্রভূত আত্মত্যাগেব কাহিনীতে সমৃদ্ধ। এই ক্ষাত্রপ্রকৃতির উগ্রতা ও অসহিষ্ণুতাকে অতিক্রম করে তাঁরা কি করে এক কোমল, মাধুর্যপূর্ণ, আত্মনিবেদনের রসে সম্পৃক্ত কৃষ্ণভক্তিব আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, সে রহস্য এখনও উদ্ঘাটিত হয়নি। টড অত্যন্ত প্রসন্ন-সরসতার সঙ্গে এই কৃষ্ণ-অনুরাগ সমৃদ্ধ সংস্কৃতির বিষয় আলোচনা করে কৃষ্ণভাবনাব গভীরতা এবং প্রসার সম্পর্কে অত্যন্ত বিস্তৃত এক বিবরণ তাঁর গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করে গিয়েছেন দেখা যায়। তাঁর এই রচনায় মুঘল সম্রাট আকবরকে তিনি কৃষ্ণ সম্পর্কে অনুরক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। পরম কৃষ্ণানুরাগী অম্বরের অধিপতি, আকবরের একান্ত বিশ্বস্ত, প্রখ্যাত সমরকুশলী রাজা মানসিংহ যে একবার সম্রাটকে কৃষ্ণ-লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনে নিয়ে গিয়েছিলেন তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

একবার মুঘল-সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী আফগান অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিলে আকবর উপলব্ধি করেছিলেন যে এই বিদ্রোহ দমনে রাজা মানসিংহ ভিন্ন অন্য কেউ সক্ষম হবেন না। তাই তিনি মানসিংহকে আফগানিস্তানে যাওয়ার আদেশ করেন। রাজা মানসিংহ ছিলেন আকবরের প্রথম হিন্দু রাজমহিষীর ভ্রাতা এবং অম্বরের অধিপতি ভগবানদাসের দত্তকপুত্র ও উত্তরাধিকারী। এই ঘনিষ্ঠতার সূত্রেই সম্রাটের একান্ত আস্থাভাজন ও অনুগত। রাজা মান সম্রাটের আদেশ একপ্রকার অগ্রাহ্য করেই বলেছিলেন যে কোন নিষ্ঠাবান হিন্দু পশ্চিমে সিন্ধুনদের তীরবর্তী আটক অতিক্রম করে না। রাজপুত কাহিনীতে প্রচলিত আছে যে সংশয়াকুল বাদশাহ মানসিংহকে এই অভিযানে প্রবৃত্ত করবার জন্য অভিনব এক কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। আকবর মানসিংহের গভীর কৃষ্ণপ্রীতি ও কৃষ্ণদর্শন সম্পর্কে জ্ঞানের পরিচয় জানতেন। মানসিংহকে তাঁর আটক অতিক্রম করবার অনীহার অসারতা প্রতিপন্ন করে বাদশাহ একটি বয়েৎ (কবিতা) রচনা করে মানসিংহের কাছে প্রেরণ করলেন। এই কবিতার বয়ান ছিল :

সব হ্যায় ভূম গোপাল কা
ইসিমে আটক কাঁহা,
জিসকা মনমে আটক হ্যায়
উহে আটক মানতা !

উল্লেখ আছে যে আকবরের এই জ্ঞানগর্ভ বয়েৎ পাওয়ার পরই রাজা মান আফগানিস্তান অভিযানে নেতৃত্ব করেছিলেন এবং সেখান থেকে বিজয় গৌরব অর্জন করে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। টড আরও উল্লেখ করেছেন এক অবিশ্বাস্য সংবাদ যে, ব্যক্তিগত অনুশীলনের ক্ষেত্রে বাদশাহ নাকি গোপাল কৃষ্ণেরই অনুরাগী ছিলেন এবং স্বপ্নে নির্দেশ লাভ করে তিনি যমুনাতীরের এক সংগুপ্ত স্থান থেকে তাঁর পূর্বজন্মের সাধনার নানা উপকরণ খুঁজে পেয়েছিলেন। স্বভাবতই রাজপুতসূত্রে প্রাপ্ত এইসব সংবাদ তিনি বেশ সরসতার সঙ্গে বর্ণনা করে গিয়েছেন যদিও পরবর্তী কোন বস্তুবাদী লেখকই এইসব বিবরণকে কোন গুরুত্ব দান করেনি। টড তাঁর গ্রন্থে কৃষ্ণ সম্পর্কে যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তেমন সুললিত, শ্রদ্ধাজড়িত, কিন্তু প্রভূত পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণগর্ভ আলোচনা অন্য কোন বৈদেশিকের কৃষ্ণসম্পর্কিত আলোচনায় পাওয়া যায়

না। এই বিস্তৃত আলোচনায় টড তাঁর সময়ে পরিজ্ঞাত গ্রীক ও মিশরীয় দেবতত্ত্ব ও ধর্মীয় কাহিনীসমূহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের পরিচয় সন্নিবিষ্ট করেছেন। এই আলোচনায় তাঁর যে ব্যাপক অধ্যয়ন ও গ্রীক, হিব্রু, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষা সম্পর্কে যথেষ্ট পারঙ্গমতা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বহু যুক্তি প্রয়োগ করে তিনি যে সমস্ত ইঙ্গিত ও সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেছিলেন বর্তমানে তেমন দুঃসাহসিক কাজে আর কেউ যে ব্রতী হবেন এমন অনুমান করা যায় না।

তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের স্বীকৃত পথিকৃৎ ফ্রান্জ বপ্ (১৭৯১-১৮৬৭) সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের মূল রূপ ও প্রত্যয়ের সাদৃশ্য প্রতিপন্ন করে ভাষাতত্ত্ব-বিজ্ঞান নামে একটি নূতন জ্ঞানচর্চার প্রবর্তন করেন। বপ্ ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে প্যারীতে এসে সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন এবং ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত A Comparative Grammar of the Sanskrit, Zend, Greek, Latin, Lithuanian, Gothic, German and Slavonic নামে পুস্তক প্রকাশ করে এই সমস্ত ভাষাগুলির মৌলিক সাদৃশ্য প্রতিপাদন করেছিলেন। বপের প্রতিষ্ঠিত এই সাদৃশ্যই শেষ পর্যন্ত ম্যাক্স-মূলারকে এইসব ভাষাগোষ্ঠীর আদিম রূপ হিসেবে একটি Indo-Aryan জাতির পরিকল্পনা করতে এবং সেই Aryan বা আর্যজাতির ইউরোপ বা মধ্যএশিয়া থেকে ভারতে এসে উপনিবেশ স্থাপন করা সম্পর্কিত মতবাদ প্রবর্তন করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

যখন টড ভারতসংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন তখনও ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির অন্বেষণের ক্ষেত্রে আর্যজাতির বাইরে থেকে ভারতে উপনিবিষ্ট হওয়া সম্পর্কিত মতবাদের প্রচলন হয়নি। টড গ্রীকদের দেবতা অ্যাপোলোকে ভারতের কৃষ্ণেরই গ্রীক প্রতিরূপ বলে গণ্য করতেন। রাজস্থানে কৃষ্ণকে সাধারণ্যে কানিয়া বা কানাই নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তিনি কানাই শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে কৃষ্ণ শব্দের মূল ধ্বনি কান-এর সঙ্গে মিশরীয় সূর্যদেবতা কান-এর নাম ও রূপ সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিলেন। এবং এই সূত্রে অনুমান করেছিলেন যে গ্রীকদের দেবতা অ্যাপোলো এবং মিশরের সূর্যদেবতা কান মূলত ভারতের এই কৃষ্ণেরই প্রতিরূপ এবং কৃষ্ণ থেকেই গৃহীত হয়েছিল। মিশরের কান দেবতার গায়ের রং নীল (শ্যামবর্ণ), মাথা অতিকায় পক্ষী ঈগলের মত (বিষ্ণু-কৃষ্ণের প্রতীক গরুড়ের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত) এবং হাতে পদ্মফুল

(ভারতীয় সূর্যদেবতার হাতেও পদ্মফুল দেখা যায়)। মিশরের অধিষ্ঠাতা দেবতা কান-এর কলেবর থেকেই মিশরের নদীর নাম নীল; এইরকমই সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয় যমুনানদীর ক্ষেত্রে, ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে সাদৃশ্যে যার নাম হয় কালিন্দী। এই কৃষ্ণতত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়েই টড সুদূর রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অস্ট্রাখানে অবস্থিত অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী একটি কৃষ্ণমন্দিরের অভ্যন্তরস্থ মুরলীধর কৃষ্ণের মূর্তির অস্তিত্বের উল্লেখ করে তৎকালীন সময়ে কৃষ্ণ-অনুরাগের ব্যাপক বিস্তৃতির উল্লেখ করেছিলেন। কৃষ্ণচেতনা সম্পর্কে এত ইঙ্গিত, এত উপকরণ এবং এত সংবাদ টডের রচনার মত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গেই টড মন্তব্য করেছিলেন :

We may by an analysis of the titles and attributes of the Hindu Apollo prove that from the Yamuna may have been supplied the various incarnations of this divinity which peopled the pantheons of Egypt, Greece and Rome.[৬]

এই ধরনের অসংখ্য মন্তব্যে টড ভারতকেই বিশ্বসংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি ও উৎসস্বরূপ বলে প্রতিপন্ন করবার যে প্রয়াস করেছিলেন ক্রমবর্ধমান ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধিকর্তা ইউরোপীয় শাসকদের তা মোটেই গ্রহণযোগ্য বা রুচিকর বলে গণ্য হয়নি। উইলিয়াম জোন্সের সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা, ওয়ারেন হেস্টিংসের ভগবদ্‌গীতা সম্পর্কিত উক্তি, গীতার শ্লেগেল-কৃত অনুবাদ পাঠে উইলহেলম ফন হামবোল্ডের আন্তরিক সুখ্যাতি উচ্চারণের ফলে ভারতের সংস্কৃতি সম্পর্কে বিস্ময় মিশ্রিত যে শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়া ঘটতে খুব বিলম্ব হয় নাই। হয়ত এই প্রতিক্রিয়া গড়ে উঠতে টডের 'রাজপুত জাতির ইতিহাস'ও বেশ কিছু ইন্ধন জুগিয়েছিল। তাই লক্ষ্য করা যায় ম্যাক্সমুলারের ভারতীয় সংস্কৃতির আকর ক্ষেত্র বেদের অনুবাদে ব্রতী হওয়ার প্রয়াস এবং সেই সূত্রে এই বেদ-রচয়িতারা যে বহুদূর ইউরোপ বা মধ্যএশিয়া থেকে এদেশে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, এই মতবাদের প্রতিষ্ঠা করা। ম্যাক্সমুলার (১৮২৩-১৯০০) সম্ভবত তাঁর বিংশতিবর্ষ বয়সে সংস্কৃত চর্চা আরম্ভ করেন। ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি অত্যন্ত সহজ সংস্কৃতে রচিত হিতোপদেশ গ্রন্থের একটি জার্মান অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। প্রায় ঐ সময়ই থিওডর বেনফি নামে একজন

জার্মান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, বিখ্যাত সংস্কৃত কাহিনী-পুস্তক পঞ্চতন্ত্রের একটি জার্মান অনুবাদ (Das Panchatantra) প্রকাশ করে এই মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যে ইউরোপে প্রচলিত লোককাহিনী বা উপকথা-রূপকথাগুলি মূলত ঐ পঞ্চতন্ত্র থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল। হিতোপদেশের আখ্যায়িকাগুলিও যে ইউরোপে প্রচলিত ঈশপস্ ফেবলস্-এরই মৌলিক আকর এবং আরবদের দ্বারা কৃত অনুবাদ থেকে গ্রীক কাহিনীকার ঈশপ, গ্রীক ভাষায় সেগুলি রূপান্তরিত করেছিলেন একথাও বেনফি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন। ম্যাক্সমুলারের রচিত হিতোপদেশের অনুবাদে কিন্তু ভারতের নিকট ঈশপস্ ফেবলস্-এর ঋণ সম্পর্কে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ম্যাক্সমুলার সেই ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দেই ভাল করে সংস্কৃত আয়ত্ত করবার উদ্দেশ্যে প্যারীতে আসেন এবং সেখানে বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত ইউজিন বুর্নফের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বুর্নফের প্রেরণাতেই ম্যাক্সমুলার শেষ পর্যন্ত লণ্ডনে এসে (১৮৪৮ খ্রীঃ) ঋগ্বেদ অনুবাদে ব্রতী হন এবং ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে ঋগ্বেদের অনুবাদের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। সামান্য চার-পাঁচ বছরের অনুশীলনে ঋগ্বেদের মত গ্রন্থ অনুবাদ ও বৈদিক সংস্কৃত আয়ত্ত করে ঋগ্বেদ সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা ও মন্তব্য সংগঠন করা সম্ভব কিনা এ জিজ্ঞাসা বা এই জার্মান পণ্ডিতের মতবাদ সম্পর্কে কোন সংশয় তেমনভাবে কেউ উত্থাপন করেছেন বলে জানা নাই। অবশ্য পণ্ডিত বালগঙ্গাধর তিলক এবং অধ্যাপক ডক্টর অবিনাশচন্দ্র দাস ম্যাক্সমুলার প্রবর্তিত মতবাদ প্রত্যাখ্যান ও ভিন্ন মতবাদ প্রচার করেছিলেন।

এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায় জার্মান দেশীয় পণ্ডিত অ্যালবার্ট ওয়েবারের (১৮২৫-১৯০১) প্রবর্তিত কিছু মতবাদে। কিছুকাল সংস্কৃত পড়বার পর ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে ওয়েবার তাঁর গভীর গবেষণামূলক গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করে বিস্তৃত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে বইটির ইংরাজী অনুবাদ History of Indian Literature নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থেই প্রথম উল্লিখিত হয় যে মহাকবি বাল্মীকি রচিত মহাকাব্য রামায়ণ গ্রীক মহাকাব্য হোমার রচিত ইলিয়াডেরই ভারতীয় রূপান্তর। পণ্ডিতপ্রবর ওয়েবার রামায়ণকে ইলিয়াডের রূপান্তররূপে প্রমাণ করেই নিরস্ত থাকেননি। তাঁর ভারতীয় সংস্কৃতির গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে, যে বৎসর তিনি বোম্বাই থেকে

প্রকাশিত Indian Antiquary নামক গবেষণামূলক সাময়িক পত্রিকায় An investigation into the origin of the Festival of Krishna Janmastami নামে একটি বৃহৎ প্রবন্ধে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন যে, ভারতে প্রচলিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক অনেক কাহিনী এবং বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিমূলক মতবাদ বস্তুত খ্রীষ্টীয় পরিকল্পনা ও প্রভু যীশুর জীবনকাহিনী থেকেই সংকলিত ও সংগৃহীত হয়েছিল। পাশ্চাত্যে যে এই মতবাদ তখন সবিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই গৃহীত হয়েছিল তা দেখে খুব বিস্মিত হওয়া যায় না। অচিরকালের মধ্যেই দেখা যায় মহাভারত নিয়ে গবেষণায় খ্যাতিসম্পন্ন আমেরিকান পণ্ডিত ই. ডব্লিউ. হপকিনস্ ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর রচিত Religions of India গ্রন্থে ওয়েবার প্রবর্তিত মতবাদ সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করলেন। এ ছাড়া ডব্লিউ. কেনেডি ১৯০৭ ও ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে ওয়েবারের মতবাদের সমর্থনে বিস্তৃত যুক্তিজালের প্রসার করেন এবং এন. ম্যাকনিকল নামে জনৈক লেখক ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত Indian Theism নামক গ্রন্থে ওয়েবারের মতের অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ সমর্থন দেওয়ার চেষ্টা করেন। অবশ্য তাঁর এই প্রচেষ্টার পেছনে যে উদ্দেশ্য নিহিত ছিল তা তিনি গোপন করেননি। তিনি বলেছেন, "Sooner or later the Indian spirit would find Solace in Christ." ইউরোপীয় জিজ্ঞাসুদের ভারত-জিজ্ঞাসার মূলে কিভাবে এবং কত শীঘ্র এদেশের অন্ধকারে নিমজ্জিত নেটিভ অধিবাসীদের প্রভু যীশুর দয়ার অংশীদার করে ত্রাণের ব্যবস্থা করা যায় এই মহৎ উদ্দেশ্যই যে নিহিত ছিল একথা ম্যাকনিকলের লেখার মত অন্যান্য অনেকের লেখার ভেতর দিয়েও প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। ভগবান কৃষ্ণের জীবনলীলা ও বৈষ্ণব ভক্তিবাদ যে যীশুখ্রীস্টের জীবনকাহিনী ও খ্রীস্টধর্ম থেকেই রূপান্তরিত হয়েছিল এই মতবাদ প্রতিষ্ঠার পেছনেও ঐ একই উদ্দেশ্য যে ক্রিয়াশীল ছিল একথাও তাঁরা গোপন রাখতে পারেননি। ঐসব পণ্ডিতদের আগ্রহাতিশয্য লক্ষ্য করেই মনিয়ার উইলিয়ামস্ মন্তব্য করেছিলেন "Whatever might be the fallacies and errors of these (Hindu) religions, it would be wrong to describe their authors as benighted heathens"—[৭]। যে Religions of India গ্রন্থে হপকিনস্ ওয়েবারের মত সমর্থন করে বৈষ্ণব ধর্মকে খ্রীষ্টীয় ধর্মেরই ভারতীয় রূপান্তর বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছিলেন, তিনিও উৎসাহী ভারত-

জিজ্ঞাসুদের প্রতি এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন—"To refute Hindu doctrines one must have great logical ability and deep learning and a Missionary who did not possess these would do well to leave the native scholar alone"। ইউরোপীয় কৃষ্ণজিজ্ঞাসুদেব মধ্যে জার্মান পণ্ডিত রুডল্‌ফ অটোব নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অটোর ভারতচর্চার প্রায় সম্পূর্ণ প্রয়াসই বৈষ্ণবধর্ম ও কৃষ্ণ বিষয়েই উৎসারিত হয়েছিল।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদে ইউরোপেব বণিক ও দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা বিপুল উদ্যোগ নিয়ে সমুদ্রপথে পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে অভিযান করে বাণিজ্য ও রাজ্য বিস্তারের প্রয়াস করতে থাকে। এই প্রয়াসের ফলে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ হতে থাকলে ইউরোপে এক নূতন যুগের সূচনা হয়। মধ্যযুগে সুদীর্ঘ-কাল ইউবোপের সঙ্গে বাইরের জগতের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। ইউরোপের অধিবাসীরা খ্রীষ্টীয় ধর্মের গোঁড়ামি এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নিয়ে এক আবদ্ধ গণ্ডীতে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালীতে যে রেনেসাঁস বা সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল, তারপর থেকেই আস্তে-আস্তে ইউরোপের পুনরভ্যুত্থান ঘটতে থাকে। এই সময়ে ইউবোপীয়রা নবাবিষ্কৃত আমেরিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতে উপনিবেশ স্থাপন করে এবং আফ্রিকায় ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্য বিস্তারে তৎপর হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে অনুপ্রবেশের এই ইতিহাস মানবিকতার দিক থেকে অত্যন্ত বেদনাময় ও কলঙ্কজনক হলেও ইউরোপীয় জাতিগুলির অর্থনৈতিক উন্নতিতে এই সম্প্রসারণের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এই উন্মাদনাকর অর্থ ও সাম্রাজ্যলিপ্সা ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে একদিকে যেমন প্রবল দাম্ভিকতা এবং পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করেছিল তেমনি অন্যদিকে জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সমাজ-বিদ্যার চর্চায়ও যথেষ্ট অগ্রগতির সঞ্চার করেছিল। এই দ্রুত অগ্রগতিরই ফলশ্রুতি লক্ষ্য করা যায় আমেরিকাব ঔপনিবেশিকদের স্বাধীনতা স্পৃহায়, ফরাসীদেশের গীর্জা ও রাজতন্ত্রবিরোধী বিপ্লবে এবং বাষ্পযন্ত্রের প্রয়োগে উৎপাদন কৌশলের অভাবনীয় প্রসারে। ইউরোপে যখন এইসব পরিবর্তন ঘটছিল সেই সময়েই এশিয়ার দেশগুলিতে, বিশেষ করে ভারতে ইউরোপীয় কোন কোন জাতি তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে প্রাধান্য লাভ করতে থাকে।

ভারতের সঙ্গে এই যোগাযোগের ফলেই ইউরোপীয়দের মধ্যে ভারতের

সমাজ, ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে কৌতূহল দেখা দিয়েছিল, আর এই কৌতূহল শুধু ইংলণ্ডেই সীমিত থাকেনি। সাম্রাজ্য বিস্তার প্রয়াসী ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও জার্মান দেশেও এই কৌতূহলের প্রসার ঘটেছিল। এই কৌতূহলই ইউরোপীয়দের ভারতবর্ষের ধর্ম ও অতীত সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে উৎসাহিত করে তোলে। তবে ইউরোপীয়দের সকল কর্মতৎপরতার পেছনেই প্রায় সবক্ষেত্রেই ক্রিয়াশীল ছিল সেই ক্ষমতা সচেতন জাতিগুলির অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা। সুদূর অতীতের গ্রীকো-রোমক সংস্কৃতির উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কিছু সচেতনতা থাকলেও খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতির সর্বগ্রাসী প্রভাবে যে যুক্তিবিরোধী গোঁড়ামির প্রবর্তন হয়েছিল, এই নবচেতনায় উদ্ভূত ইউরোপ সে প্রভাব বড় একটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ফলে কখনও কখনও রোমান ক্যাথলিক নীতির কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা ফরাসী-দেশে গীর্জার পুরোহিতদের শোষণের বিরুদ্ধাচরণ ঘটে থাকলেও খ্রীষ্টীয় গোঁড়ামির মানসিকতা থেকে ইউরোপীয় প্রতিভা তেমনভাবে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। এই মানসিকতাই ইউরোপীয় প্রতিভাকে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থাকে উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে দেয়নি। বরং ভারতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রবল সমালোচনা ও তার হীনমন্যতা বিধানের প্রচেষ্টারই আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। বহিরাগত ও ইউরোপে অবস্থানকারী ভারত-জিজ্ঞাসুদের এই ইতিহাস ও সমাজ চর্চার ধারায় এমন কিছু অভিনবত্ব এবং শক্তিমত্তার ছাপ ছিল, যার ফলে ভারতের নূতন ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ইউরোপীয় প্রতিভার এই ভারতচর্চাকে স্বাগত জানিয়ে এসেছে। তাদের ভারতচর্চার পশ্চাৎভূমি বা গূঢ় উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় বা ইতিহাস এবং সমাজ-জিজ্ঞাসুদের মধ্যে আজ পর্যন্তও তেমন দেখা দেয়নি।

ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতির প্রবাহধারা সম্বন্ধে এই বিশ্লেষণাত্মক সন্দেহবাদ, বিশেষ করে সংস্কৃতির কোন মৌলিক আধার সম্পর্কেও এই সন্দেহবাদকে দৃঢ়ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠা করবার সংক্রামকতা কিছু কম আত্মপ্রকাশ করেনি। ভারতীয় জীবনচর্যার মধ্যে শৈব সাধনা এবং বৈষ্ণব ভক্তিবাদকে অন্যতম প্রধান দুই গভীর উৎসধারা বলে গণ্য করা যেতে পারে। বস্তুত এই দুই দৃঢ়ভিত্তিকে অবলম্বন করেই ভারতসংস্কৃতি ইসলামের বিধ্বংসী আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রসারমাণ খ্রীষ্টীয় প্রভাবকেও একদিন এই দুই প্রবল শক্তির নিকটেই

পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল বলা চলে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শৈব সাধনার বাহ্যিক ইঙ্গিতগর্ভ প্রতীক, লিঙ্গ-উপাসনাকে অবলম্বন করে পাশ্চাত্য ভারততত্ত্বানুসন্ধানীরা ভারতীয় সংস্কৃতিকে অতি সহজেই উপহাসাস্পদ বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছে। এই লিঙ্গ প্রতীকের ইঙ্গিতগর্ভতা কখনই তারা উপলব্ধি করবার বিশেষ চেষ্টা করেনি ; বরং দেখা যায় ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম উৎস হরপ্পা সভ্যতাতেও যে লিঙ্গযোনির উপাসনার প্রচলন ছিল এই তথ্যও তারা প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছে, তাদের যুক্তিকে অকাট্য প্রমাণের উদ্দেশ্যে। শৈব সাধনার ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি বৈষ্ণব সাধনার ভক্তিবাদের কেন্দ্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলাকে অবলম্বন করেও নানা তথ্যের অবতারণা করা হয়েছে দেখা যায়। সোজাসুজি শ্রীকৃষ্ণের জীবনলীলা কাহিনীর উপর জার্মান পণ্ডিত ওয়েবার, যীশুখ্রীস্টের জীবনলীলার সাদৃশ্য এবং সেই ভিত্তিতে শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়ে প্রসারিত ভক্তিবাদকে খ্রীস্টধর্মের দ্বারা প্রভাবিত বলে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে অন্য এক জার্মান পণ্ডিত লোরিনসারের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে, যাঁর মতে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার উপর বাইবেলের বিস্তৃত প্রভাব ছিল। ওয়েবার ও লোরিনসারের এইসব প্রয়াস বৃথা হয়নি। ভারতীয় ধর্ম সম্পর্কে যেসব ইউরোপীয় পণ্ডিত ওযেবারের পরে গবেষণায় প্রবৃত্ত ও গ্রন্থরচনায় ব্রতী হয়েছেন তাঁদের অনেকেই অতি সহজ ও যুক্তিভিত্তিক তথ্য হিসেবেই ওয়েবারের মতের অনুসরণ ও প্রতিধ্বনি করেছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের এই তির্যক বিশ্লেষণ প্রবণতার কারণ বেশ উপলব্ধি করা গেলেও কিছু ভারতীয় পণ্ডিতও ঐ ভাবধারায় যে কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা লক্ষ্য করলে বিস্মিত হতে হয়। ওযেবার সংস্কৃত সাহিত্য কিছু পড়েছিলেন ; তবে ওয়েবারের ভারত-চর্চায় ব্রতী হওয়ার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই ইউরোপীয়দের দ্বারা বেদ-ব্রাহ্মণ, আরণ্যক-উপনিষদ, মহাভারত-রামায়ণ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। এইসব পূর্বতন আলোচনা ও কিছু মূল উপকরণকে অবলম্বন করে ওয়েবার যে গ্রন্থ রচনা করেন সেই Akademische Vorlesungen Uber Indische Lituratur Gestische নামক গ্রন্থে তিনি কেবল ভারতীয় সাহিত্যের বিবরণ দিয়েই নিরস্ত থাকেননি। যেখানে যেখানে সুযোগ উপস্থিত হয়েছে সেখানেই ভারতীয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্তাদের, বা গ্রন্থে নিহিত দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম সম্পর্কে নানা চটুল মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। এই পদ্ধতিতেই

ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত দেবকীপুত্র কৃষ্ণের প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছিলেন —"Krishna worship proper, that is the sectarian worship of Krishna as the one God probably attained its perfection through the influence of Christianity"—।[৮] এই মতবাদের বিস্তৃততর প্রচারে ব্রতী হয়ে ওয়েবার জার্মান ভাষায় Krishna's Geburtsfest নামক একটি বৃহৎ প্রবন্ধ ও ইংরাজীতে An investigation into the origin of the Festival of Krishna Janmastami রচনা করেছিলেন।[৯] ওয়েবারের এইসব তথ্য প্রচারের ফলে ইউরোপের বিদগ্ধ মানসে ভারতে ব্যাপক মর্যাদায় অভিষিক্ত ভক্তিধর্মের উপর খ্রীষ্টীয় প্রভাবের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং হপকিন্‌স, কেনেডি ইত্যাদি লেখকদের দ্বারা এই দৃঢ়মূল মতবাদ পরে আরও ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছিল দেখা যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই একবার ভারতীয় পণ্ডিতদের প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করে দেখা যেতে পারে। ভারতীয় ভক্তিমার্গের কেন্দ্রপুরুষ ও মূল অবলম্বন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে যীশুখ্রীস্টের জীবনভিত্তিক প্রভাবের দ্বারাই বিবর্তিত হয়েছিলেন এবং তিনি যে সেই ছান্দোগ্য উপনিষদের দেবকীপুত্র কৃষ্ণ থেকে স্বতন্ত্র এই তত্ত্ব যেমন ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে ইলিয়টের রচিত Hinduism and Buddhism (Vol. II), গোণ্ডার Visnu, ইত্যাদির দ্বারা সমর্থিত হ'ল তেমনি ভারতীয় লেখকদের মধ্যে গোবিন্দাচার্য স্বামী এবং পরশুরাম চতুর্বেদীও এই মতবাদের দৃঢ় সমর্থকরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। এঁদের সকলকে অতিক্রম করে গেলেন প্রখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার। তিনি তাঁর ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে জর্মানীর Strassburg থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems নামক গ্রন্থে এই মতবাদকে এক চূড়ান্ত রূপ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি অশেষ প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রমাণ করতে চেষ্টা করলেন যে শিশুভগবান কৃষ্ণ সম্পর্কিত কাহিনী আভীর বা আহির নামে পরিচিত একশ্রেণীর গোচারণবৃত্তিধারী উপজাতীয়ের দ্বারা প্রসারলাভ করেছিল। এই আভীরেরা ছিল একশ্রেণীর যাযাবর মানুষ ; তাঁর মতে এরা খ্রীষ্টীয় সমাজে প্রচলিত খ্রীস্ট সম্পর্কিত নানা কাহিনী সম্পর্কে অবহিত ছিল। সেইসব কাহিনীর সঙ্গে আভীরেরা নাকি 'খ্রীস্ট' নামটিও তাদের সঙ্গে ভারতে বয়ে এনেছিল। এবং ধ্বনিসাদৃশ্য থেকে ভারতীয়েরা এই খ্রীস্টকে শিশুভগবান বাসুদেব কৃষ্ণের

সঙ্গে এক বলে পরিগণিত করে নিয়েছিল। "It is possible that they brought with them the name of Christ also and this name probably led to the identification of the boy-god with Vasudeva Krishna"। তিনি আরও অনুমান করেছিলেন যে কৃষ্ণ-কাহিনীর গোপিনী-বৃত্তান্ত সুন্দর ও সুগঠন আকৃতিবিশিষ্ট আভীর কুলকন্যাদের উপর ভিত্তি করেই উদ্ভূত হয়েছিল। এই গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যেও পণ্ডিত ভাণ্ডারকার তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে নীতিবোধ সম্পর্কে শিথিল আভীর রমণীদের প্রতিচ্ছবিই দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি লিখলেন—"The dalliance of Krishna with cowherdesses which introduced an element inconsistent with the advance of morality into the Vasudeva religion was also an aftergrowth, consequent upon the freer intercourse between the wandering Abhiras and their more civilised Aryan neighbours. Morality cannot be expected to be high or strict among races in the condition of the Abhiras at the time ; and their gay neighbours took advantage of its looseness"। অভূতপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব এবং বিস্ময়কর এইসব যুক্তি তাঁর এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হওয়ার বেশ কিছুদিন পূর্বেই লণ্ডন থেকে প্রকাশিত রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালেও (১৯০৭) পণ্ডিত ভাণ্ডারকার ভারতের সংস্কৃতির বিশিষ্ট প্রকাশ এই ভাগবত ধর্ম সম্পর্কিত মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন। বৃন্দাবনের ভগবান কৃষ্ণ আশ্রিত ভাগবত ধর্ম ও সাধনা সম্পর্কে এই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব প্রচারের ফলশ্রুতি অনতিবিলম্বেই আত্মপ্রকাশ করেছিল দেখা যায়। তৎকালীন ঔপনিবেশিক শক্তির ধারকেরা এই মতের ইঙ্গিতটিকে স্বাগত জানাতে বিলম্ব করেননি ; অনতিকালের মধ্যে পণ্ডিত ভাণ্ডারকারকে তাঁর এই গভীর আনুগত্যের পুরস্কার দেওয়া হয়, এবং নাইটহুডে বিভূষিত করে তাঁর সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করা হয়। এইভাবেই সংস্কৃতির জগতে ভারত-মানসের উদ্ভাবিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, পূর্ণব্রহ্মরূপে গণ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণব ভক্তি-ধর্ম পাশ্চাত্য থেকে আলব্ধ খ্রীষ্টীয় ধর্মেরই প্রতিচ্ছবিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে অবশ্য উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে যে পণ্ডিতপ্রবর ভাণ্ডারকারই বাসুদেবরূপীকৃষ্ণের উপাসনাকে যীশুখ্রীস্টের আবির্ভাবের অনেক পূর্বে উদ্ভূত

বলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ওয়েবার তাঁর মতবাদ ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দ থেকে প্রচার করতে শুরু করে থাকলেও ভারতসংস্কৃতির মৌলিক স্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী সেই মতবাদের তেমন কোন প্রতিবাদ হয়নি বা দীর্ঘকাল পর্যন্ত দৃঢ় যুক্তির সাহায্যে তা খণ্ডিতও হয়নি। অবশ্য খ্যাতনামা মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত কাশীরাম ত্র্যম্বক তেলাঙ ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় লোরিনসারের গীতার উপর বাইবেলের প্রভাব সম্পর্কিত মতবাদ সুপ্রযুক্ত যুক্তিবিচারের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করেন। ওয়েবার প্রচার করেছিলেন যে ইলিয়াড কাব্য থেকেই রামায়ণের বিষয়বস্তু গৃহীত হয়েছিল। ওয়েবারের এই মতেরও (Uber des Ramayanam, 1870) তেলাঙই প্রথম প্রতিবাদ করেছিলেন (1873)। এই প্রতিবাদ সত্ত্বেও কিন্তু ওয়েবার তাঁর মত থেকে বিচ্যুত হননি ; তিনি তাঁর পাণ্ডিত্যের দম্ভে ভারতীয় দৃষ্টিকোণকে কোন গুরুত্বই দিতে স্বীকৃত ছিলেন না। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে ওয়েবারের মত-বাদকে দৃঢ়তার সঙ্গে আক্রমণ ও খণ্ডন করেছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কাহিনীতে গোপিনী ঘটিত বিবরণ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনেও সন্দেহ ছিল, এবং তিনি ঐ কাহিনীসমূহকে প্রক্ষিপ্ত বলে গণ্য করার পক্ষপাতী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের মূল সত্যানুসন্ধানে আধুনিক (অর্থাৎ পাশ্চাত্য ধরনের) রীতির তুলনা ও বিচার পদ্ধতি প্রয়োগ করবার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে খুব জোরালো যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার ১৮৮৩ সালে বোম্বাইয়ের প্রার্থনাসমাজের এক সভায়। এই যুক্তিবাদের পথ অনুসরণ করেই তিনি বৈষ্ণব ভক্তিধর্মকে খ্রীস্টধর্মের ছায়াবলম্বনে বিবর্তিত বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। অবশ্য এর অনেক আগেই বঙ্কিমচন্দ্র ওয়েবার প্রবর্তিত মতবাদের অসারতা প্রদর্শন করে তার যথোপযুক্ত উত্তর দিয়েছিলেন। এই সময়ই প্রখ্যাত দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বৈষ্ণব ধর্মের ও খ্রীস্ট ধর্মের তুলনা করে উভয়ের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছিলেন। পণ্ডিত রমাপ্রসাদ চন্দ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রবন্ধের সাহায্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাচীনতা প্রতিপন্ন করে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। এরপর অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর সুপরিচিত Materials for the Study of the Early History of Vaisnava Sect নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বৈষ্ণব ভক্তিবাদের উপর খ্রীষ্টীয় প্রভাব

সম্পর্কিত মতবাদকে উপযুক্ত যুক্তি বিচারের দ্বারা অসিদ্ধ প্রমাণ করেছিলেন।

একদিকে যেমন বৈষ্ণব ভক্তিবাদের উপর একশ্রেণীর পণ্ডিত খ্রীস্টধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন, অন্যদিকে আর একশ্রেণীর পণ্ডিত ঐ ভক্তিবাদের উপর সুফী মতবাদের প্রভাব প্রত্যক্ষ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন দেখা যায়। তবে বৈষ্ণব ভক্তিধর্ম যে সুফী মতবাদের প্রভাবপ্রসূত এ তথ্য প্রমাণ করা তেমন সম্ভব হয়নি। পাশ্চাত্য ভারততত্ত্ববিদেরা যে ভারতীয় ধর্ম সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চায় কোন বিশিষ্ট উদ্দেশ্য দ্বারাই প্রণোদিত হয়েছিলেন এ তথ্য খুব দৃঢ়তার সঙ্গে দেশীয় ভারততত্ত্বজিজ্ঞাসুদের দ্বারা তেমনভাবে উচ্চারিত হয়েছে, তা বড় দেখা যায় না। বরং প্রায় সমস্ত দেশীয় ভারততত্ত্ববিদেরাই পাশ্চাত্য পদ্ধতির অনুসরণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তেরই অনুসরণ করে এসেছেন। অবশ্য এই ধারার কিছু ব্যতিক্রমও যে ছিল না তা নয়। এই প্রসঙ্গে বহু গ্রন্থের রচয়িতা, পণ্ডিত নরেন্দ্রনাথ লাহার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যাঁরা পাশ্চাত্যরীতিতে, পাশ্চাত্যধারায় যুক্তিবিচার প্রয়োগ করে ভারততত্ত্বের চর্চা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন নরেন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। তিনিই প্রথম একথা দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির বহিরঙ্গ বিচারেই তৎপরতা দেখিয়েছেন, কখনও তাঁরা ভারতীয় ধর্ম ও সাধনার অন্তরঙ্গ গভীরতায় প্রবেশ করতে পারেননি। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেছেন যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভারত সভ্যতার কালনির্ণয়ে প্রায় সর্বদাই এই সভ্যতার বিভিন্ন প্রকাশকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলে প্রমাণ করবার কৃতযত্ন প্রয়াস করেছেন। "The western scholars have been chiefly interested in the outer element of Indian religions and not their inner elements of spirituality and Sadhana .....Western scholars have tried to prove, as far as possible the comparatively late date of our civilization and that they picked up the pen with a questionable motive to cast doubts upon facts which constitute an object of pride to the Indians."[১০]

পণ্ডিতপ্রবর ডক্টর লাহার এই উপলব্ধি ভারতীয় ভারততত্ত্বজিজ্ঞাসুদের দ্বারা এখনও তেমনভাবে গৃহীত হয়েছে বলে মনে হয় না। পাশ্চাত্য ইতিহাসবেত্তারা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিচারে যেভাবে যেসব যুক্তি প্রয়োগ করেন বা

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেই ধরনের যুক্তি ও বিচারের সাহায্যেই তাঁদের সিদ্ধান্তগুলিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ভিত্তিহীন বলে প্রমাণ করা যায়। সে ধরনের কোন চেষ্টা পারঙ্গম ভারতীয় ইতিহাসবেত্তারা বড় একটা করেননি। তবে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে গভীর বিস্ময় যে অনেকের মনেই সংগুপ্ত রয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভারতসংস্কৃতির অন্যতম প্রাণশক্তি শ্রীকৃষ্ণ এমনি এক বিস্ময় এবং যার পূর্ণ প্রত্যয় যে এখনও হয়নি, বারংবার কৃষ্ণচেতনা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াসই তাব প্রমাণ। ইলিয়ট, ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর Hinduism and Buddhism নামক পুস্তকে ব্যাপকভাবে বৈষ্ণব 'ভক্তিধর্ম' সম্পর্কে আলোচনা করেন। এরপব ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে জে. গোণ্ডা তাঁর সুপ্রচারিত Visnu নামক গ্রন্থে মহাভারতে উপস্থাপিত বাসুদেব কৃষ্ণ এবং বৃন্দাবনে গোপজনাশ্রয়ে লালিত কৃষ্ণ যে এক নন এই যুক্তি উত্থাপন কবে কৃষ্ণবিষয়ক বিতর্ককে আবার পুনরুজ্জীবিত করেন। Aspects of Early Vaisnavism নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে তিনি বাসুদেব কৃষ্ণাশ্রিত বৈষ্ণবধর্মের ক্রমবিবর্তনের বিস্তৃত রূপরেখাও পাঠকদের সামনে উপস্থিত কববার চেষ্টা কবেছেন। বস্তুত ভারতে বিষ্ণু-কৃষ্ণ সাধনা সম্পর্কে পারঙ্গমতার দিক থেকে পণ্ডিতবর গোণ্ডাব অবদান অনস্বীকার্য। পাশ্চাত্য ভারততত্ত্ববিদদের ভগবান কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণাশ্রিত বৈষ্ণবধর্মকে অবলম্বন কবে ঔৎসুক্যের কিছু বিরাম ঘটেনি। ওয়েবাব এবং ভাণ্ডাবকারেব দ্বারা এই শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত বৈষ্ণবধর্মের উপব খ্রীস্টধর্মেব প্রভাব সম্পর্কে মতবাদ প্রচারিত হয়েছিল এবং ভাণ্ডাবকাবের মতে এই কৃষ্ণাশ্রিত ভক্তিবাদ উত্তব ভারতে আভীর সম্প্রদায় কর্তৃক আনীত এবং প্রসারিত এই তথ্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তই যদিও শেষ সিদ্ধান্ত বলে একসময় মনে করা হয়েছিল, তৎসত্ত্বেও কৃষ্ণভাবনা নিয়ে বিস্ময় ও বিচার বিশ্লেষণের আজ পর্যন্তও অবসান হয়নি। সম্প্রতি আমেরিকাব চিকাগো থেকে মিলটন স্যাঙ্গাব সম্পাদিত (১৯৬৬) Krishna, Myths, Rites and Attitudes নামক একখানি সংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই সযত্নগ্রথিত সংগ্রহ থেকেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বহু পণ্ডিতের রচিত একাধিক প্রবন্ধে কৃষ্ণ যে এখনও কি পরিমাণে ঔৎসুক্য ও বিস্ময়েব কারণ বলে বিবেচিত হচ্ছেন তা উপলব্ধি কবা যায়।

এ পর্যন্ত পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতসংস্কৃতির বিচার বিশ্লেষণে খ্রীস্টীয় পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মতবাদই বিশেষ ক্রিয়াশীল ছিল। সম্প্রতি কিছুদিন হল

ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির বিচারে পাশ্চাত্যের আর এক বিশ্লেষণপন্থী গোঁড়া মতবাদ সক্রিয় হয়ে উঠেছে লক্ষ্য করা যায়। কার্ল মার্কস্ প্রবর্তিত বস্তুতান্ত্রিক-দ্বন্দ্ববাদ বা কমিউনিজম নামে পরিচিত এই মতবাদ সামগ্রিকভাবে বিশ্বের তাবৎ সমাজ বিবর্তনকে নূতন করে পরীক্ষার প্রয়াস প্রচলন করেছে। এই নূতন প্রয়াস, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমস্ত অঙ্গকেই নিজের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ ও সেই বিচারভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিয়োজিত করেছে দেখা যায়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সম্পর্কে নিজস্ব বিশ্লেষণমূলক পরিচয় দিতে বেশ কিছু মার্কসীয় ঐতিহাসিকও তৎপর হয়ে উঠেছেন। বিতর্কমূলক কৃষ্ণ-তত্ত্বও তাঁদের দৃষ্টি অতিক্রম করেনি। ডি. ডি. কোশাম্বী ছিলেন এই মার্কসীয় বিশ্লেষণবাদীদের অন্যতম পথিকৃৎ। তিনি মূলত ছিলেন গণিতজ্ঞ। পরে ইতিহাসবেত্তারূপে খ্যাতি অর্জন করেন। মনে হয় ভাণ্ডারকারের মতবাদের কিছু প্রভাব কোশাম্বীর উপরও ছিল। একসময়ে কোশাম্বী ভগবদ্‌গীতা অবলম্বন করে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এইসব প্রবন্ধে ভারতীয় সমাজের উপর নানা বিপর্যয়কর প্রভাব এবং কিভাবে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ধর্মকে জনগণের পরিচালনের এবং শোষণের কাজে ব্যবহার করেছিলেন তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে দেখা যায়। কমিউনিজম রীতিসম্মত ধারণা ও যুক্তি-বাদের আলোকে কোশাম্বীর এইসব বিশ্লেষণ স্বভাবতই যথেষ্ট গুরুত্বের দাবী রাখে। কোশাম্বীর মতে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন আর্যেতর গোষ্ঠীর লোক।

পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে ভারতসংস্কৃতি চর্চার এই নূতন বিবর্তন খুবই কৌতূহলো-দ্দীপক। অধিকাংশ ভারতীয় ঐতিহাসিক ও ভারততত্ত্বানুরাগীরা যে অনুশীলন-পর্বের ভেতর দিয়ে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস অনুসরণে অগ্রসর হয়েছেন, তাতে বর্তমানে অনুসৃত একদেশদর্শিতা ছাড়া অন্য পথ খুঁজে পাওয়া খুব সহজ নয়। ইতিহাস-বিবর্তনের বৈচিত্র্যপূর্ণ গতি এবং তার পেছনে যে কোন অমোঘ-শক্তির নির্দেশ আছে সে সম্পর্কে পাশ্চাত্য ইতিহাসবেত্তাদের এখনও কোন সচেতনতা আত্মপ্রকাশ করেনি। বহুদিন পর্যন্ত পাশ্চাত্যে ইতিহাস ছিল মূলত দ্বন্দ্ববিবাদের ঘটনার বিবরণ। পরে ইতিহাসের অন্তরালে কিছু মানবতাবাদী ধারণার সঞ্চার হতে থাকলেও বর্তমানে প্রজ্ঞাবাদী মার্কসীয় দর্শনানুগামীরা ইতিহাসকে তাঁদের নিজস্ব মননের ছাঁচে ঢেলে সাজাতে চাইছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভারত-চেতনার এবং ভারতীয় জ্ঞানপ্রজ্ঞার সাধন-মননের এবং

এই সাধন-মননের অন্যতম অবলম্বন 'মহাভারততত্ত্বধার' ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানে ব্রতী হওয়া যেতে পারে।

নির্দেশিকা

১. Asiatic Researches, Vol. I, p. 405
২, মহাভারত, আদিপর্ব, ১৮০।২০-৩১।
৩. হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৪।২২-২৪।
৪ বিষ্ণুপুরাণ, ৫।৩।৮।
৫. পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী, ৪।১।১১৪।
৬. Tod, J., Annals and Antiquities of Rajasthan (Reprint, London, 1914), p. 429
৭. Williams, M. Monier Religions, Thought and Life in India (London. 1883), p. 568.
৮ Waber., A. History of Indian Literature (4th Edn , London, 1904), p. 71.
৯. Indian Antiquary, 1874.
১০ Law, N. N., Studies in Indian History and Culture (Calcutta, 1925) p. 10.

২

কৃষ্ণচেতনার পূর্বাভাষ

আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে চেতনা ও উপলব্ধির এক বিস্ময়কর পরিব্যাপ্তি থাকলেও এই চিন্তার উৎস ও বিস্তার সম্পর্কে তেমন জিজ্ঞাসার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। হিন্দুসমাজে নবজাতক পুত্রসন্তানের নামকরণ কালে কৃষ্ণ-বাসুদেবের প্রচলিত বহু নামের দিকেই জাতকের অভিভাবকদের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হয়ে থাকে বলে লক্ষ্য করা যায়। অসংখ্য দেবস্থানে অধিষ্ঠিত উপাস্যরূপে এবং মন্দিরের বাইরেও ধ্বংসপ্রবণ মূর্তিবিদ্বেষীদের দ্বারা বিপর্যস্ত সংখ্যাহীন মূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেবের অপ্রমেয় জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য থাকলেও কৃষ্ণচেতনার এই বহুব্যাপকতার উদ্ভব ও বিস্তার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জনমানসে তেমন আছে বলে মনে হয়না। বাসুদেব-কৃষ্ণ সম্পর্কে উপলব্ধি এতই সহজ ও স্বতঃসিদ্ধ যে, এ বিষয়ে অনেক জিজ্ঞাসার অস্তিত্ব থাকলেও তা নিয়ে সাধারণো তেমন কোন উদ্বেগ নাই। আমাদের মনে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে ভক্তি ও অনুরাগ এত গভীর ও সহজাত যে দেবত্বের গণ্ডী অতিক্রম করে কৃষ্ণসত্তা মনে হয় যেন সাধারণ মানুষের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য সহচররূপে নিবিড় বন্ধনে গ্রথিত হয়ে রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র জীবন চিত্রের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও কৃষ্ণ-ভক্তেরা স্ব-অভিলাষ অনুসারে শিশু, কিশোর বা পরিণত চতুর্ভুজ বাসুদেবরূপী কৃষ্ণের ভিন্ন ভিন্ন রূপের উপাসনা করে থাকেন। ব্যাপকতায় ও বৈচিত্র্যে শ্রীকৃষ্ণসত্তা এত বিস্তৃত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যা অনুসন্ধিৎসুমাত্রকেই পরম-বিস্ময়ে অভিভূত না করে পারে না। শ্রীকৃষ্ণচেতনার এই বিস্ময়কর বিস্তৃতিই অভারতীয় ভারত-জিজ্ঞাসুদের নিকট কৃষ্ণরহস্যকে এক অপ্রমেয় ঔৎসুক্যের আকর বলে গণ্য হয়ে এসেছে। এই ঔৎসুক্য আত্মপ্রকাশ করেছে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে প্রচারিত নানা গবেষণায়, বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা অভিমতে এবং অনেক-ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে বিদ্বেষজনিত নানা মন্তব্যে। এইসব জিজ্ঞাসা, তথ্য সংগ্রহ ও সেই তথ্যের বিচার এবং কৃষ্ণ সম্পর্কে উদ্ভূত নানা সমস্যার বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাধান ও সিদ্ধান্তে কেবল যে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসার গুরুত্বই সূচিত

হয়েছে তাই নয়, ভারতসংস্কৃতিতে উদ্ভূত কৃষ্ণচেতনার অন্তর্নিহিত গভীর তাৎপর্যেরও ইঙ্গিত সুস্পষ্টভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কৃষ্ণ-জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে প্রধানতম সমস্যা শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা এবং তাঁর পরিচয়। পৃথিবীর মানবসংস্কৃতির ইতিহাসে যে ক'জন ব্যক্তিমানুষের প্রভাব স্বকীয় সমাজ ও নিজস্ব কালকে অতিক্রম করে সুদূরপ্রসারী স্বীকৃতি লাভ করেছে তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। ভারতবর্ষের বাইরে সেমেটিক সমাজ উদ্ভূত প্রভু যীশুখ্রীস্ট এবং পয়গম্বর মহম্মদ এবং মহাচীনের দার্শনিক কনফিউসিয়াস এবং লাওৎসের প্রভাব বহু বিস্তৃত কালব্যাপী ক্রিয়াশীল রয়েছে দেখা যায়। ভারতবর্ষের অন্যতম ঐতিহাসিক পুরুষ ভগবান বুদ্ধ ভারতের সীমান্তের বাইরেও বিস্তৃত দিগন্তব্যাপী স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। এই স্বীকৃতকীর্তি মহাপুরুষদের প্রত্যেকেই নূতন মতভিত্তিক স্বতন্ত্র ধর্মপ্রবর্তন ও স্বপ্রবর্তিত ধর্ম প্রচারের নির্দেশ ও বিধি-ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, যাঁদের কীর্তিকলাপের পরিচয় তাঁদের সমসাময়িক কাল থেকে রক্ষিত কাহিনী ও বিবরণাদি থেকে জানতে পারা যায়। ভারত-উপমহাদেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব উপরোল্লিখিত মহাপুরুষদের থেকেও দীর্ঘপ্রসারী। বুদ্ধ, খ্রীস্ট বা মহম্মদের অনুগামীদের অনুসরণের জন্য নির্দেশাবলী সুস্পষ্ট ভাবে দেওয়া রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তেমন কোন নির্দেশাবলী নিজে প্রবর্তন করেছিলেন এমন প্রমাণ তাঁর সমসাময়িক কাল থেকে রক্ষিত কোন উপকরণে পাওয়া যায় না। তিনি তাঁর জীবনকালে কোন নূতন দর্শন বা নূতন ধর্মমত প্রচার করেছিলেন বা দীক্ষাদানের সাহায্যে নূতন কোন ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন এমন প্রমাণ নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সত্যই কোন ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন কিনা, থাকলে, কবে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল, তিনি নিজে কোন নূতন ধর্ম প্রবর্তন করে না থাকলেও কিভাবে এবং কেন এই কৃষ্ণচিন্তাকে অবলম্বন করে এক বিশিষ্ট মানসিকতা, এক বিশিষ্ট জীবনপথ আত্মপ্রকাশ করেছিল, সে রহস্যের সুপ্রযুক্ত সমাধান এখনও হয়েছে বলে মনে হয় না। ইতিহাসের পথ ধরে স্মৃতি যতদূর অতীতে প্রসারিত হতে পারে এবং সেই পথে শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়ের জন্য যে সকল উপকরণের উপর নির্ভর করা যেতে পারে, প্রথমে ছান্দোগ্য উপনিষদ, তারপরে প্রখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, বেদব্যাস নামে আখ্যাত গ্রন্থকারের রচিত মহাভারত এবং কিছুসংখ্যক পুরাণই তাদের মধ্যে প্রধান। নানা গ্রন্থে পরিধৃত এইসব উপকরণই ভগবান

শ্রীকৃষ্ণকে ভারতের সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে পরিপূর্ণ কায়া গ্রহণ করে উপস্থিত হতে সাহায্য করেছে। তাছাড়া প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের দিক থেকে আছে মধ্যপ্রদেশের ভূপালের সন্নিকটবর্তী যে স্থানটি অতীতে বেশনগর নামে পরিচিত ছিল, সেই বিদিশায়, খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে হেলিয়োডোরাস নামে জনৈক গ্রীকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভগবান বাসুদেবের প্রীতিলাভের জন্য উৎসর্গীকৃত একটি পাষাণে নির্মিত গরুড়-স্তম্ভ। প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকেরা পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে বাসুদেবের উল্লেখ এবং বিদিশার গরুড-স্তম্ভে দেব-দেব বাসুদেবের প্রশস্তিকেই শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেব সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য প্রাচীনতম উপকরণ বলে গণ্য করে থাকেন। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে এই উভয় উপকরণেই শ্রীকৃষ্ণকে বাসুদেব এই আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে।[১]

'কৃষ্ণ' এই শব্দের মানুষের নাম হিসেবে উল্লেখ সর্বপ্রথম ঋগ্বেদে দেখতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে একাধিক কৃষ্ণের উল্লেখ আছে; এঁর একজন কৃষ্ণ ছিলেন ঋষি। অন্য কৃষ্ণ জনৈক ইন্দ্র বিরোধী বীর, যাঁকে অনার্য বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। এই উভয় কৃষ্ণই ইতিহাস-পুরুষ বাসুদেব-কৃষ্ণ থেকে স্বতন্ত্র। স্বভাবতই এর পরে উল্লেখ করা যেতে পারে ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত কৃষ্ণের কথা।[২] এখানে শ্রীকৃষ্ণের পরিচয়সূত্রে তাঁকে দেবকী-পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দেবকীনন্দনরূপে অভিহিত কৃষ্ণ এবং পরবর্তী কালের সাত্বত কুলসম্ভূত বসুদেবের পুত্র হিসেবে বাসুদেব নামে পরিচিত কৃষ্ণকে সাধারণভাবে এক ও অভিন্ন বলেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে, যদিও কিছু পণ্ডিতের মনে এই পরিচয় নিঃশঙ্কচিত্তে মেনে নেওয়ায় দ্বিধা দেখা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদের এই বর্ণনায় দেবকী-পুত্র কৃষ্ণকে ঘোর আঙ্গিরস নামে একজন ঋষির সঙ্গে বাক্য বিনিময়ে রত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কোন কোন পুরাতত্ত্ববেত্তা শ্রীকৃষ্ণকে এখানে ঋষি ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য বলে অভিহিত করেছেন। এদিকে মহাভারতের বর্ণনায় সন্দীপন নামে একজন মুনিকে কৃষ্ণ-বাসুদেবের বাল্যকালের শিক্ষাগুরু বলে বর্ণনা করা হয়েছে দেখা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদের আঙ্গিরসের শিষ্য বলে যে কৃষ্ণকে অভিহিত করা হয়েছে তাঁকে মহাভারতে বর্ণিত সন্দীপন মুনির নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত কৃষ্ণের সঙ্গে এক ও অভিন্ন মনে করতেও অনেকের দ্বিধা আছে। আবার অনেকে মনে করেন মহাভারতে অগ্রণী নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ কৃষ্ণ এবং পুরাণ সাহিত্যে গোকুল ও বৃন্দাবন

লীলার গোপালকৃষ্ণও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। প্রবহমান ভারতসংস্কৃতিতে যে কৃষ্ণ-চেতনার এক তুলনাহীন প্রভাব বহুযুগ যাবৎ প্রবল প্রেরণা, কর্মোদ্যম ও অধ্যাত্ম অনুভূতির যোগান দিয়ে আসছে সেই কৃষ্ণের পরিচয় সম্বন্ধে এমনি নানা সমস্যা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্কের উদ্ভব ঘটেছে।

যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত চিন্তা কল্পনার সমাবেশ হয়েছে সেইসব বিবরণে শ্রীকৃষ্ণকে অনেক জায়গায় যেমন পূর্ণব্রহ্ম বা ঈশ্বররূপে উপস্থিত করা হয়েছে তেমনি তাঁকে প্রাচীন দেবতা বিষ্ণু বা হরির মনুষ্যদেহে জন্মগ্রহণ-কারী অবতার রূপেও কীর্তিত করা হয়েছে। সমাজের এক মহাসংকটের মুখে কুরুক্ষেত্র সংগ্রামরূপী মহাবিপ্লবে এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশ করতে শ্রীকৃষ্ণসত্তায় বিষ্ণুশক্তির পূর্ণবিকাশ ঘটেছিল। ভারতমানস এই মহাপরিকল্পনার ভিত্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে এক লোকোত্তর ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই শ্রীকৃষ্ণসত্তার সৃষ্টি কিন্তু মহাভারতের নিজস্ব নয়। মহাভারত পরিপূর্ণরূপে গ্রথিত হওয়ার পরও মহাভারতের খিল হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ইত্যাদিতে যেমন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও ক্রিয়াকল্পের নূতন নূতন সংযোজন হয়েছে তেমনি মননচিন্তার সীমাহীন প্রেক্ষাপটে সংখ্যাহীন মানুষ তাদের উপলব্ধির অংশ সংযোজন করে শ্রীকৃষ্ণ-কলাদেহকে নূতন নূতন পরিধিতে গড়েছে, দিয়েছে নানা নূতন আভরণ ও রূপসজ্জা; নূতন করে প্রতিরূপায়িত করেছে তাঁর জীবনের কনকাণ্ডকে, চিত্র-বৈচিত্র্যোময় নিত্য প্রমূর্ত অভিনব রূপপ্রকল্পে। এমন করে শ্রীকৃষ্ণসত্তা যেমন যুগের পর যুগ নূতন নূতন চিন্তা-চেতনায় প্রমূর্ত হয়েছে, তেমনি এই শ্রীকৃষ্ণসত্তা তাঁর মাতা দেবকীর গর্ভে আবির্ভাবের বহু পূর্বের বিষ্ণুসত্তা অবলম্বন করে মহাকালের বিচরণ পথের বহু অতীতে ভারত-মানসকে প্রসারিত করেছে এক পরমাশ্চর্য কল্পপ্রবণতার উপলব্ধি ও সৃজন মহিমায়। শ্রীকৃষ্ণচেতনাকে উপলব্ধি করতে হলে যেমন কংস কারাগারে তাঁর আবির্ভাব কাল থেকে ইতিহাসের পথ ধরে নামতে হয়, প্রতিক্ষণে প্রতি সংঘটনে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতির চিহ্ন সন্ধানে, তেমনি যেতে হয় অতীতের সেই বিষ্ণুচিন্তার উদ্ভব ও বিবর্তন পথের অন্বেষণে, যে পথে ভবিষ্যতে শ্রীকৃষ্ণের মহা আবির্ভাবের আগমন বার্তা ধ্বনিত হয়েছিল।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ প্রচার করেছিলেন: আদিত্যানাং অহং বিষ্ণুঃ জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্। মাতা দেবকীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণ বেদের অদিতি

মাতার সন্তান বিষ্ণুবই পরম আবির্ভাব। পিতা বসুদেবের জন্ম হয়েছিল প্রখ্যাত যাদববংশের বৃষ্ণিশাখার একটি পরিবারে। এই যাদববংশসূত্রেই কালস্রোতের পথ ধরে চলে যাওয়া যায় ঋগ্বেদে, যে গ্রন্থের মন্ত্রসংগ্রহে যেমন একাধিকবার উল্লেখ পাওয়া যায় যাদববংশের, তেমনি লক্ষ্য করা যায় বিপুল তৃতীয় পদ-সঞ্চারে তাবৎ বিশ্ব পরিব্যাপনকারী ভগবান বিষ্ণুব পরিকল্পনার।

এই বিশাল পটভূমিসূত্রেই শ্রীকৃষ্ণ সুদূব অতীত কাল থেকে প্রবাহিত ভারতীয় সংস্কৃতিধারার সঙ্গে এক গভীর যোগসূত্রে গ্রথিত হয়েছেন, কালের বিস্তৃতি অতিক্রম করে। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে হলে তাই সেই অতীতের বিবরণের সঙ্গেও কিছু পরিচয়েব বিশেষ আবশ্যকতা আছে এবং সেইজন্যই এখানে সে সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনার অবতারণা করা হচ্ছে।

কৃষ্ণচিন্তার উন্মেষ

মহাভারত এবং পুরাণ কাহিনীগুলির মতে যাদববংশ ভারতেব সংস্কৃতি ক্ষেত্রে একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ বংশ বলে গণ্য হয়ে এসেছে। যাদববংশের আদিপুরুষ যদু ছিলেন প্রখ্যাত চন্দ্রবংশীয নৃপতি যযাতিব প্রথম পুত্র। কথিত আছে যযাতি অসুরবাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা এবং অসুরগুরু শুক্রাচার্যেব কন্যা দেবযানীকে বিবাহ কবেছিলেন। দেবযানীর ছিল তিন পুত্র—যদু, অনু এবং তুর্বসু ; শর্মিষ্ঠার দুই পুত্র, দ্রুহ্যু এবং পুরু। একসময়ে শ্বশুর শুক্রাচার্য যযাতির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে অভিসম্পাত কবেছিলেন, যাব ফলে যযাতি জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। যযাতির অনুরোধে তাঁর পঞ্চপুত্রের মধ্যে অসুবকন্যা শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত কনিষ্ঠতম পুত্র পুরু পিতার জবা গ্রহণ কবে পিতাকে স্বকীয় যৌবন প্রদান করে-ছিলেন। এই কারণেই জীবনের অপরাহ্নে বানপ্রস্থ গ্রহণের সংকল্প নিয়ে যযাতি পুরুকে শুধু তাঁর যৌবনই প্রত্যর্পণ করেন নাই, কনিষ্ঠতম হলেও তাঁকেই তিনি আপনার স্থলাভিষিক্ত করে বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন। যযাতির রাজ্য পাঁচ পুত্রের মধ্যেই বণ্টিত হয়েছিল ; পুরু, পিতার সম্পূর্ণ রাজ্যের আধিপত্য অর্জন করেন নাই। তবে যযাতি প্রদত্ত রাজ্য পঞ্চকেব মধ্যে পুরুকেই অধিনায়কত্ব দেওয়া হয়েছিল, এবং অন্যান্য ভ্রাতারা পুরুর এই অধিনায়কত্বকে স্বীকারও করে নিয়ে-ছিলেন। এই কাহিনী থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা

যেতে পারে যে, পুরুর এইভাবে অধিরাজ হিসেবে স্বীকৃতির মাধ্যমে ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাস্বীকৃত অধিনায়কত্বের সংরক্ষণে সমমর্যাদাসম্পন্ন অংশীদার রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সংগঠনের সূত্রপাত হয়েছিল, যে রাষ্ট্রচেতনা বহুকাল পর্যন্ত ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে সংহত ও সুদৃঢ় করে রেখেছিল। ভারত রাষ্ট্রকাঠামো সম্পর্কে যাঁরা গবেষণা করেছেন তাঁদের রচনায় এই ঘটনার তাৎপর্য সম্পর্কে কোন উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। কুরু-পাণ্ডব সংঘর্ষজাত মহাভারত যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা বর্ণনা প্রসঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রিক চেতনার এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

পুরাণে বর্ণিত যযাতি কাহিনীর কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা এ নিয়ে বিতর্ক আছে। যযাতির এবং মহাভারত যুদ্ধের ঐতিহাসিকতার কোন প্রত্ন-তাত্ত্বিক প্রমাণ এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

পুরাণে বর্ণিত কাহিনী এবং ইতিবৃত্তগুলিকে এপর্যন্ত আধুনিক ইতিহাস-বেত্তারা প্রামাণ্য হিসেবে গ্রহণ করেননি। তবে বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত ঘটনা ও বিবরণের কিছু কিছু ইতিহাসভিত্তিক বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও এইসব বিবরণের ভিত্তি এবং যথার্থতা সম্বন্ধে প্রভূত সন্দেহই ইউরোপীয় ভারততত্ত্ববিদদের দ্বারা ঘোষিত হয়ে এসেছে লক্ষ্য করা যায়। আর স্বদেশীয় ভারতবিদেরা এ বিষয়ে একান্তই উদাসীন।

পুরাণগুলিতে সাধারণভাবে কালস্রোতের যে বিভাগ পরিকল্পিত হয়েছে তাকে বলা হয় মন্বন্তর। এই কল্পনাপ্রসূত বিবরণমতে সৃষ্টি যেমন স্বয়ং সমুদ্ভূত, আদি মনুও তেমনি স্বায়ম্ভুব। সৃষ্টি যে বিবর্তনপথে স্বয়ংই উদ্ভূত হয়েছে, বর্তমানের একান্ত অগ্রসর বৈজ্ঞানিক চিন্তার দ্বারাও সেই তত্ত্ব সমর্থিত হচ্ছে দেখা যায়। পরপর ছয়জন মনুর কাল অতিক্রান্ত হলে বিবস্বান নামে পরিচিত সূর্যের পুত্র বৈবস্বত মনুর যুগ বিবর্তিত হয়। বর্তমান যুগকে এই বৈবস্বত মনু। যুগ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। পুরাণগুলিতে বর্ণিত ঘটনার ক্রমাবলী এবং রাজন্যকুলপঞ্জির আদিপুরুষ এই বৈবস্বত মনু থেকেই বর্ণিত হয়েছে দেখা যায়। তবে বৈবস্বত মনুর আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বের কিছু ঘটনার স্মৃতিও পুরাণগুলিতে রক্ষিত আছে বলে প্রতীয়মান হয়।

ঋগ্বেদে দেবতা হিসেবে বিবস্বতের নামের উল্লেখ আছে। সেখানে এই বিবস্বতকে দুই অশ্বিন, মৃত্যুর অধিপতি যম এবং মনুষ্যজাতির আদিপুরুষ মনুর

পিতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে।[৩] ইরানের মাজদা উপাসকদের ধর্মগ্রন্থ জেন্দ আবেস্তাতেও বিবস্বত ও যমের উল্লেখ আছে।[৪] আবেস্তাতে বিবস্বত বিবনহ্বন্ত, এবং যম যিম নামে পরিচিত। ইরানীয় পরিকল্পনায় এই বিবনহ্বন্তই প্রথম মানুষ এবং ইরানীয়েরা নিজেদেরকে সেই বিবনহ্বন্তেরই বংশধর বলে মনে করেন। ভারতীয় পরিকল্পনায় বিবস্বান কিন্তু ক্রমে সূর্য বা আদিত্যরূপে পরিগণিত হলেন এবং মনু গণ্য হলেন বৈদিক সংস্কৃতির প্রবর্তক, প্রথম মানুষ রূপে। বৈদিক ও আবেস্তিক সংস্কৃতি ও মনন কল্পনা একই উৎসমূল থেকে উদ্ভূত হলেও বিবস্বতের দুই অপত্য মনু এবং যমকে অবলম্বন করে দুইটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতিধারার প্রবর্তন হয়েছিল এইসব তথ্য থেকে তা প্রতীয়মান হয়।

শতপথ ব্রাহ্মণে মনু-মৎস্য কথা নামে একটি কথিকা আছে।[৫] এই কথিকায় এক মহাপ্লাবনে কি করে এক রহস্যজনক মৎস্যের নির্দেশে বৃহৎ এক নৌকায় উঠে মনু আত্মরক্ষা করেছিলেন তার বিবরণ উল্লিখিত আছে।[৬] খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ বাইবেলেও অনুরূপ এক মহাপ্লাবনের উল্লেখ আছে। এই প্লাবন থেকে এক নৌকায় উঠে যিনি আত্মরক্ষা করেছিলেন, বাইবেলে তাঁর নাম 'নোয়া'। মনু ও 'নোয়া' এই দুই নামের সাদৃশ্য এবং মহাপ্লাবন ও সেই প্লাবন থেকে আত্মরক্ষার বিবরণের সৌসাদৃশ্য দৃষ্টে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনেকেই দ্বিধাহীনভাবে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে শতপথ ব্রাহ্মণের এই প্লাবনের কাহিনীটি ভারতীয়েরা সেমেটিক সূত্র থেকেই পেয়েছিল। এই কাহিনী ভারতের নিজস্ব বা ভারতে সংঘটিত কোন প্লাবনের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়নি। অবশ্য খ্যাতনামা ভারতবিদ ম্যাক্সমূলার ও হপকিন্স এই অভিমত সম্পর্কে খুব সুনিশ্চিত ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে স্মরণে রাখা যেতে পারে যে সেমেটিক সংস্কৃতিতে মানুষজাতিকে নোয়ার সন্তান হিসেবে প্রতিপন্ন করে কোন শব্দের প্রচলন নাই; ইউরোপীয় ভাষাগুলিতে মনুষ্যজাতির পরিচয়ে ব্যবহৃত 'ম্যান' শব্দের সঙ্গে মনু শব্দজাত মানব বা মনুষ্য শব্দের সাদৃশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। পারসিকদের আবেস্তাতেও এই প্লাবনের উল্লেখ আছে। কিন্তু সেখানে প্লাবনোত্তর এই মনুকে অবলম্বন করে মনুষ্যসমাজের উদ্ভব ও বিবর্তনের কোন প্রসঙ্গ নাই। বলতে কি যদিও বিবস্বান (বিবনহ্বন্ত) এবং যম (যিম) আবেস্তায় আবেস্তিক সমাজের আদি প্রবর্তক বলে কীর্তিত, সেখানে কিন্তু মনুর কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। এই অনুল্লেখ যে সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত এবং বেদে বর্ণিত মানুষ বা মনুপ্রবর্তিত সমাজ এবং বিবনহ্বন্ত

ও যিম থেকে উদ্ভূত আবেস্তিক সমাজের বিভিন্নতা ও বিভেদেরই ইঙ্গিত বহন করছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

এই প্লাবনের কাহিনী যে মূলত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যেই উদ্ভূত হয়েছিল একথা হয়তো সুনিশ্চিত। শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত সেই মহাপ্লাবনের অবসানে মনুর শেষপর্যন্ত কি হয়েছিল তার কোন উল্লেখ নাই। ঋগ্বেদে মনুকে নূতন একধরনের যজ্ঞের প্রবর্তক বলে অভিহিত করা হয়েছে। ঋগ্বেদের নির্দেশিত ধর্মক্রিয়ার প্রধান অবলম্বন ছিল এই যজ্ঞ; অগ্নিতে হব্য আহুতি দিয়ে যজ্ঞের সাহায্যে উদ্দিষ্ট দেবতার প্রীতিবিধানের ব্যবস্থাই ছিল ঋগ্বেদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের মুখ্য কৃত্য। ঋগ্বেদের দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রকেই প্রাধান্ত দেওয়া হয়েছিল। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে রচিত ঋকের সংখ্যাই অগ্নির পরে সর্বাধিক। ইন্দ্রকে ঋগ্বেদে মঘবন, পুরন্দর এবং দেবরাজ ইত্যাদি নানা আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। ঋগ্বেদে বর্ণিত ইন্দ্রের কীর্তির মধ্যে দানব নামে পরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বী বৃত্রকে সংহার করাই প্রধানতম বলে বিবেচিত হয়েছে। ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে 'বৃত্র' শব্দ বহুবচনেও ব্যবহৃত হয়েছে, যা থেকে অনেকে অনুমান করেছেন যে বিশিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত একশ্রেণীর লোককে বৃত্র আখ্যায় অভিহিত কবা হত।

বৃত্রনামে পরিচিত এই জনগোষ্ঠীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ইন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা। ঋগ্বেদেব এই ইন্দ্র এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বৃত্র কে ছিলেন এবং কি কারণে ইন্দ্রের সঙ্গে বৃত্রের দ্বন্দ্ব ও ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রের নিধন ঘটেছিল এ সম্বন্ধে পণ্ডিতমহলে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এইসব প্রশ্ন সম্পর্কে কোন সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ রেনো ঋগ্বেদের ইন্দ্র-বৃত্র উপাখ্যানকে বহিরাগত আর্যদের সঙ্গে নাগ-উপাসক ভারতের প্রাক্-আর্য অধিবাসীদের বিরোধ ও সংঘর্ষের ইঙ্গিতগর্ভ বিবরণ বলে মনে করতেন। কোশাম্বীর মতে প্রাক্-আর্য অধিবাসীদের জলাধারগুলি (বাঁধ) ইন্দ্রের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল, ইন্দ্র-বৃত্র উপাখ্যানে সেই স্মৃতিই বিধৃত আছে।[৭] পুনার ভাণ্ডারকার গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পণ্ডিত ডাণ্ডেকার তাঁর পূর্বগামী বেনভেনিস্টে এবং রেনুর অভিমতের সমর্থনে লিখেছেন যে, ইন্দ্র মূলত একজন পরাক্রমশালী জননায়করূপেই আবির্ভূত হয়েছিলেন, পরে দেবতারূপে গণ্য হন।[৮]

সম্প্রতিকালে প্রত্নতত্ত্ববিদ সার মর্টিমার হুইলার অনুমান করেছেন যে ভাবতে আগন্তুক একটি জাতিগোষ্ঠীর নায়ক এই ইন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা সিন্ধু অঞ্চলের মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় অবস্থিত তাম্র-প্রস্তর যুগের নগরগুলিকে ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করেছিলেন।[৯] ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে ইন্দ্র কর্তৃক নিহত বৃত্রের নিরানব্বইটি নগরও ইন্দ্র ধ্বংস করেছিলেন। এই নগর বা পুর বিদারণ কবার কৃতিত্ব থেকেই ইন্দ্রের পুরন্দর আখ্যা বা পরিচিতি অর্জিত হয়েছিল। বৃত্র ছাড়া ইন্দ্র প্রত্যক্ষ-ভাবে আরও যে-সব শত্রু নিধন করেছিলেন তাদের মধ্যে নমুচি, বল, অর্বুদ ইত্যাদির উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে বৃত্রকে বলা হয়েছে দানব ও অহি বা সর্প। বলের অধীনেও অনেক নগর ছিল।[১০] ইন্দ্র সেগুলিও ধ্বংস করেছিলেন। তাঁর এই প্রবল পরাক্রমের উপলব্ধি ও স্বীকৃতিব ফলেই অনুগামীদের দ্বারা ইন্দ্র দেবত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন বলে অনুমান করা যায়। বহু নগরেব উপর কর্তৃত্ব-সম্পন্ন দানবরাজ 'বৃত্র' যে বিশেষ এক উচ্চ সভ্যতার অধিকারী ছিলেন ঋগ্বেদের বর্ণনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অন্যায় নয়। ইন্দ্র যেমন 'বৃত্র' এবং 'বল' ইত্যাদি দানবকে নিজে পর্যুদস্ত করেছিলেন, তেমনি ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে যে তিনি কুৎস নামে পবিচিত আঙ্গিরসের বংশের একজন ঋষিকে তার এক দুর্মদ শত্রু সুষ্ণকে হত্যা করতে সাহায্য করেছিলেন।[১১]

ইন্দ্র-পূর্ববর্তী সমাজে যাদের দেবতা বলে উপাসনা করা হত ঋগ্বেদে তাদের অসুর নামেও পরিচয় আছে। ঋগ্বেদে ইন্দ্রকেও কয়েকবার অসুর আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে দেখা যায়।[১২] অন্যান্য যে-সব দেবতাকে ঋগ্বেদে অসুর আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে তাদেব মধ্যে দ্যৌস্, বরুণ, সবিতৃ, পুষণ, ইত্যাদি প্রধান। ঋগ্বেদের দেবতাদেব মধ্যে অসুর আখ্যায় অভিহিত এইসব দেবতাবা বেশ প্রাচীন। দেবতা হিসেবে ইন্দ্রের উদ্ভবকে স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত পরবর্তী-কালের ঘটনা বলে গণ্য করা যেতে পাবে। ইন্দ্রের সঙ্গে সূর্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিচয় কুৎস-সুষ্ণ দ্বন্দ্বেব প্রসঙ্গে পরিলক্ষিত হয়। তেমনি অন্য একটি বিবরণেও 'এতস' নামে এক দ্রুতগামী অশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে সূর্যের রথের চাকা খুলে পড়বার বিবরণও ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে। ইন্দ্র এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এতসকে সাহায্য করেছিলেন। 'এতস' নিঃসন্দেহে সূর্যেরই অশ্ব ; সূর্যের রথের সঙ্গে এতসের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সূর্যের রথের চক্র বিচ্যুত হয়ে পডার, ও এই দ্বন্দ্বে এতসকে ইন্দ্রের সাহায্যদানের কাহিনীটির অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতের কোন ব্যাখ্যা

বেদ আলোচনার ক্ষেত্রে প্রখ্যাত পণ্ডিত এ. এ. ম্যাকডোনেল দেননি। তিনি লিখেছেন, "It appears to be impossible to suggest any satisfactory interpretation of this myth."[১৩] দ্যৌস্ ছিলেন দেবতারূপে কল্পিত মহাকাশ। শূন্যমণ্ডলে সৃষ্টির আদি থেকেই মহাবিস্ময়ের আকর সূর্য স্বয়ং প্রত্যক্ষ এবং মানুষের নিকট দেবতা বলে গণ্য। ইন্দ্রের দেবতারূপে অভ্যুত্থানের সময় বা পরে যাদের সঙ্গে ইন্দ্রের বিরোধ ঘটেছিল তাদের মধ্যে বৃত্র, বল ইত্যাদি শক্তিধর নাগর সভ্যতায় সমৃদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রকৃত পরিচয় কি বা তারা কোন্ দেবতার উপাসক ছিলেন এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উঠতে পারে। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলে কিছু 'বৃত্র'কে আর্য এবং অন্য কিছু 'বৃত্র'কে দাস এই আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। এই তথ্যসূত্রে বৃত্র বলতে একসময় যে মানুষ বোঝাত, এবং জাতিগতভাবে তাদের এক অংশকে যে ইন্দ্রের অনুগামী এবং আর্যদের স্বজাতি বলে গণ্য করা হত, ঋগ্বেদের এই উল্লেখ থেকে তা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়। ইন্দ্রের বিশেষ প্রীতি-ভাজন ঋষি কুৎসের প্রতিদ্বন্দ্বী সুষ্ণকে উল্লেখ করা হয়েছে দাস আখ্যায়। ইন্দ্রের অন্য আর একজন অত্যন্ত প্রীতিভাজন রাজার নাম ছিল দিবোদাস। এই দিবোদাসকে ঋগ্বেদে একজন আর্যবংশীয় রাজা বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। ইনি দেবরাজ ইন্দ্রের অনুগ্রহে সম্বর নামে এক মহাপরাক্রমশালী শত্রুকে পরাজিত ও নিহত করেছিলেন। (১।৫১:৬ ; ২।১৯:৬) ঋগ্বেদে প্রায় কুড়িবার সম্বরের উল্লেখ আছে ; কোথাও কোথাও তাকে উল্লেখ করা হয়েছে দাস বলে। ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে যে মহাপরাক্রান্ত এই সম্বর অহংকারের বশে নিজেকে একজন দেবতা বলে মনে করত। (৭।১৮:২০) প্রভূত শক্তি থাকা সত্ত্বেও এই সম্বরকে ইন্দ্র পর্যুদস্ত ও নিহত করেছিলেন এবং সম্বরের বহু নগরীও তিনি বিধ্বস্ত করেছিলেন। ঋগ্বেদের এই বর্ণনায় স্পষ্টই বোঝা যায় যে দিবোদাসের সহায়তাকারী এই ইন্দ্র স্বয়ং যুদ্ধ করে সম্বরকে পরাজিত করেননি। দেবরাজ ইন্দ্রের শক্তির আশ্রয় ও কৃপায় মানুষ দিবোদাসই সম্বরকে পর্যুদস্ত করেছিলেন, যেমন ইন্দ্রের কৃপায় ঋষি কুৎস পর্যুদস্ত করেছিলেন তাঁর দাস আখ্যায় পরিচিত শত্রু সুষ্ণকে। ঋজিশ্বান নামে ইন্দ্রের অন্য এক আশ্রিত অনুগামী 'পিপ্রু' নামে অন্য এক শত্রুকে পরাজিত ও নিহত করেছিলেন, যাকে ঋগ্বেদে দাস এবং অসুর এই দুই আখ্যায়ই অভিহিত করা হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। (দাস পিপ্রু ১।১০১:১-২ ; ৮।৩২:২ ; অসুর পিপ্রু ১০।১৩৮:৩) ইন্দ্রের অনুগত জনগোষ্ঠীর

বিরুদ্ধাচারী প্রভৃত শক্তিশালী একশ্রেণীর মানুষকেই যে ঋগ্বেদে কখনও দাস, কখনও দস্যু, কখনও দানব, আবার কখনও বা অসুর আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে এইসব উল্লেখ থেকে একথা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়। বেদের আলোচনায় যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ পণ্ডিতই এইসব দাস, দস্যু, বা অসুরদের ভারতে আর্য আগমনের পূর্বেকার আদিবাসী অনার্য শ্রেণীর জনগোষ্ঠী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

অন্যান্য যে সকল প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের বিরোধ ও সংঘর্ষ ঘটেছিল তাদের মধ্যে সূর্যের সঙ্গে বিরোধের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঋগ্বেদের বেশ কয়েকটি সূক্তে এই বিরোধের বর্ণনা আছে। ঋগ্বেদের উল্লিখিত নানা ঘটনা ও বিবরণে স্বভাবতই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত ভিন্ন ভিন্ন কিছু জনগোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপ, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং পরিচয় ও অবস্থানের সংবাদ বিধৃত আছে বলে মনে হয়। এইসব জনগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান যারা, ঋগ্বেদের সূক্ত বা বক্তব্যগুলি তাদের দ্বারাই রচিত হয়েছিল এবং এইসব রচনায় তাদের নিজেদের ক্রিয়াকলাপ সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদির পরিচয়ই প্রধান। এইসব তথ্যসূত্রেই এই সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বৈদিক সংস্কৃতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই সংস্কৃতিধারার যাঁরা পরিপোষক এবং অনুগামী তাঁরা প্রায়শই নিজেদের 'আর্য' এই আখ্যায় অভিহিত করেছেন। তবে ঋগ্বেদেই এই সংস্কৃতির অনুগামীদের সঙ্গে বিবদমান বেশকিছু প্রতিদ্বন্দ্বী জনগোষ্ঠীরও উল্লেখ এবং বর্ণনা আছে ; এই প্রতিদ্বন্দ্বী জনগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে বেদের সূক্ত রচয়িতাদের শত্রুতা ও যুদ্ধবিগ্রহের উল্লেখ ও সেইসব বিরোধের বিবরণই ঋগ্বেদের অনেক সূক্তের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। এই দ্বন্দ্ববিরোধ, যারা বেদ বা ইন্দ্রের অনুগামী এবং মনুর সন্তান, তাদের মধ্যেও ঘটেছিল। ঋগ্বেদে, বিশেষ করে সপ্তম মণ্ডলে বর্ণিত দাশরাজ্ঞ সংগ্রামের বিজেতা রাজা সুদাস এবং তাঁর দশজন প্রতিদ্বন্দ্বী সকলেই কিন্তু ইন্দ্রানুগামী সমাজেরই অংশীদার ছিলেন ; তবে যমুনাতীরবর্তী 'ভেদ' নামে পরিচিত সুদাসের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী এক মহাশক্তিধর রাজাকে ঋগ্বেদে স্বতন্ত্র সংস্কৃতির অনুগামী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঋগ্বেদে ইন্দ্রের সঙ্গে সূর্যের এই বিরোধ ও ইন্দ্র কর্তৃক সূর্যের চক্র ছিনিয়ে নেওয়ার বর্ণনার মধ্যে যে তেমন কোন বিশেষ তাৎপর্য আছে এ ধারণা, এ সম্বন্ধে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁদের কাছে বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে

হয়নি। ঋগ্বেদের এই উল্লেখ সম্পর্কে ইংরাজ পণ্ডিত ম্যাকডোনেলের মতই এ সম্বন্ধে প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। ম্যাকডোনেল বলেন : "This may allude to the obscuration of the Sun by a thunderstorm."[১৪]

ইন্দ্রের সঙ্গে বিরোধের উল্লেখ ঋগ্বেদে থাকলেও সূর্য ঋগ্বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা বলে স্বীকৃত। তবে ইন্দ্রের দেবতা হিসেবে স্বীকৃতি যে সূর্যের স্বীকৃতির অনেক পরে ঘটেছিল বেদে তার অনেক প্রমাণ আছে। সূর্য তাঁর অস্তিত্বসূত্রেই দেবতা। (১০।৩৭:১) জন্মসূত্রে ইন্দ্র যে মানুষই ছিলেন ঋগ্বেদের অন্তত দুটি সূক্ত থেকে তা বেশ বোঝা যায়। (৩।৪৮ ; ৪।১৮) এই দুই সূক্তের বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে মাতার গর্ভের পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করে ইন্দ্রের জন্ম হয়েছিল। (৪।১৮:১-২) পৃথিবীর ইতিহাসে বহু শক্তিধর মানুষেরই এই ধরনের অস্বাভাবিকভাবে জন্মগ্রহণ করবার কথা জানা যায়। রোমক ইতিহাসের পরমতম শক্তিধর বীর জুলিয়াস সিজারকে যে প্রক্রিয়ার দ্বারা তাঁর মাতৃগর্ভ থেকে বিমুক্ত করা হয়েছিল, সেই শল্যক্রিয়াকে আজও সিজারের নামে পরিচিত করা হয়ে থাকে। অপালা নামে জনৈক মহিলার এক দুর্ঘটনায় দেহ থেকে পা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তাকে একটি কৃত্রিম পা সংযোজিত করে দেওয়া হয়েছিল—ঋগ্বেদে এই কাহিনীর বর্ণনা আছে। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের জন্ম সম্পর্কিত কাহিনী থেকে শল্যের ব্যবহারে কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রের জন্ম হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়ত খুব অযৌক্তিক নয়। ঋগ্বেদের পূর্বোল্লিখিত সূক্তের এই ব্যাখ্যাই সমীচীন বলে মনে হয়। বহু তপস্যা ও যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলেই ইন্দ্র দেবত্ব অর্জন করেছিলেন। ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্তে ইন্দ্রকেও 'অসুর' আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। এই উল্লেখ থেকে মনে হয়, যে-সমাজে ইন্দ্রের জন্ম হয়েছিল সেই সমাজ মূলত 'অসুর' সমাজ নামেই পরিচিত ছিল। তখনও এই সমাজ দেবসমাজ নামে পরিচয় লাভ করেনি। পরে সমাজের আধিপত্য নিয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের এক প্রবল দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল, ফলে যারা তাঁর নেতৃত্ব স্বীকারে সম্মত ছিল তাদের নিয়ে ইন্দ্র এক স্বতন্ত্র সমাজ প্রবর্তন করেছিলেন। এই নূতন সমাজই দেবসমাজ নামে চিহ্নিত হয়েছিল।

ইন্দ্র পরিচালিত এই সমাজের ইতিহাস অতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। ঋগ্বেদ সংহিতার অনুশীলনে এই সমাজের প্রারম্ভিক ইতিবৃত্তান্ত সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। ইন্দ্রের

আবির্ভাব ও দেবতারূপে ইন্দ্রের স্বীকৃতির পূর্বে এই সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে তেমন কিছু পরিচয় এই বেদ থেকে উপলব্ধি করা দুষ্কর। তবে ইন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বেও যে এই সমাজের অস্তিত্ব ছিল এবং ইন্দ্রের উদ্ভবের পর সেই প্রাচীনতর সমাজের সকলেই যে ইন্দ্রকে নেতা বা দেবতা স্বীকার করে নেয়নি এ বিষয়ে বোধহয় সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। এই সমাজের পূর্বতন দেবতাদের মধ্যে একসময় ইন্দ্রের স্থান স্বীকৃত হয়েছিল এবং অচিরকালের মধ্যেই এই সমাজের এক বৃহৎ অংশ ইন্দ্রকে এই দেবতাদের মধ্যে পুরোগামী ও রাজা বলে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অন্যান্য দেবতারা, যাঁরা অতীতে সাধারণত অসুর আখ্যায় অভিহিত হতেন তাঁদের অসুর পরিচয় বিলুপ্ত হল ; তাঁরাও এই ইন্দ্রের অনুগামী সমাজে দেবতা নামেই পরিচয় লাভ করলেন। এইসব পূর্ব থেকে প্রচলিত ইন্দ্র ভিন্ন অন্য দেবতাদের ঋগ্বেদীয় সূক্তগুলিতে সাধারণত ইন্দ্রের সহচর বা ইন্দ্রের সাহায্যকারী বলেই অভিহিত করা হতে লাগল ; ইন্দ্রই হয়ে দাঁড়ালেন প্রধান নেতা এবং দেবতা।

ইন্দ্রের সহায়ক দেবতাদের মধ্যে, বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে এমন একজন দেবতার উল্লেখ দেখা যায় যাঁর নাম 'বিষ্ণু'। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর উল্লেখ খুব কমই লক্ষ্য করা যায় ; অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে ঋগ্বেদীয় সমাজে বিষ্ণুর দেবতা হিসেবে তেমন কোন প্রাধান্য ছিল না। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সমাজে, বিভিন্ন পুরাণে, রামায়ণে এবং মহাভারতে বিষ্ণু অভাবনীয়ভাবে জনপ্রিয়তার এক উত্তুঙ্গ শীর্ষস্থান অর্জন করেছিলেন। এই বিবর্তনের ইতিহাস অত্যন্ত বিস্তৃত এবং গভীর রহস্যে সমাকীর্ণ।

ঋগ্বেদে যে-বিষ্ণুর উল্লেখ ছিল অত্যন্ত সীমিত তিনি কি করে পরবর্তী যুগে এই অভূতপূর্ব প্রাধান্য অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন ভারততত্ত্ব অনুশীলনকারী পাশ্চাত্য এবং দেশজ সকল পণ্ডিতই প্রায় এই তথ্য নিয়ে বিস্ময় অনুভব করেছেন এবং এই সমস্যার নিজ নিজ বুদ্ধি ও প্রতিভাসম্মত সমাধানের প্রয়াস করেছেন। এই সমস্যা নিয়ে যে-সব বৈদেশিক জিজ্ঞাসুর বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল তাঁদের মধ্যে খ্যাতনামা ভারতবিদ পণ্ডিত স্টেন কোনো (Die Inder in A. Bertholet and E. Lehmann, Lehrbuch der Religionsgeschte, Tubingen, 1925, Vol. II., pp. 27 ; 29 ; 63) বলেছেন যে, ঋগ্বেদে বিষ্ণুর উল্লেখ কম থাকলেও দেবতা হিসেবে বিষ্ণুর মর্যাদা, প্রাধান্য বা সামর্থ্য

কিছু কম ছিল না। ভারতীয় সংস্কৃতিতে বিষ্ণু-কৃষ্ণ রহস্য অনেক পাশ্চাত্য ভারত জিজ্ঞাসুকেই যে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ ও আকৃষ্ট করেছে সে-কথা এই সমস্যা সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণে যাঁরা বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের সংখ্যা ও অনুশীলন থেকেই উপলব্ধি করা যায়। ভারত সমাজে এই বিষ্ণু-কৃষ্ণ চেতনা যে খ্রীস্টধর্ম বিস্তারে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল ওয়ার্ড, মার্শমান, ডাফ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ খ্রীস্টধর্ম প্রচারে কৃতসংকল্প পাদ্রীদের রচনা থেকেও বেশ ভালভাবে উপলব্ধি করা যায়। ধর্মপ্রচারের সঙ্গে তেমন যুক্ত না থাকলেও জার্মান ভারতবিদ ওয়েবার নানা যুক্তিবিচারের সাহায্যে এই বিষ্ণু-কৃষ্ণ তত্ত্বের উপর খ্রীষ্টীয় প্রভাব প্রমাণে সবিশেষ তৎপরতা দেখিয়েছিলেন। এ ছাড়া নিছক তত্ত্বানুসন্ধানী যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ফরাসি পণ্ডিত বেরগেইগনে (La religion Vedique, II, Paris, 1883), ইংরাজ সংস্কৃতজ্ঞ মনিয়ার উইলিয়াম্‌স (Hinduism, London, 1880), জার্মান পণ্ডিত ফন শ্রোডার (Arische religion, Leipzig, 1914), আমেরিকান ভারতজিজ্ঞাসু ওয়াশব্রুক হপকিন্‌স (Journal of the American Oriental Society, 16, 1896), ম্যাকডোনেল (Vedic Mythology, Strassburg, 1915), আর্থার বেরিডেল কীথ (The Religion and Philosophy of the Vedas and the Upanishads, Harvard, 1925), হিলেব্রাণ্ড (Vedische Mythology, Breslau, 1929) প্রমুখ খ্যাতনামা ভারততত্ত্ববিদদের বিষ্ণু-কৃষ্ণ তত্ত্ব সম্পর্কে অনুশীলন, চিন্তা এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এ সম্বন্ধে আগ্রহীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এঁদের মধ্যে বেরিডেল কীথ হয়ত ঠিকই অনুমান করেছিলেন যে ঋগ্বেদের সমাজে যে-সব দেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল তাদের সকলের পারস্পরিক মর্যাদা সম্পর্কে ঋগ্বেদে সংগৃহীত মন্ত্রসমূহ থেকে নিশ্চিতভাবে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। (The Religion and Philosophy of the Vedas and the Upanishads, p. 109) এই যুক্তি থেকেই তাঁর মনে হয়েছে যে ঋগ্বেদে বিষ্ণু সম্পর্কিত মন্ত্রের স্বল্পতা থাকলেও বিষ্ণুকে অপ্রধান বলে গণ্য করা কোনমতেই সমীচীন নয়। কিন্তু কি কারণে বিষ্ণু পরবর্তী যুগে অন্য বৈদিক দেবতাদের অতিক্রম করে প্রধানতম দেবতারূপে গণ্য হয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে তিনি কোন কারণ নির্দেশ করেননি।

ঋগ্বেদে বিষ্ণু সম্পর্কিত মন্ত্রে বিষ্ণুর এমন একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে যা

অন্য কোন দেবতার ক্ষেত্রে দেখা যায় না। এই বৈশিষ্ট্য বিষ্ণুর 'পরমং পদম্'। এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় বিষ্ণুর তৃতীয় পদক্ষেপে, যার উল্লেখ বিশেষ করে প্রথম মণ্ডলের ১৫৫ সংখ্যক সূক্তের কয়েকটি মন্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণুর এই তিনটি পদক্ষেপ যে নভোমণ্ডলে সূর্যের পরিক্রমণের দ্যোতক এ সম্বন্ধে প্রায় সকল বেদজিজ্ঞাসুই একমত। বিষ্ণু তাঁর তিনটি পদক্ষেপে সমস্ত সৃষ্টিকে অতিক্রম করেন। এই পদ-সঞ্চারণের দুইটি মানুষ দেখতে পায়, কিন্তু তাঁর তৃতীয় পদক্ষেপ এত উঁচুতে যে তা পক্ষীদেরও অগম্য এবং মানুষের দৃষ্টির অতীত। (১. ৫৫:৫ ; ৫।৯৯:২) এই মন্ত্রের প্রবক্তার পরমতম অভিলাষ বিষ্ণুর এই পরম-পদ লাভ করা। (১।১৫৪:৬) বিষ্ণুর এই উচ্চতম অবস্থানকে সাধারণের দৃষ্টিতে নভোমণ্ডলে গ্রথিত একটি চক্ষুর মত প্রতীয়মান হয়। (১।২২:২০) বিষ্ণুর এই তৃতীয় পদ যেখানে সেখানেই তাঁর প্রিয় অবস্থানস্থল (৩।৫৫), যাস্ক যাকে বলেছেন বিষ্ণুপদ (নিরুক্ত ১২।১৯)। এই বিষ্ণুপদই পরবর্তী যুগে বিষ্ণুলোক বা জীবমাত্রের শেষ আশ্রয় বলে গণ্য হয়েছে।

ঋগ্বেদে অল্পসংখ্যক যে কয়েকটি মন্ত্রে বিষ্ণুর উল্লেখ আছে তার মধ্যে বিষ্ণুর এই পদসঞ্চারণ, তিনবার পদক্ষেপ (ত্রি-বিক্রম) ও সেই উর্ধ্বতম বা পরমতম পদক্ষেপের উল্লেখই প্রাধান্য অর্জন করে আছে। এই ইঙ্গিতকেই বিষ্ণু-কৃষ্ণ তত্ত্ব-অনুশীলনকারীরা পরবর্তীকালে বিষ্ণুদেবতার অপ্রতিদ্বন্দ্বী বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা ও প্রাধান্য অর্জনের বীজ বলে গণ্য করেছেন। বিষ্ণুর এই 'পরমং পদম্' বা উচ্চতম অবস্থানস্থলের বৈশিষ্ট্য দেখেই পণ্ডিতেরা পরবর্তী যুগে বিষ্ণুকে পরমতম সত্তারূপে গৃহীত হওয়ার কারণ বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মধ্যবর্তী পদক্ষেপের উল্লেখসূত্রে কিছু ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে বিষ্ণুর বামনরূপে উপস্থিত হয়ে সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত করে দেবতাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার উল্লেখ এবং পুরাণ সাহিত্যে বলিকে প্রতিহত করে বামনরূপী বিষ্ণুর ত্রিজগৎ পুনরুদ্ধারের কাহিনীর উল্লেখ করা হয়।

ঋগ্বেদে বর্ণিত রূপক কাহিনীসমূহের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রের নিধনের ঘটনাকে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। ইন্দ্র তাঁর আয়ুধ বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে নিধন করে বৃত্রের দ্বারা আবদ্ধ গোসমূহকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এই গাভীসমূহকে আকাশের মেঘের প্রতীকরূপে গণ্য করা হয়।[১৫] ইন্দ্র-বৃত্রের এই কাহিনীকে অশনি বা বজ্রপ্রহারে আকাশে আটকে থাকা মেঘ

থেকে বর্ষণ ঘটানোর রূপক বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইন্দ্র-বৃত্র সংগ্রামে অন্যান্য সব দেবতাকেই ইন্দ্রের সহায়ক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইন্দ্রের সহকারী এইসব দেবতাদের মধ্যে অবশ্য একাধিকবার বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের উনসপ্ততিতম সূক্তটিতে বিষ্ণুকেই ইন্দ্রের একমাত্র সাহায্যকারীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে দেখা যায়। এ ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি সূক্তে ইন্দ্রের সহায়করূপে বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। (৭।৯৯:৫ ; ১।১৫৪ ; ১।১৫৫) তা ছাড়া বৃত্রের সঙ্গে সংগ্রামে অন্যান্য যে-সব দেবতাকে ইন্দ্রের সহায়ক বলে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে মিত্র, বরুণ, বায়ু, মরুৎ, সোম, বৃহস্পতি, পূষণ ইত্যাদির নাম আছে।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে বৃত্রের সঙ্গে সংগ্রামে ঋগ্বেদে সূর্যকে কখনও ইন্দ্রের সহায়ক বলে উল্লেখ করা হয় নাই। বরং কোন কোন সূক্তে ইন্দ্রকেই সূর্য বলা হয়েছে দেখা যায়। (৫।২৬:১ ; ৮।৮২:৪ ; ১০।৮৯:২ ইত্যাদি) অন্যত্র ইন্দ্রের সঙ্গে সূর্যের দ্বন্দ্বের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া ইন্দ্রের সঙ্গে উষাদেবতার সংঘর্ষেরও উল্লেখ আছে (২।১৫:৬ ; ৪।৩০:৮-১১ ; ১০।১৩৮:৫)। ইন্দ্রের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রসঙ্গে উষাকে বলা হয়েছে আকাশের কন্যা এবং অশুভের প্রতীক। উষার রথ এই সংঘর্ষে বিপাশা নদীর জলে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। (৪।৩০:৮-১১) ঋগ্বেদে উষাদেবতার উদ্দেশে রচিত অপূর্ব কাব্যরসসমৃদ্ধ রচনার সমাবেশ দেখা যায় (১।৯২:৪ ; ১২৩:১১ ; ১২৪:৩-৪)। উষা বরুণের আত্মীয়া, (১।১২৩:৫), আদিত্যদেবতা ভগের ভগিনী (ঐ) এবং সূর্যের দয়িতা বা স্ত্রী (৭।৭৫:৫)। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে নভোমণ্ডলস্থ তেজোগর্ভ প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃপুঞ্জরূপে প্রতীয়মান সূর্য একসময়ে সমাজে অন্যতম প্রধান উপাস্যরূপে গণ্য হতেন। ইন্দ্রের নেতৃত্বে সমাজের এক অংশ প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজে সূর্যই সম্ভবত প্রধান দেবতারূপে প্রচলিত থেকে গিয়েছিলেন। এর ফলেই হয়ত ইন্দ্রানুগামী সমাজে ইন্দ্রকে নভোমণ্ডলে সূর্যের প্রতিষ্ঠাতা, এমনকি ইন্দ্রকেই সূর্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস করা হয়েছিল, ঋগ্বেদের কোন কোন সূক্ত থেকে এই তথ্য উপলব্ধি করা যায়। দেবরাজ ইন্দ্রের নেতৃত্বাধীন সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বীরা উপাস্য হিসেবে সূর্যকেই প্রধান বলে স্বীকার করত ; সেই হেতুই হয়ত ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে সূর্যের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রত্যক্ষ শক্তি হিসেবে

সূর্যের প্রতিনিয়ত উপস্থিতি ও দৃশ্যমানতার ফলে সূর্যের শক্তি সম্পর্কে উপলব্ধির কোন অভাব ছিল না। তবে জ্ঞান ও চিন্তার প্রসারের ফলে উপলব্ধির হয়ত কিছু রূপান্তর ঘটেছিল। যার ফলে প্রত্যক্ষ জ্যোতিপুঞ্জরূপে প্রতীয়মান সূর্যকে দেবতারূপে গণ্য না করে সূর্যমণ্ডলস্থিত তেজ ও শক্তির অপ্রত্যক্ষ শক্তিকে দেবতারূপে কল্পনা করবার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। এবং দেবতাদের মধ্যে প্রধান স্বয়ং ইন্দ্রকেই কখনও কখনও এই সূর্যমণ্ডলস্থিত দেবতা এবং স্বয়ং সূর্যরূপেও অভিহিত করা হয়েছে।[১৬] কোথাও দেখা যায় ইন্দ্র নিজেই নিজেকে সূর্য বলে দাবি করছেন; (৪।২৬:১) আবার কোথাও ইন্দ্রকে প্রত্যক্ষভাবে সূর্য বলেই অভিহিত করা হচ্ছে। শতপথ ব্রাহ্মণে ইন্দ্রই যে নভোমণ্ডলে অবস্থিত সূর্য এই অভিমত একাধিকবার ব্যক্ত হয়েছে দেখা যায়। এই ব্রাহ্মণের এক জায়গায় বলা হয়েছে আকাশে যিনি আলোক দেন তিনিই ইন্দ্র (ইন্দ্রো যা এষ তপতি-শতপথ ৩।৪।২:১৫)। অথর্ববেদে আছে ঐ আদিত্যই ইন্দ্র যিনি প্রজাপতি (অসৌ বা আদিত্য ইন্দ্র এষ প্রজাপতি—তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫।৭:১ ও অথর্ব ১৩৷৩:১৩), মৈত্রায়নী সংহিতায়ও ইন্দ্রকে আদিত্য অর্থাৎ সূর্য বলে অভিহিত করা হয়েছে (মৈত্রায়নী সংহিতা ১।১০:১৬, ১৫৫:১৯ অসৌ বা আদিত্য ইন্দ্রঃ)। এইসব উক্তি থেকে ইন্দ্রকেই নভোমণ্ডলস্থ প্রত্যক্ষ দেবতা সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন বলে প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কিন্তু ইন্দ্রকে সূর্য প্রতিপন্ন করেই ইন্দ্রানুরাগীরা বিরত হননি; তাঁকে সূর্য অপেক্ষাও অধিকতর শক্তিশালীরূপে প্রতিপন্ন করবার প্রয়াসও দেখা দিয়েছে। তাঁরা এমনকি একথাও বলেছেন যে ইন্দ্রই সূর্যের স্রষ্টা (২।১২:৭; ২।২১:৪; ৩।৩১:১৫ ইত্যাদি), ইন্দ্রই সূর্যকে কিরণ দিতে বাধ্য করেছেন (৩।৪৪:২) এবং সূর্যকে দিয়ে তিনি অন্ধকার বিদূরণ করেছেন (১।৬২:৫; ২।২০:৫)। এইভাবে ইন্দ্রকে সূর্য অপেক্ষাও অনেক বড় বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই প্রত্যক্ষমান সূর্যকে আর যেন দেবতা বলে গণ্যই করা হচ্ছে না; এই সূর্য যেন জ্যোতিপ্রদ একটি প্রাকৃতিক সত্তা মাত্র! যদিও দেবতারূপে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সূর্যের মহিমা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হচ্ছে না, তাহলেও দেবতারূপে সূর্যকে আর সূর্য নামে অভিহিত না করে সূর্যের দৈবী শক্তিকে কল্পনার ভিতর দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে এবং ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করবার প্রবণতা আত্মপ্রকাশ কবছিল। এই নূতন পরিপ্রেক্ষিতে সূর্য-শক্তিকে যে-সব ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিকল্পনা করা হল তাদের বলা হল 'আদিত্য'।

স্বয়ং সূর্যকেই হয়ত একসময়ে অদিতির সন্তানরূপে 'আদিত্য' বলে অভিহিত করা হয়েছিল (১।৫০:১২ ; ১।১৯১:৯ ; ৮।৯০:১১), এবং অদিতির সন্তান হিসেবে সূর্যকে অদিতেয়ও বলা হয়েছিল (১০।৮৮:১১)। কিন্তু 'আদিত্য' রূপে সূর্যের স্বীকৃতি খুব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি ; ঋগ্বেদে প্রধানত সূর্যকে আদিত্যদেব থেকে স্বতন্ত্র বলেই গণ্য করা হয়েছে দেখা যায় (৮।৩৫:১৩-১৫)। ঋগ্বেদের বেশ কয়টি মন্ত্রে আদিত্য দেবতাদের স্তুতি পাওয়া যায় এবং এইসব মন্ত্র থেকেই যে-সব দেবতা সেই সময় আদিত্য বলে গণ্য হচ্ছিলেন তাঁদের নামও পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের কোথাও এই আদিত্য দেবতার সংখ্যা সাত (৯।১১৪:৩), আবার কোথাও আট (১০।৭২:৮)। কিন্তু যেখানে একসঙ্গে কয়েকজন দেবতাকে আদিত্য নামে অভিহিত করা হয়েছে তেমনি একটি মন্ত্রে মিত্র, অর্যমন, ভগ, বরুণ, দক্ষ এবং অংশ এই ছয়জন দেবতাকেই আদিত্য নামে অভিহিত করা হয়েছে দেখা যায় (২।২৭:১)। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে আদিত্য দেবতাদের এই তালিকায় সূর্যের নাম নাই ; অবশ্য অন্য এক মন্ত্রে মার্তণ্ড নামে এক আদিত্য দেবতার উল্লেখ আছে, যে নামে সূর্যের পরিচয় পরবর্তীকালে কিছু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অথর্ববেদের মতে অদিতির আট সন্তান (৮।৯:২১) এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে সম্ভবত অথর্ববেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এই আটজন আদিত্য দেবতার নাম বলা হয়েছে মিত্র, বরুণ, অর্যমন, অংশ, ভগ, ধাতৃ, ইন্দ্র এবং বিবস্বৎ (১।১:৯:১)। শতপথ ব্রাহ্মণের উল্লেখে এই আদিত্য দেবতারা সংখ্যায় দাঁড়ালেন বারজন—যাঁরা বৎসরের দ্বাদশমাসের অধিপতি (৬।১:২:৮ ; ১১।৬:৩:৮)। ঋগ্বেদের মতে বরুণ আদিত্য দেবতাদের মধ্যে প্রধান (৭।৮৫:৪)। এইভাবে সূর্যকে আর দেবতা হিসেবে সূর্যনামে অভিহিত না করে ভিন্ন ভিন্ন আদিত্য দেবতারূপে অভিহিত করা হতে থাকল, যাঁদের মধ্যে পূর্বতন পর্যায়ের অসুর নামে অভিহিত উপাস্য বরুণই প্রধানরূপে পরিগৃহীত হয়েছিলেন। কিন্তু বরুণ যে প্রধানত অসুর নামেই পরিচিত ছিলেন, ঋগ্বেদে বেশ কয়েকবার বরুণের অসুর পরিচয়ের উল্লেখ থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। ইন্দ্রের অভ্যুত্থানে সমাজের চিন্তা-কল্পনায় কিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন এইসব অসুর দেবতারা আর তাঁদের প্রাধান্য বা তেমন স্বীকৃতি বজায় রাখতে পারেননি। ইন্দ্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে দেবতা-পরিকল্পনায় যেমন বেশকিছু পরিবর্তন ঘটেছিল তেমনি কিছু কিছু নূতন দেবতা

এবং নূতন দেবতা-পরিকল্পনাও আত্মপ্রকাশ করেছিল। ইতিপূর্বে মনুর পিতা বিবস্বত নামে যে দেবতার উল্লেখ করা হয়েছে সেই বিবস্বত নামে দেবতাকে দেবরাজ ইন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠরূপে উল্লেখ করা হয়েছে দেখা যায় (২।১৩:৬ ; ৮।৬:৩৯ ; ৮।৬১:৮)। ঋগ্বেদ এবং বেদানুগ সমাজে এই বিবস্বতকেই সৃষ্টির আদিমানুষ মনু (বালখিল্য ঋ ৪:১) এবং পিতৃলোকের প্রধান যমের পিতা বলে অভিহিত করা হয়েছে (১০।১৪:৫)। ঋগ্বেদে যদিও একবারও বিবস্বতকে আদিত্য বা সূর্য বলে অভিহিত করা হয়নি কিন্তু যজুর্বেদে এবং ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে বিবস্বতকে অন্যতম আদিত্য বলেও গণ্য করা হল (বাজসনেয়ী সংহিতা ৮:৫ ; মৈত্রায়নী সংহিতা ১।৬:১২ ; শতপথ ব্রাহ্মণ ১০।৫:২:৬ ইত্যাদি)। এই সূত্রেই মনু বিবস্বৎ নামে পরিচিত আদিত্য বা সূর্যের পুত্র এবং মনুর বংশ সূর্যবংশ নামে আখ্যা লাভ করল।

ঋগ্বেদীয় সংস্কৃতি ও মনু

ঋগ্বেদে বহুবার মনুর উল্লেখ পাওয়া যায়; ঋক্‌মন্ত্রে মনুকেই বারবার আদি পিতারূপে আখ্যাত করা হয়েছে (১।৮০:১৬ ; ২।৩৩:৩ ; ১০।৬৩:৭)। বৈদিক সমাজে যে যজ্ঞকর্মের প্রচলন আছে মনুকেই সেই যজ্ঞকর্মের প্রবর্তক বলেও প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে (১।৪৪:১১ ; ৫।২১:১)। বৈদিক ও ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এইজন্যই মনুর প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মিশরদেশীয় প্রাচীন কাহিনীতে মিশরীয় সমাজের আদিপুরুষের নাম 'মেনেস'। আবার বাইবেলের একটি কাহিনীতে এক বিধ্বংসী প্লাবনের বর্ণনায় ঈশ্বরের অনুগ্রহে এই প্লাবন থেকে যিনি উদ্ধারলাভ করেছিলেন তার নাম ছিল 'নোয়া' (Gen. V. 29)। বাইবেলের মতে সেই প্লাবনোত্তর যুগের মানুষেরা এই নোয়ারই বংশধর। যে আদিম ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ থেকে Man শব্দের উদ্ভব হয়েছে তার সঙ্গে বেদের মনু-মনুস, মিশরীয় আদিপুরুষ মেনেস এবং বাইবেলের 'নোয়া' শব্দের সাদৃশ্যের মধ্যে অতীত যুগের সংস্কৃতি বিবর্তনের কিছু গভীর ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে বলে সন্দেহ না করে পারা যায় না। এই প্রসঙ্গেই শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত প্লাবন ও সেই প্লাবন থেকে এক মৎস্যের সাহচর্যে মনুর উদ্ধারলাভের কাহিনীর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যেতে পারে। শতপথ ব্রাহ্মণের এই মনু-মৎস্য কথা (মাধ্যন্দিন ১।৮:১) একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী।

বাইবেলে বর্ণিত নোয়ার কাহিনীর সঙ্গে শতপথের মনুকাহিনীর সাদৃশ্য দেখে অনেক পাশ্চাত্য ভারতবিদ শতপথের কাহিনীটিকে বাইবেলের কাহিনীরই রূপান্তর এবং বাইবেল থেকেই আহৃত বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ আবার এই কাহিনীতে ভারতে আর্য জাতির প্রবেশের ইঙ্গিতও লক্ষ্য করেছিলেন।[১৭] তবে জেন্দ আবেস্তাতেও এই প্লাবনের উল্লেখ লক্ষ্য করে অনেকে এই কাহিনীকে ইন্দো-ইউরোপীয় উপলব্ধিপ্রসূত বলেও মনে করেছেন।[১৮] দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার ইরাকে অবস্থিত, সুপ্রাচীন উর নগরীর ধ্বংসাবশেষের আবিষ্কারক ও লুপ্তপুরাকীর্তি উদ্ধারকারী সার লিওনার্ড উলি এক অভূতপূর্ব প্লাবনকে ঐ নগরীর ধ্বংসের কারণ বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। তা ছাড়া ঐ অঞ্চলের অসুর সম্রাট হাম্মুরাবির আমলের কীলকাক্ষরে মাটির টালির উপরে খোদিত একটি লিপিতেও এক প্লাবনের কাহিনীর বর্ণনা আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্প্রতি সিন্ধুদেশের মহেঞ্জোদারোতে যে প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষণ ও খনন পরিচালিত হয়েছে তা থেকে অনেকে সিদ্ধান্ত করতে চেয়েছেন যে সিন্ধুনদীর অববাহিকায় প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন মহেঞ্জোদারোও একাধিকবার বিধ্বংসী প্লাবনে ক্ষতিগ্রস্ত ও জনহীন হয়ে গিয়েছিল।[১৯]

শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত প্লাবন সম্পর্কে উল্লেখ অথর্ববেদেও রয়েছে লক্ষ্য করা যায় (১৯।৩৯:৮); একটি প্লাবনের উল্লেখ আবেস্তাতেও আছে, যে-প্লাবন সম্ভবত শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত প্লাবনের সঙ্গে একই। এই প্লাবন সম্পর্কে এখানে গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করতে হল এইজন্য যে বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে যে-মনুর নাম অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, এই প্লাবনের সঙ্গে তার যোগও তেমনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বৈদিক সংস্কৃতিকে ভগবান মনু থেকেই প্রবহমান বলে গণ্য করা যেতে পারে। ঋগ্বেদের মতে মনু আদি পিতা ; সেইসঙ্গে মনুকে যজ্ঞসংস্কৃতি ও যজ্ঞভিত্তিক ধর্মাচরণের প্রবর্তক বলেও নির্দিষ্ট করা আছে। মূলত মনুই বৈদিক সংস্কৃতির প্রারম্ভস্থল। তিনিই প্রথম ক্ষেত্রকর্ষণের প্রবর্তক, প্রথম পরিবারের পিতা ; তাঁর ছিল বহু পুত্র, যাঁর মধ্যে ইক্ষ্বাকু ছিলেন অন্যতম। ইক্ষ্বাকুর বংশে জাত রাজন্যবর্গ কোশলে শক্তি প্রতিষ্ঠা করে দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করেছেন। এই বংশ মনুর পিতা বিবস্বতের সূর্যসত্তার উত্তরাধিকারসূত্রে সূর্যবংশ বা আদিত্যবংশ নামে প্রখ্যাত। ঋগ্বেদেও এই বংশের বেশ কয়েকজন রাজন্যের নামের উল্লেখ আছে যাঁদের মধ্যে পুরুকুৎস (৭।১২:৩), ত্রসদস্যু (৬।১৯:৩৬) ও হরিশ্চন্দ্রের

(১।২৪) কথা বিশেষভাবে বলা চলে। তবে ঋগ্বেদে এই ইক্ষ্বাকু বংশের উদ্ভব সম্পর্কে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

ঋগ্বেদে ইক্ষ্বাকুর উল্লেখ আছে, তবে সেখানে মনুর পুত্ররূপে তাঁর পরিচয় নাই। তেমনি শতপথ ব্রাহ্মণে মনুর এক কন্যা ইলারও উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে পুরুরবা, নহুষ, যযাতি এবং যদু, অনু, তুর্বসু, দ্রুহ্যু এবং পুরু নামের উল্লেখ আছে। পরবর্তী নানা পুস্তকে, বিশেষ করে পুরাণ সাহিত্যে এবং মহাভারতে উল্লেখ আছে যে মনুর কন্যা ইলার সঙ্গে চন্দ্রের পুত্র বুধের পরিণয় এবং ইলা থেকে পুরুরবার পুত্র নহুষ, নহুষের পুত্র যযাতি এবং যযাতির সঙ্গে অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা এবং অসুরগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর পরিণয় হয়েছিল। দেবযানী থেকে তাঁর দুই পুত্র যদু ও তুর্বসু এবং শর্মিষ্ঠা থেকে তিন পুত্র দ্রুহ্যু, অনু ও পুরুর জন্ম হয়েছিল এইসব বিবরণও পুরাণে পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে পুরুরবার সঙ্গে গন্ধর্বকন্যা (অপ্সরা) উর্বশীর প্রণয়-ঘটিত এক বিচিত্র ও রসসমৃদ্ধ ঘটনা এবং সংলাপের সমাবেশ আছে।[২৩] উত্তর-কালে চন্দ্রবংশের বিবরণ প্রসঙ্গে পুরাণ সাহিত্যে, মহাভারতে এবং এক প্রভূত রসোত্তীর্ণ নাটকের উপজীব্য ঘটনা হিসেবে কালিদাসের বিক্রমোর্বশীয় নাটকে এই পুরুরবা-উর্বশীর কাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। কাহিনীটির প্রভূত জনপ্রিয়তা থেকে স্বভাবতই ভারতীয় সংস্কৃতি মানসে এই কাহিনীটির গুরুত্ব এবং প্রভাবের গভীরতা সম্পর্কে একটি ধারণার সৃষ্টি না হয়ে পারে না। প্রামাণিকতার কোন নির্ভরযোগ্য উপকরণ না থাকায় জনপ্রিয় এইধরনের কাহিনীকে সাধারণত কল্পনাপ্রসূত বলেই মনে করা হয়ে থাকে। তবে ঋগ্বেদ এবং সমধর্মী ভারতীয় সাহিত্যের কিছু কিছু তথ্যকে অনেক পণ্ডিত ইতিহাস-ভিত্তিক বলে স্বীকার করেছেন দেখা যায়। এমনি একটি ঘটনা প্রতিদ্বন্দ্বী দশজন রাজন্যের সঙ্গে ঋগ্বেদে বর্ণিত সুদাস রাজার যুদ্ধ। বিশেষ করে ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলে 'দাশরাজ্ঞ' নামে পরিচিত এই যুদ্ধের একটি বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই সংগ্রামে সুদাসের প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে যদু, তুর্বসু, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরুরাজের পরাজয় ঘটেছিল। তাছাড়া ভরত নামে একজন রাজাও সুদাস কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়েছিলেন ; পরে পুরোহিত বশিষ্ঠের আনুকূল্যে এই রাজা ভরত স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এমন উল্লেখ আছে।

এই দাশরাজ্ঞ যুদ্ধ প্রসঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের মাহাত্ম্য যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা

খুবই উল্লেখযোগ্য। এই বর্ণনায় রাজা সুদাসের সমস্ত সামর্থ্য ও তার অভাবনীয় সাফল্য দেবরাজ ইন্দ্রের সহায়তা ও আনুকূল্যেই যে সম্ভব হয়েছিল, ঋগ্বেদের এই অংশের মন্ত্রগুলিতে যেন এই সত্যই প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস সুস্পষ্ট। সুদাসের এই জয়লাভ যেন এক অসাধ্যসাধন কর্ম; এইধরনের কর্মসাধন যেন শুধুমাত্র ইন্দ্রের দ্বারাই সম্ভব। এই সূক্তের মন্ত্রের প্রবক্তারা সুদাসকেই যেন ইন্দ্র বলে ধরে নিয়েছেন বলে মনে হয়। ইন্দ্রের আরও অনেক অভূতপূর্ব ও অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপের উল্লেখও বৈদিক সাহিত্যে আছে। এইসব অসাধ্যসাধন ক্রিয়া প্রসঙ্গে ইন্দ্রের সহায়ক হিসেবে যে দেবতার নাম বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে তিনি 'বিষ্ণু'। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর উল্লেখ থেকে শুরু করে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে, বিভিন্ন পুরাণে ও রামায়ণ এবং মহাভারতে ভগবান বিষ্ণুর বিবর্তন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক বিস্ময়কর স্থান অধিকার করে আছে। বিষ্ণুকে নিয়ে বৈদিক গ্রন্থগুলিতে, সংহিতায়, ব্রাহ্মণে, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে যতগুলি আখ্যান সন্নিবিষ্ট হয়েছে অন্য কোন দেবতার ক্ষেত্রে অত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আখ্যানের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কালক্রমে বিষ্ণু এক অনন্যসাধারণ দেবতারূপে পরিগণিত হয়েছিলেন; তাহলেও কিন্তু ঋগ্বেদে বিষ্ণুর উল্লেখ অন্যান্য দেবতার তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। উল্লেখের এই স্বল্পতা থেকে এমন সিদ্ধান্ত অনেকে করেছেন যে ঋগ্বেদের আমলে বিষ্ণুর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। তবে আবির্ভাব এবং বিবর্তনপথে বিষ্ণুর এই অনন্যসাধারণ ভূমিকা-লাভ সম্পর্কে তেমন কোন গবেষণারও আভাষ পাওয়া যায় না।

বেদ এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে দেবতাদের অধিপতিরূপে ইন্দ্র এক প্রবল পরাক্রান্ত ও অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতারূপেই কীর্তিত। নিশ্চিতরূপেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে দানব, দৈত্য বা অসুরদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধে ইন্দ্রের নেতৃত্বে আত্মরক্ষা ও প্রাধান্য বিস্তারে সাফল্য অর্জনের ফলেই ইন্দ্র তাঁর অনুগামী সমাজে প্রথমে রাজপদে প্রতিষ্ঠা ও পরে দেবতারূপে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন। নানা গ্রন্থে ইন্দ্রের রাজারূপে স্বীকৃতিলাভের বিবরণ আছে। অসুরদের সঙ্গে বিরোধে দেবতাদের বারংবার পরাজয় ঘটছিল। এই পরাজয় কেন ঘটছে তার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে দেবতারা উপলব্ধি করলেন যে তাঁদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য কোন রাজা নাই। অসুররা তাদের রাজা প্রহ্লাদের নেতৃত্বলাভের ফলে অতি সহজে জয়লাভে সক্ষম হয়। তখন গুরু বৃহস্পতির পরামর্শে ইন্দ্রকে রাজপদে

অভিষিক্ত করা হল। এরপরেও কিন্তু দেবতারা অসুরদের সঙ্গে শক্তির পরীক্ষায় সর্বদা জয়ী হতে পারেননি। বেদে এবং পুরাণে অসুরদের নিকট বারবার ইন্দ্র পরিচালিত দেবতাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে একবার দেবতারা অসুরদের নিকট পরাজিত হলে বিষ্ণুর কৌশলে তাঁরা তাঁদের হৃতরাজ্য পুনরধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বস্তুত ব্রাহ্মণ ও অধিকাংশ পুরাণে বিষ্ণুকে সমধিক প্রাধান্য আরোপ করা হয়েছে লক্ষ্য করা যায়, যদিও পৌরাণিক পরিকল্পনায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের দেবতারূপে সমপর্যায়ভুক্ত।

বিষ্ণুর এই প্রাধান্য অর্জনের সূচনা ঋগ্বেদেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল বলা চলে। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে ঋগ্বেদের মন্ত্রে অন্যান্য দেবতার তুলনায় বিষ্ণুর উল্লেখ সীমিত ; কোন মন্ত্রেই বিষ্ণুকে তেমন বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। ঋগ্বেদে উল্লিখিত বিভিন্ন দেবতার আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের প্রায় সকলেই ঋগ্বেদের পরিপ্রেক্ষিতে বিষ্ণুকে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন দেবতা বলেই অভিহিত করেছেন। কালপ্রবাহে সমাজে স্বীকৃত বিভিন্ন দেবতার জনপ্রিয়তার তারতম্য ঘটেছে ; একসময়ের কোন অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং প্রাধান্যসমৃদ্ধ দেবতা পরবর্তী যুগে তাঁর জনপ্রিয়তা হারিয়ে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছেন, এমনকি মাত্র স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছেন। ঋগ্বেদে অগ্নিকে যেমন দেবতারূপে বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে, ইন্দ্রও তেমনি ঋগ্বেদে স্বীকৃত হয়েছেন দেবরাজরূপে। এই অগ্নি ও ইন্দ্র উভয়েই পরবর্তী যুগে তাঁদের আপেক্ষিক গুরুত্ব আর রক্ষা করতে পারেননি। ঋগ্বেদে অন্যান্য যে-সব দেবতার কিছু পরিমাণে জনপ্রিয়তা বর্তমান ছিল তাঁদের মধ্যে বরুণ, মিত্র, ভগ, পূষণ, বিবস্বৎ ইত্যাদি আদিত্য নামে পরিচিত দেবতা, কল্পনার রসে অভিষিক্ত অপূর্ব কাব্যছন্দে কীর্তিত দেবী উষা, মরুৎ, নাসত্য ইত্যাদি দেবতা পরবর্তী যুগে প্রায়-বিস্মৃতির গহনে নিমজ্জিত হয়েছিলেন। কিন্তু ঋগ্বেদের সেই অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন দেবতা বিষ্ণু কিভাবে ক্রমে এক অভাবনীয় প্রাধান্যলাভ করেছিলেন সে কাহিনী নিতান্তই বিস্ময়কর এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদে দেবতারূপে বিষ্ণুর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মৈত্রী বা বন্ধুত্ব। ঋগ্বেদে যে কয়টি মন্ত্রে বিষ্ণুর উল্লেখ দেখা যায় তার মধ্যে অনেকগুলিতেই তাঁর উল্লেখ ইন্দ্রের সঙ্গে বা ইন্দ্রের সহায়করূপে। ইন্দ্রের সঙ্গে

বিষ্ণুর এই মিত্রতার পরিপ্রেক্ষিত মূলত ইন্দ্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী অসুর নামে পরিচিত সমাজের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম। উল্লিখিত মন্ত্রগুলির অধিকাংশেই বৃত্রের সঙ্গে সংগ্রামরত ইন্দ্রের সাহায্যকল্পে বিষ্ণুর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন ও প্রার্থনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ মণ্ডলের বিংশতিতম মন্ত্রের দ্বিতীয় পদে উল্লেখ আছে যে বিষ্ণুর সহায়তা নিয়ে ইন্দ্র বৃত্রকে সংহার করেছিলেন। দেবতা ইন্দ্র এবং অসুর বৃত্রের দ্বন্দ্বকে ভারতসংস্কৃতির এক বিশেষ ইঙ্গিতগর্ভ বিবরণ বলে গণ্য করা চলে।

নির্দেশিকা

১. Archaeological Survey of India, Annual Report (A. S. I., A. R.), 1908-9, p. 126.

২. ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৩'১৭:৬

৩. বিবস্বত—অশ্বিনদেব পিতা, ঋক্ ১০।১৭.২ , যমের পিতা, ঋক্ ১০।১৪:৫ ; মনুর পিতা, ঋক্—বালখিল্য, ৪।১ ; অথর্ববেদ ৮।১০ ২৪ . শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩।৪।৩।৩

৪. যাস্ক, ৯।১০

৫. শতপথ ব্রাহ্মণ, ১।৮।১।১-১০

৬. Macdonell, A. A., Vedic Mythology, Delhi, 1971, p. 139.

৭. Kosambi, D. D., An Introduction to the Study of Indian History, Bombay, 1956, p. 70.

৮. Dandekar. R. N., Vritraha Indra, Annals of the Bhandarkar Oriental Institute, Pune, Vol 31, pp. 1f—Some Aspects of the History of Hinduism, pp. 91f.

৯. Wheeler, R. E. M., Ancient India, Vol. 3, 1947, pp. 72f.

১০. ঋগ্বেদ, ৬।১৮:৫

১১. ঐ, ১।৬৩ ৩ ; ৬।২৬:৩ ; ৭।১৯ ২

১২. ঐ, ১।১৭৪:৩ , ৮।৭৯.৬

১৩. Macdonell, A. A., Vedic Myth., p. 150.

১৪. ঐ, p. 31.

১৫. The cow released by Indra may in many cases refer to the waters—ঐ, p. 59.

১৬. Hopkins W., Religions of India, p. 92.

১৭. Macdonell A. A., History of Sanskrit Literature, London, 1925, pp. 212f. Waber, A., Indische Studien, Vol 1, p. 106f.

১৮. Hopkins, W., Hist., p. 160.

১৯. Raikes, R. L., Mohenjo-daro floods—riposte, Antiquity, Vol. 41, pp. 309-10.

২০. পুরূরবা-উর্বশী কাহিনী—ঋগ্বেদ, ১০।৯২-৯৬

৩

দেবতা ও অসুর প্রসঙ্গ

ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেবতা ও অসুর সম্পর্ক বিষয়ে কিছু অন্বেষণ ভারত-সংস্কৃতিতে বিষ্ণু-কৃষ্ণচেতনার উদ্ভব ও প্রসার বিচারে বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। ঋগ্বেদে উল্লিখিত দেবতাদের মধ্যে দ্যৌকে বলা হয়েছে পিতা (দ্যৌষ-পিতর—৬।৫১:৩); আবার এই দ্যৌকে অসুর আখ্যায়ও অভিহিত করা হয়েছে। এই অসুর পিতা থেকে প্রজাত দেবতারা আদিতে অসুব আখ্যায়ই অভিহিত হতেন; এবং ঋগ্বেদের প্রধান প্রধান দেবতাদের বহুবার ঋগ্বেদে অসুর আখ্যায়ই অভিহিত করা হয়েছে।[১] সমভাষাভাষী ইন্দো-ইউরোপীয় জন-গোষ্ঠীরা যখন একই সঙ্গে সংহত এবং নিকট সন্নিধানে ছিল সেই সুদূর অতীত-কালে এই দ্যৌয়ের কল্পনার উদ্ভব হয়েছিল, গ্রীক পুরাণকথায় উল্লিখিত জিউস পেটার (Zeus pater) ও ল্যাটিনে জুপিটারের উল্লেখ থেকে তা সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যায়। গ্রীক পুরাণকথায় দেব সম্প্রদায়ে আধিপত্যেব পরিবর্তনের কিছু সুনির্দিষ্ট উল্লেখ আছে যেমনটি বৈদিক সাহিত্যে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় না। গ্রীক পুরাণকথায় জিউসকে পিতা আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকলেও তাকে নভোমণ্ডলের প্রতীক দেবতা বলে গণ্য করা হয় না। বৈদিক চিন্তায় দ্যৌকে যেভাবে নভোমণ্ডলের প্রতীক বলে বর্ণনা করা হয়েছে গ্রীক উপাখ্যানে ঔরেনস (Ouranos) তেমনি নভোমণ্ডলের প্রতীক। যদিও শব্দবিজ্ঞানে বরুণ শব্দের সঙ্গে ঔরেনস শব্দের ঐক্য স্বীকৃত হয় না, তা হলেও শব্দতত্ত্ববিদেরা এই দুই শব্দের অত্যন্ত নিকট সাদৃশ্য উপেক্ষা করতে পারেননি। গ্রীক কাহিনীতে ঔরেনসের মাতা পৃথিবীর নাম 'গিয়া'। বেদের উল্লিখিত দেবতাদের পারস্পরিক মর্যাদা নিয়ে যে গবেষণা আছে, তাতে বরুণই যে একসময়ে দেবতাদের প্রধান বলে বিবেচিত হতেন এই কথাই স্বীকৃত হয়েছে। ঋগ্বেদে বরুণকে রাজা এবং সম্রাজ এই দুই আখ্যায়ই অভিহিত করা হয়েছে। (২।২৭:১০; ৫।৮৫:৩; ১০।১৩২:৪)। ঋগ্বেদে বরুণের প্রধানত অসুর আখ্যাই প্রচলিত। প্রাচীন ইরানে জরথুষ্ট্র যে ধর্মের প্রবর্তন করেন সেই ধর্মের প্রধান উপাস্য ছিলেন অহুর-মাজদা। এই মাজদার যে চারিত্রিক বিবরণ জরথুষ্ট্রের রচিত জেন্দ আবেস্তাতে পাওয়া যায় সেই বিবরণের

সঙ্গে বৈদিক বরুণের নিকট সাদৃশ্য লক্ষ্য করে অনেকেই বেদের অসুর বরুণ ও আবেস্তার অহুর-মাজদাকে এক ও অভিন্ন বলেই অভিহিত করেছেন। আবেস্তা গ্রন্থে যেমন কিছু বৈদিক দেবতার নাম পাওয়া যায়, তেমনি সেখানে ইন্দ্রেরও উল্লেখ আছে: কিন্তু ইন্দ্র সেখানে অশুভ শক্তির প্রতীক। আবেস্তা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে অহুর-মাজদার অনুগামী ইরানবাসীদের সঙ্গে ইন্দ্র-অনুগামী বৈদিক ভারতীয়দের বিরোধের ফলে এক মূল জনগোষ্ঠীই বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তবে বহুকাল ধরেই এই দুই সম্প্রদায় অর্থাৎ অহুর-মাজদাপন্থী আবেস্তিক ও বেদপন্থী বৈদিক জনগোষ্ঠী পাশাপাশিই বাস করত; অহুর-মাজদার উপাসক পারস্য সম্রাট সাইরাস (কুরুষ), ডেরিয়াস (দারায়বুস) (খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী থেকে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকাল পর্যন্ত এই রাজবংশ পারস্যে রাজত্ব করে) ইত্যাদির শাসন-লিপি পাঠে তা জানা যায়।

গ্রীক উপকথায় উল্লেখ আছে যে ঔরেনস থেকে তিন শ্রেণীর সন্তানের উদ্ভব হয়েছিল। তাঁরা যথাক্রমে টাইটান, সাইক্লপ এবং হেকাটনসিওর নামে অভিহিত হতেন। এই টাইটানদের বেদ ও আবেস্তায় বর্ণিত অহুর-অসুরদের অনুকল্প বলে অভিহিত করা যেতে পারে। টাইটানদের অন্যতম প্রধান ছিলেন হেলিয়স (Helios)। অপূর্ব দেহসৌষ্ঠবসম্পন্ন এই হেলিয়স তাঁর তুষারশুভ্র চার ঘোড়ায় টানা রথে আকাশমণ্ডল পরিক্রমণ করে সন্ধ্যাবেলা সাগরে নিমজ্জিত হয়ে যান, আবার পরদিন প্রভাতে পূর্বাকাশে তাঁর পুনরাবির্ভাব ঘটে। এই বিবরণ থেকে সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে এই হেলিয়স ও ঋগ্বেদে বর্ণিত সূর্য এক ও অভিন্ন; সূর্য শব্দই যে গ্রীক পুরাণে হেলিয়স রূপ নিয়েছে এবং মূল শব্দ যে সুরিয়স ছিল, পশ্চিম এশিয়ার ইরাকে আবিষ্কৃত আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ২০০০ অব্দের একটি লিপি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। জার্মান বেদবিচারক রথ এবং আমেরিকান পণ্ডিত হুইটনি অনুমান করেছেন যে বরুণের প্রাধান্যকে বিনষ্ট করে বৈদিক সমাজে ইন্দ্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[২] ঋগ্বেদের কোন কোন মন্ত্রে যেমন বরুণকে দেবতাদের এবং মনুষ্যজাতির রাজা বলে অভিহিত করা হয়েছে (২।২৭:১০ ; ১০।১৩২:৪), তেমনি ইন্দ্রকেও অন্যান্য মন্ত্রে প্রায় অনুরূপভাবেই সর্বজগতের রাজা (৪।১৯:২), সকল মানুষ ও যা কিছু সচল তার অধিপতি (৫।৩০:৫) এবং তাঁকেই এককভাবে সকল বিশ্বের রাজারূপে আখ্যাত করা হয়েছে (৩।৪৬:২)। এইভাবেই বলা হয়েছে যে দেবতা বা মানুষের মধ্যে

কেউ ইন্দ্রের সমকক্ষ হতে পারে না, তাঁকে সামর্থ্যে অতিক্রম করা তো দূরস্থ (১।৬৫:৯)। তিনি সকল দেবতার উপরে (৩।৪৬:৩); সকল দেবতাই শক্তি ও সামর্থ্যে ইন্দ্র অপেক্ষা ন্যূন (৮।৫১:৭)। পূর্বতন সকল দেবতাই ইন্দ্রের এই প্রাধান্যের নিকট নতিস্বীকার করেছেন (৭।২১:৭); এমনকি বরুণ এবং সূর্যও ইন্দ্রের আদেশের অধীন (১।১০১:৩)। যদিও বিভিন্ন মন্ত্রে যে দেবতার স্তুতি করা হয়েছে অনেকক্ষেত্রেই উদ্দিষ্ট সেই দেবতাকেই প্রধান বলে প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়; তা হলেও ইন্দ্রকে যেভাবে ঋগ্বেদে প্রাধান্য আরোপ করা হয়েছে তাতে স্পষ্টই ইন্দ্রকে অন্যান্য সমস্ত দেবতা, বিশেষ করে বরুণ এবং সূর্য থেকেও বেশি প্রাধান্য দেওয়ার সুস্পষ্ট প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক বা পরবর্তী কোন আকর গ্রন্থে ইন্দ্র কিভাবে এই প্রাধান্য অর্জন করেছিলেন তার কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নাই; এই প্রাধান্য অর্জন উপলক্ষে বিশেষ করে বরুণ ও সূর্যের উল্লেখে গ্রীক পুরাণকথার কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য না করে পারা যায় না। গ্রীক পুরাণকথায় বর্ণিত আছে যে ঔরেনস একসময় দেবরাজ্যে প্রধান ছিলেন। বৈদিক দেবতা বরুণ সম্পর্কে রথ ও হুইটনির অনুমানের সঙ্গে গ্রীক পুরাণকথাব ঔরেনসের সাদৃশ্য পরিষ্কার। কিন্তু গ্রীক পুরাণকথায় বর্ণিত আছে যে টাইটানদের মধ্যে ঔরেনসের পরে হেলিয়সের দাবিই ছিল প্রধান। কিন্তু হেলিয়সেব দাবিকে প্রতিহত করে জিয়ুস নিজেকে টাইটানদের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করলে অন্যান্য টাইটানরা সেই দাবি স্বীকার করে নিল, এবং জিয়ুসই রাজত্বে অধিষ্ঠিত হলেন। ঔরেনস ও হেলিয়স জিয়ুসের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে নিষ্প্রভ এবং কিছু পরিমাণে বিস্মৃত হয়ে পড়লেন।

বেদ থেকে আরম্ভ করে পুরাণ পর্যন্ত যে-সব দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায় তাদের বিবর্তনের ক্ষেত্রেও অনুরূপ কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এই সাদৃশ্য সম্পর্কে উপলব্ধি থেকেই সম্ভবত রথ প্রমুখ পণ্ডিতেরা ইন্দ্রের প্রাধান্যলাভ ও বরুণের প্রাধান্যের বিলুপ্তি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু গ্রীক পুরাণ-কাহিনীতে প্রধানত কল্পনার ভাগই বেশি দেখা গেলেও ভারতীয় পরিবেশে এই বিবর্তনের পিছনে বেশকিছু সামাজিক ও গোষ্ঠীগত সংঘাতের উপস্থিতি ছিল এ-কথা অনুমান করা যায়। গ্রীক উপাখ্যানে যেমন ঔরেনস ও হেলিয়সের অবনমন এবং জিয়ুসের অভ্যুত্থান ঘটেছিল, বৈদিক পটভূমিকায়ও তেমনি ইন্দ্র কেবল বরুণকেই অতিক্রম করেননি, সূর্যের প্রাধান্যও ইন্দ্রের দ্বারা প্রতিহত হয়েছিল।

তবে অসুর বরুণকে পাশে ফেলে যত সহজে ইন্দ্র তার স্থান অধিগ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সূর্যের দৈবী সত্তার প্রাধান্য ইন্দ্রের পক্ষে তত সহজে অবলুপ্ত করা সম্ভব হয়নি।

একসময়ে ইন্দ্র-বৃত্র সম্পর্কিত পুরাণকাহিনীকে মেঘে আবৃত জলের বর্ষণের প্রতীক বলে গণ্য করা হয়ে থাকলেও নানা কারণে এই কাহিনীর আড়ালে যে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল এ-কথা মনে করার যথেষ্ট যুক্তি আছে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সম্ভবত ইন্দ্র আদিতে একজন শক্তিমান পুরুষ ও ঐতিহাসিক সত্তাসম্পন্ন মানুষই ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি এক জনগোষ্ঠী কর্তৃক তাদের নেতৃত্বে বা রাজপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

ঋগ্বেদে বলা হয়েছে যে অগ্নির পিতা এবং মাতাই ছিলেন ইন্দ্রেরও পিতা এবং মাতা। কয়েকটি মন্ত্রে উল্লেখ আছে যে অগ্নির পিতা ছিলেন দৌঃ এবং মাতা পৃথিবী। অগ্নি তার দাহিকা শক্তি এবং যজ্ঞের মাধ্যমরূপে পার্থিব পরিবেশের প্রত্যক্ষ দেবতা। দ্যৌ ও পৃথিবীকে পিতা-মাতা বলে প্রতিষ্ঠিত করা ইন্দ্রকে দেবত্বে অধিষ্ঠিত করার প্রয়াসেরই ক্রিয়াশীল ইঙ্গিত বলে অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। কারণ অন্য একাধিক মন্ত্র থেকে ইন্দ্রের পিতা হিসেবে ত্বষ্টৃকেই অভিহিত করা হয়েছে অনুমান করা যায়। একটি মন্ত্রে উল্লেখ আছে ইন্দ্রের পিতা ইন্দ্রের জন্য আয়ুধ হিসেবে বজ্র নির্মাণ করেছিলেন। অন্যত্র উল্লেখ আছে ত্বষ্টৃই এই বজ্রের নির্মাতা। ঋগ্বেদের মতে ত্বষ্টৃ ছিলেন একজন নিপুণ ও কৌশলী কারুস্রষ্টা। তিনি শুধু ইন্দ্রের জন্য বজ্রই নির্মাণ করে দেননি, তিনি অসুরদের (১।১১০:৩) এবং দেবতাদের জন্য পানপাত্রও নির্মাণ করে দিয়েছিলেন (১।৬১:৫ ; ৩।৩৫:৩)। ঋগ্বেদে ত্বষ্টৃর সঙ্গে ইন্দ্রের পিতা-পুত্র সম্বন্ধ মনে হয় সুনির্দিষ্টভাবেই বিবৃত হয়েছে ; সেইসঙ্গে এই সম্পর্ক যে ভাল ছিল না তাও বোঝা যায়। ঋগ্বেদে পরিষ্কার ইঙ্গিত আছে যে ত্বষ্টৃ ইন্দ্রের ভয়ে সবিশেষ ভীত ছিলেন এবং তিনি ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন।

ত্বষ্টৃকে অপ্রত্যক্ষভাবে মনুষ্যজাতির আবির্ভাবের কারণ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কারণ, ঋগ্বেদের মতে ত্বষ্টৃর কন্যা সরণ্যু ছিলেন বিবস্বত নামে জনৈক পুরুষের স্ত্রী এবং এই সরণ্যুর গর্ভে যম ও যমী নামে ভ্রাতা ও ভগ্নীর জন্ম হয় (১০।১৪:৫ ; ১০।১৭:১)। এঁরাই ছিলেন মরণশীল মানুষের পূর্বগামী এবং পিতৃ-

লোকের অধীশ্বর। বিবস্বতের অন্য এক সন্তান ছিল যার নাম মনু। এই মনুকে মনুষ্যজাতির পিতা বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। ঋগ্বেদে উল্লিখিত বিবস্বৎ জরথুষ্ট্রীয় গ্রন্থ আবেস্তায় বিবনহ্বন্ত নামে পরিচিত। (যাস্ন ৯।১০) আবেস্তায় বিবনহ্বন্তকে প্রথম মানুষরূপে অভিহিত করা হয়েছে যিনি যিমকে (ঋগ্বেদের যম) তাঁর পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন। বেদ এবং পরবর্তী সাহিত্যে যমকে মৃত্যু-লোকের অধীশ্বর এবং ভীতির কারণ বলে গণ্য করা হয়ে থাকলেও জরথুষ্ট্রের অনুগামী ইরানীরা (পার্শী) যিমকে তাদের আদিপুরুষহিসেবে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে থাকে। ভারতীয় সমাজে কোন নবজাতককে কখনও যম শব্দ সম্বলিত কোননামে অভিহিত হতে দেখা যায় না, কিন্তু পার্শীদের মধ্যে জিম বা জেমসেদ নাম এখনও যথেষ্ট জনপ্রিয়।

বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে যম ও যমীর উৎপত্তি সম্পর্কে যে-বিবরণ আছে তাতেও পূর্বোক্ত কাহিনীর সমর্থন পাওয়া যায়। বৃহদ্দেবতার মতে ত্বষ্টৃর সরণ্যু ও ত্রিশির নামে যমজ সন্তান জন্মেছিল (বৃহদ্দেবতা ৬।১৬২)। ত্বষ্টৃ সরণ্যুকে বিবস্বতের সঙ্গে বিবাহ দিযেছিলেন এবং এই পরিণয়ের ফলে সরণ্যুর যম ও যমী নামে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মে। এরপর স্বামীর অনুপস্থিতিকালে সরণ্যু তার নিজের মত এক নারী সৃষ্টি করে নিজের পুত্র-কন্যাকে তার হাতে রেখে স্বামিগৃহ থেকে দূরে চলে গিযেছিলেন। বিবস্বত স্বগৃহে ফিরে সরণ্যুর অনুরূপ এই নারীকেই সরণ্যু মনে করে গ্রহণ করেন এবং সরণ্যুর এই প্রতিনিধির গর্ভে 'মনু'র জন্ম হয় (বৃহদ্দেবতা ৭।১)। যাস্ক তাঁর নিরুক্তে ঋগ্বেদের বিবস্বত ও ত্বষ্টৃ ঘটিত কাহিনী সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে এই কাহিনীকে ইতিহাস আখ্যায় অভিহিত করেছেন (তত্রেতিহাসা আচক্ষতে, নিরুক্ত ১২।১০)। এই সূত্রেই ত্বষ্টৃ, বিবস্বত, সরণ্যু, যম, যমী ও মনু সম্পর্কিত বিবরণ ও কাহিনী বেশকিছু পরিমাণে ইতিহাসভিত্তিক বলে অনুমান করা খুব অযৌক্তিক নয়। বৈদিক সংস্কৃতির বিবর্তন প্রসঙ্গে এই কাহিনী যে যথেষ্টই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও মূল্যবান একথা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এই প্রসঙ্গেই বলা যেতে পারে যে দেবত্বের অধিকারে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্যই হয়ত ত্বষ্টৃ এবং সবিতৃকে যেমন এক করা হয়েছে (দেবস্ ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপ, ৩।৫৫:১৯ ; ১০।১০:৫), তেমনি বিবস্বতকে বলা হয়েছে আদিত্য (শতপথ ব্রা ১০।৫:২-৪ ; বাজ সং ৮।৫ ; মৈ সং ১।৬:১২)।

ঋগ্বেদে যমকে যেমন বৈবস্বত বলা হয়েছে (১০।১৪:২), তেমনি মনুকেও

বৈবস্বত বলা হয়েছে (বালখিল্য ৪।১)। মনু যেমন ঋগ্বেদের সমাজের পিতৃপুরুষ, যমও তেমনি জরথুস্ত্রানুগামী ইরানী সমাজের পিতৃপুরুষ। ভারতীয় পুরাণ প্রবাহ-ধারায় মনু এবং ইরানী প্রবাহধারায় যম এই উভয়ের জন্মদাতা বা পিতা এই উভয় ধারায়ই বিবস্বত বা বিবনহ্বন্ত নামে পরিচিত একই ব্যক্তি। ভারতীয় ধারায় মনুকে যেমন দেবতা বলে অভিহিত করা হয়েছে, তেমনি মনুর অধস্তন পরিবারগুলি দেব-উপাসকরূপেই পরিচিত। অন্যদিকে ইরানে জরথুষ্ট্রের অনু-গামীরা অহুর-মাজদাকেই তাঁদের প্রধান উপাস্যরূপে গণ্য করে থাকেন এবং এই সূত্রে তাঁরা অসুর-উপাসক। হয়ত বিবস্বত, মনু এবং যম—বেদ এবং আবেস্তায় বর্ণিত মনুষ্যজাতির জন্মদাতারা মূলত মানুষই ছিলেন পরে দেবতারূপে উপাসিত হতে থাকেন। এই যুক্তিতেই একথাও বলা চলে যে ইন্দ্রও গোড়াতে মহা-শক্তিধর এক বীরপুরুষরূপেই গণ্য হতেন, পরে দেবতাদের অগ্রগণ্য ও রাজা বলে স্বীকৃতিলাভ করেন। এতৎসত্ত্বেও কিন্তু ইন্দ্রের প্রাধান্যের উল্লেখ প্রসঙ্গে ঋগ্বেদ ইন্দ্রকে দেবতা ও মানুষদেব মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন বলে উল্লেখ করেছে এবং দেবতা ও মানুষ এই উভয়ের মধ্যেই তাঁর দ্বিতীয় বা সমকক্ষ কেউ নাই এই কথাই বারবার উল্লেখ করেছে দেখা যায়। যাদের জন্ম হয়েছে এবং যারা এখনও জন্মায়নি তাদেব মধ্যেও ইন্দ্র অপ্রতিদ্বন্দ্বী (৪।১৮:১); স্বর্গে বা মর্ত্যে তাঁর সমকক্ষ কেউ নাই (৭।৩২:২৩), বিশেষ করে দেবতা বা মানুষের মধ্যে তাঁর সমান বা তাঁকে অতিক্রমকারী কেউ নাই (৬।৩০:৪), ঋগ্বেদের এইসব উক্তিকে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই ইন্দ্র যদি মূলত এক বীরাগ্রগণ্য মানুষরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে মনে করা যায়, তবে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বৃত্রও যে নিশ্চিতই অন্যতর এক মহাশক্তিশালী মানুষই ছিলেন এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তর্কের কোন অবকাশ থাকে না। বৃত্রের সঙ্গে ইন্দ্রের দ্বন্দ্ব এই যুক্তিতে পার্থিব সম্পদ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বলেই গণ্য করা যেতে পারে।

ঋগ্বেদে ত্বষ্টৃকে ইন্দ্রের পিতা বলে ইঙ্গিত করা হলেও এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ত্বষ্টৃর কন্যা সরণ্যুর সঙ্গে বিবস্বতের পরিণয়ের ফলে যম ও যমীর জন্ম হয়। মনুও বিবস্বতের পুত্র এবং অথর্ববেদে, শতপথ ব্রাহ্মণে (১৩।৪-৩:৩) এবং পরবর্তী বহু গ্রন্থে মনুকে বৈবস্বত মনু নামে অভিহিত করা হয়েছে। নিরুক্তকার যাস্কের মতে (১২।১০) আদিত্য বিবস্বতের প্রচণ্ড তেজ সহ্য করতে না পেরেই সরণ্যু সবর্ণাকে তার প্রতিনিধিরূপে বিবস্বতের

নিকট রেখে দূরে অপসরণ করলে, এই সবর্ণার গর্ভে মনুর জন্ম হয়েছিল। এই বিবরণসূত্রে মনু ত্বষ্টৃর কন্যার পুত্র।

ঋগ্বেদে ত্বষ্টৃর বহুবার উল্লেখ থাকলেও কোথাও তার পিতা-মাতার উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে ঋগ্বেদে প্রায় সমস্ত দেবতার ক্ষেত্রেই তাদের পিতৃবৃত্তান্তের কিছু উল্লেখ আছে। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে মহর্ষি ভৃগুর পুত্র শুক্রের সঙ্গে পিতৃকন্যা 'গো'র পরিণয় হয়েছিল (১।৭৬) এবং এই বিবাহের ফলে শুক্রের চারটি পুত্রের জন্ম হয়। তাদের নাম ছিল যথা-ক্রমে ত্বষ্টৃ, বরূত্রিন, যণ্ড (বা সণ্ড) এবং মর্ক। এই ত্বষ্টৃর ছিল দুই পুত্র, যাদের নাম ত্রিশিরস্ ও বিশ্বকর্মন্। ত্রিশিরস্‌কে বিশ্বরূপ নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। এদিকে ঋগ্বেদেও ত্বষ্টৃকে যেমন বিশ্বরূপ বলা হয়েছে, তেমনি এক বিশ্বরূপকে তার পুত্ররূপেও উল্লেখ করা হয়েছে।

ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে যে, এই ত্রিশির বা তিনমাথাওয়ালা বিশ্বরূপকে সংহার করে ইন্দ্র তার গাভীগুলিকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন (১০।৮:৪ ; ৯)। ঠিক এর পরের মন্ত্রেই উল্লেখ করা হচ্ছে যে ইন্দ্রই এই ত্বষ্টৃর পুত্র ত্রিশির বিশ্বরূপকে নিধন করে তার গাভীসম্পদ অধিকার করেছিলেন (১০।৯)। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সপ্তদশ মন্ত্রের প্রসঙ্গে বৃহদ্দেবতাতে যে-কাহিনীর বর্ণনা আছে তাতে বিবস্বতের পত্নী সরণ্যু ও ত্রিশিরস্‌কে স্পষ্টতই ত্বষ্টৃর যমজ সন্তান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঋগ্বেদ এবং পরবর্তী নানা শাস্ত্রগ্রন্থে এই ত্বষ্টৃ, ইন্দ্র ও বিশ্বরূপ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য যে-জটিলতার সৃষ্টি করেছে তার নিরাকরণের জন্য তেমন কোন চেষ্টা হয়েছে বলে মনে হয় না। ম্যাকডোনেল তাঁর Vedic Mythology গ্রন্থে লক্ষ্য করেছেন যে ইন্দ্রকে ত্বষ্টৃর পুত্র বলে ঋগ্বেদে ইঙ্গিত আছে। আবার বিশ্বরূপকে সুস্পষ্টভাবেই ঋগ্বেদে ত্বষ্টৃর পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঋগ্বেদে স্পষ্ট বর্ণিত আছে যে ইন্দ্র তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিলেন। ইন্দ্র ত্রিশির বিশ্বরূপ নামে পরিচিত ত্বষ্টৃর পুত্রকেও হত্যা করেন। মহাভারতের মতে এই ত্রি-শির বিশ্বরূপ বৃত্রেরই অন্য নাম। ত্রিশিরস্ বিশ্বরূপকে হত্যা করে ইন্দ্রের ব্রহ্ম-হত্যার পাপ হয়েছিল। কোন কোন পুরাণে আছে ত্রি-শিরস্ বিশ্বরূপ ইন্দ্রকে 'নারায়ণবর্ম' নামক অধ্যাত্মজ্ঞান প্রদান করেছিলেন এবং বিশ্বরূপের নিকট পাওয়া এই জ্ঞানের দ্বারা শতক্রতু ত্রিভুবনের ওপর আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন

(এতাং বিদ্যামধিগতো বিশ্বরূপাচ্ছতক্রতু/ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীং বুভুজে বিনির্জিত্য মৃধেঽসুরাণ—ভাগবতপুরাণ ৬।৮:৪২)। মহাভারতে ত্বষ্টৃর পুত্র এই ত্রিশির-বিশ্বরূপকে সুস্পষ্টভাবেই 'বৃত্র' আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে (৫।২২)। ঋগ্বেদের একাধিক মন্ত্রে ত্বাষ্ট্র নামে ত্বষ্টৃর পুত্রের উল্লেখ আছে, যে-ত্বাষ্ট্র প্রভূত অশ্ব ও গাভীসম্পদের অধিকারী ছিলেন ; আর এই ত্বাষ্ট্রকেই ইন্দ্র ত্রিতের হাতে সমর্পণ করেছিলেন নিধন করবার জন্য। ঋগ্বেদে বেশ কয়েকবার ইন্দ্রকেই যেমন বৃত্রের নিধনকারীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে (১।১৬৫:৮ ; ৭।২১:৩ ; ৮।৮৫:১৮ ; ১০।৯৯:৬ ; ১৩।৮:৬), তেমনি ত্রিতকেও বৃত্রের নিহন্তারূপে বর্ণনা করা হয়েছে (৮।৭:২৪)।

ঋগ্বেদে উল্লিখিত এই ত্রিতকে নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আবেস্তাতে থ্রিত নামে এক শক্তিধর পুরুষের উল্লেখ আছে। সেই সঙ্গেই উল্লেখ আছে থ্রায়েতায়োন নামে অন্য এক শক্তিধর পুরুষের, যে অজি দহাক নামে পরিচিত তিন মাথা, তিন মুখ ও ছয় চক্ষু সম্বলিত এক দানবকে নিহত করেছিল। আবেস্তার অজি দহাককে ঋগ্বেদের অহি অর্থাৎ 'বৃত্র' এবং তিন মুখ তিন মাথা দৈত্যকে ঋগ্বেদের ত্রিশির-বিশ্বরূপ বলে মনে করা খুব অযৌক্তিক নয়। এই বৃত্র-অহি-ত্রিশির ভিত্তিক পুরাণকথা ঋগ্বেদ ও আবেস্তা এই দুই সংস্কৃতিধারাতেই উল্লিখিত থাকায় সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই কাহিনী বৈদিক ও আবেস্তিক জনগোষ্ঠীর সহাবস্থানকালেই উদ্ভূত হযেছিল।

মহাভারত ও পুরাণ সাহিত্যে একজন ত্বষ্টৃকে শুক্রের পুত্ররূপে উল্লেখ করা হয়েছে। ঋগ্বেদে কিন্তু ত্বষ্টৃর পিতৃপরিচয়ের কোন উল্লেখ নাই। পুরাণ কাহিনী-মতে শুক্র মহর্ষি ভৃগুর পুত্র। ঋগ্বেদে বেশ কয়েকবার ভৃগুশব্দের উল্লেখ আছে, কিন্তু নিশ্চিন্তভাবে ভৃগু নামে কোন ঋষির উল্লেখ নাই। বহুবচনে ব্যবহৃত এই ভৃগু শব্দের ব্যবহারে প্রথম অগ্নি প্রজ্বালক ও যজ্ঞকর্মে প্রবৃত্ত এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়কে বোঝাত বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন। সর্বপ্রথমে অথর্ববেদেই সম্ভবত ভৃগুকে একজন মহর্ষিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে (অ বে ৫।১৯:১)। তারপর ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বরুণের দ্বারা গৃহীত ও প্রজাপতি থেকে উৎপন্ন ভৃগুর জন্ম-বৃত্তান্ত বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে (ঐ ব্রা ২।২০:৭)। শতপথ ব্রাহ্মণে মহর্ষি ভৃগু বরুণের পুত্ররূপে বর্ণিত হয়েছেন (শ ব্রা ২১।৬:১১)।

ভৃগুর বারুণী বা বরুণের পুত্র আখ্যালাভের কাহিনীর কিছু বিস্তৃততর বিবরণ

বৃহদ্দেবতাতেও পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ আছে যে প্রজাপতি সন্তানকামনায় এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। সেই যজ্ঞস্থলের অগ্নিগর্ভ থেকে 'ভৃগু' এবং অঙ্গার থেকে 'অঙ্গিরস', এই দু'জন সুপরিচিত ঋষির জন্ম হয়।[৩] ভৃগুকে অথর্ববেদে প্রথম অগ্নির প্রজ্বালক ও যজ্ঞকর্তা প্রাচীন ঋষি বলে গণ্য করা হয়েছে।[৪] অথর্ব-বেদের মতে এঁরা স্বর্গে বসবাসকারী দেবতা (অ বে ১১।৬:১০), কিন্তু ঋগ্বেদে এঁদের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পিতারূপেই অভিহিত করা হয়েছে বলে মনে হয় (১০।১৪:৬)। সম্ভবত এইসব প্রাচীন নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠীপতিদের অধস্তন সন্তানেরা একই সমাজে স্বতন্ত্রভাবে উপনিবিষ্ট এবং আলাদাভাবে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর গোত্র-সমাজরূপে গণ্য হতেন। বেদের অন্যান্য কয়েকজন ঋষি সম্পর্কেও অনুরূপ অলৌকিক উপায়ে যজ্ঞস্থলে জন্মলাভ করবার কাহিনীর উল্লেখ আছে। প্রজাপতির অনুষ্ঠিত যজ্ঞে উপস্থিত দেবতাদেব মধ্যে বাচ বা ভারতীকে (যিনি অন্যত্র সরস্বতী নামেও অভিহিত হয়েছেন) দেখার ফলে প্রজাপতি এবং বরুণের দ্বারা যেমন আঙ্গিরস ও ভৃগুর জন্ম হয়েছিল, তেমনি অন্যতর এক যজ্ঞ-স্থলে উর্বশী-দর্শনস্পৃষ্ট মিত্র ও বরুণের দ্বারা অগস্ত্য এবং বশিষ্ঠের জন্ম হয়েছিল এই বিবরণ পাওয়া যায় (বৃহদ্দেবতা ৫।১৪৯-৫০)। এই সূত্রে বশিষ্ঠকে ভৃগুর ভাই বলে গণ্য করা যেতে পারে।

ঋগ্বেদ এবং পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন নির্ভরযোগ্য উপকরণ থেকে এখানে যে-সব বিবরণ সংকলন করা হল তা থেকে এমন কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রস্তাব এখানে করা হবে, বিষ্ণুর অভ্যুত্থান ও প্রাধান্যলাভ সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে যা থেকে বেশকিছু আলোক পাওয়া যেতে পারে।

পূর্বে যে-সব তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে যে ঋগ্বেদে এবং পরবর্তী সাহিত্যে ভারতসংস্কৃতির প্রারম্ভিক পর্যায় সম্পর্কে বিচ্ছিন্নভাবে এমন অনেক সংবাদ, এমন অনেক তথ্য নিহিত আছে যার প্রকৃত মূল্যায়ন ও পারস্পরিক যোগসূত্র এখনও সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ঋগ্বেদের অনেক ব্যাখ্যাতা এই ইন্দ্র-বৃত্র কাহিনীকে মেঘ থেকে বর্ষণঘটিত প্রাকৃ-তিক ঘটনার প্রতীক বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।[৫] মনে হয় ইন্দ্রের আবির্ভাবের বহু পরে, তিনি যখন পূর্ণ দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তখনই তাঁর জাগতিক কিছু ক্রিয়াকর্মের প্রতীকী ব্যাখ্যা প্রচলিত হয়েছিল। ইন্দ্র এবং বৃত্র বা ত্রিশির-বিশ্ব-রূপের দ্বন্দ্বের মূলে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য থাকা অসম্ভব নয়। যদি ধরে নেওয়া

যায় যে ইন্দ্রের পিতা ত্বষ্টৃ মূলত একজন মানুষই ছিলেন, তাহলে মহাভারতের সাক্ষ্যমতে তাঁকে শুক্রের পুত্র বলেই গণ্য করতে হয়। এ সিদ্ধান্ত মেনে নিলে এ-কথা বিচার করে দেখতে হয় কি কারণে ঋগ্বেদে ভৃগুদের উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী মহাকাব্য ও পুরাণ সাহিত্যে অসুরগুরু নামে পরিচিত ভৃগুপুত্র শুক্রের কোন উল্লেখ সেখানে নাই। ঋগ্বেদে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে ইন্দ্র তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিলেন এবং তাঁর মাতার বৈধব্য ঘটিয়েছিলেন।[৬] ত্বষ্টৃর অন্যতর পুত্র ত্রিশির-বিশ্বরূপের উল্লেখ ঋগ্বেদেও আছে এবং এই পরিচয়সূত্রে বিশ্বরূপ-বৃত্রকে ইন্দ্রের ভ্রাতা বলে গণ্য করা চলে। ইন্দ্র এবং বৃত্র-বিশ্বরূপের এই মহাপ্রতিদ্বন্দ্বিতা সমাজে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। এই মহাপরিবর্তনের রূপরেখা বেদ ও বেদপরবর্তী ধর্মীয় সাহিত্য থেকে অনুমান করে নেওয়া অসম্ভব নয়।

ঋগ্বেদে ইন্দ্রের মাতার উল্লেখ আছে; যাঁর নাম বলা হয়েছে নিষ্টিগ্রী (১০।১০১:১২)। সায়নের মতে এই নিষ্টিগ্রী হচ্ছেন অদিতি। ইন্দ্রকে আদিত্য বলে অভিহিত করা হয়েছে লক্ষ্য করেই সায়ন সম্ভবত নিষ্টিগ্রী এবং অদিতিকে অভিন্ন বলে গণ্য করেছেন। ইন্দ্রকে অন্যতম আদিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই কোন সুপ্রাচীন অতীতে হয়ত নিষ্টিগ্রীকে অদিতির সঙ্গে অভিন্ন প্রতিপন্ন করার প্রয়াস হয়েছিল। অদিতি অবশ্য ছিলেন দেবপ্রসূতি আকাশ (দৌর অদিতি, ১০।৬৩:৩) বা পৃথিবী (১।৭২:৯; অথর্ব ১৩।১:৩৮)। ইন্দ্রকে অদিতির পুত্র প্রতিপন্ন করার পেছনে তাঁকে দেবতা বলে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ছিল। অথর্ববেদের মতে ইন্দ্রের মাতার নাম ছিল 'একাষ্টকা', যিনি ছিলেন প্রজাপতির কন্যা (অথর্ব ৩।১০:১২-১৩)। এই উল্লেখ থেকেও প্রজাপতির কন্যার গর্ভজাত বলে অভিহিত করে ইন্দ্রকে দেবতা পর্যায়ে উন্নীত করার প্রয়াসই লক্ষ্য করা যায়। ইন্দ্রের মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বৃত্র, যাঁকে নানা সূত্র থেকে ত্রিশির-বিশ্বরূপের সঙ্গে অভিন্ন এবং ত্বষ্টৃর পুত্র বলে এই আলোচনায় দেখান হয়েছে; বৃহদ্দেবতার মতে সেই ত্রিশির-বিশ্বরূপের মাতা ছিলেন অসুরকন্যা (অসুরানাং স্বসুঃ পুত্রম্ ত্রিশিরা বিশ্বরূপধৃক্—বৃহদ্দেবতা ৬।১৪৯)। ত্রিশিরা দেবগণের পৌরোহিত্য স্বীকার করেছিলেন কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ছিল অসুরদের উদ্দেশ্যসাধন। ইন্দ্রের প্রত্যয় জন্মেছিল যে অসুররাই ত্রিশিরাকে দেবতাদের মধ্যে প্রেরণ করেছে। এই কারণেই ইন্দ্র ত্রিশিরা-বিশ্বরূপের তিনটি মাথাই কেটে ফেললেন (বৃহদ্দেবতা

৬।১৫০—ত্বমৃষিং প্রহিতং ত্বিন্দ্রো দেবেষু বুবুধেহসুরৈঃ। সোহস্য বজ্রেণ তান্যাশু শিরাংসি ত্রীণ্যথাচ্ছিদত্)। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের প্রথম থেকে অষ্টম শ্লোকের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে বর্ণিত বৃহদ্দেবতার এই কাহিনী ইন্দ্র ও ত্রিশির-বিশ্বরূপ সম্পর্কের এক অত্যন্ত ইঙ্গিতগর্ভ বিবরণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। ত্রিশির-বিশ্বরূপকে হত্যা করার জন্য ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়েছিল এবং ঋষি সিন্ধুদ্বীপ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের নবম সূক্ত উচ্চারণ করে জলমোক্ষণের দ্বারা ইন্দ্রকে সেই পাপ থেকে মুক্ত করেছিলেন।

সমাজে ইন্দ্রের প্রভূত প্রতিষ্ঠা জন্মে থাকলেও পিতৃহত্যা ও ব্রহ্মহত্যার অপরাধে অপরাধী ইন্দ্রকে ঋষিসমাজের সকলেই অকুণ্ঠ সমর্থন দিতে স্বীকার করেন নাই। সূর্যকে ঋগ্বেদে সর্বদর্শী চক্ষুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং অথর্ববেদে সূর্যকে (দিবাকর) বর্ণনা করা হয়েছে 'বৃত্র' থেকে উৎপন্নরূপে (৪।১০:৫)। বরুণ তো কেবল অসুরশ্রেষ্ঠই নন, তিনি সকল ন্যায়নীতির ধারক, সকল অন্যায়ের শাস্তিবিধানকারী (৭।৮৬:৩-৪)। স্বভাবতই বিশ্বরূপ-বৃত্রের সঙ্গে সংগ্রামে ইন্দ্র সূর্য বা বরুণের কোন সহায়তা চাইতে বা আশা করতে পারেননি।

এই প্রাধান্যলাভের দ্বন্দ্বে দেখা যায় ইন্দ্র প্রধানত যে-দেবতার সহায়তা প্রার্থনা করেছেন ঋগ্বেদে সেই দেবতা অপেক্ষাকৃত অপরিচিত। এই দেবতা ছিলেন 'বিষ্ণু', বৃত্রের সঙ্গে সংগ্রামে যিনি ছিলেন ইন্দ্রের প্রধানতম অবলম্বন। বিষ্ণুকে ইন্দ্রের ভ্রাতাও বলা হয়েছে (৬।৫৫:৫); ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের বিংশতম ঋকে উল্লেখ আছে যে ইন্দ্র বিষ্ণুর সহায়তায় বৃত্রকে নিধন করেন। এককভাবে বিষ্ণুর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত ঋক সংখ্যায় খুবই বিরল; প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে (৭।৯৯:৫-৬ ; ১।১৫৫:২) বা অপ্রত্যক্ষভাবে (৭।৯১:৪ ; ১।১৫৪:৬ ; ১৫৫:১) বিষ্ণুর উদ্দেশে ব্যক্ত মন্ত্রে ইন্দ্রের সংযোগ দেখা যায়। বিষ্ণুর সঙ্গে ইন্দ্রের এই মৈত্রীর এক অভূতপূর্ব পরিচয় আছে ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের অষ্টাদশ ঋকে যেখানে বৃত্রের নিধনের প্রাক্কালে বিষ্ণুকে আহ্বান করে ইন্দ্র বলছেন : 'হে বন্ধু বিষ্ণু ! তুমি তোমার পদ বিস্তৃত কর।'

ইন্দ্র-বৃত্রের এই দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম সম্বন্ধে বৃহদ্দেবতায় একটি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়, যে-বিবরণে দেবতা হিসেবে বিষ্ণুর প্রাধান্য অর্জনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রচণ্ড শক্তিতে সমৃদ্ধ বৃত্র জগতত্রয় (ভূঃ,ভুবঃ, স্বঃ) প্রমর্দিত করে অপরাজেয়

হয়ে উঠেছিলেন এবং ইন্দ্র যখন কোনমতেই তাঁকে দমন করতে পারছিলেন না, তখন তিনি বিষ্ণুকে আহ্বান করে বলেছিলেন, 'আমি বৃত্রকে বধ করতে ইচ্ছা করি ; হে বিষ্ণু, তুমি তোমার পদবিস্তার কর এবং আমার পার্শ্বে এসে দাঁড়াও' (অর্থাৎ আমাকে সাহায্য কর)। বিষ্ণু প্রত্যুত্তরে বললেন, 'হাঁ, তাই হউক।' (বৃহদ্দেবতা ৬।১২১-১২৩—ত্রীংল্লোকানভিতপ্যোমান্ বৃচতস্থৌ স্বয়া ত্বিষা॥ ত্বং নাশকন্থন্তমিন্দ্রো বিষ্ণুমধ্যেত্য সোঽব্রবীত্। বৃত্র হনিষ্যে তিষ্ঠস্ব বিক্রমাস্ব মমান্তিকে॥)

ভাগবতপুরাণে শতক্রতু নামে অভিহিত ইন্দ্র এবং ত্বষ্টৃর পুত্র ত্রিশির-বিশ্বরূপ সম্পর্কিত যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে বর্ণিত ইন্দ্র-বিশ্বরূপঘটিত তথ্যের অনুরূপ বিস্তৃত সমর্থন বৃহদ্দেবতা ভিন্ন অন্য কোথাও নাই। ভাগবতপুরাণে উল্লিখিত আছে যে বিশ্বরূপের নিকট থেকেই ইন্দ্র এই বিষ্ণু-জ্ঞান (নারায়ণ-বর্ম) লাভ করেছিলেন। এই জ্ঞানই ইন্দ্রকে ত্রিলোকের আধিপত্য ভোগে সক্ষম করেছিল। বিশ্বরূপের উপর প্রবল সন্দেহবশে ইন্দ্র তাঁকে হত্যা করেন। বিশ্বরূপকে হত্যা করার শক্তি ইন্দ্র লাভ করেছিলেন সেই নারায়ণ-বর্ম জ্ঞান-সূত্রে অর্থাৎ বিষ্ণুর অনুগ্রহে এবং এই বিষ্ণু জ্ঞান এবং তজ্জনিত শক্তি ইন্দ্র ত্রিশির-বিশ্বরূপের নিকট থেকেই লাভ করেছিলেন।

বৃত্রনিধনে ইন্দ্রকে সহায়তাদান এবং এই দুঃসাধ্য কৃত্যের অংশীদারত্বই ঋগ্বেদে বিষ্ণুর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত ঋক্‌সমূহের প্রধান সংবেদন। ঋগ্বেদে বিষ্ণুকে আদিত্য বলা হয়নি, যদিও পরবর্তী সংস্কৃতিধারায় বিষ্ণু আদিত্যদের মধ্যে প্রধান বলে গণ্য হয়েছিলেন (আদিত্যানাং অহং বিষ্ণুঃ—ভগবদ্গীতা ১০।২১)। ঋগ্বেদে (২।২৭:১ ; ৯।১১৪:৩ ; ১০।৭২:৪) যেখানে যেখানে আদিত্যদের উল্লেখ আছে তার কোথাও কিন্তু বিষ্ণুর উল্লেখ নাই। এমনকি অথর্ববেদ (৮।৯:২১) কিম্বা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।১:৯-১) প্রদত্ত আদিত্যদেবতাদের তালিকায়ও বিষ্ণুর নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। শতপথ ব্রাহ্মণেই প্রথম আদিত্যদের সংখ্যা বার বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁদের বৎসরের বার মাসের সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলে অভিহিত করা হয়েছে। (শ ব্রা ৬।১:২-৮ ; ১১।৬:৩-৮) নানা উপলব্ধির বিবর্তনপথে দ্বাদশ আদিত্যের প্রত্যেককে এক একটি মাসের অধিকর্তারূপে নির্দিষ্ট করা বেশ পরিণত চিন্তা ও জ্ঞানের পরিচায়ক এবং কালের দিক থেকে ঋগ্বেদের প্রাচীনতম সূক্তগুলির

উদ্ভবের কালের থেকে অনেক পরবর্তী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই উপলব্ধির ভিত্তিতে পৌষমাসের অধিকর্তা বিষ্ণু। ঋগ্বেদে কখনও কখনও ইন্দ্রকে আদিত্য বলে অভিহিত করা হলেও (৭।৮৫:৪ ; বাল ৪।৭) পরে ইন্দ্র আর আদিত্য পদবাচ্য থাকেননি। ইন্দ্রকে ঋগ্বেদে একাধিকবার 'সূর্য' বলেও অভিহিত করা হয়েছে (৪।২৬:১ ; ১০।৮৯:২) ; আবার অন্যত্র ইন্দ্রকে সূর্যের চেয়েও বড় প্রতিপন্ন করার চেষ্টাও যেন অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি সূর্যের স্রষ্টা (২।১২:৪ ; ২।২১:৪), তিনিই সূর্যকে কক্ষপথে স্থাপন করেছেন (৩।৪৪:২ ; ৮।৭৮:৭)। ইন্দ্র-বরুণ এবং ইন্দ্র-সোমও সূর্যের স্রষ্টা বলে অভিহিত হয়েছেন (৭.৯৯:৪ ; ৬।৪৪:২)। এইসব ঋকের প্রতিপাদ্য মনে হয় সূর্যকে অন্যতম প্রধান দেবতা বলে গণ্য না করে নভোমণ্ডলস্থ এক প্রকৃতি সঞ্জাত জ্যোতিঃপিণ্ডরূপে নির্দিষ্ট করা এবং বিশেষ করে ইন্দ্রকে সূর্য অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া। বস্তুত অসুর দেবতাদের মধ্যে বরুণ এবং মিত্রের সঙ্গে ইন্দ্রের কিছু সৌহার্দ্য থাকলেও সূর্য সম্পর্কে ইন্দ্রের স্পর্শকাতরতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এইদিক থেকে ইন্দ্র ও সূর্যের দ্বন্দ্বের উল্লেখ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে একটি ঋকের উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে মন্ত্রের প্রণেতা ঘোষণা করছেন যে অন্য দেবতা অপেক্ষা ইন্দ্রকেই তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করেন ; ইন্দ্রের অভ্যুত্থানে অগ্নি, সোম ও বরুণ তাঁদের স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছেন (১০।১১৪:৩)। সকল দেবতাই ছিলেন ইন্দ্রের ভয়ে ভীত (১১।২২:৮)। প্রাচীন অসুর দেবতাদের মধ্যে বরুণ কখনও কখনও ইন্দ্রের সঙ্গে সৌহার্দ্যসম্পন্ন বলে বর্ণিত হলেও সূর্য প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী। এইসব উল্লেখ থেকে অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে বৃত্র (বা ত্রিশির-বিশ্বরূপ) এবং তৎপরবর্তী অসুর নামে পরিচিত ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বীরা মূলত ছিলেন সূর্যের উপাসক। বরুণ, মিত্র ইত্যাদি অসুর দেবতারা তাঁদের উপাস্য থাকলেও সূর্যই ছিলেন তাঁদের প্রধান উপাস্য ; এবং বরুণ, মিত্র অরিয়মন, ভগ, পূষণ, দিবাকর, ভাস্কর, তপন ইত্যাদি সূর্যেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপভেদ বা নামভেদ বলে গণ্য হত।

এই প্রাচীন অসুর দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণুর যে কোন স্থান ছিল, ঋগ্বেদের উল্লেখ থেকে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীন আদিত্যদের মধ্যে যেমন বিষ্ণুর কোন উল্লেখ ছিল না, তেমনি ঋগ্বেদে বিষ্ণুকে কোথাও অসুর নামে অভিহিত করা হয়েছে এমন প্রমাণও নাই। বিষ্ণু কেবলমাত্র ইন্দ্রের বৃত্রনিধনকালে

তাঁকে সাহায্য করেন নাই, অসুর 'বলের' বিরুদ্ধেও বিষ্ণু ইন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন। (ঋ ১।১৫৬:৪) ঋগ্বেদে বিষ্ণুর নাম এক ইন্দ্র ভিন্ন অন্য কোন দেবতার সঙ্গে উচ্চারিত হতেও বড় একটা দেখা যায় না। ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর কোনটিতে বিষ্ণুনামের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত বা সমধর্মী কোন দেবতার সন্ধান পাওয়া যায় না; আবেস্তাতেও বিষ্ণুর কোন উল্লেখ নাই। বিষ্ণু একান্তভাবেই ভারতীয় চিন্তা-প্রসূত দৈবী পরিকল্পনা; অন্যান্য দেবতাদের তুলনায় বিষ্ণুর উদ্দেশে রচিত একক সূক্ত অপেক্ষাকৃত কম; ম্যাকডোনেলের গণনায় মাত্র পাঁচটি সম্পূর্ণ মন্ত্রে বিষ্ণুব স্তুতি পাওয়া যায় এবং এই সংখ্যা ও আপেক্ষিক মাহাত্ম্যের দিক থেকে বিষ্ণুর তেমন কোন প্রাধান্য ছিল এ কথা উপলব্ধি করা যায় না।[৭] তৎসত্ত্বেও বৃত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিষ্ণুকেই ইন্দ্রের প্রধান সহায়ক হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যেন বৃত্রকে পরাজিত করতে ইন্দ্র সম্পূর্ণভাবেই বিষ্ণুর উপর নির্ভরশীল এবং বিষ্ণুই যেন এই দানবজয়েব কৃতিত্বের মূল অংশীদার। ইন্দ্র কর্তৃক আরোপিত এই প্রাধান্যই যে ভগবান বিষ্ণুকে পরবর্তীকালে লোকোত্তর শীর্ষমহিমায় অধিষ্ঠিত করেছিল, দেব-পরিকল্পনার বিবর্তন অনুসরণ করলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

ভারতীয় মানসে উদ্ভূত দেবতা-পরিকল্পনায় বিষ্ণুর এই আকস্মিক অভ্যুত্থান ভারততত্ত্ব-অনুসন্ধানী পণ্ডিতদের মনে এক মহাবিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। ভারতীয় জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অধ্যাত্মসাধনার অনেক কিছুই পরবর্তী যুগে এই বিষ্ণুকে আশ্রয় করে বিবর্তিত হয়েছে; বিশ্বজগতের সমস্ত চরাচরকে আবৃত করে বিষ্ণু-সত্তার দুর্লঙ্ঘ্য অস্তিত্বের পরিকল্পনা ভারতীয় দৈবী পরিকল্পনার এক বিস্ময়কর উপলব্ধি।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় উল্লেখ আছে যে বৃত্র প্রবল শক্তিধর হয়ে সমস্ত পৃথিবী আবৃত করলে ত্বষ্টৃ ও ইন্দ্রের মনে ভীষণ ভীতির সঞ্চার হয়; এই সময় ইন্দ্র বিষ্ণুকে আহ্বান করে বলেন, 'হে বিষ্ণু এখানে সমাগত হও; যে এই বিশ্বকে আবৃত করে আছে আমরা তাকে ধরি' (তৈ সং ২।৪।১২:৩)। যেহেতু বৃত্র ত্রিজগৎ আবৃত করে রেখেছিল সেইহেতু বিষ্ণুও তাঁর প্রথম তৃতীয় অংশ ভূ, পরবর্তী তৃতীয় অংশ ভুবঃ ও শেষ তৃতীয় অংশ স্বঃ-এর উপর বিস্তৃত করে দিলেন এবং এরপরই ইন্দ্র তাঁর বজ্র দিয়ে বিষ্ণুর সহায়তায় বৃত্রকে নিধন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিষ্ণু ও ইন্দ্রের সংযোগ ঋগ্বেদেও বর্ণিত আছে। ঋগ্বেদের

একটি সূক্তে আছে জগতের পরম মঙ্গলবিধায়ক বিষ্ণু শুভকারী ইন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন (১।১৫৬:৫)। বিষ্ণুর আশ্রয়ে বা স্থানে থেকে (স্থানম্) ইন্দ্র তাঁর পরাক্রমযুক্ত কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। (বিষ্ণোঃ স্থান্ন ইতি ইন্দ্রো বীর্যম অক্রণোৎ—কঠক সংহিতা ১।১২)। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে বলা হয়েছে, বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে। ইন্দ্রস্য যুযয়ঃ শাখা (১।২২:১৯)। এখানেও ইন্দ্রকে বিষ্ণুর উপর নির্ভরশীল বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। স্বভাবতই লক্ষ্য করা যায় যে ঋগ্বেদের পরবর্তী ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে বিষ্ণুতে বিশেষ প্রাধান্য আরোপ করে ইন্দ্রকে বিষ্ণুর সহায়তায়ই তাঁর সাফল্য অর্জনে সক্ষম বলে প্রতিপন্ন করা হলেও ঋগ্বেদেই ইন্দ্রের প্রধানতম সহায়করূপে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয়েছিল তার যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে। এই সূত্র ধরেই দেখা যায় যে মহাভারতে প্রত্যক্ষভাবেই বিবৃত হচ্ছে যে, বৃত্রের সঙ্গে সংগ্রামে ইন্দ্রের সাফল্যের মূলে ছিল বিষ্ণুর তেজ এবং বলের অংশমাত্র লাভের সুযোগ। বিষ্ণুকে এইভাবেই দেবকল্পনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থান আরোপ করা হয়েছিল এবং বিষ্ণুর এই অভ্যুত্থান-রহস্য তাই পণ্ডিতসমাজে বিশেষ ঔৎসুক্যের সঞ্চার করেছে।

বিষ্ণু সম্পর্কে তাই এত অন্বেষা, এত জিজ্ঞাসা, এত গবেষণা। বিষ্ণু সম্পর্কে প্রধান জিজ্ঞাসা, কি কারণে ঋগ্বেদের সেই অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন দেবতা শেষপর্যন্ত এই ধরনের সর্বব্যাপী প্রাধান্য অর্জন করতে সক্ষম হলেন।[৮] এই সম্পর্কিত আলোচনায় ডাচ পণ্ডিত রুবেন, সম্ভবত ঋগ্বেদ বা তৎপরবর্তী সাহিত্য থেকে কোন নির্দেশ না পেয়েই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, বৈদিক আর্য সম্প্রদায় অনার্য ভারতীয়দের কাছ থেকে এই বিষ্ণুকে গ্রহণ করেছিলেন।[৯] অন্যান্য পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই ঋগ্বেদে বর্ণিত বিষ্ণুর পদবিস্তারের মহিমাকেই পরবর্তীকালে তাঁর বিস্তৃততর মাহাত্ম্যের মূল উপাদান বলে বিবেচনা করলেও রুবেন ইন্দ্রের সঙ্গে বিষ্ণুর সম্পর্ককেই এই প্রাধান্যলাভের মূল কারণ বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। বৃত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিষ্ণুর উপর ইন্দ্রের নির্ভরশীলতা যে বিষ্ণুর অলোকসামান্য প্রাধান্যলাভের সহায়ক হয়েছিল এ বিষয়ে রুবেনের চিন্তা যথেষ্ট সমর্থনের দাবি রাখে।

ইন্দ্রের আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই ঋগ্বেদ যে-সমাজমানসের সৃষ্টি সেই সমাজ সংহত এবং সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠছিল। এই সমাজে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দুটি কাঠের ঘর্ষণে অগ্নিপ্রজ্বালন কৌশল আবিষ্কৃত হয়ে থাকলেও গৃহে

স্থায়িভাবে অগ্নিসংরক্ষণেরও প্রচলন ছিল, যে-আগুনকে বলা হত আহিতাগ্নি। এই আগুন নানাভাবে সভ্যতার বিকাশে সাহায্য করেছিল—আহার্যদ্রব্য রন্ধনে, বনজঙ্গল অগ্নিদগ্ধ করে কৃষিক্ষেত্র প্রসারে, নগর পত্তনে এবং ইট অগ্নিদগ্ধ করে গৃহনির্মাণে। এই উপলব্ধিও তাদের জন্মেছিল যে অগ্নির এই দুর্বার দাহিকা শক্তি নভোমণ্ডলস্থ প্রত্যক্ষ জ্যোতির্মণ্ডল সূর্যের এবং অন্তরীক্ষস্থ বজ্রবিদ্যুৎরূপী ইন্দ্রের অনুকল্প। মহাকাশে অবস্থিত এই সূর্য স্বনামে অথবা নানা বিকল্প নামে এই সমাজে প্রধানতম উপাস্যরূপে গণ্য হয়েছিলেন। এই সমাজের যাঁদের কাছে দেবতারা অসুর আখ্যায় পরিচিত ছিলেন এবং যাঁরা ইন্দ্রকে দেবত্বে অধিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁরা জানতেন যে ইন্দ্র এই অসুর-উপাসক সমাজেই উদ্ভূত হয়েছিলেন; তাই তাঁকে কোন কোন মন্ত্রে অসুর আখ্যায়ও অভিহিত করা হয়েছিল। কিন্তু বৃত্রের সঙ্গে সংগ্রামে সাফল্যলাভসূত্রে এই বৃহৎ অসুর-উপাসক সমাজ থেকে ইন্দ্র বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এই বিচ্ছিন্নতাই সুস্পষ্ট হয় যখন ইন্দ্র তাঁর অনুগামীদেরই কেবল আর্য নামে পরিচয়ের অধিকার দিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের এই অধিকার থেকে বিচ্যুত করেছিলেন। সুদাস তাঁর পরাজিত শত্রুদের আর্যত্ব থেকে বিচ্যুত করেন। ইন্দ্রের এই নির্দেশ কিন্তু অসুর-উপাসক সমাজে স্বীকৃত হয় নাই এবং আবেস্তা থেকে তার প্রমাণও পাওয়া যায়। আবেস্তাতে অহুর বা অসুর-মাজদার উপাসকেরাও নিজেদের 'আরিয়' বা আর্য বলেই দাবি করতেন লক্ষ্য করা যায়। আর্যত্বের প্রবল দাবিদার এই ইন্দ্রানুগামী সম্প্রদায় ঋগ্বেদ সংকলনকাল পর্যন্তও অসুর দেবতা বরুণ, মিত্র, সবিতৃ, পূষণ এবং সর্বোপরি সূর্য সম্পর্কিত স্তুতি ঋগ্বেদ গ্রন্থ থেকে বাদ দিতে পারেননি বা দেননি। তবে ইন্দ্রকে অবলম্বন করেই যে এই বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত হয়েছিল, বেদ এবং পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, সূত্র, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ-কাহিনী থেকে তা সুস্পষ্টরূপেই উপলব্ধি করা যায়। বস্তুত ত্বষ্টৃ যদি সবিতৃর সঙ্গে অভিন্ন বলে গণ্য হন (ঋ ৩।৫৫:১৯ ; ১০।১০:৫), তবে যেহেতু সবিতৃ অসুর নামে অভিহিত হয়েছেন সেই সূত্রে ত্বষ্টৃকেও অসুর আখ্যায় অভিহিত করা চলে (সবিতৃ=অসুর, ঋ ৪।৫৩:১) তাহলে ত্বষ্টৃর পুত্র ত্রিশির-বিশ্বরূপ বা বৃত্রও অসুর এবং ইন্দ্র ও স্বয়ং অসুর (ইন্দ্র—অসুর ঋ ১।১৭৪:১ ; ৮।৭৯:৬), সবিতৃ তো সূর্যেরই এক রূপ ; এই সূত্রেই ইন্দ্রের নিজেকে আর্য বলে দাবি করায় (ঋ ৪।২৬:১ ; ১০।৮৯:২) কোন অসঙ্গতি দেখা যায় না। অন্যত্র দেখা যায়

ইন্দ্রের রথ বৃত্রের রথের অশ্বের দ্বারা বাহিত হচ্ছে (ঋ ১০।২২:১-৬), আবার তার একটু পরেই উল্লেখ আছে যে ইন্দ্রের রথ সূর্যের অশ্বের দ্বারা বাহিত হচ্ছে (১০।৪৯:৭)। বৃত্রকে পরাজিত ও নিহত করে ইন্দ্র শুধু যে বৃত্রের সকল সম্পদই অধিকার করেছিলেন তাই নয়, সূর্যের প্রতিনিধিত্ব করবার যে অধিকার বৃত্রের ছিল তাও আত্মসাৎ করেছিলেন। ত্বষ্টৃর কন্যা সরণ্যুর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল বিবস্বতের এবং সরণ্যুর প্রতিনিধি সবর্ণা থেকে বিবস্বতের পুত্ররূপে মনুর জন্ম হয়েছিল। এই সূত্রে মনু ইন্দ্রের ভগিনী-কন্যা। আবেস্তায় মাত্র দু'বার ইন্দ্রের উল্লেখ আছে ; এবং সে-উল্লেখ ইন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য নয়, ইন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষেরই দ্যোতক।[১০] ঋগ্বেদে কিন্তু বারংবার মনুর সঙ্গে ইন্দ্রের ঘনিষ্ঠতার উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত থেকেই ত্বষ্টৃকে ইন্দ্রের পিতা বলে অনুমান করে নেওয়া চলে। এদিকে ত্বষ্টৃর কন্যা সরণ্যুর (ঋ ১০।১৭:১-২) প্রতিকল্প সবর্ণা যে মনুর মাতা ছিলেন এই তথ্য সুপরিজ্ঞাত। পারস্পরিক পরিচয়ের এইসব তথ্য জানা থাকা সত্ত্বেও মনু যে ইন্দ্রের ভগিনীর সন্তান এই উল্লেখ কোথাও সুস্পষ্ট-ভাবে পাওয়া যায় না। আর ইন্দ্র-মনু সম্পর্কের যে তেমন কোন গুরুত্ব আছে এমন কথাও কেউ বলেননি। মনুর পিতা বিবস্বত সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন ; পরে দেবতার পর্যায়েও উন্নীত হয়েছিলেন। কিন্তু ঋগ্বেদে বা অন্য কোথাও বিবস্বতকে গোষ্ঠীনায়ক বা রাজা বলে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু প্রাচীন বহু তথ্যসূত্রে মনুকে মনুষ্যকুলের রাজা বলে পরিচিত করা হয়েছে (শ ব্রা ১৩।৪।৩:৩-৫)। জন্মসূত্রে মনু দেবতা, কারণ মনুর পিতা বিবস্বতকে বরুণ এবং অন্যান্য দেবতার সঙ্গে পূজার্হ বলে উল্লেখ করা হয়েছে (ঋ ১০।৬৫:৬)। যজুর্বেদে এবং বহু ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বিবস্বতকে আদিত্য আখ্যায়ও অভিহিত করা হয়েছে। মনুর উত্তরাধিকারীরা এই ভিত্তিতে দেবতা পরিচয়ের অধিকারী বলে গণ্য হতেন। ঋগ্বেদে বিবস্বতের সঙ্গে ইন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠতার উল্লেখ আছে (৮।৬:৩৯ ; ২।১৩:৬)। একটি মন্ত্রে উল্লেখ আছে যে ইন্দ্র তাঁর সমস্ত সম্পদ বিবস্বতের সংরক্ষণে স্থাপিত করেছিলেন (ঋ ২।১৩:৬)। ইন্দ্র প্রভূত শক্তিসামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং রাজা হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজ্য বা সম্পদের কোন উত্তরাধিকারীর উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না।

এদিকে বিবস্বতের রাজা হিসাবে পরিচয় না থাকলেও বিবস্বত-পুত্র মনু রাজা বলে গণ্য হয়েছিলেন। ঋগ্বেদে মনুর কোন উত্তরাধিকারীর উল্লেখ নাই।

কিন্তু পরবর্তী যুগে রচিত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণকাহিনীতে মনুর ইক্ষ্বাকু প্রমুখ পুত্র ও ইলা নামে এক কন্যার উল্লেখ পাওয়া যায় ; আবার ঋগ্বেদে ইক্ষ্বাকু এবং ইলা উভয়েরই উল্লেখ আছে ; ইলা তো ঋগ্বেদের বেশ কয়েকটি মন্ত্রে দেবতারূপে উল্লিখিত হয়েছেন। কিন্তু ঋগ্বেদে কোথাও এঁদের মনুর সঙ্গে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ নাই। এই সমস্ত গ্রন্থে মনু সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলিকে একসঙ্গে গ্রথিত করলে এবং বিশ্লেষণ করলে বেশকিছু রহস্য ও সমস্যার সমাধান হতে পারে। এইসব তথ্যের মধ্যে ঋগ্বেদে মনুকে যেমন বিবস্বতের পুত্র বলা হয়েছে, তেমনি একজনকে সাবর্ণি মনু বলেও বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি সবর্ণার পুত্র। বৈদিক সাহিত্যে অনেক দেবতা এবং ঋষিকে পরিচিত করতে তাদের মায়ের নামের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ঋগ্বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা বরুণ, মিত্র, ভগ ও পূষণ আদিত্য আখ্যায় তাঁদের মাতা অদিতির নামে পরিচিত হয়েছেন। এমনকি সূর্যকেও একাধিকবার আদিত্য বা অদিতের নামে অভিহিত করা হয়েছে। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মণস্পতি কর্তৃক তাবৎ শূন্যতা থেকে, বা কোন কিছুই যখন বর্তমান ছিল না সেই অবস্থায় জগতের সৃষ্টি হল, ক্রমে উদ্ভূত হল পৃথিবী, মহাশূন্য, দক্ষ ও অদিতি ; অদিতি জন্ম দিলেন দেবতাদের, শেষপর্যন্ত আবির্ভূত হলেন সূর্য (১০।৭২:৬)। অদিতিকে অভিহিত করা হয়েছে মাতৃরূপে এবং দেবতাদের দুগ্ধদাত্রীরূপে (১০।৬৩:৩)। এই অদিতির উদ্ভব ও পরিচয় নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। তবে সৃষ্টির আদিতে মাতা অদিতির পরিচয়েই যে দেবতাদের পরিচয় ছিল এ কথা সুস্পষ্ট। ঋগ্বেদের আদি দেবতারা সবাই অসুর আখ্যায়ই অভিহিত ছিলেন। এবং তাঁদের এই আদিত্য আখ্যাসূত্রে স্বভাবতই মনে হয় যে সেই অসুর-উপাসক সমাজ প্রধানত ছিল মাতৃতান্ত্রিক, যেখানে মাতার নামেই সন্তানের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হত। পরে এই সমাজ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পরিণত হলেও, পরিপূর্ণ পিতৃতন্ত্র সমাজের সকল অংশে প্রবর্তিত হয়নি। মনুর পিতা বিবস্বতের সঙ্গে ইন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ঋগ্বেদ থেকে ইন্দ্রের কোন পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইন্দ্রের অনুগামীদের মধ্যে তাঁর যে প্রাধান্য ছিল, ইন্দ্র দেবত্বে অধিষ্ঠিত হলে সেই প্রাধান্য হয়ত ভগিনী সরণ্যুর অনুকল্পা সবর্ণার পুত্র মনুর অধিগত হয়েছিল। এই সূত্রেই মনুকে রাজা ও মনুর উত্তরাধিকারী বংশধরদের রাজপদে অধিষ্ঠিত দেখতে পাওয়া যায়। পুরাণ ও ইতিহাস (অর্থাৎ

মহাভারত) মতে মনুর বহু পুত্র ও এক কন্যা ছিল। পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ইক্ষ্বাকু যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন সেই বংশ সূর্যরূপী বিবস্বতের উত্তরাধিকারী হিসেবে সূর্যবংশ নামে পরিচয় লাভ করে। কন্যা ইলার সঙ্গে চন্দ্রপুত্র বুধের পরিণয় হয় এবং ইলার পুত্র পুরুরবা যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন সেই বংশ চন্দ্রের উত্তরাধিকারসূত্রে চন্দ্রবংশ নামে পরিচয়লাভ করে।

এখানে আর একবার শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত মনু-মৎস্য উপাখ্যানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রহস্যময় মৎস্যের অনুজ্ঞায় মনু এক বিধ্বংসী প্লাবন থেকে ত্রাণলাভ করেছিলেন। সেই মৎস্য পরবর্তী সমাজমানসে অবতাররূপী বিষ্ণু বলে গণ্য হয়েছিলেন। মনু ইন্দ্রের উত্তরাধিকার লাভ করে যেমন রাজা বলে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন তেমনি ইন্দ্রের পরম সহায়ক বিষ্ণুর দ্বারা অনুগৃহীত হওয়ায় মনুর উত্তরাধিকারীদের নিকট অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা বিষ্ণুই পরমতম উপাস্যরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। ইন্দ্র বহু যজ্ঞ সম্পাদন করে ইন্দ্রত্বলাভ করেছিলেন, তাই তাঁর নাম হয়েছিল শতক্রতু (ক্রতু = যজ্ঞ)। ঋগ্বেদের মতে মনুও প্রভূত যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ; এবং তাঁর অনুগামী সমাজে যেভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয় সেইভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান মনুর দ্বারাই প্রবর্তিত হয়েছিল (১।৭৬:৫ ; ১।৪৪:১১), ঋগ্বেদে এই তথ্যই প্রতিষ্ঠিত আছে।

মনুর কন্যা ইলা ও তাঁর পুত্র পুরুরবাকে নিয়ে বেশকিছু বিস্ময়কর কাহিনী আছে। পুত্রকামনায় মনু এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন, কিন্তু সেই যজ্ঞ-অনুষ্ঠান সত্ত্বেও কোন পুত্রের জন্ম না হয়ে এক কন্যার জন্ম হয়েছিল। এই কন্যা ইলাই মনুর জ্যেষ্ঠ সন্তান। মিত্র বরুণের অনুকম্পায় এই কন্যা পরে পুত্রে পরিণত হন এবং সুদ্যুম্ন নামে পরিচয় লাভ করেন। কিন্তু মহাদেবের শাপে সুদ্যুম্ন পুনরায় নারীতে পরিণত হলে সেই মনুপুত্রী ইলার সঙ্গে বুধের মিলন হয়। এই মিলনের ফলে ইলার পুরুরবা নামে এক পুত্র জন্মে (বিষ্ণুপুরাণ ৪।১:৫-১৩)। ইলা-সুদ্যুম্নের সন্তান এই পুরুরবাকে অবলম্বন করে যে উপাখ্যান আছে তা যেমন রহস্যপূর্ণ তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক। যে মূল বংশকে অবলম্বন করে ভারতের সংস্কৃতিধারা দীর্ঘকাল প্রবাহিত ছিল, যে বংশের স্মৃতি এবং পরম্পরা এখনও বিদ্যমান, সেই ঐল-যযাতি-পুরু-ভরতবংশের আদিপুরুষ এই পুরুরবা যে বিস্ময়কর পরিমণ্ডল নিয়ে ভারতমানসে দৃঢ়মূল হয়ে আছেন তার প্রথম উল্লেখ ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে, পঞ্চনবতিতম সূক্তে পুরুরবা-উর্বশীঘটিত যে উল্লেখ-যোগ্য উপাখ্যান আছে তার দিকে প্রায় সকল ভারততত্ত্ববিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারেনি। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও আখ্যান সাহিত্যেও এই উপাখ্যান প্রভূত কৌতূহল ও অনুরাগ নিয়ে বারংবার উচ্চারিত হয়েছিল, যা থেকে এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। খ্যাতনামা জার্মান বেদতত্ত্ববিদ গেল্ডনার তাঁর Vedische Studien নামক প্রভূত পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিস্তৃতভাবে ঐ পুরুরবা-উর্বশী কাহিনী সম্পর্কে আলোচনা করে প্রাচীন কোন্ কোন্ গ্রন্থে এই উপাখ্যানের বর্ণনা আছে তার বিবরণ দিয়েছেন। ঋগ্বেদে আকস্মিকভাবে পুরুরবা ও উর্বশীর কথোপকথনের মাধ্যমে এক ভাবসমৃদ্ধ নাটকীয় পরিবেশ রচিত হয়েছে। এই কথোপকথনের মাধ্যমে যে আখ্যানের চিত্ররূপ উপলব্ধ হয় তা যেমন কাব্যগুণসমৃদ্ধ তেমনি হৃদয়গ্রাহী। উর্বশীর পরিচয় তিনি অপ্সরা। ঋগ্বেদের বিবরণমতে অপ্সরারা গন্ধর্বসমাজের নারী, অপরূপ দেহ-সৌষ্ঠবের অধিকারী, নৃত্যগীতাদি বিদ্যায় পারদর্শী। পুরুরবার পরিচয় তিনি রাজা। এ ছাড়া এমনও বলা হয়েছে যে তিনি যেন স্বয়ং ইন্দ্র। অপূর্ব রূপবতী উর্বশীকে দেখে পুরুরবার গভীর অনুরাগ জন্মে এবং তিনি তাঁকে বিবাহ করেন। কিন্তু উর্বশী যখন সন্তানসম্ভবা তখন পরস্পরের ব্যবহারে যে প্রতিবন্ধকতাকে স্বীকৃতি দেওয়ায় উর্বশী রাজাকে বরণ করেছিলেন, পুরুরবা সে সত্য লঙ্ঘন করেন। এর ফলে উর্বশী রাজার অন্তঃপুর পরিত্যাগ করে আত্মগোপন করেন। প্রণয়কাতর পুরুরবা দীর্ণ হৃদয়ে দয়িতার অন্বেষণে ইতস্তত পরিভ্রমণ করে এক সরোবরে তাঁর দর্শন পেলে তাঁকে প্রত্যাবর্তনের জন্য একান্তভাবে অনুরোধ করেন। কিন্তু উর্বশী সে অনুরোধ রক্ষায় তার অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন—তবে তাঁর গর্ভজাত পুত্রকে রাজার নিকট প্রত্যর্পণের স্বীকৃতি দিয়ে বিদায়ের ক্ষণে রাজাকে আশ্বাস দেন—মৃত্যুর পরে স্বর্গে তাঁদের পুনর্মিলন হবে (ঋ ১০।৯৫:১৮)। নরনারীর মিলন-বিরহে উদ্‌গত গভীর হৃদয়াবেগের যে পরিবেদন ঋগ্বেদের এই বিবরণে বর্ণিত হয়েছে কাব্যগুণে তা তুলনাহীন। এই আখ্যায়িকার এক বিস্তৃততর বিবরণ আছে শত-পথ ব্রাহ্মণে (শ ব্রা ১১।৫:১)। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের একটি মন্ত্রেও পুরুরবার উল্লেখ আছে মনুর অধস্তন পুরুষরূপে (মানবেয়—ঋ ১।৩১:৪)। এ ছাড়া উর্বশী-পুরুরবার এই কাহিনী বেদের ভাষ্যকার যাস্ক তাঁর নিরুক্তে, সদ্‌গুরুশিষ্য তাঁর সর্বানুক্রমণীতে, শৌনকের দ্বারা রচিত বৃহদ্দেবতায়, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ এবং

মহাভারতে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়া মহাকবি কালিদাস এই আখ্যায়িকা অবলম্বনে 'বিক্রমোর্বশীয়' নামে সুবিখ্যাত নাটক রচনা করেছিলেন ; আরও পরে প্রখ্যাত কথাকার সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' গ্রন্থেও এই কাহিনীর এক রসসমৃদ্ধ বিবরণ গ্রথিত আছে। উর্বশী-পুরুরবার এই কাহিনী ভারতীয় সংস্কৃতিমানসে অত্যন্ত গভীর ও অন্তরঙ্গভাবে গেঁথে থাকাই এ সম্বন্ধে ভারত-জিজ্ঞাসুদের এত ঔৎসুক্যের কারণ। পাশ্চাত্যে বেদজিজ্ঞাসার আরম্ভে ম্যাক্স-মূলার এই উপাখ্যানকে সূর্য-উষা (Sun-dawn) সম্পর্কভিত্তিক রূপক কাহিনী বলে সিদ্ধান্ত করেন।[১১] পরে অনেকেই তাঁর পথ অনুসরণ করে এই কাহিনীকে নিছক রূপক বলে ব্যাখ্যা করেছেন। গেল্ডনার বিস্তৃত অনুশীলনের পর পুরুরবা-উর্বশী কাহিনীকে কল্পনাপ্রসূত পৌরাণিক উপাখ্যান বলে সিদ্ধান্ত করেন।[১২] দেশীয় পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকসময় পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অপেক্ষাও অধিকতর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও বিশ্লেষণধর্মী হয়ে থাকে। বিখ্যাত বস্তুতন্ত্রবাদী ভারততত্ত্ববিদ কোশাম্বী এই কাহিনীকে নৃতত্ত্বের গণ্ডিতে এনে দুই বিভিন্ন সমাজের নরনারীর বৈবাহিক যোগাযোগের একটি নিদর্শন বলে ব্যাখ্যা করেছেন।[১৩]

হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে যে বংশাবলী আছে তাতে পুরুরবাকে মনুর কন্যা ইলার পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুই পুরাণেই উর্বশী—পুরুরবা কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

হরিবংশপুরাণে উর্বশী সম্পর্কে বলা হয়েছে :

গান্ধর্বী চোর্বশী দেবী রাজানং মানুষং কথম্
দেবান্‌ৎসৃজ্য সম্প্রাপ্তা তন্মো ব্রূহি বহুশ্রুত ॥[১৪]

হরিবংশ এই কাহিনীকে বহুশ্রুত অর্থাৎ ব্যাপকভাবে প্রচারিত বলে অভিহিত করেছে। বিষ্ণুপুরাণেও উর্বশী-পুরুরবা কাহিনী বেশ বিস্তৃতভাবেই বর্ণিত হয়েছে (বিষ্ণু ৪।৬।৩৪-৭১)। পুরুরবার বংশেই নহুষ, যযাতি, পুরু, ভরত ইত্যাদি প্রাচীন কীর্তিগাথায় বিশ্রুত রাজন্যবর্গের জন্ম হয়। বিষ্ণুপুরাণেই উল্লেখ আছে যে উর্বশী পুরুরবাকে 'আয়ু' নামে এক পুত্র উপহার দিয়েছিলেন। ঋগ্বেদে এক যজ্ঞকর্তা আয়ুর উল্লেখ পাওয়া যায় (৪।৬:৩১)। বিষ্ণুপুরাণ মতে আয়ু রাহুর কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন এবং এই রাহুকন্যা থেকে আয়ুর পাঁচটি পুত্র জন্মে। আয়ু যেমন পুরুরবার জ্যেষ্ঠপুত্র, তেমনি আয়ুর জ্যেষ্ঠপুত্র নহুষ। নহুষের ছয় পুত্র ছিল, তার মধ্যে প্রথম পুত্র যতির রাজ্যলাভের অভিলাষ না থাকায় দ্বিতীয়

যযাতি নহুষের পরে সিংহাসনলাভ করেন। ঋগ্বেদে যেমন পুরুরবা এবং আয়ুর উল্লেখ পাওয়া যায় তেমনি নহুষ এবং যযাতিরও একাধিকবার উল্লেখ আছে। অবশ্য ঋগ্বেদে নহুষ এবং যযাতিকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে যেমন উল্লেখ করা হয়নি, তেমনি পুরাণে এঁদের যে পরিচয় তারও কোন উল্লেখ নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ঋগ্বেদে উল্লিখিত ব্যক্তি এবং উপাখ্যানের প্রায় সব কিছুকেই ইচ্ছামত অনৈতিহাসিক, কল্পনাপ্রসূত এবং রূপকথার সামিল বলে গণ্য করেছেন। মনু, পুরুরবা, নহুষ, যযাতিও এঁদের মতে একান্তই কাল্পনিক। এই বৈদিক পরিবেশ, বেদে বর্ণিত ঘটনাবলী এবং বৈদিক চরিত্রগুলিকে সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক এবং কল্পনাপ্রসূত বলে এড়িয়ে গেলে ভারত সংস্কৃতি বিবর্তনের রূপরেখা কখনই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। বিশেষ করে বিষ্ণু-কৃষ্ণ পরিচয়কে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দেবতারূপে বিষ্ণুর উদ্ভব যে পটভূমিতে হয়েছিল সেই যুগের সমাজ ও পরিবেশের যুক্তিযুক্ত অনুশীলনের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

নির্দেশিকা

১. Macdonell, A. A., Vedic Myth., pp. 22f.
২. Roth, R , in Zeitschrift der Deutschen Morganlandischen Gesellschaft (Z. D. M. G.), VI, 73 , Whitney, W. D., in Journal of the American Oriental Society (J. A. O. S.), III, p, 327.
৩. বৃহদ্দেবতা, ৫।৯৭-৯৯।
৪. Macdonell, A. A., Vedic Myth., p. 141.
৫. ঐ, p. 59, Luders, H., Varuna, I, p. 167,
৬. ঋগ্বেদ, ৪।১৮:১২।
৭. Macdonell, A. A., Vedic Myth., p. 37.
৮. Monier Williams, M., Hinduism (London, 1880), pp. 87f ; Hopkins, E, W., in J. A. O. S., XVI, 1896, p. CXLVIII ; Glassnapp, H., Die Religion Indien (Struttgart, 1943), pp. 141f.
৯. Eisensch-miede und Damonen in Indian (Leiden, 1939), p. 234.
১০. Muir, J. Original Sanskrit Texts (O. S. T.), Vol V (1884), p. 21.
১১. Max Muller, F., Chips from German workshop, II, p. 130.
১২. Vedische Studien, I., p. 243.
১৩. Kosambi, D. D., Myth and Reality. (Bombay, 1962), p. 46.
১৪. হরিবংশ, হরিবংশপর্ব, ২৬।৪৯।১২।

৪

বৈদিক সংস্কৃতির উদ্ভব

ইতিপূর্বে যে সমস্ত তথ্য উপস্থিত করা হল তা থেকে স্বভাবতই প্রতীয়মান হবে যে একই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্নতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঈর্ষা ছিল, যা ভিন্ন ভিন্ন কারণে বিভিন্ন সময়ে ঘোর সশস্ত্র সংগ্রামে রূপ নিত। বৃহস্পতির পত্নী তারার অপহরণকে উপলক্ষ করে দেবাসুর সংগ্রামের যে কাহিনী পুরাণগুলিতে পাওয়া যায়, বৈদিক সাহিত্যে তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে সেখানে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের, অর্থাৎ দেবতা ও অসুরদের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখা যায়। পুরাণের মতে দেবরাজ ইন্দ্রের পরিচালনায় দেবতারা বৃহস্পতির সাহায্যে অগ্রসর হলে জম্ভ-কুম্ভ আদি দৈত্যের অধীনে অসুরেরা চন্দ্রের সমর্থক শুক্রাচার্যের সাহায্যার্থে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল (বিষ্ণু ৪।৬:১২-২১)। কিন্তু কালের পারম্পর্যে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের সংঘর্ষের এই 'তারাময়' সংগ্রামই প্রথম নয়। তারাকে সোম বা চন্দ্র কর্তৃক অপহরণের ফলে যে দেবাসুর সংঘর্ষ হয় সেই সংগ্রামকে পুরাণে 'তারকাময়' সংগ্রাম নামে উল্লেখ করা হয়েছে (এবং চ তয়োরতীবোগ্রসংগ্রামস্তারা নিমিত্ত স্তারকাময়ো নামাভূত্—বিষ্ণু ৪।৬:১৬)। অসুর ও দেবতা উভয়েই প্রজাপতির সন্তান এবং অসুররা জ্যেষ্ঠ এবং দেবতারা কনিষ্ঠ, এ তথ্য প্রাচীন সাহিত্যে বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। তেমনি ঋগ্বেদেও বিভিন্ন দেবতার অসুর নামে পরিচয় পাওয়া যায়। এইসব তথ্যে একই সমাজের দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার ইঙ্গিত যে সুস্পষ্ট একথা অস্বীকার করা যায় না। দেবপূজকরাই কেবল নিজেদেব আর্য বলে মনে করত না, অসুরপূজকরাও নিজেদের আর্য বলে দাবি করত, অহুর-মাজদার উপাসক আবেস্তাপন্থী পারসিকদের দাবি থেকেই সে কথা উপলব্ধি করা যায়। ঋগ্বেদের প্রধান দেবতাদের প্রায় সকলেই কখনও না কখনও অসুর নামে অভিহিত হয়েছেন। একমাত্র বিষ্ণুকেই ঋগ্বেদে অসুর আখ্যায় অভিহিত হতে দেখা যায় না। আর দেবাসুর সংগ্রামে এই বিষ্ণুই দেবতাদের বিজয়লাভের সহায়করূপে পরিগণিত হয়েছেন। কিন্তু তারাঘটিত যে যুদ্ধের উল্লেখ পুরাণ সাহিত্যে দেখা যায় সেই যুদ্ধের প্রসঙ্গে দেবতারা যে জয়লাভ করেছিলেন এমন উল্লেখ নাই আর এই সংগ্রাম প্রসঙ্গে ভগবান

বিষ্ণুরও প্রত্যক্ষ কোন উল্লেখ নাই। এই যুদ্ধের কাহিনী সাধারণত বৈদিক এবং পৌরাণিক অনেক কাহিনীর মত কাল্পনিক বলেই গণ্য হয়ে থাকলেও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পরম্পরা বিচারে এই যুদ্ধঘটিত কল্পনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পুরাণের বর্ণনামতে এই যুদ্ধ বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রারম্ভকালে ঘটেছিল ; কারণ, মনুর কন্যা ইলার সঙ্গে তারার অপহরণকারী সোম বা চন্দ্রের পুত্র বুধের বিবাহ সূত্রে চন্দ্র এবং মনু সমকালীন। যদিও মনুকে অবলম্বন করেই এই মন্বন্তরের আরম্ভ কিন্তু মনুর পিতা বিবস্বতের অস্তিত্ব ও ক্রিয়াকলাপের কিছু বিবরণ ঋগ্বেদে উল্লেখ থাকায় পূর্ববর্তী মন্বন্তর থেকে এই মন্বন্তরকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার কোন প্রাকৃতিক বা অন্য কোন কারণের উল্লেখ পুরাণ সাহিত্যে পাওয়া যায় না। দ্বাপরযুগের অবসান ও কলিযুগের আরম্ভও যেমন কোন বিশিষ্ট ঘটনা দ্বারা নির্দিষ্ট ছিল না, মন্বন্তরের বিবর্তনও তেমনি সুস্পষ্ট কোন বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নির্দেশিত ছিল না। তবে ঋগ্বেদকে যদি পরবর্তী সকল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির আদি উৎস বলে গণ্য করা যায় তবে বৈবস্বত মনুর পূর্ববর্তী কোন ইতিবৃত্তকে সেখানে বিশেষ কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। বৈবস্বত মনুতেই এই বৈদিক বিবরণ ধারার প্রারম্ভ। পুরাণের মতে চাক্ষুষ মন্বন্তরের বিকুণ্ঠার গর্ভজাত বৈকুণ্ঠ নামে পরিচিত দেবতারা বৈবস্বত মন্বন্তরে মহর্ষি কাশ্যপ জায়া অদিতির গর্ভে জাত হয়ে আদিত্য নামে পরিচিত হবেন, আর এই আদিত্য দেবতাদেরই পুরোগামী হবেন বিষ্ণু। এ ছাড়া রুদ্র এবং বসু নামে দেবতারাও এই মন্বন্তরে দেবতারূপে উপাসিত হবেন। অদিতিগর্ভজাত বিষ্ণু বামনরূপে তিন পদক্ষেপে সমস্ত লোক জয় করে সেই বিজিত তিন লোকে পুরন্দর নামে পরিচিত এই মন্বন্তরের ইন্দ্রকে নিষ্কণ্টকভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। ঘটনার পারম্পর্য সম্পর্কে এই-সব বিবরণ ভবিষ্যৎবাণীর মত পুরাণে বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণ মতে সর্বকালের সমস্ত কিছুরই আধার সেই বিষ্ণু—যে বিষ্ণুশব্দ প্রবেশ অর্থে বিশ্ ধাতু থেকে উৎপন্ন। (যস্মাদ্বিষ্টমিদং বিশ্বং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ। তস্মাৎস প্রোচ্যতে বিষ্ণু-র্বিশের্ধাতোঃ প্রবেশনাৎ ॥)[১] পুরাণমতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব, দেবতাদের মধ্যে এই তিনজনই প্রধান বলে অভিহিত হলেও আসলে এই তিন দেবতা ভগবান বিষ্ণুরই ত্রিবিধ রূপ ; বিষ্ণুই অচিন্ত্য, অনন্ত, সর্বাত্মক ও সর্বশ্রেষ্ঠ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে পূর্বতন মন্বন্তরের দেবতাদেরও সেই সর্বাত্মক এক ও অনন্য মহাশক্তির অংশরূপে গণ্য করা হয়ে থাকলেও সেইসব দেবতাদের মধ্যে কোন দেবতাই

প্রত্যক্ষভাবে বিষ্ণুনামে আখ্যাত হননি। ভগবান বিষ্ণু একান্তভাবেই বৈবস্বত মন্বন্তরের দেবতা, আদিত্যাদের অগ্রণী এবং তিন পদক্ষেপে তিন লোককে আবৃত করে বামনরূপী এই বিষ্ণু ইন্দ্রকে এই ত্রিলোকের অধীশ্বরত্বে অধিষ্ঠিত করেছিলেন।

ভগবান বিষ্ণু নামে এই দেবতার উদ্ভব ও স্বীকৃতিলাভের এই পৌরাণিক বিবরণের সমর্থন ঋগ্বেদ ও ঋগ্বেদোত্তর যুগে উদ্ভূত শাস্ত্রগ্রন্থেও পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর উল্লেখ সীমিত। দেবতাদের উল্লেখের বিশ্লেষণকারীদের মতে সর্বসুদ্ধ একশতবার ঋগ্বেদে বিষ্ণুর উল্লেখ আছে; এই সমস্ত উল্লেখের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশেষত্বপূর্ণ উল্লেখ বৃত্রকে পরাজিত ও নিহত করার জন্য ইন্দ্র কর্তৃক বিষ্ণুর সহায়তা প্রার্থনা (৪।১৮:১১ ; ৮।১২:২৬)। ঋগ্বেদ বেশ কয়েকবারই বিষ্ণুর সঙ্গে ইন্দ্রের কথা এমনভাবে উল্লেখ করেছে যা থেকে বিষ্ণুর উপর ইন্দ্রের নিভরশীলতার কথা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হয়। বিষ্ণুর উপর ইন্দ্রের এই নির্ভরশীলতা ছাড়া ঋগ্বেদে দেবতা হিসেবে বিষ্ণুর আর তেমন কোন বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। অবশ্য বিষ্ণুর তৃতীয় পদের উল্লেখ, (পরমপদ—ঋ ১।১৫৪:২ ; ১।২২:২০) এবং তাঁর উরুক্রম এবং উরুগায় ইত্যাদি আখ্যা তাঁর এই ত্রিপদ পরিক্রমণ প্রসঙ্গেরই পরিচায়ক যা নিয়ে বেদব্যাখ্যাতাদের মধ্যে, বিশেষ জল্পনা-কল্পনা হয়েছে, কিন্তু কোন নিশ্চিত সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। অনেকে বিষ্ণুর এই ত্রিপদ বিচরণ নভোমণ্ডলে সূর্যের উদয়, মধ্যাহ্নে আকাশের শীর্ষস্থানে আগমন ও সায়াহ্নে পশ্চিম আকাশে অস্তমিত হওয়া বলে ব্যাখ্যা করেছেন। (ঔর্ণভাবের এই ব্যাখ্যা যাস্ক তাঁর নিরুক্তে উল্লেখ করেছেন—১২।১৯) অন্যেরা বিষ্ণুর এই ত্রিপদ বিচরণকে তাবৎ সৃষ্টির পরিক্রমণ বলে অভিহিত করতে আগ্রহী। এই ত্রিপদ বিস্তারের অধিকতর পরিণত পরিচয় অথর্ববেদ (৬।৫:৭) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (১।২:৫) পাওয়া যায়। অথর্ববেদে আছে যে ইন্দ্র এবং বিষ্ণু অসুরদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হলে আপোসে সিদ্ধান্ত হয় যে বিষ্ণু তাঁর তিন পদক্ষেপে যতটুকু জমি অতিক্রম করবেন ততটুকুই হবে ঐ দুই দেবতার অংশ। কিন্তু বিষ্ণু তাঁর তিন পদক্ষেপে ত্রিজগৎ, বেদ ও বাচকে অতিক্রম করে সবকিছুর ওপর তাঁদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। শতপথ ব্রাহ্মণের বিবরণ এই প্রসঙ্গে আরও বিশদ ও উল্লেখযোগ্য। এখানে বিষ্ণুকে যজ্ঞ এবং বামন আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[২] অসুররা এক দ্বন্দ্বে দেবতাদের পরাভূত করে তাবৎ পৃথিবী নিজেদের মধ্যে বণ্টন

করে নিতে উদ্যত হলে দেবতারা তাদের অনুরোধ জানান যে ঐ বামনরূপী বিষ্ণু তাঁর দেহ বিস্তৃত করে যতখানি পরিধি আবৃত করতে পারবেন ততটুকু পেলেই তাঁরা সন্তুষ্ট হবেন। অসুররা এই প্রতিবেদনে স্বীকৃত হলে দেবতারা যজ্ঞরূপী বিষ্ণুর সঙ্গে যজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়ে সমস্ত জগতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। এই বিবরণে বিষ্ণুর তৃতীয় পদক্ষেপের উল্লেখ নাই কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণেরই অন্য এক অংশে উল্লেখ আছে দেবতাদের তাবৎ আধিপত্যই বিষ্ণু ত্রিলোকের উপর তাঁর তিনপদ বিস্তারের দ্বারা অধিকার করে পাইয়ে দিয়েছিলেন।[৩] তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও বামনরূপী বিষ্ণুর ত্রিলোকের উপর আধিপত্য বিস্তারের উল্লেখ আছে।[৪] বৈদিক সাহিত্যের এইসব বিবরণে ইন্দ্র এবং বিষ্ণুর উল্লেখ থাকলেও অসুরদের অধিপতি বা নেতার কোন নামের উল্লেখ নাই। পুরাণ সাহিত্যে সোজাসুজি বামনরূপী বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমের দ্বারা ত্রিলোক জয় করে এই ত্রিলোকের আধিপত্য ইন্দ্রকে দান করবার উল্লেখ আছে।[৫] এই প্রসঙ্গে মহাভারত কাহিনীতে কিভাবে বামনরূপী বিষ্ণুর দৈত্যপতি বলির নিকট থেকে ত্রিজগতের অধিকারলাভ ঘটেছিল, তার বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।[৬] বৈদিক সাহিত্যে বহুবার বিষ্ণুর এই তৃতীয় পদ বা পদবিস্তারের প্রসঙ্গ আছে। এই তৃতীয় পদ এবং সেই ত্রিপদের দ্বারা ত্রিলোক আবৃত করা বা জয় করা বা অধিকার করা, বিভিন্ন দেবতার মধ্যে একমাত্র বিষ্ণুরই বৈশিষ্ট্য। যদিও ঋগ্বেদে এই পদবিস্তারের কিছু উল্লেখ আছে কিন্তু এই ঘটনার উপর ঋগ্বেদে তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এমন মনে হয় না। যজ্ঞের প্রাধান্য ঋগ্বেদে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই যজ্ঞ অবশ্য সেই যজ্ঞ যা প্রথম মনু কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়েছিল (১।৭৬:৫ ; ১০।৬৩:৭)। ঋগ্বেদে যজ্ঞকে বিষ্ণুর সঙ্গে এক করা হয় নাই। ব্রাহ্মণ সাহিত্যে, বিশেষ করে শতপথ ব্রাহ্মণেই প্রথম যজ্ঞ ও বিষ্ণুকে এক ও অভিন্ন বলে উল্লেখ পাওয়া গেল।[৭] এই শতপথ ব্রাহ্মণে বিষ্ণুকে যেভাবে দেবতাদের মধ্যে প্রধান বলে আখ্যাত করা হয়েছে[৮] তারই প্রতিধ্বনি দেখা যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, যেখানে দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করা হল দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণুই প্রধান।[৯] ঋগ্বেদে বিষ্ণুর তেমন গুরুত্বের অভাব এবং দেবতা হিসেবে অন্যান্য প্রধান দেবতাদের সঙ্গে বিষ্ণুর বিভিন্নতা ইত্যাদি নানা লক্ষণ বিচার করে ভারতে অনার্য বা প্রাক্-আর্য সংস্কৃতি থেকে বহিরাগত আর্যেরা বিষ্ণুকে গ্রহণ করেছিল এই কল্পনার প্রথম প্রচলন করেন জার্মান পণ্ডিত রুবেন

তাঁর Eisenschmiede und Damonen in Indien নামক পুস্তকে। ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে যে সর্বলোকোত্তর অনন্ত সত্তার দার্শনিক পরিকল্পনা আত্মপ্রকাশ করেছিল, বৈদিক সংস্কৃতিতে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উপলব্ধি খুঁজে না পেয়েই কিছু পাশ্চাত্য পণ্ডিত হয়ত এইধরনের কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভগবান বিষ্ণু বা পরবর্তীকালে বাসুদেব কৃষ্ণ সম্পর্কে এই আর্যবহির্ভূত সমাজের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসের মূলে কল্পনা ভিন্ন কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য আছে বলে প্রতীয়মান হয় না। একটা সময়ে বিষ্ণুর ক্রমবর্ধমান প্রাধান্য ভগবান বিষ্ণুর যজ্ঞের সঙ্গে সমাত্মকতা থেকেই গড়ে উঠেছিল। যজ্ঞের মূল সহায়ক ছিলেন অগ্নি ; এই অগ্নির যে একসময়ে বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল ঋগ্বেদে অগ্নির ব্যাপক স্তুতি ও বহু উল্লেখই তার প্রমাণ। স্বভাবতই অগ্নি যখন প্রথম প্রজ্জ্বালিত হয়েছিল তখন যে-বিস্ময় মানুষের মনে জন্মেছিল তা থেকেই অগ্নির প্রতি আকর্ষণ ও ভক্তির উদ্ভব ঘটেছিল সন্দেহ নাই। গৃহজীবনে আগুনের ব্যবহার ছিল সভ্যতার পথে এক বৃহৎ পদক্ষেপ। পরে প্রযুক্তিবিদ্যার নানা ক্ষেত্রে, মৃৎপাত্রকে ব্যবহারোপযোগী করতে, ধাতুকে ইচ্ছামত আকৃতিতে আনতে, গৃহনির্মাণের ইটকে পুড়িয়ে নিতে আগুনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হল। কিন্তু বৈদিক সমাজে আগুনের আর একটি ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হল যজ্ঞ ক্রিয়ায়। আগুনে দেওয়া অনেক দ্রব্যের নিঃশেষে বিলুপ্তি ঘটে, অন্য কোন-ভাবেই কোন জিনিসের এভাবে বিলুপ্তি ঘটে না। বিস্ময়কর এই ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যই অগ্নিকে দেবতায় পরিণত করেছিল। অগ্নিতে প্রদত্ত দ্রব্যসামগ্রীর বিলুপ্তির পর সেইসব দ্রব্য কোথায় যায় ? ঐসব দ্রব্য অগ্নি বহন করে নিয়ে যায়। বৈদিক সমাজের মানুষ যখন আরাধ্য দেবতার উদ্দেশে কোন কিছু সমর্পণের অভিলাষ করেছিল তখন অগ্নিকে দেবতার উদ্দেশে অর্পণীয় দ্রব্যের বাহনরূপে কেবল কল্পনাই করল না, প্রত্যক্ষভাবেই অগ্নিকে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করল, অগ্নি পরিগণিত হলেন তাবৎ দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত আহুতির বাহনরূপে। এই সূত্রেই অগ্নিকে অভিহিত করা হল দেবতাদের মুখ এবং জিহ্বারূপে, যার মাধ্যমে দেবতারা যজ্ঞীয় হব্য আহার করেন।[১০] স্বাভাবিকভাবে শুকনো কাঠে পাতায় ঘর্ষণের ফলে অরণ্যপথে দাবানলের বিস্তার ঘটে এবং এই দাবানলেই মানুষের সঙ্গে আগুনের প্রথম পরিচয়। প্রথমে মানুষ হয়ত দু'টি চকমকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাতে সক্ষম হয়েছিল। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের দ্বারা দু'টি

পাথরের সাহায্যে আগুন জ্বালানোর উল্লেখ আছে। (২।১২:৩) কিন্তু দু'টি অরণি কাঠের ঘর্ষণে অগ্নিসৃষ্টিই ছিল বৈদিক সভ্যতার এক বিশেষ আবিষ্কার। এক-সময় প্রত্যহ প্রভাতে দুই অরণির সাহায্যে আগুন জ্বালিয়ে নেওয়া গৃহস্থমাত্রেরই ছিল অবশ্যকর্তব্য (ঋ ৩।২৯:২ ; ৬।২৩:২-৩ ; ৭।১:১ ; ১০।৭:৯)। এইভাবে উৎপাদিত অগ্নিই গণ্য হত পবিত্র এবং যজ্ঞকর্মে বিধেয়। আর এই অগ্নি দ্বারাই যজ্ঞক্রিয়া প্রথম সম্পাদিত হয়েছিল (৩।১৫:৪)। অরণ্যে সম্ভূত স্বাভাবিক দাবানল দেখেই হয়ত উপলব্ধি হয়েছিল যে গাছ কাঠেই আগুনের অধিষ্ঠান (৬।৩:১ ; ১০।৭৯:৭)। ভৃগু মহর্ষি বলে স্বীকৃত হলেও তাঁর পুত্র উশনস (অর্থাৎ শুক্র) অসুরদের গুরু নামেই পরিচিত। আর যে অগ্নি মাতরিশ্বান ও বিবস্বতের নিকট আবির্ভূত হয়েছিলেন (১।৩১:৩), সেই অগ্নিই বৈবস্বত মনুর যজ্ঞেব মাধ্যমরূপে যজ্ঞবাদী সমাজে পরিগৃহীত হয়েছিলেন। দেবানুগামী সমাজের সঙ্গে অসুরানুগামী সমাজের বিরোধের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল অসুরদের মনু প্রবর্তিত যজ্ঞের বিরোধিতা। অসুররাও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত ; জরথুস্ত্র প্রবর্তিত অহুর-মাজদা উপাসক সমাজে যজ্ঞ যশ্ন নামে পরিচিত ছিল।[১১] পুরাণে রাজা বেনকে যজ্ঞ, দান এবং হবনের প্রবল বিরোধীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই যজ্ঞবিরোধিতার জন্যই বেনের মৃত্যু ঘটেছিল। বেনপুত্র পৃথুকে কিন্তু যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা বলেই বর্ণনা করা হয়েছে।[১২] এই পৃথুর যে যজ্ঞবাদী সমাজে বিশেষ প্রভাব জন্মেছিল, পৃথুর নাম থেকেই পৃথিবী নামের উৎপত্তি হয়েছিল এই স্বীকৃতি থেকে তা বোঝা যায়। মহর্ষি ভৃগু দ্বারা যজ্ঞের প্রবর্তন হয়ে থাকলেও বিবস্বত এবং মনু যে-যজ্ঞের প্রবর্তন করেছিলেন সেই যজ্ঞ ভৃগু প্রবর্তিত যজ্ঞ থেকে নিশ্চিতই ছিল ভিন্নপ্রকারের। অসুররাজ বিরোচনের পুত্র বলি পৃথিবী জয়ের পর এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং এই যজ্ঞ উপলক্ষেই বামনরূপী ব্রাহ্মণবেশধারী বিষ্ণু ত্রিপাদ ভূমি দানরূপে চেয়েছিলেন এবং গুরু শুক্রের বিরোধিতা সত্ত্বেও অসুরসম্রাট বলি কর্তৃক সেই দান প্রদত্ত হয়েছিল ; বামন বিষ্ণু তাঁর দুই পদক্ষেপে স্বর্গ এবং মর্ত্য অধিকার করে তৃতীয় পদ বলির মস্তকে স্থাপন করে তাকে পাতালে প্রেরণ করেছিলেন। ত্রিপদ বিস্তারের দ্বারা (অথর্ব ৬।১৫) বা আপন শরীর বিস্তারের দ্বারা (শতপথ ১।২:৫) সমগ্র ত্রিলোকের উপর আধিপত্যলাভের যে কাহিনী বিভিন্ন বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়, সেখানে অসুরদের অধিপতির নামের উল্লেখ না থাকলেও পুরাণবর্ণিত রাজা বিরোচনের

পুত্র মহাপরাক্রান্ত বলিই যে সেই বামনরূপী বিষ্ণুর দ্বারা বিড়ম্বিত ও অন্তগৃহীত অসুররাজ, প্রচলিত এই ধারণার মূল সেইখানেই নিহিত ছিল সন্দেহ নাই।

পুরাণের পরম্পরা বিচারে কালানুগত্য প্রতিষ্ঠা একান্ত দুরূহ। অনেক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধিতা ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পুরাণে প্রদত্ত তথ্যের ব্যবহারকে কষ্টসাধ্য করে তোলে। তবে স্মরণ রাখা যেতে পারে যে পুরাণগুলি এবং রামায়ণ, মহাভারত যখন বর্তমান রূপে গ্রন্থবদ্ধ হয়, এইসব গ্রন্থে বর্ণিত অতীতের ঘটনাগুলি সেইসব গ্রন্থ রচিত হওয়ার কয়েক হাজার বছর পূর্বেকার ঘটনা। সেই সুদীর্ঘকাল কিভাবে ঐসব ঘটনাগুলির ইতিবৃত্ত রক্ষিত হয়েছিল তা জানা যায় না। বেদে উল্লিখিত নারাশংসী এবং গাথা সম্বন্ধে যেসব উল্লেখ আছে এবং পুরাণে সূত ও মাগধদের সম্বন্ধে যা জানা যায় তা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, পুরাণকারেরা ঐসব উপকরণের উপরই নির্ভরশীল ছিলেন। পুরাণের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে আঠারখানি পুরাণকে প্রধান বলে গণ্য করা হয়। এইসব পুরাণের মধ্যে বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ দু'টি হয়ত প্রাচীনতম এবং অন্যান্য পুরাণের মধ্যে ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত হয়ত অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে সংকলিত। ভাষায় এবং রচনার বিন্যাসে যথেষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকলেও এইসব পুরাণে বিধৃত ঘটনার বিবরণসমূহ প্রায় একই প্রকার। এই সমস্ত বিবরণের সঙ্গে বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত বিভিন্ন ব্যক্তি ও ঘটনার নৈকট্য বিচার করলে পুরাণের বিবরণগুলিকে একেবারে কাল্পনিক বলে খারিজ করে দেওয়া যায় না। ঋগ্বেদ-গ্রন্থে বৈবস্বত মনুর কালের পূর্বের কোন ঘটনার উল্লেখ বড় একটা নাই। পুরাণকারদের বিবেচনামতে বৈবস্বত মনু সপ্তম মন্বন্তরের মনু। এই মনুর বংশ-পরম্পরাই পুরাণের প্রধান উপজীব্য হলেও পূর্বতর মন্বন্তরসমূহের পারম্পর্যেরও কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ পুরাণগুলিতে দেবার প্রয়াস আছে। প্রথম মন্বন্তরের স্বায়ম্ভুব মনুর সন্তান পরম্পরা অবলম্বন করেই এই সপ্তম মন্বন্তরে এসে উপনীত হওয়া যায়। এই মন্বন্তরের আদিপুরুষ বৈবস্বত মনুর আবির্ভাবের প্রাক্কালে পরিস্থিতির যে বিবরণ আছে তার মধ্যে কল্পনার সংমিশ্রণ থাকলেও কিছু পরিমাণে পারম্পর্য বিধান করা অসম্ভব নয়। প্রতি মন্বন্তরেই সেই মন্বন্তরের দেবতা, ঋষি, ইন্দ্র ও মনুর বিবরণ পাওয়া যায়। সপ্তম মন্বন্তরের মনু বৈবস্বত, ইন্দ্র:পুরন্দর, আদিত্য, রুদ্র ও বসু এই তিনবর্গের দেবতা ও বশিষ্ঠ, কাশ্যপ.আদি ঋষি এবং মনুর পুত্রেরা পৃথিবীর অধীশ্বর ছিলেন।

যদিও বিবস্বতের পুত্র মনুর সূত্রেই এই মন্বন্তরের প্রসার, তা হলেও বিবস্বতকে এই মন্বন্তরের অন্যতম আদিত্যদেবতা হিসেবেই পুরাণকারেরা বিহিত করেছেন। দেবতারাও মাতৃগর্ভজাত এবং এই সপ্তম মন্বন্তরে ঋষি কশ্যপের পত্নী দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যদেবতার জন্ম হয়। এই দ্বাদশ আদিত্য যথাক্রমে বামনরূপী বিষ্ণু, ইন্দ্র, অর্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পুষা, বিবস্বান, সবিতা, মৈত্র, বরুণ, অংশু ও ভগ।[১৩] পুরাণোক্ত এইসব আদিত্যদেবতার মধ্যে ঋগ্বেদে কোথাও মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, অংশ ও দক্ষ এই ছ'জনকে (২।২৭:১), কোথাও সাত, আবার কোথাও আটজন আদিত্যের উল্লেখ করা হয়েছে (৯।১১৪:৩ ; ১০।৭২:৮)। অথর্ববেদ মতে আদিত্যদেবতার সংখ্যা আট, যার মধ্যে দক্ষের উল্লেখ নাই এবং ধাতা, ইন্দ্র এবং বিবস্বতকে আদিত্য হিসেবে ধরা হয়েছে (অথর্ব ৮।৯:২১)। শতপথ ব্রাহ্মণে আদিত্যদেব সংখ্যা বার এবং তাদের এই ব্রাহ্মণে বৎসরের দ্বাদশ মাসের অধিপতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। (শত ৬।১।২:৮; ১১।৬।৩:৮)। স্বভাবতই মনে হয় পুরাণকর্তারা শতপথ ব্রাহ্মণে নির্দিষ্ট দ্বাদশ আদিত্য গ্রহণ করায় এই ব্রাহ্মণের যুগেই আদিত্যদেবতা সম্পর্কিত ধারণা সুনির্দিষ্ট রূপলাভ করেছিল।

অথর্ববেদে আদিত্যদেবতাদের নামের উল্লেখ না থাকলেও তাদের সংখ্যা বলা হয়েছে আট (৮।৯:২১) ; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে যে আটজন আদিত্যদেবতার নাম আছে তাতেও বিষ্ণুর নাম নাই (১।১।৯:১)। অতএব নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, শতপথ ব্রাহ্মণ রচিত হবার পূর্বে কোন সময়ে বিষ্ণু আদিত্যরূপে গৃহীত হয়েছিলেন এবং যজ্ঞের সঙ্গে অভিন্ন গণ্য হয়েছিলেন। এই শতপথ ব্রাহ্মণেই উল্লেখ আছে যে অসুররা যখন সমস্ত পৃথিবী নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিচ্ছিল, তখন দেবতারা যজ্ঞরূপী বিষ্ণুকে পুরোভাগে নিয়ে অসুরদের কাছে এসে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যে বামনাকৃতি বিষ্ণু শয়ন করলে যতটা জমি আবৃত হবে তাদের ততটাই জমি দেওয়া হোক।[১৪] অসুরেরা এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হলে যজ্ঞরূপী বিষ্ণু সমগ্র পৃথিবীব্যাপী নিজেকে বিস্তৃত করে তার অধিকারলাভ করেছিলেন। এই ব্রাহ্মণে অসুরদের কোন অধিপতির উল্লেখ না থাকলেও পুরাণে বিষ্ণুর বামন রূপে অদিতির গর্ভে জন্ম ও তাঁর অসুররাজ বলির নিকট থেকে ত্রিলোক জয় করে ইন্দ্রকে তার উপর অধিষ্ঠিত করবার বিবরণ থেকে শতপথ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বর্ণিত ঘটনা যে বিষ্ণু কর্তৃক বলির নিকট থেকে রাজ্য অধিকারের ঘটনা,

এ বিষয়ে দ্বিধার কোন কারণ থাকে না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বামনরূপী বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপে ত্রিলোক আবৃত করার উল্লেখ থাকলেও শতপথ ব্রাহ্মণে কিন্তু উল্লেখ আছে যে বামনরূপী বিষ্ণু যজ্ঞরূপে সমগ্র পৃথিবী আবৃত করেছিলেন এবং এই পৃথিবীর উপর আধিপত্যলাভ করেছিলেন।

বামনরূপী বিষ্ণু এবং যজ্ঞের একত্ব ও অভিন্নত্ব এবং ত্রিলোকের পরিবর্তে কেবলমাত্র পৃথিবীর উপর তার বিস্তৃতির যে উল্লেখ শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায়, বিষ্ণুর দেবতারূপে প্রাধান্যলাভের ক্ষেত্রে তার সবিশেষ গুরুত্ব আছে বলে মনে হয়। যজ্ঞের ব্যাপক অনুষ্ঠানের উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের যুগে যজ্ঞ অভীষ্ট দেবতাদের উদ্দেশে প্রদত্ত হব্য-কব্য পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমরূপেই গণ্য হত। যজ্ঞের অন্তর্নিহিত কোন গভীর সংবেদন, দার্শনিক তাৎপর্য বা বিশেষত্ব সে যুগে গড়ে উঠেছিল এমন প্রমাণ পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু ক্রমে সেই যজ্ঞবাদী সমাজে যজ্ঞ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক তাৎপর্যের আধাররূপে পরিগণিত হয়েছিল। যজ্ঞের এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দার্শনিক মাহাত্ম্যই শেষপর্যন্ত যজ্ঞকে সর্ব-বিস্তারী, সর্বলোকপ্রাণ, অচ্যুত, অনন্ত বিষ্ণুর সঙ্গে এক ও অভিন্ন করে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর পরমপদকে বলা হয়েছে পুণ্যবান মানুষের অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত আশ্রয় বা স্বর্গ (১।১৫৪:৫)। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের যিনি পুরুষ (১০।৯০:১৩) পরবর্তী যুগে তিনিই বিষ্ণুর সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলে গণ্য হয়েছিলেন (পুরুষঃ স পরং পার্থ—গীতা ৮/২২)। বিষ্ণুর এই সর্বাত্মকতার বীজ ঋগ্বেদেই উপ্ত ছিল কিন্তু সকল দেবতাকে অতিক্রম করে তাঁকে এই সর্বাত্মক বৈশিষ্ট্যে সংস্থাপিত করবার যে গভীর জিজ্ঞাসা ও চিন্তাকল্পনা ভারতীয় মনীষায় গড়ে উঠেছিল, সেই বিবর্তনের রূপরেখা নিশ্চিতভাবে কোথাও তুলে ধরা হয়নি। ব্রাহ্মণের যুগেই এই বিবর্তন যে অনেকটা পরিণতি লাভ করেছিল তা বেশ লক্ষ্য করা যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণুকেই প্রধান বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১৫] শতপথেও বিষ্ণুর প্রাধান্য অর্জনের কাহিনী বর্ণিত আছে।[১৬] শতপথ ব্রাহ্মণে এই কাহিনীর অঙ্গরূপেই এমূষ নামে এক বরাহের গভীর বারিরাশিতে নিমজ্জিত পৃথিবীকে উদ্ধারের বর্ণনা আছে।[১৭] এই এমূষ নামে বরাহের উল্লেখ ঋগ্বেদেও আছে। সেখানে এই এমূষ বৃত্রেরই একটি রূপ, যাকে ইন্দ্র শরনিক্ষেপ করে নিধন করেছিলেন। তৈত্তিরীয় সংহিতায় এই এমূষ-ইন্দ্র সঙ্ঘর্ষের কিছু বিস্তৃততর বিবরণ পাওয়া যায় (৬।২।৪:২-৩)।

এখানে বর্ণিত আছে যে এমূষ অসুরদের সম্পদ এক পর্বতের অন্তরালে লুকিয়ে রাখলে, ইন্দ্র একগুচ্ছ কুশ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে সেই এমূষকে নিধন করেন। যজ্ঞরূপী বিষ্ণু সেই বরাহকে দেবতাদের জন্য আহরণ করে আনেন, ফলে দেবতাদের দ্বারা অসুরদের সম্পদের অধিকারলাভ ঘটল। শতপথ ব্রাহ্মণে এই বরাহকে বলা হয়েছে এমূষ, যিনি পৃথিবীকে জলরাশি থেকে উদ্ধার করেছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণের মতে এই উদ্ধারকর্তা বরাহ ছিলেন প্রজাপতিরই এক রূপ এবং পৃথিবীকে উদ্ধার করে তিনি পৃথিবীর ভর্তা বা স্বামীরূপে গণ্য হয়েছিলেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মতে এক কৃষ্ণবর্ণের বরাহ তাঁর সহস্র হাতের সাহায্যে পৃথিবীকে উত্তোলন করেছিলেন (১।১০:৮ ; ১০।১:৮)। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের মতে প্রজাপতিই বরাহের আকার ধারণ করে গভীর জলের তলা থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করে আনেন (১।১।৩:৫)। রামায়ণেও বর্ণিত আছে যে প্রজাপতিই বরাহরূপ ধারণ করে জলের তলা থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন (২।১১০:৩)। বৈষ্ণবীয় পুরাণসমূহে পৃথিবী উদ্ধারকারী এই বরাহের কাহিনীর যেমন জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি এই বরাহকে সেখানে ভগবান বিষ্ণুরই একটি রূপ বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১৮] এবং এই ঘটনার পরিণতিতেই পৃথিবী বা ভূমি বিষ্ণুর অন্যতম পত্নীরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। আর পুরাণকাহিনীতে এরই সূত্র ধরে পৃথিবী ও বিষ্ণুর ঘনিষ্ঠতার ফলে নরক নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত অসুরের জন্মের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৯] বরাহরূপী বিষ্ণুর পৃথিবী উদ্ধারঘটিত এই কাহিনী সুদূর যবদ্বীপ (বর্তমান ইন্দোনেশিয়া) (ভোমকাব্য ২।১:৯, Old Javanese Bhomakawya, tr. by A. Teeuw) এবং মালয় উপদ্বীপেও প্রসারলাভ করেছিল।

ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে পরবর্তী রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের বর্ণনায়ও এই কাহিনীর জনপ্রিয়তা ও শিল্পে বরাহ অবতারের মূর্তির ব্যাপক রূপায়ণ থেকে বরাহঘটিত এই কাহিনীকে যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল তা উপলব্ধি করা যায়। ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন গ্রন্থে এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বরাহ সম্পর্কে পরম্পরাগত যেসব উল্লেখ পাওয়া যায় তা যেমন কৌতূহলজনক তেমনি রহস্যপূর্ণ। ঋগ্বেদে এই ভয়ানক বরাহের নাম এমূষ, যাকে বৃত্রেরই নামান্তর বলে বলা হয়েছে। বৃত্রের ঋগ্বেদে প্রচলিত নাম অহি ; তবে আবার তাকে বরাহ বলা হচ্ছে কেন ? অহি বা সর্পের মত বরাহও যে একসময় 'টোটেম' বলে পূজিত হত,

হরপ্পার বহু শিল মুদ্রা থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। এখনও উপজাতীয় গোন্দ সমাজে শুয়োর বলি দেওয়ার, এবং খয়রাদের মধ্যে তাদের দেবতা খোরিয়াকে শুয়োর রূপধারী বলে বিশ্বাস প্রচলিত আছে। আর সাঁওতালদের মধ্যে শুয়োরের সঙ্গে কৃষিকর্মের যোগ সম্পর্কে বিশ্বাস অত্যন্ত ব্যাপক। ইন্দ্রের দ্বারা পরিচালিত সম্প্রদায়ের অহি বা সর্প-উপাসকদের সঙ্গে যেমন দ্বন্দ্ব ছিল, বরাহ বা শুয়োর-উপাসকদের সঙ্গেও তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। এমনও হতে পারে যে ঋগ্বেদে যাদের বৃত্র বলা হয়েছে তাদের মধ্যে সর্প এবং বরাহ এই উভয়েরই উপাসনা প্রচলিত ছিল। এমুষ বা অমূষ শব্দের সংস্কৃত ধাতুগত কোন উৎপত্তি-বিধান করা যায় না; শব্দটি অসংস্কৃত বিধায় অনেকেই একে অনার্য-উদ্ভূত বলে গণ্য করেছেন। বরাহরূপী এমূষ সাতটি পর্বতের অন্তধারে অসুরদের সম্পদ পাহারা দিত। একসময় বিষ্ণু দেবতাদের পরিত্যাগ করে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন। এই সময় অসুরদের সম্পদরক্ষাকারী এমুষ বরাহকে ইন্দ্র নিহত করেন এবং সেই বরাহকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বিষ্ণুকে অনুরোধ করেন। যজ্ঞরূপী বিষ্ণু সেই বরাহকে যেমন নিয়ে এলেন তেমনি অসুরদের ধন-সম্পদও আহরণ করে আনলেন। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বর্ণিত এই বিবরণের উপসংহারে একথাও বলা আছে যে পৃথিবী অসুরদের অধিকারেই ছিল, পরে দেবতাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় (৬।২।৪:২-)। মৈত্রায়ণী এবং কঠক সংহিতায় বিষ্ণুর উল্লেখ নাই (মৈত্রায়ণী ৩।৮:৩ ; ২৫:২)। এই উভয় সংহিতায় উল্লিখিত আছে যে যজ্ঞ দেবতাদের সঙ্গে ছিলেন না, স্বতন্ত্র ছিলেন ; ইন্দ্র যজ্ঞের সাক্ষাৎ পেলে সেই বরাহকে হত্যা করতে তাঁকে অনুরোধ করেন। শতপথ ব্রাহ্মণের মতে কিন্তু এমুষ নামের বরাহই গভীর জল থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন ; এখানে এমূষকে প্রজাপতিরই অন্য রূপ বলা হয়েছে। এইসব তথ্য থেকে মূল রহস্যের উদ্ঘাটন দুরূহ হলেও, এইসব কাহিনীর অন্তর্বর্তী কয়েকটি ইঙ্গিত খুবই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমত এমুষরূপী বরাহের সঙ্গে বিষ্ণুর নিকট সান্নিধ্য, বিষ্ণু কর্তৃক দেবতাদের পরিত্যাগ করে পৃথিবীতে প্রবেশ, যজ্ঞের সঙ্গে দেবতাদের পূর্বে সম্পর্কের অভাব, ইন্দ্র কর্তৃক যজ্ঞের সঙ্গে পরিচয় ও যজ্ঞকে সাহায্যার্থে আহ্বান, বরাহরূপী বিষ্ণু ও যজ্ঞের এক ও অভিন্নতা, সর্বশেষে বরাহ কর্তৃক জলমগ্ন পৃথিবীর উদ্ধার এবং এই বরাহ ও বিষ্ণুর এক ও অভিন্নরূপে পরিগণিত হওয়া।

এখানে যে-সব তথ্যের উল্লেখ করা হল তা থেকে বিষ্ণুর সম্বন্ধে কিছু অনুমান

করার চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রথমেই লক্ষ্য করা যায় যে অন্যান্য যে-সব প্রধান দেবতার উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে, অসুর নামে পরিচিত সেইসব দেবতার সঙ্গে বিষ্ণুর সান্নিধ্য খুবই কম, ঋগ্বেদে বিষ্ণু কোথাও অসুর আখ্যায় অভিহিত হননি। এ ছাড়া ঋগ্বেদে বিষ্ণুর আদিত্য পরিচয়ও নাই। মৈত্রায়ণী সংহিতায় উল্লেখ আছে যে অতীতে দেবতাদের সঙ্গে যজ্ঞের কোন সম্বন্ধ ছিল না; ইন্দ্রের সঙ্গে যজ্ঞের সাক্ষাৎ হলে ইন্দ্র যজ্ঞকে অনুরোধ করেন বরাহকে বধ করতে। এখানে বিষ্ণুর উল্লেখ নাই কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতায় ইন্দ্রের অনুরোধে বরাহের নিধন-কারী যজ্ঞকে বিষ্ণু নামেই অভিহিত করা হয়েছে। এখানেও উল্লেখ আছে যে বিষ্ণু এই বরাহবধের প্রাক্কালে দেবতাদের সঙ্গে ছিলেন না (তৈত্তিরীয় সং ৬।২।৪:২-)। সেইসঙ্গে ঋগ্বেদে এমুষমকে বলা হয়েছে 'বৃত্র' আর ইন্দ্র দ্বারা নিহত হওয়ার পর বিষ্ণু সেই এমুষকে দেবতাদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। ইন্দ্র বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা এবং এই যজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারাই তিনি ইন্দ্রত্ব-লাভ করেছিলেন। সেইসঙ্গে একথাও উল্লেখ করা যেতে পারে যে বৃত্রকে পরাভূত ও নিহত করতে ইন্দ্রের প্রধান নির্ভর ছিলেন বিষ্ণু। এইসব তথ্য আলোচনা করলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে যে ইন্দ্রের পরমনির্ভর এই বিষ্ণুর আরাধনা কি ইন্দ্র যে সমাজে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই সমাজে পূর্বে প্রচলিত ছিল না? বিষ্ণুকে কি ইন্দ্র অন্য কোন সমাজ থেকে গ্রহণ করেছিলেন? ঋগ্বেদে বিষ্ণু এবং যজ্ঞকে এক ও অভিন্ন বলে অভিহিত করা হয়নি। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সংহিতা ও ব্রাহ্মণে বিষ্ণু এবং যজ্ঞ এক এবং অভিন্ন। শতপথ ব্রাহ্মণে সেই অমূষকে জলের তলা থেকে পৃথিবী উদ্ধারকারী বলে উল্লেখ করা হলেও সেখানেও তিনি বিষ্ণু নন, তাঁকে সেখানে জনপ্রিয় বৈদিক দেবতা প্রজাপতির সঙ্গে অভিন্ন বলে অভিহিত করা হয়েছে। যজ্ঞ এবং বিষ্ণু এক ও অভিন্ন বলে স্বীকৃত হলেও তাঁকে সেই বরাহের সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলে গণ্য করা হচ্ছে না। পরে অবশ্য প্রজাপতির সমস্ত বৈশিষ্ট্য আত্মসাৎকারী বিষ্ণুকেই সেই বরাহ ও পৃথিবীর উদ্ধারকারী বলে অভিহিত করা হল। বিষ্ণুর আদিত্যরূপে স্বীকৃতিও শতপথ ব্রাহ্মণের পূর্বে হয়নি। তা ছাড়া ঋগ্বেদীয় সমাজে যে-সব জন্তু বিভিন্ন দেবতার প্রতীকরূপে স্বীকৃত তারা সবই গৃহপালিত নানা সাংসারিক ক্রিয়ায় ব্যবহৃত পশু—যেমন বৃষ, অশ্ব, মেষ। অহির্বুধ্ন নামে সর্পের দেবতা পরিচয় থাকলেও সে পরিচয় তেমন জনপ্রিয় ছিল না; আর বরাহ তো ঋগ্বেদে

কোথাও দেব প্রতীক বলে স্বীকৃতিলাভ করতে পারেনি। পরে যজ্ঞের ও বিষ্ণুর সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলে গণ্য হলে বৃষ অশ্ব ইত্যাদি পশু একাধিক দেবতার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলে বর্ণিত হয়েছে ; বরাহ বা নাগ বিষ্ণু ভিন্ন অন্য কোন দেবতার সঙ্গে সম্বন্ধলাভ করতে পারেনি। এই দুই পশুরও, অনুমান হয়, অবৈদিক সমাজ থেকেই বৈদিক সমাজে প্রবেশলাভ ঘটেছিল কিন্তু এরা তেমন জনপ্রিয়তা বা স্বীকৃতিলাভ করতে পারেনি। এখানকার আলোচনা থেকে এমন অনুমান করা হয়ত অন্যায় হবে না যে দেবতারূপে বিষ্ণু যেমন বৈদিক সমাজে আগন্তুক, অন্য কোন সমাজ থেকে গৃহীত, তেমনি যজ্ঞও বৈদিক সমাজের নিজস্ব ছিল না, অন্য কোন সমাজ থেকে এই যজ্ঞক্রিয়াও বৈদিক সমাজে গৃহীত হয়েছিল।

বিষ্ণু তথা যজ্ঞ এবং বরাহের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর সঙ্গে জড়িত যে-সব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে তার মধ্যে তাঁর তিনটি পদক্ষেপ, বৃত্রের ও এমুষার নিধনে ইন্দ্রকে তাঁর সহায়তাদান, মাতৃ-গর্ভে ভ্রূণের রক্ষা (৭।৩৬:৯), ত্রিজগতের পোষণ (১।১৫৪:৪), বিভিন্ন বৃক্ষের ও পর্বতের সঙ্গে বিষ্ণুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিশেষ উল্লেখনীয় (১।৫৪:২—এখানে তাঁকে বলা হয়েছে গিরিক্ষিত বা গিরিস্থা)। পরম্পরার ক্ষেত্রে বিষ্ণুর এমুষাবধঘটিত বিবরণকেই প্রাচীনতম বলে গণ্য করা যেতে পারে, কারণ এই এমুষা উপলক্ষেই বিষ্ণুর সঙ্গে ইন্দ্রের সংযোগ ঘটে এবং বৈদিক প্রেক্ষা-ক্ষেত্রে বিষ্ণুর প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বলা যেতে পারে যে এই ইন্দ্র-বিষ্ণু পরিচয়ের পূর্বেই এমুষা নামে পরিচিত বিষ্ণু তাঁর জল-নিমগ্ন পৃথিবী উদ্ধারের প্রতিহার্য বা অলৌকিক কৃত্য সম্পাদন করেছিলেন। ঋগ্বেদে পৃথিবী উদ্ধারের উল্লেখ নাই, কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণে এই ঘটনার উল্লেখের সঙ্গে প্রজাপতিকে এই ঘটনার কর্তা বলে অভিহিত করা হয়েছে। বস্তুত এই অলৌকিক ঘটনার সম্পর্কে বিশ্বাস যাঁদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তাঁদের কাছে এই ঘটনা যাঁর দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল তিনি দৈবশক্তিসম্পন্ন বরাহ—আদিম কুলপ্রবর্তক পশু টোটেম। পশু, বৃক্ষ বা পর্বতকে যাঁরা কুলপ্রবর্তক, আদি জন্ম-দাতা বলে মনে করেন ও সেই আদিম কুলপ্রবর্তকের প্রতীক বা প্রতিকৃতিকে শ্রদ্ধা ও উপাসনা করেন তাঁদের ইংরাজীতে 'টোটেম'-উপাসক বলা হয়। প্রাচীন আদিম জাতীয়দের মধ্যে এইধরনের আদিম কুলপ্রতীকের উপাসনা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল ; এখনও অনেক উপজাতীয় সমাজে এই 'আদিম কুলপ্রতীকের

উপাসনার প্রচলন আছে। ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় সাধনায় এই কুলপ্রতীক-উপাসনার অবদান রয়েছে বিভিন্ন পশু, বৃক্ষ ও পর্বতের প্রতি শ্রদ্ধার বর্তমানতায়, এবং বিভিন্ন দেবদেবীর বাহনে এবং কোন কোন দেবতার অর্ধপশু, অর্ধমনুষ্য মূর্তিতে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে অন্যান্য অনেক পশুপক্ষীর মত আদিম কুলপ্রতীকরূপে বরাহের আত্মপ্রকাশ কোন প্রাচীন উপজাতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘটেছিল বলেই মনে হয়। খাদ্যের অন্বেষণে বরাহ প্রবল শক্তি নিয়ে মাটি খুঁড়ে থাকে ; মৃত্তিকার এই সঞ্চালনের ফলে যে আবদ্ধ জলের প্রবাহ ঘটে, আর আলোড়িত মৃত্তিকায় বীজ পড়লে সহজেই যে নূতন চারাগাছের জন্ম ও বৃদ্ধি ঘটে, পর্যবেক্ষণের ফলে এই উপলব্ধি থেকেই বরাহের প্রতি মানুষের আকর্ষণ জন্মেছিল। এই উপলব্ধি থেকেই বরাহকে আদিম কুলপ্রবর্তক বলেও গণ্য করা হয়েছিল এবং বরাহকে অবলম্বন করে কাল্পনিক নানা উপাখ্যানের উদ্ভব হয়েছিল। বরাহ কর্তৃক জলমগ্ন পৃথিবীর উদ্ধার এমনি একটি উপাখ্যান, শতপথ ব্রাহ্মণে যার বিবরণ প্রথম পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় এক বরাহকে অসুরদের ধনসম্পদের রক্ষক বলে অভিহিত করা হয়েছে, যাকে বিষ্ণু ইন্দ্রের অনুরোধে নিহত করেছিলেন। পরে বিষ্ণু নিজেই বরাহ প্রতীকের সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলে গণ্য হয়েছিলেন।

গভীর বারিরাশিতে নিমজ্জিত পৃথিবীব বরাহ কর্তৃক উদ্ধারের যে বর্ণনা ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে তার সমথন পুরাণেও আছে। এই ঘটনার কাল-নির্ণয়ে তার কিছু উপযোগিতা লক্ষ্য কবা যায়। পুরাণের বর্ণনায় এই উদ্ধার-কর্তা বরাহ বিষ্ণুর অবতার। বৈবস্বত মন্বন্তরের ঋষি কশ্যপের অন্যতর পত্নী দক্ষকন্যা দিতির গর্ভে দুই প্রখ্যাতনামা পুত্র জন্মেছিল, যাদেব নাম হিরণ্য-কশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ। এই হিরণ্যাক্ষের দুর্মদ অত্যাচারে পৃথিবী জলমগ্ন হয়ে পড়লে ('যজ্ঞাবতারস্য মায়াগৃহীত বারাহতনোর্মহাত্মন'), বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষকে বধ করে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। মহাভারত (৩।৮৩:১৮ ; ৩১০।২৮), ভাগবত-পুরাণ (৩:১৭-১৮) এবং অন্যান্য কিছু পুরাণে বরাহরূপী বিষ্ণুর পৃথিবী উদ্ধারের আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে।

বরাহ কর্তৃক পৃথিবী উদ্ধারের একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যার উল্লেখ এখানে হয়ত অবান্তর হবে না। কাশ্মীরে বরাহমূল (বারামূলা) নামে একটি শহর আছে। স্থানীয় লোককাহিনীতে এবং কাশ্মীরের কল্হন কৃত ইতিহাসে এই বরাহমূল

নামক স্থানের উল্লেখ আছে এবং বর্ণিত আছে যে বরাহরূপী বিষ্ণু এইখানে তাঁর দংষ্ট্রাঘাতে পর্বত বিদীর্ণ করে দিলে যে জলরাশিতে ধরণী আকীর্ণ ছিল তা নিঃসৃত হয়ে যায় এবং পৃথিবী (অর্থাৎ কাশ্মীর উপত্যকা) মানুষ, পশু, বৃক্ষ-লতাদির উদ্ভব ও জীবনের পক্ষে উপযোগিতালাভ করে। কাশ্মীরে বরাহক্ষেত্র নামেও একটি অঞ্চলের পরিচিতি আছে। নেপালে জনশ্রুতি আছে যে, নেপালের মালভূমি একসময় বিস্তীর্ণ জলরাশিতে আকীর্ণ ছিল। বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী পর্বত বিদীর্ণ করে সেই জলনির্গমনের পথ করে দিলে নেপাল উপত্যকা শুষ্ক হয়ে বাসোপযোগী হয়ে ওঠে। বরাহরূপী ভগবানের পৃথিবী উদ্ধার কাহিনীর পেছনে সুপ্রাচীন যুগের কোন বিস্তীর্ণ জলাকীর্ণ অঞ্চল থেকে পূর্তবিদ্যার সাহায্যে জল নিষ্কাশনের দ্বারা বাসযোগ্য করে তোলার ইতিহাসই যে বিধৃত আছে, এধরনের অনুমান হয়ত অযৌক্তিক নয়। এবং যিনি এ কার্যসাধন করেছিলেন, তিনি বা তাঁর জনগোষ্ঠী হয়ত বরাহরূপী বংশপ্রবর্তক আদিপিতার (totem) উপাসক ছিলেন, এবং তাঁর এই কৃতিত্ব সেই কুলপ্রবর্তক বরাহতেই আরোপিত হয়েছিল।

আর্যদের বৈদিক শাখায় আদি পিতারূপে বরাহের উপাসক কোন জনগোষ্ঠী ছিল না ; সম্ভবত এমূষা নামে বরাহের উপাসক একটি জনগোষ্ঠীকে ইন্দ্রানুগামী আর্যগোষ্ঠী শত্রু বলেই গণ্য করত। বিস্তৃত সপ্তপর্বতের অন্তরালে অবস্থিত প্রভূত সম্পদরাশির সংরক্ষক এই এমূষাকে ইন্দ্র নিহত করেছিলেন, কিন্তু বিষ্ণু সেই এমূষাকে যজ্ঞরূপে দেবতাদের দান করেন। ঋগ্বেদের এই আখ্যানেই এই বরাহরূপী দেবতার বেদানুগামী ব্রাহ্মণ্য সমাজে প্রথমে প্রজাপতির ও পরে বিষ্ণুর অবতার-রূপে গণ্য হওয়ার বীজ উপ্ত ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদে এই এমূষাকে বলা হয়েছে বৃত্র ; মনে হয় ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী 'বৃত্রে'র সমাজেও হয়ত এমূষা নামে বরাহকে আদিম কুলপিতা বলে গণ্য করা হত; পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সমাজে ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী এই বরাহ দেবতারূপে পরিগৃহীত হয়েছিলেন। অহিরূপী বৃত্রের সঙ্গে সংগ্রামে ইন্দ্র যেমন বিষ্ণুর সহায়তা প্রার্থনা করেছিলেন, এই এমূষা-রূপী 'বৃত্রে'র সঙ্গে সংগ্রামেও ইন্দ্র পরিচালিত দেবতাদের বিষ্ণুই এমূষাকে এনে দিয়েছিলেন। বৃত্রের সঙ্গে অভিন্ন অহি বা সর্প যেমন পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে অনন্তরূপী বিষ্ণু বলে পরিগণিত হয়েছিলেন, তেমনি এমূষারূপী বরাহও বিষ্ণু-রূপেই গৃহীত হয়েছিলেন তাঁর অন্যতম অবতার হিসেবে। এমনও হওয়া কিছু

অসম্ভব নয় যে, যে সমাজে আদিকুলপিতারূপে নাগরূপী অহি এবং বরাহরূপী এমুষার উপাসনা প্রচলিত ছিল, বিষ্ণু ভগবানও সেই সমাজেরই দেবতা ছিলেন এবং সেই নাগ ও বরাহের সঙ্গে এক ও অভিন্ন ছিলেন।

এই বরাহ প্রসঙ্গে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় 'যজ্ঞ'। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বর্ণিত এমুষার উপাখ্যানে বর্ণিত আছে যে ইন্দ্র এই এমুষাকে বধ করলে বিষ্ণু সেই এমুষাকে যজ্ঞরূপে দেবতাদের কাছে অর্পণ করেন। এরই ফলে অসুরদের ধনসম্পদ দেবতাদের অধিগম্য হয়েছিল। ঋগ্বেদে যজ্ঞের বিস্তৃত উল্লেখ থাকলেও ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে যজ্ঞের বিশদ বর্ণনাসূত্রে বিষ্ণুকে যজ্ঞের সঙ্গে এক ও অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে দেখা যায়। আর যজ্ঞই যে পৃথিবীর সকল কিছুর মূল সত্তা এই তত্ত্বও ব্রাহ্মণেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। শতপথ ব্রাহ্মণ (১৪।৩।২: ১) বলেন যজ্ঞই সর্বভূতের আত্মা। আর এই শতপথেই বারংবার ভগবান বিষ্ণুকে যজ্ঞের সঙ্গে একাত্মক বলে অভিহিত করা হয়েছে।[২১] আদিতে সম্ভবত প্রজাপতিকেই যজ্ঞ বলে অভিহিত করা হত।[২২] পৃথিবী উদ্ধারকর্তা বরাহকেও শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতি আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে, এবং এই গ্রন্থে প্রজাপতিকেই যজ্ঞের সঙ্গে অভিন্ন বলা হয়েছে।[২৩] তবে ঋগ্বেদেই প্রজাপতিকে বিষ্ণুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছিল (১০।১৮৪:১)। শতপথ ব্রাহ্মণে এই প্রজাপতিকে পৃথিবীর উদ্ভাবক ও পৃথিবীকে প্রজাপতির পত্নীরূপেও বর্ণনা করা হয়েছে (শতপথ ৭।৩।১:২০ ; ১৪।১।২:১১) এবং সেখানে প্রজাপতিকেই কচ্ছপ ও বরাহ বলে অভিহিত করা হয়েছে। যদিও শতপথ ব্রাহ্মণে বিষ্ণুকেও যজ্ঞের সঙ্গে একাত্মক করা হয়েছে কিন্তু বিষ্ণু মনে হয় তখনও পরিপূর্ণভাবে বৈদিক সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেননি এবং বৈদিক সমাজে বিষ্ণুর সঙ্গে আসা যজ্ঞ, পৃথিবীর স্বামিত্ব, কূর্ম এবং বরাহঘটিত আখ্যান বৈদিক দেবতা প্রজাপতিতেই আরোপ করে রাখা হয়েছিল। যজ্ঞ ও বিষ্ণুর এক ও অভিন্নতা এমুষা বরাহসূত্রেই বৈদিক সমাজে পরিগৃহীত হয়েছিল, এবং ঋগ্বেদে যেভাবে যজ্ঞকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হব্য পৌঁছে দেবার মাধ্যমমাত্র থেকে দার্শনিক চিন্তাসমন্বিত সর্বভূতাত্মারূপে বিবর্তিত হতে দেখা যায় ও বিশেষ করে পৃথিবীর বুকে আবাস ও অন্নরূপে কৃষিজাত খাদ্য-উৎপাদনের আধার বলে গণ্য করা হয়েছিল তা সেই বরাহরূপে বিষ্ণুকল্পনার উদ্ভাবকদের নিকট থেকেই গৃহীত হয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়।

ভূ-পৃষ্ঠের জলমুক্তি ও কৃষিবিস্তারে যজ্ঞের মাহাত্ম্য

অথৈ জলের তলা থেকে বরাহদেব পৃথিবীকে উদ্ধার করলেন এবং পৃথিবী গণ্য হলেন প্রাচুর্যের প্রসূতিরূপে (ঋ ১০।৩৫:৭)। এই পরিপ্রেক্ষিতেই লক্ষ্য করা যায় যে জীবনধারণের মূল উপকরণ খাদ্যকে বিষ্ণুর সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলে অভিহিত করা হয়েছে (শতপথ ব্রা ৭।৫।১:২১ ; মৈত্রায়ণী উপনিষদ ৬।১৩ ; মহাভারত ১২।৪৭:৭১)। এই অন্ন পৃথিবী থেকেই উৎপন্ন হয়। যজ্ঞরূপী বরাহই পৃথিবীর মুক্তিসাধন করেছিলেন। এই পৃথিবীর উদ্দেশে উৎসারিত হয়েছে ঋগ্বেদের মন্ত্র—স্যোনা পৃথিবী ভবানৃক্ষরা নিবেশনী / যচ্ছানঃ শর্ম সপ্রথঃ (১।২২: ২৫)—হে পৃথিবী, (তুমি) সুখকরী নিষ্কণ্টকা ও নিবাসযোগ্যা হও। আমাদিগকে বিস্তীর্ণ শরণ প্রদান কর। অন্য একটি মন্ত্রে পৃথিবীর নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে যেন প্রার্থনাকারীর উর্দ্ধগমনশীল যজ্ঞ তিনি দেবগণের নিকট বহন করে নিয়ে যান (দ্যাবানঃ পৃথিবী ইমং সিধ্রমদ্য দিবিস্পৃশম/যজ্ঞং দেবেষু যচ্ছতাম। (২।৪১:২০)। পৃথিবী যেভাবে প্রাচীন জলমগ্নতা থেকে উত্তোলিত হয়েছিলেন সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ঋগ্বেদে এইসব মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল, পৃথিবীর অভ্যুত্থান বা পৃথুবৈণ্যের নামে কি করে পৃথিবীর পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেসব কাহিনী ঋগ্বেদে কিন্তু নাই। ঋগ্বেদের মন্ত্ররচয়িতাদের হয়ত সেইসব আখ্যান অজানা ছিল না। ঋগ্বেদেও পৃথুবৈণ্যের উল্লেখ আছে। পৃথুবৈণ্য সম্পর্কে কিছু বিবরণ অবশ্য পরবর্তী পুরাণেই বিস্তৃতভাবে বিবৃত আছে। ঋগ্বেদে বেণের উল্লেখ আছে ভৃগুবংশের মন্ত্ররচয়িতা হিসেবে। বেণ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৩ সংখ্যক মন্ত্রের রচয়িতা। অনুক্রমণী এই বেণকে ভৃগুপুত্র বলে উল্লেখ করেছেন (আর্যানুক্রমণী ১০।৬০—বেনো নাম ভৃগুস্য পুত্রঃ)। মহর্ষি ভৃগুর উল্লেখ ঋগ্বেদে বেশ কয়েকবার থাকলেও তাঁর জনপ্রিয়তা, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অঙ্গিরস থেকে অনেক কম। ঋগ্বেদে অঙ্গিরস, অঙ্গিরসপুত্র বৃহস্পতি এবং বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজের ব্যাপক উল্লেখ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে তাঁরা বৈদিক সম্প্রদায়ের নিকট গুরু এবং পুরোহিতরূপে অধিক শ্লাঘ্য ও জনপ্রিয় ছিলেন। ঋষি হিসেবে ভৃগুর স্মৃতি ঋগ্বেদে আছে, তবে ঋগ্বেদের মণ্ডলগুলি বিভিন্ন ঋষির নামে চিহ্নিত থাকলেও ভৃগুর নামে কোন মণ্ডল নাই। পরবর্তী শাস্ত্রগ্রন্থে ভৃগুর পুত্র শুক্রাচার্যকে অসুরদের পুরোহিত এবং গুরুরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের ঋষি ভরদ্বাজের জন্মবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে যাস্কের নিরুক্ত (৩।১৭), ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৩।৩৪:১),

ঋগ্বেদের নীতিমঞ্জরী (৯৭-১০২) এবং সদ্‌গুরুশিষ্য (৯৭-১০১) নামীয় টীকায়, প্রজাপতির অনুষ্ঠিত এক যজ্ঞে দুই প্রাচীন ঋষির আবির্ভাবের বিবরণ পাওয়া যায়। যদিও এই দুই ঋষিই প্রজাপতির যজ্ঞসম্ভূত এবং এই সূত্রে একই পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিবর্তিত, তা হলেও এই দুই ঋষির অন্যতম ভৃগুর উত্তর-পুরুষেরা ঋগ্বেদ বা ঋগ্বেদ পরবর্তী সমাজে তেমন সমাদর লাভ করেননি। বরং ঋগ্বেদের পরবর্তী শাস্ত্রগ্রন্থে ভৃগুর সন্তান শুক্রাচার্যকে অসুরদের পুরোহিত এবং গুরু হিসেবে মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নরূপেই গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু ঋগ্বেদে রাজা পৃথুবৈণ্যের উল্লেখ এবং সমর্থনযোগ্য টীকাকারদের এই পৃথুবৈণ্যকে ভৃগুর সন্তান বা ভৃগুর বংশজাত বলে বর্ণনা করায় পরিস্থিতি বেশ রহস্যজনক বলে প্রতীয়মান না হয়ে পারে না। ঋগ্বেদের সেই স্বল্প উল্লেখ ছাড়া পৃথুবৈণ্যের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ ঋগ্বেদের অব্যবহিত পরে রচিত কোন শাস্ত্রগ্রন্থে তেমন পাওয়া যায় না। কিন্তু বেশ কয়েকটি পুরাণে এই পৃথুবৈণ্যের কাহিনীর যেমন বিস্তৃতভাবে উল্লেখ আছে তা থেকে সংস্কৃতির প্রাচীন ঘটনাপথে পৃথুবৈণ্যের বৈশিষ্ট্য নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করা যায়।

একাধিক পুরাণে পৃথুবৈণ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৪] মহাভারতেও বেণের পুত্র পৃথুর উল্লেখ বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই করা হয়েছে দেখা যায়। পুরাণের মতে বেণের পুত্র পৃথুকেই প্রথম রাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে (আদিরাজা নমস্কার্যঃ পৃথুবৈণ্য প্রতাপবান—বায়ু উত্তরার্ধ ২।৭ ; আদিকর্তা নরাণাং বৈ নমস্ত পৃথুরেবহি—ঐ ৮)। পুরাণ ও মহাভারতে পৃথুবৈণ্যের এই বিস্তৃত উল্লেখ এক অত্যন্ত প্রবল স্মৃতিরই অভিচারণ, যে স্মৃতি ঋগ্বেদ অনুগামী আরণ্যক ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে মনে হয় ইচ্ছাকৃতভাবেই অবহেলা করা হয়েছিল। ঋগ্বেদ যে বেণ ও তার পুত্র পৃথুর স্মৃতির সঙ্গে অপরিচিত ছিল না তার সাক্ষ্য ঐ বেদের দশম মণ্ডলের ১২৩ ও ১৪৮ সংখ্যক মন্ত্রে আছে। মহাভারতে যেসব রাজচক্রবর্তীর নামের উল্লেখ আছে (ষোড়শ রাজিক) তাদের মধ্যে পৃথুবৈণ্যেরও উল্লেখ আছে।[২৫] পুরাণ গবেষণায় প্রথিতকীর্তি পারজিটার, বেণ ভিন্ন অন্যান্য চক্রবর্তী রাজন্যের বংশপরিচয় সম্পর্কে বলেছেন যে এঁদের সব ক'জনই পুরাণে উল্লিখিত ঐক্ষ্বাক বা ঐল (এবং সৌদ্যুম্ন) বংশের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু পৃথুবৈণ্য এইসব রাজবংশের কোনটির সঙ্গেই যুক্ত বলে উল্লিখিত হননি। এই কারণে পারজিটার পৃথুবৈণ্যকে কাল্পনিক বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[২৬] অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পারজিটার

তাঁর স্বজাতীয় ভারতবেত্তাদের প্রভূত সমালোচনা সত্ত্বেও পুরাণে বর্ণিত বংশধারার ও তৎসম্পর্কিত ঘটনাবলীর ঐতিহাসিকত্ব সপ্রমাণে প্রয়াস করেছিলেন। পৃথু-বৈণ্যকে কাল্পনিক গণ্য করা ভিন্ন তিনিও অন্য কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি।

পৃথুবৈণ্যের ঐতিহাসিকতা যদি স্বীকার করতে হয় তবে ভারত সংস্কৃতির বিস্তৃতি বহুদূর অতীতে প্রসারিত হয়ে যায়। প্রচলিত স্মৃতি মানসে পৃথুবৈণ্যের গুরুত্ব অঙ্কিত থাকবার কতগুলি কারণ এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। পুরাণের কাহিনীমতে পৃথুর পিতা বেণ ছিলেন অতীত স্মৃতির এক অত্যন্ত সুপরিচিত চরিত্র, ধ্রুবের উত্তরপুরুষ। পুরাণে প্রবল বিষ্ণুভক্ত ধ্রুবকাহিনীর প্রভূত জন-প্রিয়তা থাকলেও তাঁকে ইতিহাসের পর্যায়ে আনা যায়নি তার কারণ ভারতীয় কালগণনার ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব প্রাচীনতম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে। ঋগ্বেদেব উল্লিখিত অধিকাংশ রাজন্য ও ঘটনা পুরাণমতে যে মন্বন্তরে ছিল বা ঘটেছিল বলে বর্ণিত হয়েছে, প্রচলিত কালগণনা মতে বৈবস্বত মন্বন্তর নামে পরিচিত সেই মন্বন্তর সপ্তম মন্বন্তর বলে গণ্য। পুরাণ বর্ণনায় প্রতি মন্বন্তরের উল্লেখ-যোগ্য ঘটনাবলী ও রাজবংশের পরিচয় আছে, এবং এই বংশপ্রবাহের মধ্যে একটা যোগসূত্রও আছে, যা নিয়ে তেমন অনুসন্ধান বা তার যথার্থতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়নি। এই বিবর্তনপথে বৈবস্বত মন্বন্তরের অব্যবাহত পূর্বেকার মন্বন্তর চাক্ষুষ মন্বন্তর নামে পরিচিত। এই চাক্ষুষ মন্বন্তবে সেই উত্তানপাদ-ধ্রুবের বংশে সঞ্জাত অঙ্গ নামক এক রাজার ঔরসে বেণের জন্ম হয়েছিল, পুরাণগুলিতে এই তথ্যের উল্লেখ আছে। বেণ বিশেষ দেবতাভক্ত ছিলেন না, তাঁর মতে রাজাই সকলদেবময় (সর্বদেবময়নরঃ—বিষ্ণুপুরাণ (১।১৩:২২) এবং রাজা ভিন্ন অন্য কোন দেবতার পূজা, দান, যষ্টব্য এবং হোতব্য (যজ্ঞ) ইত্যাদি একান্তই অর্থহীন। এই প্রবল দেব-যজ্ঞ বিদ্বেষের ফলে ঋষিরা ক্রোধপরায়ণ হয়ে বেণকে হত্যা করেন। বেণের কোন সন্তান না থাকায় ঋষিরা বেণের দক্ষিণ-হস্ত মন্থন করলে পৃথু নামে তাঁর এক পুত্র জন্মে। ঋষিগণ তাঁর হাতে চক্র-চিহ্ন লক্ষ্য করে তাঁকে জনার্দন বিষ্ণুর অংশ বলে উপলব্ধি করেন। (হস্তে তু দক্ষিণে চক্রং দৃষ্ট্বা তস্য পিতামহ/বিষ্ণোরংশং পৃথুং মত্বা পরিতোষং পরং যযৌ—বিষ্ণুপুরাণ ১।১৩:৪৫)। পৃথুর অভিষেকের প্রাক্কালে অরাজকতাবশত ফলমূল-সমৃদ্ধ বৃক্ষাদি বিনষ্ট হয়ে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হলে প্রজাগণ পৃথুর নিকট এই অবস্থা থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবার প্রার্থনা জানায়। ধরণীই এই দুর্ভিক্ষের

কারণ জ্ঞানে পৃথু ধরণীকে তাঁর দিব্য শরাসনের দ্বারা নিধন করতে উদ্যত হলে ধরণী পুনরায় প্রজাদের জীবনোপায় খাদ্যসম্ভার প্রসব করবার প্রতিশ্রুতি দেন। ফলে পৃথু বসুন্ধরাকে তাঁর জীবন ভিক্ষা দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে মাত্র স্বচ্ছন্দজাত ফলমূলই মানুষের খাদ্যরূপে গণ্য ছিল, পৃথুর প্রয়াসে কৃষিকর্মের প্রবর্তন হল এবং উৎপন্ন শস্য মানুষের খাদ্যরূপে গণ্য হল। ধরণীর বক্ষ অসমতল ছিল, সেই উচ্চাবচ স্থলকে সমান করে গ্রাম ও নগরের পত্তন হল। বসুন্ধরার নির্দেশেই পৃথু এইসব মহৎ কর্ম সম্পাদন করেছিলেন। বসুন্ধরার উপর থেকে তাঁর ক্রোধ সংবরণ ও তাঁকে জীবন দান করায় পৃথু বসুন্ধরার পিতা (ভয়ত্রাতা হিসেবে) বলে গণ্য হলেন—বসুন্ধরাও 'পৃথিবী' নামে পরিচয়লাভ করলেন। প্রজাগণের মন পৃথুর প্রতি অনুরক্ত হল, তিনি 'রাজা' নামে পরিচিত হলেন। (এবং প্রভাবসং পৃথুঃ পুত্রো বেনস্য বীর্যবান্। যজ্ঞে মহীপতিঃ পূর্বো রাজাভূজ্জনরঞ্জনাৎ ॥— বিষ্ণু ১।১৩:৯৩)।

সংক্ষেপে বর্ণিত এই কাহিনীতে স্বভাবতই পৃথুর ব্যাপক মাহাত্ম্যের স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়। জাতকের হাতে চক্রচিহ্ন তার চক্রবর্তীত্বের পরিচায়ক। পৃথুর পূর্ববর্তী কোন নৃপতিরই চক্রবর্তীত্বের স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। পরবর্তী ধারণায় মান্ধাতাকে প্রথম চক্রবর্তী সম্রাট বলে গণ্য করা হয় (ততস্তু মান্ধাতা চক্রবর্তী সপ্তদ্বীপা মহীং বুভূজে—বিষ্ণু ৪।২:৬৩)। কিন্তু পরম্পরা কালের বিচারে পৃথু মান্ধাতার বহু পূর্বগামী। চক্র সুপ্রাচীনকাল থেকেই সূর্যের প্রতীক বলে গণ্য হয়ে আসছে। পরে চক্র বিষ্ণুর হাতে অন্যতম আয়ুধই শুধু নয়, বিষ্ণু স্বয়ং চক্রস্বামী নামেও অভিহিত হয়েছেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে পৃথুর হাতে এই বিষ্ণুচক্রের চিহ্ন দেখেই তাঁকে রাজরাজেশ্বর পদে অভিষিক্ত করা হয়েছিল। পুরাণে এইধরনের উক্তি থাকলেও মহাভারতে সোজাসুজি উল্লেখ আছে যে বিষ্ণু নিজেই পৃথুকে রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বিষ্ণু পৃথুর দেহে নিজের শক্তি অনুপ্রবিষ্ট করেই তাকে রাজা করেছিলেন, যার ফলে দেবতাদের নিকট যেমন মস্তক আনত করা হয় তেমনি সমস্ত বিশ্ব রাজার নিকট মস্তক আনত করে। কারণ রাজা বিষ্ণুরই অংশ।

মহাভারতের বর্ণনা আরও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। পৃথুকে এই বিষ্ণুশক্তিতে অভিষিক্ত হওয়ার পর ভগবান বিষ্ণুর ললাট থেকে এক সুবর্ণপদ্ম প্রাদুর্ভূত হল, যে পদ্মের উপরে প্রকট হলেন শ্রী, যিনি গণ্য হলেন ধর্মের পত্নীরূপে,

আর তাঁর সন্তানরূপে উদ্ভূত হলেন অর্থ। বিষ্ণুশক্তি এই ধর্ম ও অর্থ নিয়ে পৃথুর উপর প্রতিষ্ঠিত হলে সেই সময় থেকে রাজামাত্রেই শ্রী, ধর্ম ও অর্থ এই তিন ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ বলে গণ্য হয়ে আসছেন।[২৭] আবার ঐ মহাভারতেই বলা হয়েছে যে ইন্দ্রই পৃথুবৈণ্যকে ঐশ্বর্যসম্পদ দান করেছিলেন। যার ফলে পৃথুবৈণ্যকে বলা হয়েছে 'রূপেণেন্দ্র ইবাপরঃ'।[২৮]

ঋগ্বেদে বিষ্ণুর এই রাজকীয় মাহাত্ম্যের কোন পরিচয় বা ইঙ্গিত নাই। দেবতাদের প্রধান ইন্দ্র বিষ্ণুর সহায়তা প্রার্থনা করেন। তিনি বিষ্ণুর সাহায্যে বৃত্র, এমুষা, সম্বর এবং বর্চিন নামে দৈত্যদের নিধন করেছিলেন। কিন্তু এইসব বিজয়লাভে সাহায্যের দ্বারা বিষ্ণু যে ইন্দ্রকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন এমন উক্তি ঋগ্বেদে নাই। পরবর্তী পরিকল্পনায় চক্র বিষ্ণুর হাতের একটি আয়ুধ বলে গণ্য হলেও ঋগ্বেদে বিষ্ণুর সঙ্গে চক্রের কোন সম্পর্কের উল্লেখ নাই। সেখানে সুষ্ণ নামে এক মহাবলবান দাসের সঙ্গে সংগ্রামে ইন্দ্র কুৎসকে সহায়তা করেন ও সুষ্ণকে নিধন করেন। এই সুষ্ণ-কুৎস বিরোধে ইন্দ্র সূর্যের চক্র ছিনিয়ে নিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে (ঋ ৪।৩০:৪)। চক্র যে সূর্যেরই প্রতীক বলে গণ্য হত, ঋগ্বেদের এই বর্ণনা থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। সূর্যের রথের প্রসঙ্গেও ঋগ্বেদে চক্রের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। এই রথের পরিচালক অশ্বের নাম ছিল এতস। এতসের সঙ্গে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইন্দ্র এতসকে সাহায্য করেছিলেন যার ফলে সূর্যের রথ এতসের নিকট পরাজয় স্বীকার করেছিল। এইসব কাহিনী সূর্য-উপাসকদের সঙ্গে ইন্দ্রানুগামী সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতারই পরিচায়ক বলে মনে হয়। বেদোত্তর যুগে চক্র বিষ্ণুর হাতের অন্যতম আয়ুধই শুধু নয়, চক্রস্বামী নামে বিষ্ণু চক্রপ্রতীকের সঙ্গে এক বলে গণ্য হয়েছিলেন। এই বিবর্তনের মূলে প্রাচীন দেবতা সূর্য এবং বিষ্ণুর এক ও অভিন্নতার উপলব্ধি যে ক্রিয়াশীল ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদে সূর্যকে বিহঙ্গ-রূপেও কল্পনা করা হয়েছে, কারণ নভোমণ্ডলে পরিক্রমণ করবার ক্ষমতা একমাত্র বিহঙ্গেরই আছে। ঋগ্বেদে এই বিহঙ্গের নাম গরুৎমন্ (৫।৪৫:৯ ; ১০।১৭৭:১); পরবর্তী পরিকল্পনায় গরুৎমন্ (গরুড়) বিষ্ণুর বাহন। প্রাচীন দেবতা সূর্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই যে ক্রমে বিষ্ণুতে আরোপিত হয়েছে তা উপলব্ধি করা গেলেও এই বিবর্তনের মূল রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস তেমন হয় নাই।

পরবর্তী যুগে, বিশেষ করে বৈষ্ণবীয় পুরাণগুলিতে ভগবান বিষ্ণু তুলনাহীন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে থাকলেও ঋগ্বেদে বা ঋগ্বেদোত্তর শাস্ত্রগ্রন্থে বিষ্ণুর তেমন মর্যাদালাভ ঘটেছে বলে মনে হয় না। ঋগ্বেদে বিষ্ণুকে আদিত্য বলেও উল্লেখ করা হয়নি; শতপথ ব্রাহ্মণে আদিত্যদের দু'টি তালিকা আছে। তার একটিতে বিষ্ণুর উল্লেখ আছে, অন্যটিতে নাই। শতপথ ব্রাহ্মণে আদিত্য বলতে সূর্যকেই বোঝাত এবং বিষ্ণু কি করে নভোমণ্ডলে আদিত্যরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন সে-কাহিনী পূর্বেই বলা হয়েছে। ঋগ্বেদে 'বৃত্র' এবং 'এমূষ'র সঙ্গে সংগ্রামে ইন্দ্রের বিষ্ণুর সহায়তা গ্রহণের উল্লেখ থাকলেও সেখানে ঐসব দৈত্যের নিধনের ফলে ইন্দ্রের রাজা বলে গণ্য হওয়ার কোন উল্লেখ নাই। ঋগ্বেদে সুস্পষ্টভাবে ইন্দ্রকে কোথাও রাজা বা দেবরাজ বলে উল্লেখ করা হয়নি। শতপথ ব্রাহ্মণেই প্রথম ইন্দ্রকে দেবতাদের অধিপতি আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে (৩।৪।২:২; ৪।৬।৬:৩); অথর্ববেদেও এই তথ্য লক্ষ্য করা যায় (৩।৪:৬)। একসময় ত্রিজগতে দেবতাদের অধিকার বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অথর্ববেদের মতে ইন্দ্র এবং বিষ্ণু অসুরদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হলে বিষ্ণু তাঁর ত্রিপদ বিস্তার করে তাবৎ লোকত্রয় অধিকার করে নিয়েছিলেন (৬।১৫)। এখানে বিষ্ণুই ত্রিজগতের উপর অধিকার-লাভ করেন, কিন্তু ইন্দ্রকে এই অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করবার কোন উল্লেখ এখানে নাই। শতপথ ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও দেবাসুরের এই দ্বন্দ্বের ও বিষ্ণুর নিজ দেহ বিস্তারের দ্বারা বা বামনরূপে তিন পদক্ষেপ দ্বারা ত্রিলোক জয় করবার কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর পদবিস্তারের উল্লেখ থাকলেও প্রত্যক্ষ-ভাবে দেবাসুর সংগ্রামে বা বামনরূপ ধারণ করে তিনপদ বিস্তার করে লোকত্রয় জয় করবার কোন উল্লেখ নাই। এই আখ্যানও বিশেষভাবে ঋগ্বেদের সংকলক-দের দ্বারা তেমন উল্লেখযোগ্য বলে গণ্য হয়নি। অথর্ববেদ ও ব্রাহ্মণ রচনা-কালেই এই কাহিনীর গুরুত্ব স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু এইসব গ্রন্থকারও সমগ্র কাহিনীর বর্ণনা প্রদান করেননি। বিষ্ণুর বামনরূপে অসুররাজ বলির নিকট থেকে লোকত্রয়ের আধিপত্যলাভের কাহিনী বিস্তৃতভাবে বৈষ্ণবীয় পুরাণ-গুলিতেই বিবৃত আছে। সেখানে যাঁর নিকট থেকে বিষ্ণু এই লোকত্রয়ের আধিপত্যলাভ করেছিলেন, তিনি ছিলেন অসুররাজ বলি। কিন্তু এর পূর্বেও বিষ্ণুর এই ব্যাপ্তির স্বীকৃতি ঋগ্বেদেই বৃত্র সংক্রান্ত বিবরণে আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে বৃত্রই সমস্ত ত্রিলোক ব্যাপৃত করেছিল। ইন্দ্র সেই বৃত্রের সঙ্গে সংগ্রামে

বিষ্ণুকে অনুরোধ করছেন তিনি যেন নিজেকে বিস্তৃত করেন। এই সূত্র ধরেই মহাভারত বলছে যে অতীতকালে বৃত্রই সমস্ত ব্যাপ্ত করেছিল[২৯] (বৃত্রেণ··· ব্যাপ্তা আত্মত্বেনগৃহীতম্)। বিষ্ণুর এই ব্যাপ্তি সম্পর্কিত উপলব্ধিই পুরাণে বামন অবতারের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ছিল লক্ষ্য করা যায়।[৩০] শতপথ ব্রাহ্মণে বিষ্ণুর এই বামনরূপের প্রথম উল্লেখের যে গভীর উপলব্ধি দেখা যায়, ঋগ্বেদেও সে উপলব্ধি যে ছিল না তা নয়। তাবৎ লোকত্রয়ে বিষ্ণুর ব্যাপ্তি, তিন পদক্ষেপে সমগ্র জগৎকে আবৃত করা এবং ত্রিজগতের ঊর্ধ্বশীর্ষে বিষ্ণুর পরমপদ ইত্যাদির উল্লেখে (১।১৫৪:৪—৭।১০০:৩) বিষ্ণুর এই বিস্তৃতি ও বৈশিষ্ট্যের সম্পর্কে চেতনা সুস্পষ্ট। সেইসঙ্গে একমাত্র বিষ্ণুই সর্বব্যাপী এবং ত্রিজগত বিস্তৃত করে অবস্থিত, অন্যান্য দেবতারা পৃথিবী, দ্যৌ ও অন্তরীক্ষস্থানে তিন ভাগে বিভক্ত। এই চেতনাসূত্রেই বিষ্ণুর এই বিস্তৃতি, ঋগ্বেদের এই উপলব্ধি থেকেই হয়ত শেষপর্যন্ত বিষ্ণু তাবৎ জগৎকারণ ব্রহ্ম উপলব্ধির সঙ্গে একাত্মকরূপে গণ্য হয়েছিলেন (যাস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষু অধিক্ষিয়ান্তি ভুবনানি বিশ্বা—ঋগ্বেদ ১।১৫৪:২)। এই উপলব্ধি থেকে ত্রিবিক্রমরূপী বিষ্ণু দ্বারা ভুবনত্রয় অধিগ্রহণের কল্পনা উদ্ভূত হলেও এই উপলব্ধির ঐতিহাসিক বিবরণও কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়।

নিঃসন্দেহে বলা চলে যে অসুররাজ বলির ইতিবৃত্তের সঙ্গেই বিষ্ণুর এই বিশেষ ত্রিবিক্রমরূপে ভুবনত্রয় অধিগ্রহণে বামন অবতারের যোগ প্রতিষ্ঠিত। অসুররাজ বলির বিবরণ পুরাণ ইতিহাসে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতার দ্বারা নিহত অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রখ্যাত প্রহ্লাদের পৌত্র ছিলেন বলি। বিপুল পরাক্রমশালী এই অসুররাজ বলি ভুবনত্রয়ের উপর একচ্ছত্র আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হলে দেবতাদের নেতা ইন্দ্রের অনুগামীদের কোন সুনির্দিষ্ট রাজ্যের উপর অধিকার রইল না। পুরাণের পূর্বতন কোন গ্রন্থে হিরণ্যকশিপুর বা প্রহ্লাদের কোন উল্লেখ নাই। সাধারণভাবে পুরাণের এইসব উপাখ্যানকে কাল্পনিক কাহিনী বলেই গণ্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি চেতনায় পুরাণের ঘটনাবলীর মধ্যে বর্ণিত অতিশয়োক্তি ও অপ্রাকৃতত্ব গভীর প্রতীকী অর্থগরিষ্ঠ বলেই গণ্য করা যেতে পারে (পরোক্ষপ্রিয়াঃ হি দেবাঃ—অর্থাৎ প্রাচীন দেবকাহিনীতে পরোক্ষ বা প্রতীকীর প্রতি অনুরাগই ছিল বৈশিষ্ট্য) এবং এই কথা স্মরণ রাখলে ঘটনা ও ঘটনাসংস্পৃষ্ট চরিত্রের পারম্পর্য-নির্দেশ করা তেমন কষ্টসাধ্য হয় না। কালের বিবর্তনে ছয় মন্বন্তরে বিস্তৃত যে যুগবিভাগের কথা

পুরাণে পাওয়া যায়, বেদের ঘটনাবলীর উল্লিখিত যুগবিভাগের মধ্যে বিবস্বানের পুত্র মনুর অধ্যুষিত ষষ্ঠ মন্বন্তরই সেই বৈদিক সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। ঋগ্বেদে যে সমস্ত ঋষি, রাজা ও ঘটনাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায় তার প্রায় সমস্তই পুরাণে বর্ণিত বৈবস্বত মন্বন্তরের অন্তর্ভুক্ত। ঋগ্বেদের ঘটনাবলীর আরম্ভকাল এই মন্বন্তরের আদিপুরুষ বিবস্বত থেকে মনুর বংশধর দেবাপি ও শান্তনু পর্যন্ত বিস্তৃত।

নির্দেশিকা

১. বিষ্ণুপুরাণ, ৩।১;৪৫।
২. শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৪।১ ১।
৩. ঐ, ১।৯৷৩ ৯।
৪. তৈত্তিরীয় সংহিতা, ১।১।৩:১।
৫. ত্রিভিঃ ক্রমৈর্বিমাল্লোকাজ্জিত্বা যেন মহাত্মনা।
পুরন্দরায় ত্রৈলোক্যং দত্তং নিহতকণ্টকম্॥ —বিষ্ণুপুরাণ, ৩।২ ৪৩।
৬. মহাভারত, ৫।১০ ৬, ৮।৭০:৫৮, ৯।৩৩ ২৫।
৭. শতপথ ব্রাহ্মণ, ৪।৫.১. ৫।২।৩ ৬।
৮. ঐ, ১৩।১।৮.২।
৯. অগ্নির্বৈ দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরম —ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১।১।
১০. ঋগ্বেদ ২।১ ১৩-১৪, অগ্নির্মুখঃ প্রথমো দেবতানাং সঙ্গতানামুত্তমো বিষ্ণুঃ —শ্রুতি।
১১. Haug, Martin, Essays on the Sacred Language, Writing and the Religion of the Parsis (Ed by E. W. West, London, 1883), pp. 270f.
১২. বিষ্ণুপুরাণ, ১।১৩।
১৩. ঐ, ১।২৫ ১৩২-৩৩।
১৪. শতপথ ব্রাহ্মণ, ১।২ ৫।
১৫. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১।১।
১৬ শতপথ ব্রাহ্মন, ১৪।১ ১।
১৭. ঐ, ১৪।১।২ ১।
১৮. বিষ্ণুপুরাণ, ১।৪.১, ভাগবতপুরাণ, ১।৩.৭।
১৯. হরিবংশপুরাণ, ১।৫৫.১২০ ; বিষ্ণুপুরাণ, ৫।২১:২৩ ; ভাগবতপুরাণ ১০।৬৯:৩০ মহাভারত, ৩।১৪২।
২০. Roy, S. C., The Khairas of Ranchi (1937), p. 428.
২১. শতপথ ব্রাহ্মণ, ৫।২।৩:৬।
২২. ঐ, ৮।৪।৩.২০, মহাভারত, ১২।৩১৩:৯।
২৩. শতপথ ব্রাহ্মণ, ১১।১।৮:৩ ; ১৪।১।২:১১।
২৪. বিষ্ণুপুরাণ, ১।৩, বায়ুপুরাণ, ৬২।১০৩-১৪৮, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ২।৩৬.১০৩ ; হরিবংশ, ২।৭৪ ;

অগ্নিপুরাণ, ১৮।৮:১৮ ; মৎস্যপুরাণ, ১৪।৩-১৪ , পদ্মপুরাণ, ২।২৬ ; মহাভারত, ১২।৫৯:২২০৩ ।

২৫. মহাভারত, ৭।৫৫·২১৭০ ; ১২।২৯।৯০০-১০৩৭ ।

২৬. Pargitar, F. E., Ancient Indian Historical Tradition, (Delhi, 1962), [A. I. H. T], p. 40.

২৭. মহাভারত, ১২।৫৯.১২৭ ।

২৮. ঐ, ১২।৫৬.৯৮ ।

২৯. ঐ, ১৪।১১.৭ ।

৩০. বিষ্ণুপুরাণ, ৩।১০; কূর্মপুরাণ, ৫১।১৬ ।

ব্রাহ্মণ্য সমাজে বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা

বেদে তেমন প্রতিষ্ঠা না থাকলেও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে ভগবান বিষ্ণুর চূড়ান্ত প্রাধান্যলাভের ক্ষেত্রে অসুররাজ বলির উপাখ্যানকে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। ঋগ্বেদে বিষ্ণু দেবতা বলে গণ্য হলেও ঋগ্বেদের সমাজে বিষ্ণুর যে তেমন প্রাধান্য ছিল না, সমস্ত বেদজিজ্ঞাসু এ সম্পর্কে প্রায় একমত (Vishnu, though a deity of capital importance in the mythology of the Brahmanas, occupies but a subordinate position in the Rigveda. —Macdonell)[১] ঋগ্বেদে বিষ্ণুর একান্ত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে কয়টি কৃত্যের উল্লেখ আছে তার মধ্যে তাঁর 'উরুগায়', 'উরুক্রম' ইত্যাদি আখ্যা ও তিনটি পদক্ষেপের বিস্তৃতির উল্লেখই প্রধান। তাঁর এই তৃতীয় (পরম) বা উচ্চতম পদটির নানা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে এই পদটি যেখানে সেই উচ্চতম স্থানটিই বিষ্ণুর আবাসস্থল, একান্ত রহস্যগর্ভ, মধুময় সকল পুণ্যশীল জনের একান্ত কাম্য।[২] এই তিন পদবিস্তারে বিষ্ণু কেবল যে বিশ্বজগৎই পরিক্রমণ করেন তাই নয়, সমস্ত সৃষ্টিই তাঁর এই পরিক্রমণ পথে আবৃত। তিনিই এই ত্রিলোক এবং এই লোকত্রয়ের প্রাণীকে পোষণ করে চলেছেন (১।১৫৪:৪) এবং সবকিছুর তিনিই নিয়ন্তা (১।১৫৬:৪)। বিষ্ণুর এই-সব বৈশিষ্ট্যের পরিকল্পনায় জগৎপোষক সর্বনিয়ন্তারূপী এক অনাদি, অনির্বচনীয় পরম সত্তার উপলব্ধির বীজ নিহিত থাকলেও বেদের স্বীকৃতিতে বিষ্ণুকে তেমনভাবে সেই প্রাধান্য আরোপ করা হয়নি। ঋগ্বেদ বিষ্ণুর এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যপূর্ণ তিন পদক্ষেপের সম্পর্কে অবহিত থাকলেও এই পদবিস্তার সম্পর্কে কোন বিস্তৃত বিবরণ সেখানে নাই। বিষ্ণুর শক্তির স্বীকৃতি হিসেবে বৃত্র এবং এমুষার সঙ্গে সংগ্রামে ইন্দ্র কর্তৃক বিষ্ণুর সহায়তা প্রার্থনার উল্লেখই বিশেষ লক্ষণীয়। কিন্তু এই উভয় ক্ষেত্রেই বিষ্ণুর সহায়তা থাকলেও বিজয়লাভের কৃতিত্ব ইন্দ্রের।

অথর্ববেদেই প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় যে অসুরদের সঙ্গে সংগ্রামে ইন্দ্রের সঙ্গে বিষ্ণুরও নেতৃত্ব ছিল কিন্তু বিষ্ণুই তাঁর তিন পা বিস্তার করে তাবৎ লোকত্রয় অধিকার করেছিলেন (৬।১৫)। শতপথ ব্রাহ্মণ এই দেবাসুর প্রতিদ্বন্দ্বিতার উল্লেখ

প্রসঙ্গে বিষ্ণুকেই দেবতাদের নেতারূপে বর্ণনা করে কি করে তিনি নিজ দেহ বিস্তৃত করে ত্রিলোক আবৃত করে আধিপত্য অর্জন করেছিলেন সেই বিবরণ দিয়েছে (১।২।৫)। এই শতপথ ব্রাহ্মণেই আছে, বিষ্ণু অসুরদের সমীপে স্বকীয় দেহ দ্বারা আবৃত হয় এমন পরিমাপের জমির জন্য আবেদন করেছিলেন। এখানে তাঁকে যজ্ঞের সঙ্গে বলা হয়েছে এক ও অভিন্ন। আবার এই শতপথ ব্রাহ্মণেই উল্লেখ আছে যে এমুষা নামে বরাহের রূপধারণ করে বিষ্ণু জলনিমগ্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন (১৪।১।২:১১)। ঋগ্বেদ এই এমুষা প্রসঙ্গে বলেছে যে বরাহরূপধারী এমুষাকে ইন্দ্র নিধন করলে বিষ্ণু যজ্ঞরূপে সেই এমুষাকে দেবতাদের অর্পণ করেছিলেন (ঋ ১।৬১:৭ ; ৮।৬৬:১০)। এই সূত্রেই যজ্ঞবরাহ নামের উদ্ভব হয়েছিল। ঋগ্বেদের মতে এই এমুষা এবং বৃত্র ছিল এক।

ঋগ্বেদে যে প্রধান শত্রুর সঙ্গে ইন্দ্রের সংগ্রাম, তার নাম বৃত্র। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে যে অসুরদলের সঙ্গে ইন্দ্র এবং বিষ্ণুর দ্বন্দ্ব সেই অসুরদলের দলপতির নামের কোন উল্লেখ নাই। বেদে এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থে অসুরদের বিস্তৃত উল্লেখ আছে, কিন্তু দু'-একজন অসুরের নাম ঋগ্বেদে থাকলেও অসুরদের সঙ্গে যে দ্বন্দ্বে বিষ্ণু তাবৎ লোকত্রয়ের অধিকারলাভ করেছিলেন সেই অসুরদের নামের কোন উল্লেখ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ করে নাই। ঋগ্বেদে অনেক দেবতাকেই অসুর আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে ; এমনকি ইন্দ্রকেও অসুর বলা হয়েছে। পরে অসুর-দেবতায় প্রবল বিচ্ছিন্নতা ঘটেছিল এবং ঋগ্বেদেই ইন্দ্রের সঙ্গে অসুর-নামে পরিচিত কিছু শত্রুর যুদ্ধের উল্লেখ আছে। দেবতার শত্রু অসুরদের ছত্রভঙ্গ করবার জন্য ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনার মন্ত্র ঋগ্বেদে আছে (৮।৮৫:৯), যা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে এখানে যে অসুরদের ছত্রভঙ্গ করবার জন্য ইন্দ্রের সহায়তা প্রার্থনা করা হয়েছে তারা প্রার্থনাকারীদেরই শত্রু এবং মানুষ, কোন বিরুদ্ধশক্তিসম্পন্ন আধিভৌতিক সত্তা নয়। ঋগ্বেদে বৃত্রকে অসুর বলা হয়নি ; সেখানে বৃত্র দানব নামে পরিচিত।[৩] কিন্তু ঋগ্বেদেই ইন্দ্রকে অসুরহন্তা (অসুর-হন্) আখ্যা দেওয়া হয়েছে (৬।২২:৪)। ইন্দ্রের দ্বারা নিহত দুই শত্রু, পিপ্রু (১০।১৩৮:৩) এবং বর্চিন্‌কেও (৭।৯৯:৫) বলা হয়েছে অসুর। বহু অনুগামীর অধিনায়ক এবং বহু দুর্গের অধিপতি এই দুই অসুরও যে মানুষই ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই যুক্তিতেই মনে হয় ঋগ্বেদে এবং পরবর্তী, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে, যারা অসুর নামে অভিহিত হয়েছে তারাও মানুষই ছিল। অবশ্য

মানুষ এই শব্দের একটু রূপগত অর্থ আছে। মনু শব্দ থেকে উৎপন্ন এই মানুষ, মনুষ্য বা মানব শব্দ মনুর সন্তান এই অর্থেরই প্রকাশক। বৈবস্বত মন্বন্তরে বৈবস্বত মনুর সন্তানেরাই মানুষ নামের অধিকারী বলে ঋগ্বেদে ইঙ্গিত করা হয়েছে।[৪] ইতিপূর্বে এই প্রজাতিকে বোঝাতে জন, নর এইসব শব্দ ব্যবহার করা হ'ত। ঋগ্বেদে এবং তৎপরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে বিবস্বতই মনুষ্য নামে পরিচিত জনগোষ্ঠীর আদি পিতা।[৫] বৈদিক জনগণের মত আবেস্তিক জনগণও বিবনহন্তকে আদি পিতা বলে গণ্য করত (যাশ্ন ৯।১০)। বৈদিক সাহিত্যে বিবস্বতকে যেমন আদিত্য বলা হয়েছে তেমনি তাঁকে বরুণ আদি অসুরবর্গীয় দেবতাদের সঙ্গেও উল্লেখ করা হয়েছে।[৬] কিন্তু কোথাও তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে অসুর বলা হয়নি। বিবস্বত সরণ্যু নামে যে কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন তাঁর পিতা ত্বষ্টৃকেও কোথাও অসুর নামে অভিহিত করা হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে পুনরায় উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইন্দ্রকে এই ত্বষ্টৃর পুত্র বলে ঋগ্বেদে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ত্বষ্টৃর সঙ্গে ইন্দ্রের যোগ এবং বৃত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইন্দ্রের দ্বারা বিষ্ণুর সাহায্য প্রার্থনার বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। ঋগ্বেদে বৃত্রের সঙ্গে সংগ্রামকালে ইন্দ্র কর্তৃক বিষ্ণুকে বিস্তৃত পদক্ষেপ দ্বারা তাঁকে সাহায্য করবার যে প্রতিবেদনের উল্লেখ আছে (ঋ ৪।১৮:১১ ; ৮।১০০:১২) সেই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ক্রমে বৃহদ্দেবতার উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বৃহদ্দেবতা বলছেন, বৃত্র তার প্রবল শক্তির সাহায্যে লোকত্রয় অধিকার করে সমুদয় সৃষ্টিকে উৎপীড়িত করলে ইন্দ্র তাকে দমন করতে অসমর্থ হয়ে বিষ্ণুর নিকট গিয়ে বললেন, 'হে বিষ্ণু' আমি বৃত্রকে নিধন করতে বাসনা করি। তুমি তোমার পদবিস্তৃত কর এবং আমার পার্শ্বে দাঁড়াও অর্থাৎ আমাকে সাহায্য কর। (ত্রিংল্লোকান-ভিতস্থেমান্ বৃত্রস্তস্থৌ স্বযা ত্বিষা/তং নাশকজ্জেতুমিন্দ্রো বিষ্ণুমভ্যেত্য সোঽব্রবীৎ। বৃত্রং হনিষ্যে তিষ্ঠস্ব বিক্রম্যাস্ব মমান্তিকে ॥ বৃহদ্দেবতা ৬।১২১-১২২)।

ত্বষ্টৃর কন্যার গর্ভে এবং বিবস্বতের ঔরসে যে-মনুর জন্ম হয়, ঋগ্বেদ এবং ঋগ্বেদ অনুগামী ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে সেই মনুর বংশধরদেরই প্রাধান্য বিশেষ-ভাবে বর্ণিত আছে। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ত্বষ্টৃ এবং বিবস্বত উভয়েই ঋগ্বেদে দেবতা আখ্যায় অভিহিত হয়েছেন ; এই সূত্রেই ত্বষ্টৃর পুত্র ইন্দ্রও দেবতা তথা দেবতাদের নেতা ও অধিপতি। মনুর সন্তান (মানব বা মনুষ্যদের) এই সূত্রে বলা হয়েছে বিবস্বানরূপী আদিত্যের সন্তান এবং

বিবস্বতের সন্ততিদেরও দেবতা বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।[৭] মনু তো কেবল বিবস্বতের পুত্র হিসেবেই দেবতা বলে গণ্য হতেন না, নিজের অধিকারেই তিনি দেবতায় পরিণত হয়েছিলেন। এঁরা সকলেই মনে হয় ত্বষ্টৃ-বিবস্বতের সময় থেকেই আর অসুর-উপাসক ছিলেন না, অসুর-উপাসক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেব-উপাসকরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। এই দুই তথাকথিত আদিত্য দেবতাদের উপলক্ষ করে বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত হয়ে থাকলেও ত্বষ্টৃর পুত্র ইন্দ্র এবং বিবস্বতের পুত্র মনুকে অবলম্বন করেই এই বিচ্ছিন্নতা সুস্পষ্ট এবং এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভূত ব্যবধান গড়ে উঠছিল। ফলে ইন্দ্র ও মনু অনুগামী দেবসম্প্রদায় বা দেব-উপাসক সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্তই প্রধানত বেদে এবং বেদ-অনুগামী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি-ধারায় ও সাহিত্যে বিশেষ প্রাধান্যের সঙ্গে বিবৃত হয়েছে।

অবশ্য পুরাণ সাহিত্যে মূলত মনুর উত্তরাধিকারী ঐল এবং ঐক্ষ্বাক রাজবংশ-সমূহের বিবরণ ও ধারাবাহিকতার কথা থাকলেও সমান্তরালভাবে আসুর রাজ-বংশের কিছু কিছু রাজন্যের নাম এবং ইতিবৃত্তও কোন কোন পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে। পুরাণের বর্ণনায় বিধৃত বৈবস্বত মন্বন্তর কাহিনী বিশেষ কৌতূহল-জনক। এই মন্বন্তর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে এই মন্বন্তরে পূর্বতন (অর্থাৎ চাক্ষুষ) মন্বন্তরের দেবতারাই আদিত্য, রুদ্র এবং বসু নামে দেবতা; এই মন্বন্তরের ইন্দ্রের নাম পুরন্দর। বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বামিত্র ও ভরদ্বাজ, এঁরা হবেন ঋষি; এবং বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু, নৃগ, ধৃষ্ট ইত্যাদি শতপুত্র হবে।[৮] এই বৈবস্বত মন্বন্তরে ভগবান বিষ্ণু ঋষি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বামনরূপে প্রকট হয়ে (আদিত্যনামবরজো বিষ্ণুর্বামনরূপধৃক্—ভাগবত ৮।১৩:৬) আপন ত্রি-পদ বিস্তারে সমস্ত লোকত্রয় জয় করে ইন্দ্রকে তার আধিপত্য দান করবেন (বিষ্ণু ১।৩:৪২-৪৩)। আদিত্য দেবতারা এই বৈবস্বত মন্বন্তরেরই দেবতা, এবং বিষ্ণু তাঁদের মধ্যে অগ্রজ। পূর্বতন মন্বন্তরের দক্ষ-প্রজাপতির ত্রয়োদশ কন্যার সঙ্গে মুনিবর কশ্যপের বিবাহ হয়। দক্ষের জ্যেষ্ঠা কন্যা দিতির হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষ নামে দুই মহাপরাক্রান্ত পুত্র জন্মে। দিতির পুত্র হিসেবে এরা দৈত্য নামে পরিচিত। ভগবান বিষ্ণু তাঁর নৃসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপুকে নিধন করলে হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রখ্যাত বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ রাজত্বলাভ করেন। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন এবং বিরোচনের পুত্র বলি। বেশ কয়েকটি বৈষ্ণবীয় পুরাণে বলির উপাখ্যান বিস্তৃতভাবে বর্ণিত

আছে, যে বর্ণনা থেকে প্রাচীন ঘটনাসংস্থানে বলি কাহিনীর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রবধের পরে দৈত্যদের সঙ্গে দেবতাদের এক প্রবল সংগ্রাম উপস্থিত হয়েছিল। এই সংগ্রামে দৈত্যেরা দেবতাদের পরাজিত করলে দেবতারা ব্রহ্মার পরামর্শে দৈত্যদের সমুদ্রমন্থনের প্রস্তাব দেয়। প্রায় সব পুরাণেই এই সমুদ্রমন্থনের বিবরণ আছে। সমুদ্রমন্থনে যে বিষ উদ্ভূত হয়, শিব সেই বিষ কণ্ঠে ধারণ করে পৃথিবীকে সেই বিষের প্রচণ্ড প্রকোপ থেকে রক্ষা করেন। এর পরে সমুদ্র থেকে ওঠে সুধা, যে সুধার অধিকারলাভের জন্য পুনরায় দেবাসুরে প্রবল সংগ্রাম বাধে এবং অসুররাজ বলির মৃত্যু ঘটে। কিন্তু অসুর-গুরু ভৃগুপুত্র শুক্রের দ্বারা পুনর্জীবন লাভ করে অসুররাজ বলি ক্রমে এক মহাবিক্রমশালী মহীপতিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। মন্বন্তর বর্ণনায় বৈবস্বত মন্বন্তরের পর ভবিষ্যৎ অষ্টম মন্বন্তর হিসেবে, বিবস্বতের কন্যা সাবর্ণির গর্ভে সংবরণের ঔরসে জাত সাবর্ণিকে মনুরূপে অভিহিত করা হয়েছে। এই মন্বন্তরেই বিরোচনের পুত্র বলিকে ইন্দ্ররূপে গণ্য করা হয়েছে, যে বলির নিকট ভগবান বিষ্ণু পাদত্রয় ভূমি দান হিসেবে নিতে গিয়ে তাঁকে সুতলে স্থাপিত করেছিলেন।

বিরোচনপুত্র বলি যে বেদোত্তর সংস্কৃতিতে এক বিশেষ স্বীকৃতিলাভ করে-ছিলেন—অথর্ববেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় বর্ণিত বামনরূপী বিষ্ণুর তৃতীয় পদবিস্তারের দ্বারা তাবৎ লোকত্রয়ে অধিকার বিস্তারের বিবরণ থেকেই সে-কথা উপলব্ধি করা যায়। অথর্ববেদ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে বর্ণিত বিষ্ণুর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার এই রূপক কাহিনী পুরাণে সবিশেষ বিস্তৃতিলাভ করেছিল। বিষ্ণুপুরাণে অসুরদের যে বংশবিবরণ পাওয়া যায় সেই বংশাবলির নির্দেশে কশ্যপের অন্য এক পত্নী দনুর গর্ভে জাত বৃষপর্বা নামে এক প্রখ্যাত পুত্রের উল্লেখ আছে। এই বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠার সঙ্গে ইলা-সুদ্যুম্নের বংশজাত যযাতির পরিণয়ের বিবরণ পৌরাণিক সূত্রে এবং মহাভারতেও পাওয়া যায়। এই বংশ-ধারার বিবরণে দিতির বংশজাত বলির তৃতীয় উত্তরাধিকারী এবং দনুর বংশ-জাত বৃষপর্বাকে হিরণ্যকশিপুর সমকালীন বলে গণ্য করা চলে। পুরাণ গ্রন্থগুলিতে ইক্ষ্বাকুর অধস্তন তৃতীয় পুরুষ পুরঞ্জয়ের সময়ে দেবাসুর সংগ্রাম-ঘটিত এক উপাখ্যানের বিস্তৃত বর্ণনা আছে (বিষ্ণু ৪।২:২০-৩২)।

কৌতূহলোদ্দীপক এই আখ্যায়িকায় বর্ণিত আছে যে, এই পুরঞ্জয়ের রাজত্ব-কালে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে এক প্রচণ্ড সংগ্রামের সম্ভাবনা দেখা দিলে দেবতারা পুরঞ্জয়ের সমীপে উপস্থিত হয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন। পুরঞ্জয় এক শর্তে দেবতাদের সাহায্যদানে স্বীকৃতি দেন। তিনি বলেন যদি যুদ্ধের সময় দেবতাদের অধিপতি ইন্দ্র পুরঞ্জয়কে তাঁর স্কন্ধে বহন করতে রাজি হন, তবেই তিনি তাঁদের সাহায্য করবেন। এই প্রস্তাব স্বভাবতই অত্যন্ত হীনতাব্যঞ্জক, তা সত্ত্বেও দেবতারা পুরঞ্জয়ের এই প্রস্তাবে স্বীকৃতিদান করেন এবং ইন্দ্র বৃষরূপ ধারণ করে পুরঞ্জয়কে যুদ্ধক্ষেত্রে বহন করলে পুরঞ্জয়ের বিক্রমের ফলে দৈত্যেরা পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। বৃষরূপধারী ইন্দ্রের স্কন্ধারূঢ় হওয়ার ফলে পুরঞ্জয় কাকুস্থ নামে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন। যদিও প্রত্যক্ষভাবে ঋগ্বেদে কাকুস্থের নামোল্লেখ নাই, তাহলেও কাকুস্থের অস্তিত্ব এবং খ্যাতি সম্পর্কে বৃহদ্দেবতার সমর্থন উল্লেখ করা যেতে পারে। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের উনবিংশতিতম মন্ত্রের সঙ্গে অন্য কয়েকটি মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে (ঋ ৮।১৯, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭) কাকুস্থের নামের উল্লেখ পাওয়া যায় (ঋষে বরং বৃণীষ্বেতি প্রহস্তমৃষিরব্রবীৎ/কাকুৎস্থ কন্যাঃ পঞ্চাশদ্ যুগপদ্রময়ে প্রভো—বৃহদ্দেবতা ৬।৫৪)।

বিষ্ণুপুরাণে দেবাসুর সংগ্রামের আরও একটি কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী আছে, যার কিছু অপ্রত্যক্ষ সমর্থনও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। এই কাহিনীর নায়কের নাম 'রজি'; পুরাণোক্ত বংশাবলী অনুসারে রজি ছিলেন ঐলবংশের পুরূরবার পুত্র আয়ুর চতুর্থ পুত্র। আয়ুর জ্যেষ্ঠপুত্র নহুষ; অন্য চারপুত্রের নাম যথাক্রমে ক্ষত্র-বৃদ্ধ, রম্ভ, রজি ও অনেনা। ঋগ্বেদে নহুষ এবং যযাতির উল্লেখ আছে, যদিও তাদের পিতাপুত্র সম্বন্ধ ঋগ্বেদে উল্লিখিত হয় নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে অবশ্য এরা সবাই কাল্পনিক।

একবার দেবাসুর সংগ্রাম উপস্থিত হলে দেবতা ও অসুর উভয় পক্ষই ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ পক্ষ জয়লাভ করবে। উত্তরে ব্রহ্মা বলেন যে, রজি যে পক্ষে শস্ত্রধারণ করবেন সেই পক্ষেরই জয়লাভ হবে। এ কথা শুনে প্রথমে দৈত্যগণ রজির সাহায্য প্রার্থনা করলে রজি বলেন যে দেবতাদের পরাজিত করলে যদি দৈত্যেরা তাঁকে তাদের ইন্দ্র বলে স্বীকার করে, তবেই তিনি তাদের পক্ষে শস্ত্র-ধারণ করবেন। প্রত্যুত্তরে রজির এই প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়ে দৈত্যগণ বলে যে তাদের (অর্থাৎ দৈত্যদের) ইন্দ্র তো প্রহ্লাদই আছেন; তারা অন্য কাকেও তাদের

ইন্দ্র বলে গ্রহণ করতে পারবে না। দৈত্যেরা রজির সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলে দেবতারা রজির সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁদের সাহায্য করতে অনুরোধ করেন। রজি তাদেরও সাহায্যের ঐ শর্তেরই উল্লেখ করেন। দেবতারা কিন্তু এই শর্তই গ্রহণ করেন এবং বলেন 'আপনিই আমাদের ইন্দ্র হবেন'। পরে রজি দৈত্যদের সম্পূর্ণ পরাজিত করলে চতুর ইন্দ্র রজির দুই পা নিজের মস্তকে স্থাপন করে বলেন, 'ভয় থেকে পরিত্রাণকারী এবং অন্নদাতা, পিতারই সমান এবং আপনি আমার পিতা।' এই কথা শুনে রজি ইন্দ্রের প্রতি প্রীতিবশত তাঁর ইন্দ্রত্বের দাবি পরিহার করেন। কিন্তু রজির পুত্র পিতার উত্তরাধিকার লাভ করে পিতার ইন্দ্রত্বের দাবি পুনরুজ্জীবিত করেন এবং ইন্দ্রকে পরাজিত করে নিজে ইন্দ্রের অধিকার পরিচালনা করতে শুরু করেন। ইন্দ্রত্বলাভ করবার পর রাজ্যাধিকারচ্যুত শতক্রতু ব্রহ্মার নিকট আপন দুর্ভাগ্যের কথা জ্ঞাপন করলে ব্রহ্মা শতক্রতুর প্রতি প্রীতিবশত রজিপুত্রের বুদ্ধিকে মোহিত করেন। ফলে রজিপুত্র ব্রাহ্মণ বিরোধী, ধর্মত্যাগী ও বেদবিমুখ হয়ে পড়েন (তে চাপি তেন—ব্রহ্মদ্বিষো ধর্মত্যাগিনো বেদবাদ পরাঙ্মুখ বভূবুঃ—বিষ্ণুপুরাণ ৪।৯:২০)। ইতিমধ্যে ব্রহ্মা শক্রের তেজবৃদ্ধির জন্য প্রভূত যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করেছিলেন। রজিপুত্র নানা পাপ আচরণের ফলে দুর্বল হয়ে পড়লে ব্রহ্মার অনুষ্ঠিত যজ্ঞের দ্বারা অনুগৃহীত ইন্দ্র রজিপুত্রকে নিহত করে আপন ইন্দ্রত্ব পুনরুদ্ধার করেন।[৯] ঋগ্বেদে রজির উল্লেখ এবং ইন্দ্র কর্তৃক রজির নিহত হওয়ার সংবাদ বর্ণিত আছে।[১০] তবে সেখানে রজি ও ইন্দ্রের বিরোধের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে এই ঘটনার উল্লেখ থেকে ঘটনাটির ঐতিহাসিকত্ব স্বীকৃত হতে পারে।

পুরাণে বর্ণিত এই দেবাসুর বিরোধজনিত সংবাদসমূহ বিষ্ণুর দেবতারূপে প্রাধান্যলাভের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। পুরাণে প্রদত্ত বংশাবলী অনুসারে বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকুর পুত্র বিকুক্ষি (যিনি শশাদ নামেও পরিচিত), বিকুক্ষির পুত্র পুরঞ্জয়, যিনি বৃষরূপধারণকারী ইন্দ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করে দৈত্যদের পরাজিত করেছিলেন। এরই সমান্তরালে এই বৈবস্বত মনুর অন্য এক অবস্তন বংশে আছে সুদ্যুম্ন, যিনি নারীত্বলাভ করে চন্দ্রপুত্র বুধের সঙ্গে পরিণীতা হয়ে পুরুরবা নামে পুত্র উৎপন্ন করেন। পুরুরবার পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র যযাতি, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজি ও অনেনা।

মনু বৈবস্বত
(কোনও কোনও পুরাণে
এই মনুকে শ্রাদ্ধদেব নামেও
অভিহিত করা হয়েছে)

মনুর অধস্তন বংশাবলীর বিন্যাসে পরিলক্ষিত হয় যে ইক্ষ্বাকুর তৃতীয় বংশধর পুরঞ্জয়ের নিকটও দেবতারা একবার সহায়তা প্রার্থনা করেছিলেন। সেখানে ঐ পুরঞ্জয় ভগবান বিষ্ণুর প্রসাদেই অসুরদের পরাজিত করেছিলেন। (ততশ্চ শতক্রতোর্বৃষরূপধারিণঃ ককুদি স্থিতোঽতিরোষসমন্বিতো ভগবতশ্চরাচরগুরোরচ্যুতস্য তেজসাপ্যায়িতো দেবাসুরসংগ্রামে সমস্তানেবাসুরান্নিজঘান—বিষ্ণু ৪।২:৩১)। এখানে উল্লেখ্য যে অতি বলবান দৈত্য কর্তৃক পরাজিত হয়ে দেবগণ বিষ্ণুর আরাধনা করলে আদি-অন্তহীন অশেষ জগৎপাবায়ণ নারায়ণ দেবতাদের বলেন যে রাজর্ষি শশাদের পুত্র পুরঞ্জয়ের দেহে তিনি অংশমাত্রে অবতীর্ণ হয়ে দৈত্যদের বিনাশ করবেন, দেবতারা যেন পুরঞ্জয়ের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই বর্ণনা প্রসঙ্গে দৈত্যদের সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের 'তত্র চাতিবলিভিরসুরৈরমরাঃ পরাজিতাস্তে ভগবন্তং বিষ্ণুমারাধয়াঞ্চক্রুঃ'—এই উক্তিতে দেবতাদের পরাজয়ের কারণ হিসেবে 'তত্র চাতিবলিভিরসুরৈঃ' কথাটি প্রায় প্রত্যক্ষভাবেই দৈত্যরাজ বলির উল্লেখ বলে প্রতীয়মান হয়। পুরাণ বর্ণনামতে দৈত্যরাজ বলি দুইবার দেবতাদের পরাজিত করেছিলেন। একবার এই পরাজয়ের পর দেবতাদের দ্বারা বলি নিহত হলে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বলিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। পুনর্জীবনপ্রাপ্ত বলি প্রভূত বীর্যবান হয়ে ত্রিলোকের উপর আধিপত্য বিস্তার করলে ভগবান আদিত্য—বিষ্ণু বামনরূপে ত্রিপাদ বিস্তার করে ত্রিলোক অধিকার করেন এবং ইন্দ্রকে সেই অধিকারে অধিষ্ঠিত করেন। আদিত্য দেবতা বিষ্ণু বামনরূপে এই বৈবস্বত মন্বন্তরেই আবির্ভূত হয়েছিলেন; দৈত্যরাজ বলিও এই বৈবস্বত মন্বন্তরেরই ঋষি কশ্যপের পত্নী দিতির গর্ভজাত হিরণ্যকশিপুর বংশধর, প্রহ্লাদের পৌত্র এবং বৈরোচনের পুত্র।
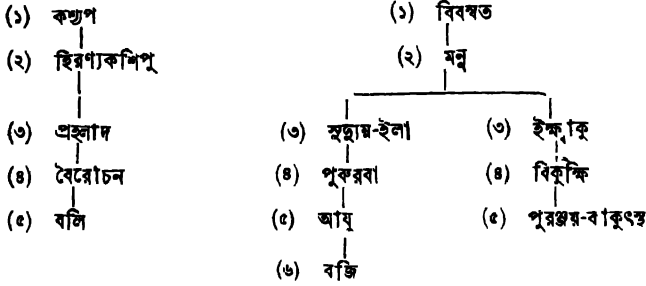
এই বংশতালিকা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে পুরঞ্জয় এবং রজি ইক্ষ্বাকু ও ইলার দুই বংশধর, এবং তাঁরা সেই দৈত্যরাজ বলিরই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবেই জিজ্ঞাসা জাগতে পারে, কেন দৈত্য এবং দেবতা এই উভয় বিবদমান সম্প্রদায়ই ইক্ষ্বাকুর বংশধরদের নিকট সহায়তা প্রার্থনা করেছিলেন। ঋগ্বেদে নানা প্রসঙ্গে দানব, অসুর, দাস এবং দস্যু এইসব শব্দকে সমার্থবাচক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঋগ্বেদের দানব এবং অসুরেরা যে অনেক ক্ষেত্রেই পৃথিবীর অধিবাসী এবং বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, প্রভূত ঐশ্বর্যসম্পদের মালিক এবং পুর ও প্রাসাদে বসবাসকারী সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ জনগোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন এ সত্য একান্তই স্বতঃসিদ্ধ। ঐতিহাসিক দিক থেকে ইন্দ্রপরিচালিত, দেবতা নামে পরিচিত যে জনগোষ্ঠী অসুরদের পুর-দুর্গাদি মাঝে মাঝে বিধ্বস্ত করত, তাঁরাও নিঃসন্দেহে পৃথিবীর অধিবাসী সাধারণ মানুষই ছিলেন। এই বংশধারার সমান্তরালতা ঋষি কশ্যপের বংশবৃত্তান্ত থেকেও প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। প্রজাপতির অন্যতর সন্তান মারীচি। মারীচির সন্তান কশ্যপ, যিনি দক্ষের ত্রয়োদশ কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। বর্তমান মন্বন্তরের সমস্ত জীবই ঋষি কশ্যপের এই ত্রয়োদশ পত্নীর সন্তান। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের এক শত চতুর্দশতম মন্ত্রে এই প্রসঙ্গের ইঙ্গিত আছে।[১১] বৃহদ্দেবতাতেও বিস্তৃতভাবে এই কশ্যপ-দক্ষকন্যাজাত প্রজন্মের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১২] বৃহদ্দেবতার এই তালিকায় কশ্যপপত্নীদের সন্তানদের যে তালিকা আছে তাতে দেব, অসুর, গন্ধর্ব, উরগ, রাক্ষস, পক্ষী, পিশাচ ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। এই তালিকায় দিতি এবং দনুর সন্তানেরা দৈত্য ও দানব এবং অদিতির সন্তানেরা আদিত্য দেবতা নামে পরিচিত। এই সূত্রে অন্যতম আদিত্য ত্বষ্টৃর কন্যা এবং বিবস্বতের পুত্র মনুর সন্তানেরাও দেবতা বলে গণ্য হওয়ার অধিকারী। ঋগ্বেদে সোমের সঙ্গে ইন্দ্রের নৈকট্য উভয়কে প্রায় এক ও অভিন্নরূপে প্রতিপন্ন করেছে। এই যুক্তিতে

সোমের অধস্তন পুরুরবার বংশই সম্ভবত এই মর্তলোকে নরেন্দ্র পদবীর অধিকারী বলে গণ্য হ'ত। এই যুক্তিতে আরও মনে হয় ইন্দ্রত্বের অধিকার নিয়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। পুরাণের সমর্থন থেকে আরও অনুমান করা চলে যে বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রারম্ভে এই ইন্দ্রত্বের অধিকার কোন একটি জনগোষ্ঠীর উপর বর্তেছিল, যাঁরা ছিলেন ইন্দ্রের অনুগামী, অসুরবিরোধী এবং যজ্ঞবাদী। এই নূতন রীতির যজ্ঞের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন বিবস্বতের পুত্র মনু। ইন্দ্রানুগামী ও অসুরবিরোধী সমাজ এই মনুর বংশধরদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল, যেহেতু দেখা যায় যে ইক্ষ্বাকুর পৌত্র পুরঞ্জয় দেবাসুর সংগ্রামে অসুরদের বিধ্বস্ত করেছিলেন; আবার ইলা-সুদ্যুম্নের পুত্র পুরুরবার পৌত্র রজিও অসুরদের পরাভূত করেছিলেন। পুরঞ্জয়ের ক্ষেত্রে ইন্দ্র বৃষভরূপে পুরঞ্জয়কে বহন করেছিলেন, স্বভাবতই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, যে-জনগোষ্ঠী অসুরদের দ্বারা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পুরঞ্জয়ের সহায়তা প্রার্থনা করেছিল সেই জনগোষ্ঠীরই অধিপতি ইন্দ্র নামে পরিচিত ছিলেন; অর্থাৎ ইক্ষ্বাকু নিজে বা তাঁর কোন বংশধরই ইন্দ্র নামে পরিচয়লাভ করেননি। তেমনি চন্দ্র বা সোম বংশের রজিও ইন্দ্র নামের অধিকারী ছিলেন না; পুরঞ্জয় অসুরবিরোধী অন্য জনগোষ্ঠীর অধিনায়ক ইন্দ্রকে শর্ত দিয়েছিলেন যুদ্ধকালে তাঁকে স্কন্ধে বহন করতে হবে। ইন্দ্রের মর্যাদাকে এইভাবে ক্ষুণ্ণ করলেও পুরঞ্জয় নিজে ইন্দ্র বলে স্বীকৃতিলাভ করবার দাবি করেননি। কিন্তু রজি যুদ্ধজয়ের পর নিজে দেবতা নামে পরিচিত জনগোষ্ঠী দ্বারা ইন্দ্র বলে স্বীকৃত হওয়ার দাবি করেছিলেন এবং তিনি সমকালীন ইন্দ্র বলে প্রতিষ্ঠিত তাঁর সাহায্যপ্রার্থীর অনুনয়ে নিজে সেই অধিকারের দাবি ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই শর্তের উপর নির্ভর করে রজির পুত্র তৎকালীন ইন্দ্রের হাত থেকে ইন্দ্রত্ব অর্থাৎ দেবতা নামে পরিচিত জনগোষ্ঠীর অধিনায়কত্ব অধিগ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তবে রজির পুত্র সে অধিকার বজায় রাখতে পারেননি; তিনি ব্রাহ্মণবিদ্বেষী ও ধর্মচ্যুত হয়ে পড়লে প্রকৃত ইন্দ্রত্বের অধিকারী তাঁকে নিহত করে আপন অধিনায়কত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পুরাণে এই রজিপুত্রের নামের কোন উল্লেখ নাই। ঋগ্বেদে ইন্দ্র এক রজিকে নিহত করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে, যদিও সেখানে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

ইন্দ্র-রজিঘটিত বিবরণের বৈদিক সমর্থন থেকে সমকালীন ঘটনার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মনুর সন্তান হিসেবে ইক্ষ্বাকুর দেবত্বের দাবি ছিল কিন্তু তাঁর

অধিনায়কত্বের স্বীকৃতি থাকলেও তিনি ইন্দ্র আখ্যায় অভিহিত ছিলেন না। সোম-চন্দ্রের উত্তরাধিকারী সুদ্যুম্ন-ইলার সন্তান পুরূরবার অন্যতম উত্তরপুরুষ রজিরও ইন্দ্র আখ্যায় পরিচিতি ছিল না; কিন্তু তাঁর ইন্দ্রত্বের অভিলাষ ছিল। সে সময়ে যিনি ইন্দ্র তাঁর পরিবর্তে ইক্ষ্বাকুর যেমন ইন্দ্ররূপে স্বীকৃত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না বলেই তিনি অসুরদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েও ইন্দ্রত্বের দাবি করেননি। কিন্তু রজি সে দাবি করেছিলেন এবং ইন্দ্র তাঁকে পিতা বলে স্বীকার না করলে তিনি সেই দাবিতে ইন্দ্র বলে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতেন। এই বিবরণ থেকে অনুমান করা অন্যায় নয় যে রজি ইন্দ্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে ইন্দ্রের যে সম্পর্ক তাতে তাঁকে পিতা বলে স্বীকার করে নিতে সমকালীন ইন্দ্রের কোন দ্বিধা ছিল না। পুরাণের বংশতালিকা মতে ইক্ষ্বাকু বংশের পুরঞ্জয় বা পুরঞ্জয়ের পুত্র অনেনা এবং পুরূরবার বংশের যযাতিকে রজির সমসাময়িক গণ্য করা চলে। দেবাসুর সংগ্রামে পুরঞ্জয় দেবতাদের পক্ষে অসুরদের একবার প্রতিহত করলেও এর অব্যবহিত পরেই অসুরেরা পুনরায় দেবতাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। এইবার দেবতারা পুরঞ্জয় বা তাঁর পুত্র অনেনা কিংবা সমসাময়িক ঐল বংশের যযাতির সহায়তা প্রার্থনা না করে রজির সহায়তা প্রার্থনা করেছিলেন কেন, তার কোন কারণ পুরাণ কাহিনীতে উল্লেখ নাই। পুরাণে পুরঞ্জয়ের সাহস ও শৌর্যের উল্লেখ আছে কিন্তু অনেনার কেবল নামের উল্লেখ ছাড়া অন্য কিছু নাই। দেবাসুরের পুনরায় দ্বন্দ্ব ঘটলে দেবতারা রজির সাহায্য প্রার্থনা করলেন, যদিও রজির আরও জ্যেষ্ঠ তিন ভ্রাতা ছিলেন; নহুষ ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। দ্বিতীয় ক্ষত্রবৃদ্ধ এবং তৃতীয় রম্ভ। পুরাণে আয়ুর জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসেবে নহুষের উল্লেখ থাকলেও তাঁর সম্পর্কে বিস্তৃত কোন বিবরণ নাই। আয়ুর বংশধরদের মধ্যে ক্ষত্রবৃদ্ধ, পুত্রহীন রম্ভ এবং রজির বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বিষ্ণুপুরাণ নহুষের পুত্র যযাতির প্রসঙ্গের অবতারণা করেছে দেখা যায়। নহুষকে এই প্রধান বৈষ্ণবীয় পুরাণে কোন বৈশিষ্ট্যই প্রদান করা হয়নি কিন্তু যযাতি সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে তাঁর চরিত্র এবং ক্রিয়াকলাপের বিস্তৃত বিবরণ গ্রথিত করা হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। এই বংশের, বিশেষত ইলা থেকে যযাতির পাঁচ পুত্রের বংশতালিকা অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে বারোটি পুরাণে (বিষ্ণু, বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, হরিবংশ, ভাগবত, লিঙ্গ, কূর্ম ইত্যাদি), রামায়ণে (৭।৫৬:২৫-২৭)

এবং মহাভারতে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এইসব রাজন্যের মধ্যে পুরুরবার কাহিনী ঋগ্বেদে (১০।৯৫), শতপথ ব্রাহ্মণে এবং অন্যান্য পুরাণে, এবং নহুষ, যযাতি, যদু, তুর্বসু, দ্রুহ্যু, অনু এবং পুরুর উল্লেখ ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়।

পুরাণের মতে আয়ুর পত্নী ছিলেন প্রভা; তিনি ছিলেন নহুষ ইত্যাদি আয়ুর পুত্রের মাতা এবং অসুর স্বরভানুর কন্যা। দেবাসুর সম্পর্কিত বিবরণে এই স্বরভানুর কন্যা প্রভার সঙ্গে আয়ুর পরিণয়ের সংবাদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বরভানুকে মহাভারতে দানবরাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে (১।৬৫।২৫৩২; ৬৭।২৬৪৮; ১২।২২৭।৮২৬২)। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রেও স্বরভানুর উল্লেখ আছে একজন অসুর হিসেবে (ঋগ্বেদ ৫।৪০)। পুরাণে যে স্বরভানুর কন্যা প্রভার উল্লেখ আছে (বিষ্ণু ১।২১: ৪-৭) তাঁকে কশ্যপের অন্যতরা পত্নী দনুর সন্তান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাণের বিবরণ থেকে প্রতিপন্ন হয় যে কশ্যপের দুই পত্নী দিতি এবং দনুর পুত্রেরাই যেমন দৈত্য এবং দানব নামে অভিহিত হ'ত তেমনি তারা সাধারণ ভাবে অসুর নামেও পরিচিত ছিল। কশ্যপের অন্যতর পত্নী অদিতির পুত্রেরা আদিত্যরূপে দেবতা বলে পরিগণিত হলে দিতি ও দনুব পুত্রেরা দেবতাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অসুর আখ্যালাভ করেছিল। এই বিবরণ থেকে প্রতীয়মান হয়, আদিত্যরূপে গণ্য ত্বষ্টৃ এবং বিবস্বত থেকে উদ্ভূত জনগোষ্ঠীই এই আদিত্য দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের অনুগামী এবং দেবতাপূজক বলে গণ্য হয়েছিল। দিতির পুত্র হিরণ্যকশিপু ও তদধস্তন প্রহ্লাদ, বিরোচন, বলি এবং বান এবং দনু থেকে উৎপন্ন দ্বিমূর্দ্ধা, শম্বর, তারক, স্বর্ভানু, বৃষপর্বা এবং বিপ্রচিত্তির এই নূতন দেবগোষ্ঠীর প্রতি কোন আনুগত্য ছিল না; তাঁরা পূর্বতন অসুর নামে পরিচিত উপাস্যদের প্রতিই আনুগত্যশীল থাকায় দেবযাজী জনগোষ্ঠী থেকে স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন অসুরগোষ্ঠী নামে পরিচয়লাভ করেছিলেন। এবং নানা কারণেই এই উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আত্মপ্রকাশ করেছিল।

এই উভয় গোষ্ঠীর মধ্যেই বিষ্ণুর স্বীকৃতি ছিল বলে অনুমান করা চলে, যখন দেখা যায়, দিতির পুত্র হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদকে প্রবল বিষ্ণুভক্তরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাণে হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষের কীর্তিকাহিনী বর্ণনায় বরাহরূপী ভগবান বিষ্ণুর পৃথিবী উদ্ধারের বিবরণ পাওয়া যায়। যে বিশেষ ধরনের যজ্ঞ ইন্দ্রকে প্রাধান্য অর্জনে সহায়তা করেছিল সেই যজ্ঞে বিষ্ণুই ছিলেন

প্রধান হোতব্য ; বলা চলে, যজ্ঞ আর বিষ্ণু সেই পরিকল্পনায় এক ও অভিন্ন বলে গণ্য হয়েছিলেন। ত্রিলোকবিজয়ী বলির সফলতার পেছনেও যজ্ঞের অবদান ছিল যা যজ্ঞপরায়ণ মহর্ষি ভৃগুর পুত্র বলিরাজের গুরু শুক্রের উল্লেখ থেকে উপলব্ধি করা যায়। ঋগ্বেদে ভৃগুকেই যজ্ঞকর্মের প্রথম প্রবর্তক বলা হয়েছে। অসুররাজ বলি সামরিক শক্তিতে লোকত্রয় অধিকার করে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করছিলেন ; সেই যজ্ঞের আসরেই বামনরূপে ব্রাহ্মণবেশধারী বিষ্ণু সমুপস্থিত হয়ে তাঁর তিন পদক্ষেপে যে সামান্য ভূমি আবৃত হবে সেই পরিমাণ ভূমি দান হিসেবে প্রার্থনা করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে আকৃতিতে বামনরূপী হলেও যজ্ঞরূপী সেই বামন বিষ্ণুর বিশ্ব আবৃত করবার ক্ষমতা জ্ঞাত থাকায় ভার্গব-শুক্র, শিষ্য বলিকে সেই দান থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন; কিন্তু মহানুভব বলি তাঁর সত্যলঙ্ঘনে স্বীকৃত হলেন না, গুরুর অনুরোধেও ; এই সত্যপালনের জন্যেই, বামন বিষ্ণুকে সমস্ত অধিকার সমর্পণ করে তাঁর তৃতীয় চরণ স্বকীয় মস্তকে ধারণ করে বলি ধন্য হলেন। ভগবান বিষ্ণুও এই সত্যসন্ধ অসুররাজকে একেবারে বঞ্চিত করলেন না ; তিনি ত্রিলোকের এক অংশ সুতলে বলিকে স্থাপন করলেন।

বৈদিক গ্রন্থাদির ভিত্তিতে আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা

অথর্ববেদ থেকে আরম্ভ করে সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও পুরাণসমূহে বামনরূপী বিষ্ণুর ত্রিলোক অধিকার করবার এই কাহিনীর বারংবার উল্লেখ এবং পুরাণ ও মহাভারত কাহিনীতে অসুররাজ বলিকে এই কাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত করা হয়েছে। বেদের কাহিনী নিয়ে বহু ইউরোপীয় ও ভারতীয় গবেষক বিস্তৃত গবেষণা করেছেন। এতদিন এইসব কাহিনী-প্রকল্প বেদ ও বেদপরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। বর্তমান শতাব্দীতে হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উন্মোচনে সেই বৈদিক উপাখ্যানসমূহের নূতন পরিপ্রেক্ষিত প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু এখনও বৈদিক সাহিত্যের কাহিনী ও ইতিবৃত্তগুলিকে যুক্তির পরিধিতে এনে ব্যাখ্যার চেষ্টা না করে সেগুলিকে ইচ্ছামত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একান্ত কাল্পনিক বলে অবহেলা করার প্রবণতাই প্রচলিত রয়েছে দেখা যায়।

অথর্ববেদ ও ব্রাহ্মণগুলিতে বামনরূপী বিষ্ণুর এই ত্রিপাদ বিস্তারের কাহিনী বর্ণনায় দেবতাপক্ষে ইন্দ্রের উল্লেখ থাকলেও অসুরপক্ষে কোন অধিনায়কের

উল্লেখ নাই। ঋগ্বেদে বহুবার বিষ্ণুর এই পদবিস্তারের উল্লেখ আছে যার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিষ্ণুর এই তিন পদবিস্তারকে সূর্যের উদয়, মধ্যাহ্ন ও অস্ত বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ইঙ্গিতপূর্ণ তৃতীয় পদক্ষেপের মহিমা যে সেই বেদবাদী সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে পরিগণিত হয়েছিল, পরবর্তী যুগের শিল্পে ত্রিবিক্রমরূপী বামনাবতারের মূর্তির ব্যাপক জনপ্রিয়তা, এখানে সেখানে, বিশেষ করে গয়াধামে বিষ্ণুপদচিহ্নের পূজা, এবং পদচিহ্নের এই প্রতীকী গুরুত্বের ব্যাপক স্বীকৃতির মধ্যে নিহিত আছে বলে উপলব্ধি করা যায়। বিষ্ণু-ভিত্তিক পদচিহ্নের এইরূপ গুরুত্ব বৌদ্ধ এবং জৈনমানসেও সংক্রামিত হয়েছিল। প্রারম্ভিক বৌদ্ধশিল্পে ভগবান বুদ্ধের উপস্থিতিকে প্রতিপন্ন করবার জন্য পদচিহ্নের ব্যাপক ব্যবহার ঋগ্বেদ আশ্রিত সেই বিষ্ণুর পদক্ষেপ পরিকল্পনার ইঙ্গিতগর্ভতা থেকেই গৃহীত হয়েছিল। পৃথিবীর অন্য কোন সংস্কৃতিতে পদচিহ্নের এইধরনের বিপুল প্রতীক-গর্ভতা পাওয়া যায় না। ভগবান বিষ্ণুর আধ্যাত্মিক সর্বব্যাপকতা, অন্যান্য তাবৎ দেবসত্তাকে অতিক্রম করে অকল্পনীয়, অচিন্ত্যনীয়, সমগ্র সৃষ্টিকে আত্মস্থকারী পরমসত্তারূপে পরিগণিত হওয়ার নির্দেশক। তথাকথিত আর্যসংস্কৃতির অংশ-ভাক্ অসুরসমাজ বিষ্ণুভগবানের এই সামগ্রিকতা সম্বন্ধে সচেতন থাকলেও এই সমাজের অন্যতর অংশে বিষ্ণুর প্রতি নিভর অনেক ব্যাপকতা, গভীরতা এবং ঐকান্তিকতা লাভ করেছিল। ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে তাই বারবার এই বিষ্ণুর উপর নির্ভরশীল হওয়ার উল্লেখ দেখা যায়। বৈদিক সংস্কৃতিতে বিষ্ণু অন্য সকল দেবতাকে অতিক্রম করে এই ত্রিপদবিস্তারী রূপেই এক অনতিক্রমণীয় প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন। (ত্রেধা নিদধে পদম্—ঋ ১।২২।১৭; পৃথিব্যাম্ অন্তরীক্ষে দিবি—নিরুক্ত ১২।১৯; তেন মেধাতিথিঃ প্রাহ বিষ্ণুমেনং ত্রিবিক্রমম্—বৃহদ্দেবতা ২।৬৪)। ভগবান বিষ্ণুর এই অনতিক্রমণীয় বৈশিষ্ট্য এবং প্রাধান্য অর্জন ঋগ্বেদের কালের প্রারম্ভেই যে হয় নাই তা ঋগ্বেদে বিষ্ণুর স্বল্প উল্লেখ এবং তাঁকে যে সেখানে তেমন বৈশিষ্ট্য আরোপ করা হয়নি তা থেকেই উপলব্ধি করা যায়। তাবৎ ঋগ্বেদে বিষ্ণুকে আদিত্যদেবতার স্বীকৃতিও দেওয়া হয় নাই। ঋগ্বেদের সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিস্তারের স্মৃতি যে দুই দেবতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেই ত্বষ্টৃ এবং বিবস্বত, উভয়কেই ঋগ্বেদে আদিত্য দেবতার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, যদিও এই দু'জনই অন্যান্য আদিত্য দেবতা—যেমন বরুণ, মিত্র, ভগ, অর্যমন, দক্ষ এবং অংশের মত প্রতীক ভিত্তিক ছিলেন না। সম্ভবত এঁরা মানুষই ছিলেন। এঁদের মধ্যে ত্বষ্টৃকে বলা হয়েছে

পূর্বগামী বা অগ্রজ। এরই কন্যা সরণ্যু বিবস্বতের পত্নী। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে যে ত্বষ্টৃ ভৃগুদের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছিলেন।[১৩] মহাভারত বলছেন, পিতৃকন্যা 'গো'র গর্ভে ভৃগুপুত্র শুক্রের চার সন্তান উৎপন্ন হয়েছিল; তাদের নাম বলা হয়েছে যথাক্রমে ত্বষ্টৃ, বরুত্রিন, শণ্ড (বা ষণ্ড) এবং মর্ক।[১৪] দেবতা এবং অসুর বিষয়ে বর্তমান আলোচনায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়াস করা হয়েছে সেই প্রয়াসে মহাভারতে লভ্য এই তথ্যটির গুরুত্ব অসাধারণ বলে গণ্য হতে পারে। এখানে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে যে দেবতা এবং অসুরেরা বেদের বর্ণনাসূত্রে একই জনগোষ্ঠী সম্ভূত ছিলেন। এই মূল জনগোষ্ঠী কোন বিশেষ কারণে দেব সম্প্রদায় নামে জনগোষ্ঠীর মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছিলেন। মূল বৈদিক সাহিত্য ছিল তাঁদেরই সৃষ্টি, এবং তাঁদের উদ্ভব, বিবর্তন, সংস্কৃতি এবং জীবনচর্যার দলিল। মহাভারতে বর্ণিত মহর্ষি ভৃগু ছিলেন এক অত্যন্ত প্রখ্যাত ঋষি, যাঁর পরিচয় ঋগ্বেদেও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। ভৃগুর বংশে শুক্রাচার্যের জন্ম হয়, যাঁর পরিচয় ঋগ্বেদে উশনস নামে। শুক্রাচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মহাভারতে বলা হয়েছে ত্বষ্টৃ। সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে 'ত্বষ্টৃ' নামে একজন মানুষেরই উল্লেখ আছে, ঋগ্বেদে যাকে ইন্দ্র এবং বিশ্বরূপের এবং কন্যা সরণ্যুর পিতা নামে বর্ণনা করা হয়েছে। এই তথ্যের ভিত্তিতেই ইন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে এক বিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর মূল সংস্কৃতি-ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এই সূত্রে ত্বষ্টৃ ভার্গব ঋষিবংশের প্রখ্যাত শুক্রাচার্যেরই সন্তান বলে পুরাণে বর্ণিত হলেও ঋগ্বেদে কোথাও তাঁকে অসুর নামে অভিহিত করা হয়নি, তাঁকে দেবতাই বলা হয়েছে।[১৫] এই যুগের প্রবর্তকরূপে বর্ণিত বিবস্বত ঋগ্বেদে আদিত্য বলে অভিহিত হননি। বিবস্বতের আদিত্য পরিচয়ের উল্লেখ তৈত্তিরীয় সংহিতা (তৈত্তিরীয় সং ৬।৫।৬:২), শতপথ ব্রাহ্মণ (শতপথ ৩।১।৩:৪) ইত্যাদি ঋগ্বেদ পরবর্তী গ্রন্থে পাওয়া যায়। লক্ষণীয় এই যে পরবর্তী বেদানুগ সংস্কৃতির এই দুই আদিপুরুষের কারও সঙ্গেই ভগবান বিষ্ণুর যোগাযোগের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদের কোন মন্ত্রেই বিষ্ণুর সঙ্গে এই দু'জনের কারও নাম উচ্চারিত হতে দেখা যায় না। *অন্য যে-সব দেবতার সঙ্গে বিষ্ণুর উল্লেখ হয়েছে ইন্দ্রই তাঁদের মধ্যে প্রধান; সংখ্যায় সর্বাধিকবার বিষ্ণুর নাম ইন্দ্রের সঙ্গেই উল্লিখিত হয়েছে। ঋগ্বেদের* বর্ণনায় ইন্দ্রই প্রধানত বিষ্ণুর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ, তথা ইন্দ্রের বিষ্ণুর উপর

নির্ভরশীলতাও অত্যন্ত স্পষ্ট। বৃত্রের সঙ্গে সংগ্রামকালে ইন্দ্র একান্তভাবেই বিষ্ণুর সহায়তা প্রার্থনা করেছিলেন ঋগ্বেদে তার উল্লেখ আছে।[১৬] এইসব প্রমাণ থেকে সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক হবে না যে বিষ্ণুকে ইন্দ্রই প্রথমে ইন্দ্র পরিচালিত সমাজে গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ইন্দ্রের পিতৃস্থানীয় পূর্বগামী ত্বষ্টৃ বা বিবস্বতের কালেও এই সমাজে বিষ্ণুর কোন স্বীকৃতি ছিল না।

বেদানুগ শাস্ত্রগ্রন্থে বিষ্ণুর এই অপেক্ষাকৃত নবীন অভ্যুত্থান ও তার পূর্ববৃত্তান্তের সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টিতে আগ্রহের অভাবের ফলেই অনেক প্রখ্যাত বৈদিক গবেষক সিদ্ধান্ত করেছেন যে বৈদিক সমাজে, ভিন্ন কোন সমাজ থেকেই বিষ্ণুকে গ্রহণ করা হয়েছিল। বিষ্ণু-কৃষ্ণ সম্পর্কে গবেষণায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত রুবেন-ই প্রথম প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিলেন যে বিষ্ণু মূলত ছিলেন কোন প্রাক্-আর্য সমাজের দেবতা, যাঁকে আর্যেরা নিজেদেব দেবতা বলে গ্রহণ করেছিলেন।[১৭] রুবেনের এই সিদ্ধান্তের দৃঢ় সমর্থনে এরপর এগিয়ে এলেন সাম্প্রতিককালের অন্যতম প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ গোণ্ডা।[১৮]; রুবেনের প্রাক্-আর্যঅভিধার সংশোধন করে ব্যবহার করলেন 'অনার্য' শব্দ ('Ruben gave the verdict that Vishnu became a great god in post-Vedic times. For this reason I would, for the sake of prudence, state that a deity of his character and functions—was already important in pre-Aryan—I would prefer non-Aryan India')।[১৯] যদিও গোণ্ডা, রুবেন প্রস্তাবিত বিষ্ণুকে আর্যেরা প্রাক্-আর্য বা অনার্য ভারত থেকে গ্রহণ করেছিল এই মত সমর্থন করেছেন, তিনি এ সম্পর্কে নিজে কিন্তু কোন প্রমাণ উপস্থিত করেননি। বস্তুত ইউরোপীয় পণ্ডিতমাত্রেই ভারতে আর্য নামে এক বহিরাগত জাতির আগমন সম্পর্কে কৃতমনস্ক, ফলে ঋগ্বেদের পরিমণ্ডলের বাইরে তাঁরা প্রাক্-আর্য বা অনার্য ভিন্ন অন্য কোন সমাজের অস্তিত্ব লক্ষ্য করতে বা স্বীকার করতে রাজি হন না। ফলে ঋগ্বেদে যদিও দিতির পুত্র দৈত্য এবং দনুর পুত্র দানবদের অদিতির সন্তান আদিত্যদের সঙ্গে একই পিতা কশ্যপ এবং দক্ষ নামে পরিচিত আদিত্য দেবতার তিন কন্যার গর্ভজাত তথা একই বংশজাত বা একই মূল জনগোষ্ঠী সম্ভূত বলে সুনিশ্চিত ভাবে বলা হয়েছে, তা সত্ত্বেও গোণ্ডা, অসুর নামে পরিচিত দনু ও দিতির সন্তানদের অনার্য আখ্যায়ই অভিহিত করেছেন। এই প্রসঙ্গেই বিষ্ণুর অন্যতর

নাম মুকুন্দকে গোণ্ডা আদিবাসী (অষ্ট্রিক) মুণ্ডা জাতি থেকে গৃহীত বলে সিদ্ধান্ত করতে চেয়েছেন দেখা যায়।[২০]

ঋগ্বেদে এমুষাঘটিত কাহিনীতে ইন্দ্র কর্তৃক অন্য কোন স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী থেকে বিষ্ণুকে গ্রহণ করবার ইঙ্গিত আছে বলে কেউ মনে করেছেন বলে আমার জানা নাই। কিন্তু এই কাহিনীতে ইন্দ্র কর্তৃক নিহত এমুষা নামধেয় বরাহকে বিষ্ণু দেবতাদের যজ্ঞরূপে প্রদান করেছিলেন এই বর্ণনা আছে। এখানে এই বরাহকে বৃত্র নামেও অভিহিত করা হয়েছে। বরাহের তীক্ষ্ণ দন্তাঘাতে মৃত্তিকাপৃষ্ঠ উদঘাটিত হলে সেই বিক্ষত মৃত্তিকাপৃষ্ঠে উপ্ত বীজ বারিস্পর্শে শস্যপ্রদ উদ্ভিদ রূপে বিবর্ধিত হয়। আদি বংশপিতারূপে যাঁরা বরাহের উপাসক ছিলেন তাঁরা নিশ্চিতভাবেই বরাহের এই কৃতিত্বের সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এবং শস্যপ্রদ ভূপৃষ্ঠকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করতে অগ্নির সক্রিয়তাও সম্ভবত সেই সমাজের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না। ফলে সেই সমাজকে প্রতিহত করে সেই সমাজের আরাধ্য দেবতা (Totemistic theriomorph) প্রতীকধর্মী পশু বরাহ রূপে বিষ্ণু—ইন্দ্রের সমাজে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। এই বরাহের ইন্দ্রানুগ সমাজে প্রভূত মর্যাদা অর্জনের খুব বিলম্ব হয় নাই। শতপথ ব্রাহ্মণেই এমুষারূপী বরাহ [২১] পৃথিবীর উদ্ধারকর্তারূপে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন। কিন্তু এই বিবর্তন সমাজে সহজে গৃহীত হয়নি। তৈত্তিরীয় সংহিতায় এই বরাহকে প্রজাপতি নামে অভিহিত করা হয়েছে দেখা যায়। শস্যপ্রসূ ভূপৃষ্ঠ জলে আবৃত হলে বরাহের দন্তসঞ্চালনে সেই বারিরাশি প্রবাহিত হয়ে গিয়ে ভূমি জাগ্রত ও শুষ্ক হতে পারে এই পর্যবেক্ষণসম্ভূত সত্য যাঁদের নিকট প্রতিভাত হয়েছিল, তাঁরাই বরাহকে দেবতারূপে গণ্য করেছিলেন এবং তাঁদের নিকট থেকেই যে ইন্দ্রানুগামীরা এই বরাহকে গ্রহণ করেছিলেন এ বিষয়ে হয়ত কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু ঋগ্বেদেই বিষ্ণু কর্তৃক সেই এমুষাকে দেবতাদের নিকট প্রদত্ত হওয়ার উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও তৈত্তিরীয় সংহিতা এই বরাহকে একান্তই ঋগ্বেদ আশ্রিত দেবতা প্রজাপতির সঙ্গে একাত্মক করার মধ্যে এই সমাজে, গোড়াতে বিষ্ণুকে গ্রহণ করবার মধ্যে বেশ কিছু দ্বিধা ও সংশয় ছিল তারই পরিচয় পাওয়া যায়। তবে শতপথ ব্রাহ্মণের রচয়িতারা সে সংশয় ও দ্বিধার প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে একান্তভাবেই বিষ্ণুকে গ্রহণ করেছিলেন, এ সত্যও অতি সুস্পষ্ট। এই শতপথ ব্রাহ্মণেই বামনরূপধারী বিষ্ণুর অসুরদের পরাভূত করে ত্রিলোক অধি-

কার করবার বিবরণ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, যার প্রতিধ্বনি অথর্ববেদ এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও পাওয়া যায়। ক্রমবিবর্তনপথে শতপথ ব্রাহ্মণের রচনাকালেই ভগবান বিষ্ণু পরিপূর্ণভাবে ত্রি-পদবিস্তারী, ত্রিলোক অধিগ্রহণকারী রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। এবং এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে কালের বিবর্তনপথে বিরোচনপুত্র অসুররাজ বলিও উপযুক্ত দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। বলি অনুষ্ঠিত যজ্ঞকালে বামনরূপী বিষ্ণুর ত্রি-লোক সমাচ্ছন্ন করবার কাহিনীর মধ্যে, বলি অনুষ্ঠিত যজ্ঞ অপেক্ষা বিষ্ণুরূপী যজ্ঞের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিতটি অত্যন্ত স্পষ্ট। এই যজ্ঞ, ইন্দ্রের তথা দেবতাদের রীতিতে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, যজ্ঞের প্রথম অনুষ্ঠাতা এবং অসুরদের দ্বারা অনুসৃত যজ্ঞ থেকে সে যজ্ঞ স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতনতাই বলির যজ্ঞগুরু শুক্রাচার্যকে (ভৃগু) বামনরূপী বিষ্ণুর (যজ্ঞের) সঙ্গে সামর্থ্য পরিমাপে (Competition) বাধা দিতে প্রবুদ্ধ করেছিল। ভগবান বিষ্ণু স্বকীয় বক্ষে এই ভৃগুর পদচিহ্ন ধারণ করেছিলেন— অর্থাৎ বিষ্ণুরূপী যজ্ঞ অন্যতর যজ্ঞের প্রবর্তক ভৃগুকে নিজেব মধ্যে গ্রহণ করে সর্বব্যাপকতা অর্জন করেছিলেন। এইভাবেই বিষ্ণু তাবং লোক-ত্রয়ে পরিব্যাপ্ত এক এবং অখণ্ড সত্তারূপে স্বীকৃত হয়েছিলেন এই সিদ্ধান্ত করা যায়।

বামনরূপী বিষ্ণুকে ত্রি-লোকের অধিপত্যে স্বীকৃতি দেওয়ার পর করুণাময় ভগবান বিষ্ণু রাজা বলিকেও অনুকম্পা করেছিলেন। ইন্দ্রের সঙ্গে দানব বৃত্র এবং পুরঞ্জয়ের ও রজির সঙ্গে অসুরকুলের সংগ্রামের পর দীর্ঘকাল ইক্ষ্বাকু বা ইলার বংশের রাজন্যবর্গের সঙ্গে অসুরদের সংঘাত ও যুদ্ধবিগ্রহের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। বরং দেখা যায় নহুষপুত্র যযাতির সঙ্গে অসুররাজ বৃষপর্বার পরমাসুন্দরী কন্যা শর্মিষ্ঠার পরিণয় ঘটেছিল ; শুধু শর্মিষ্ঠার সঙ্গেই নয়, বিপুল যোগশক্তির অধিকারী অসুরগুরু শুক্রাচার্যও তাঁর কন্যা দেবযানীকে যযাতির হস্তে সমর্পণ করেছিলেন, তাঁর পত্নীরূপে। অসুরসমাজের প্রভূত প্রতিপত্তিশালী এই দুই অগ্রণী ব্যক্তির দুহিতাদের গর্ভসম্ভূত উত্তরপুরুষেরাই ঐলবংশের ধারা আশ্রয় করে সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষকে রাজন্যরূপে পোষণ করেছিলেন।

প্রভূত শক্তির অধিকারী, ত্রি-লোক বিজয়ী অসুররাজ বলির হাত থেকে রাজ্যোদ্ধারের পর ইন্দ্র নামে পরিচিত তাঁর অনুগ্রহভাজনকে, ভগবান বিষ্ণু রাজপদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন এই বিবরণ অপ্রত্যক্ষভাবে অথর্ববেদে এবং শতপথ ব্রাহ্মণে এবং প্রত্যক্ষভাবে বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এই

বিষ্ণুর অনুগৃহীত ইন্দ্রের যথার্থ পরিচয় এইসব উপকরণের কোথাও নিশ্চিতভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। ইন্দ্র নামে পরিচিত পুরন্দর আখ্যাধারী যে মহাবীর এমুষা বা বৃত্র বা বিশ্বরূপ নামে পরিচিত ত্বষ্টৃর পুত্রকে নিহত করেছিলেন, ত্বষ্টৃ বা বিবস্বতের সমসাময়িক সেই ইন্দ্র হিরণ্যকশিপুর নিম্নতর তৃতীয় পুরুষ (১. হিরণ্যকশিপু ২. প্রহ্লাদ ৩. বিরোচন ৪. বলি) বলির সমসাময়িক হতে পারেন না। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে ইলার পুত্র পুরুরবাই হয়ত প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রের উত্তরাধিকারী বলে গণ্য হয়েছিলেন। এই পরিচয়সূত্রে নহুষই সম্ভবত বলির সমসাময়িককালে ইন্দ্রত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

রাজা নহুষ ও সরস্বতীর কথা

পুরাণে বর্ণিত ঐল রাজবংশে নহুষ এবং যযাতি যে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন অধিপতি ছিলেন, ঋগ্বেদে তাঁদের নামের উল্লেখ থেকে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের পঞ্চনবতিতম মন্ত্রে নহুষ ও সরস্বতী সম্পর্কিত যে উল্লেখ আছে, সে কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মন্ত্রের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যাস্ক তাঁর নিরুক্তে রাজা নহুষের উল্লেখ করেছেন। এখানে বলা হয়েছে যে, নহুষ সুপ্রাচীনকালে এক রথে আরোহণ করে বহু দীর্ঘকাল ধরে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য একটি উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণ করছিলেন। শেষপর্যন্ত নদী সরস্বতী রাজা নহুষকে তাঁর তীরে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য স্বাগত জানান। ঋষি বশিষ্ঠের উক্তি হিসাবে ঋগ্বেদে এই কাহিনীর উল্লেখ আছে (ঋ ৭।২:৯৫-৯৬)। ঋগ্বেদ সংস্কৃতিতে সরস্বতী প্রখ্যাত নদী এবং তাবৎ ঋগ্বেদীয় সংস্কৃতি বিশেষভাবে এই সরস্বতীকে আশ্রয় করেই বিবর্তিত হয়েছিল। ঋষি এবং রাজন্যবর্গের দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞের আগুন এবং ধোঁয়ায় সরস্বতী ছিলেন পরিপ্লাবিত। পাঞ্জাব ও সিন্ধু অঞ্চলের অন্যান্য নানা নদীর নামও ঋগ্বেদে আছে কিন্তু সরস্বতীই ঋগ্বেদের উদ্গাতাদের নিকট ছিল পবিত্রতম এবং আরাধ্যতম। ঐ অঞ্চলে প্রবাহিত নদনদীর মধ্যে বৃহত্তম এবং প্রধানতম নদী সিন্ধুর উল্লেখ ঋগ্বেদে থাকলেও, এই গ্রন্থে সিন্ধুকে কোন প্রাধান্য আরোপ করা হয়নি। নদী হিসেবে অত্যন্ত বৃহৎ এবং দীর্ঘপ্রবাহী হলেও বেদে এই সিন্ধুর পবিত্রতা স্বীকৃত হয়নি। অন্যদিকে সরস্বতী একসময়ে দেবতা রূপে পরিচিতি লাভ করে ঋগ্বেদের রচয়িতাদের নিকট 'অম্বিতমে নদীতমে দেবীতমে' এই আখ্যায়

এক মহতী মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সরস্বতী একসময়ে 'ইলা' নামেও পরিচয় লাভ করেন। 'ইলা' স্বতন্ত্র দেবী ছিলেন ; মনুর কন্যা এবং পুরুরবার মাতার নামও ইলা। এই 'ইলা'ই নিঃসন্দেহে দেবী আখ্যালাভ করেছিলেন এবং ঐলদের কুলদেবীরূপে গৃহীত হয়েছিলেন। 'নদীতমে' সরস্বতীর ইলা নামে পরিচিত হওয়া থেকে উপলব্ধি করা যায় যে এই ঐল রাজপরিবারের অধিষ্ঠাত্রী ও উপাস্যা হিসেবেই ইলা ও সরস্বতী এক এবং অভিন্ন বলে গণ্য হয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত ঋগ্বেদেই সরস্বতী আরও একটি নামে পরিচিতি লাভ করেন। সেই নাম 'ভারতী'। যদিও ঋগ্বেদে ভরত দৌষ্মন্তির প্রত্যক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু ভরতবংশজদের ভারত নামে উল্লেখে ঋগ্বেদের রচয়িতাদের যে রাজা ভরতের সঙ্গে পরিচয় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পুরাণে উল্লেখ আছে যে মনুপুত্র সুদ্যুম্ন পিতার নিকট থেকে প্রতিষ্ঠান নামে একটি নগর লাভ করেছিলেন এবং সেই নগর তিনি তাঁর (যখন তিনি ইলা নামে রমণী ছিলেন সেই সময়ে উৎপন্ন) পুত্র পুরুরবাকে দিয়েছিলেন।[২২] পুরাণের মতে এই প্রতিষ্ঠান গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত প্রয়াগেরই অন্য নাম। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে রাজা ভরতের প্রসঙ্গেই গঙ্গার প্রথম উল্লেখ আছে ; ভরত গঙ্গার তীর পর্যন্ত তার সাম্রাজ্য বিস্তৃত করে সেখানে এক যজ্ঞ করেছিলেন। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলে ভরতবংশীয় রাজা সুদাসের সঙ্গে গঙ্গাতীরবর্তী দাস সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ ঐন্দ্র সংস্কৃতিবিরোধী) রাজা ভেদের সংগ্রামের উল্লেখ আছে। মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের মতে ভরতের অধস্তন বংশধর রাজা হস্তী গঙ্গার তীরে বর্তমান মীরাটের সন্নিকটবর্তী হস্তিনাপুরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। এই রাজধানী হস্তিনাপুরে সরিয়ে আনার পূর্বে ঐলবংশীয় পুরু-ভরতেরা সরস্বতী নদীর তীরেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিশ্বাস করবার কারণ আছে যে সরস্বতী একসময় তার গতিপ্রবাহ হারিয়ে বিনশন (বর্তমান রাজপুতানা ও সিন্ধুদেশের ঘগ্‌গর) নামে পরিচয়লাভ করেছিল। সরস্বতীর উপকূল তখন আর রাজধানীর পক্ষে অনুকূল না থাকায়ই হয়ত হস্তীকে নূতন রাজধানীর পত্তন করতে হয়েছিল। সেই মূল অবস্থানভূমি সরস্বতীর উপকূল পরিত্যাগ করে চলে আসতে হলেও মাতৃরূপা সেই সরস্বতীর মাহাত্ম্য বেদানুগ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে কখনও বিলুপ্ত হয় নাই। বৈদিক সংস্কৃতির ধাত্রী সেই সরস্বতী বিপুল মহিমা নিয়ে এই ব্রাহ্মণ্য পরিকল্পনায় সকল জ্ঞান, প্রজ্ঞা, স্মৃতি ও মেধার অধিষ্ঠাত্রীরূপে গণ্য হয়েছিলেন। বাস্তব

প্রস্তাবে ঋগ্বেদের কালে ইন্দ্রানুগামী বেদপন্থীরা,' যতদিন সরস্বতী-তীর বাসোপযোগী ছিল, ততদিন সরস্বতীর তীরেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ অঞ্চল থেকে মূল ঐলবংশ গঙ্গার তীরে সর্বপ্রথম রাজা হস্তীর আমলে হস্তিনাপুর নগরীতেই তাঁদের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই যুক্তিতেই মনে হয় পুরুরবার রাজ্যের কেন্দ্র কখনও প্রয়াগে অবস্থিত ছিল না। এই রাজধানী আদৌ প্রতিষ্ঠান নামে পরিচিত ছিল কিনা সে সম্বন্ধে ঋগ্বেদে কোন ইঙ্গিত নাই। শতপথ ব্রাহ্মণে ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে উল্লেখ হয়েছে, যে ব্যক্তি যজ্ঞ অনুষ্ঠানকালে ঐ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে সে আকাশমণ্ডলে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২৩] ঋগ্বেদের ঐ মন্ত্রটিতে উল্লেখ আছে যে ভগবান বিষ্ণু তাবৎ চরাচর মানুষের মঙ্গলের জন্য তিনবার অতিক্রমণ করে থাকেন। সেই বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে যে তাঁর রক্ষণাধীনে আমরা (যজ্ঞকারীরা) যেন আমাদের সন্তানসন্ততি সহ সর্ব-প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্রাচুর্য লাভ করতে পারি। বিষ্ণুর অনুগ্রহের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা-লাভের এই পরিকল্পনা থেকেই সম্ভবত পুরুরবার রাজধানীর নাম প্রতিষ্ঠানপুরী নামে অভিহিত হয়েছিল।

বরাহরূপে বিষ্ণু পৃথিবী উদ্ধার করায় পৃথিবী বিষ্ণুর পত্নী বলে গণ্য হয়ে-ছিলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এমুষারূপী বরাহকে কোন অবৈদিক জন-গোষ্ঠীর আদিবংশপিতা (টোটেম) বলেই অনুমান করা চলে। পৃথিবীর সঙ্গে বিষ্ণুর এই ঘনিষ্ঠতার ফলে পৃথিবীর এক পুত্র উৎপন্ন হয়েছিল, যে পুত্র পুরাণ কাহিনীতে প্রবল অসুর, নরক নামে অভিহিত হয়েছেন। সকল অবৈদিক বা বৈদিক সমাজের বিরোধীদেরই অসুর নামে অভিহিত হতে দেখা যায়। নরকাসুর ঘটিত এই আখ্যায়িকা থেকে অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে এই অমূষা-বরাহ মূলত কোন অবৈদিক সমাজেরই উপাস্য ছিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বরাহ-বিষ্ণুর সঙ্গে পৃথিবীই তাঁর নারী-শক্তিরূপে গণ্য ছিলেন। পরে পুরাণ বিহিত প্রতিমাকারেরা ভূদেবী নামে এই পৃথিবীর মূর্তিই কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিষ্ণু-প্রতিমার অনুষঙ্গরূপে অন্যতর শক্তি শ্রী বা লক্ষ্মীমূর্তির সঙ্গে রূপায়িত করেছেন দেখা যায়। বিষ্ণুর সঙ্গে পৃথিবীর এই যোগ, বেদের আমল থেকেই পরিজ্ঞাত। পুরাণ কাহিনীতে একবার লক্ষ্মীর সঙ্গে আদিত্য বিষ্ণুর পরিণয় এবং অন্যত্র সমুদ্রমন্থন থেকে উদ্ভূত লক্ষ্মীদেবীর বিষ্ণুকে পতিরূপে গ্রহণের উল্লেখ আছে।

নির্দেশিকা

১. Macdonell, A. A., Vedic Myth., p. 37.

২. ঋগ্বেদ, ১।১০৫ ; ১।২২:২০ ; ৩।৫৫.১০।

৩. ঐ, ১।৩২:৯ ; ২।১১:১ : ২।১২:১১।

৪. ঐ, ২।৩৩:১৩ ; ৪।৩৭:১।

৫. ঋগ্বেদ, বালখিল্য, ৪।১ ; শতপথ ব্রাহ্মণ, ৩।১।৩:৪ ; তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৬।৫।৬:২।

৬. বাজসনেয়ী সংহিতা, ৮।৫ ; মৈত্রায়ণী সংহিতা, ১।৬।১০।

৭. শতপথ ব্রাহ্মণ, ৩।১।৩:৪, তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৬।৫।৬:২।

৮. বিষ্ণুপুরাণ, ১।৩:৩০-৩৪।

৯. ঐ, ৪।৯।

১০. ঋগ্বেদ, ৬।২৬:৬।

১১. ঋগ্বেদেব নীতিমঞ্জরী টীকা, ৭।১০৪.১৬।

১২. বৃহদ্দেবতা, ৫।১৪৩-১৫৫।

১৩. ঋগ্বেদ, ২।২৭:১, ৫।৪২:১০, ১০।২৭, ১০।৪৬:৯, ১০।৭০:৩।

১৪. মহাভারত, ১।৬৫:২৫৪৪-৪৫।

১৫. ঋগ্বেদ, ৩।৫৫:১৯ ; ১০।১০.৫।

১৬. ঐ, ১।১২:৯৯ ; ৪।১৮:১১, ৬।১০২।

১৭. Ruben, A., Eisenschmiede und Dammonen in Indion, p. 284.

১৮. Gonda, J, Aspect of Early Vishnuism (2nd ed., Delhi, 1969), p.3.

১৯. ঐ, p. 3.

২০. ঐ, p. 107.

২১. শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৪।১।২:১১।

২২. বায়ুপুরাণ, ৮৫।২১-২৩ ; হরিবংশ, ১০।১৩৫।৬, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৩।৬০।২১-২২।

২৩. শতপথ ব্রাহ্মণ, ৩।৬।৩।১৫।

ভগবান বিষ্ণু ও যজ্ঞ

ঋগ্বেদে বর্ণিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে যজ্ঞের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। একসময় উদ্দিষ্ট দেবতাব প্রীতির জন্য সেই দেবতাকে স্মরণ করা বা মন্ত্র উচ্চারণ করাকেই সম্ভবত যজ্ঞ বলে অভিহিত করা হত। ঋগ্বেদে বর্ণিত ত্রিত সম্পর্কে একটি বিবরণ থেকে এইরকম ধারণা করা যেতে পারে। ত্রিত একসময়ে ভীতিগ্রস্ত হয়ে একটি কূপে পতিত হলে, দেবতাদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রোচ্চারণ করে সেই বিপদ থেকে উদ্ধারলাভের চেষ্টা করেছিলেন।[১] সেই প্রার্থনা শ্রবণে দেবগুরু বৃহস্পতি ত্রিতকে সেই কূপ থেকে উদ্ধার করেন। ত্রিতের প্রার্থনাসম্ভূত ফলকেই যজ্ঞ নামে অভিহিত হওয়ার (বৃহস্পতি প্রচোদিতা বিশ্বদেবগণাস্তয়ঃ / জগ্মুস্ত্রিতস্য তং যজ্ঞং ভাগাংশ্চ জগৃহুঃ সহ)[২] এই বিবরণ থেকে মনে হয় মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে প্রার্থনাকেই একসময়ে যজ্ঞ বলে অভিহিত করা হত। অগ্নি প্রজ্বালিত করে সেই অগ্নিতে দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করে যে অনুষ্ঠানের উল্লেখ বেদে আছে সেই রীতির যজ্ঞ কবে থেকে প্রবর্তিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত করা দুষ্কর। অগ্নিতে আহুতি প্রদান করে অনুষ্ঠিত যজ্ঞেব অনেক উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে।[৩] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে ঋগ্বেদে মনুকেই অগ্নি প্রজ্বালন কবে দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করে যজ্ঞকর্মের প্রথম অনুষ্ঠাতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। যজ্ঞের অনুষ্ঠাতাদের বলা হয়েছে মনুর অনুবর্তী জনগোষ্ঠী। ঋগ্বেদে একথাও বলা হয়েছে যে পরবর্তী কালে যে রীতিতে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সেই রীতির যজ্ঞের অনুষ্ঠান মনু দ্বারাই প্রবর্তিত হয়েছিল। (১।৭৬:৫)। যজ্ঞের সঙ্গে অগ্নির যোগও ঋগ্বেদ থেকেই প্রবর্তিত হয়েছিল। ঋগ্বেদে ত্রিবিধ অগ্নির উল্লেখ এবং এই তিনপ্রকারের অগ্নির বিভিন্ন নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এইসব নামের মধ্যে অগ্নি-গৃহপতি, অগ্নি-বৈশ্বানর, অগ্নি-শুচি, অগ্নি-জাতবেদ ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৃহপতিরূপেই অগ্নি ছিলেন সর্বাধিক জনপ্রিয়, কেননা প্রত্যেক গৃহেই প্রাত্যহিক নানা কাজে যে অগ্নির প্রয়োজন হত তা এই সর্বদা রক্ষিত অগ্নি থেকেই জ্বালিয়ে নেওয়া হত। কিন্তু যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয়

অগ্নি সেই গৃহে সংরক্ষিত অগ্নি থেকে নেওয়া হত না ; প্রত্যেক যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্যই অরণি মন্থন করে নূতন করে সেই যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালিত করে নেওয়া হত (বলেন মথয়ামাস জায়তে—নিরুক্ত ৮।২)। এই অগ্নিকে বলা হত দ্রবিনোদ। যজ্ঞের অগ্নিকে বেদে বলা হয় পৃথিবীজাত বা পার্থিব এবং এই অগ্নি ইন্দ্রের, কারণ এই অগ্নি শক্তি এবং সম্পদ প্রদান করে থাকেন (পার্থিবো দ্রবিনোদোঽগ্নিঃ পুরস্তাত্তস্ত কীর্তিতঃ/তমাহুরিন্দ্রং দাতৃত্বাদ্ একে তু বলবিত্তয়োঃ—বৃহদ্দেবতা)।[৪] অগ্নি প্রথম মাতরিশ্বান কর্তৃক ভৃগুকেই প্রদত্ত হয়েছিল। এই অগ্নি বৈশ্বানর নামে পরিচিত ছিলেন।[৫] ভৃগু যে অগ্নিকে পেয়েছিলেন সেই অগ্নিই পরে ইন্দ্র এবং মনুর দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞে আহুতিরূপে দেবতাদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার বাহন বলে গণ্য, 'দ্রবিনোদ' বা যজ্ঞের অগ্নি নামে পরিচয়লাভ করেন। অগ্নি যে অসুরদেরও ছিল একথা সুস্পষ্টভাবেই বৈদিক সাহিত্যে উল্লেখ আছে।[৬] ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একপঞ্চাশতম মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অগ্নি সম্পর্কে এক মনোরম কাহিনীর উল্লেখ ঋগ্বেদের বিভিন্ন টীকায় দেখা যায়।[৭] এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে একবার অগ্নি—সৌচিক দেবতাদের বর্জন করে ঋতুতে, জলে এবং অগ্নিতে আত্মগোপন করেন। দেবতারা ভাবেন অসুরেরাই তাঁদের অগ্নিকে গোপন করে রেখেছে ; ফলে অসুরদের সঙ্গে দেবতাদের সংগ্রাম শুরু হয়। দেবতারা অসুরদের নিহত করে সর্বত্র অগ্নির সন্ধান করতে থাকেন। এই অনুসন্ধানের ফলে বরুণ এবং যম দূর থেকে অগ্নিকে দেখতে পেলে, দেবতারা অগ্নিকে ফিরে আসবার জন্য অনুনয় করেন। দেবতারা অগ্নিকে অনুরোধ করে বলেন, 'হে জ্যোতিপুঞ্জ অগ্নি, অনুগ্রহ করে আপনি আমাদের বিচরণের পথ সহজগম্য করুন।' প্রত্যুত্তরে অগ্নি বলেন, 'হে দেবগণ, আপনারা যেমন চাইছেন আমি তেমনি সাধন করব। কিন্তু সমস্ত "পঞ্চজনগোষ্ঠীই" আমার পৌরোহিত্য উপভোগ করুক আমি এটাও চাই (প্রত্যুবাচার্থ তানগ্নির্ বিশ্বেদেবা যদুচ মাম/তৎ করিষ্যে জুষন্তাং তু হোত্রং পঞ্চজনা মম—বৃহদ্দেবতা)'।[৮] বিভিন্ন সূত্রে এই 'পঞ্চজনাঃ' শব্দের ব্যাখ্যা নিয়ে নানা মত দেখা দিয়েছে ; বিভিন্ন ব্যাখ্যা থাকলেও 'পঞ্চজন' শব্দ সম্পর্কে যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থে যে ব্যাখ্যা উল্লেখিত হয়েছে—গন্ধর্ব, পিতৃ, দেব, অসুর এবং দানবরাই 'পঞ্চজন' এই সিদ্ধান্তই সমীচীন মনে হয়।[৯] এই ব্যাখ্যা থেকে অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে মূল ভারতীয় আর্যভাষী গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত এই দেবতা, অসুর, পিতৃ, গন্ধর্ব এবং যক্ষ-

দানব সম্প্রদায়ের সকলের নিকটই অগ্নি সমভাবে আদরণীয় এবং শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। অগ্নির এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা থাকলেও যজ্ঞকর্মে অগ্নির ব্যবহার সম্ভবত ইন্দ্র তথা মনু অনুগামী সমাজেই সীমিত ছিল—ঋগ্বেদের এবং বেদপরবর্তী ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রগ্রন্থগুলি থেকে এই সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয়। অসুরেরা অযজ্ঞ, এবং রাক্ষসেরা যজ্ঞবিরোধীরূপেই বর্ণিত হয়েছে। গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের যজ্ঞ সম্পর্কে যে কোন উৎসাহ ছিল এমন প্রমাণ নাই ; এঁরা যজ্ঞ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন বলেই মনে হয়।

ঋগ্বেদে অগ্নির সঙ্গে বহুদেবতার নামের উল্লেখ থাকলেও কোথাও অগ্নির সঙ্গে বিষ্ণুর উল্লেখ পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদের সুপ্রসারিত বিবরণে অগ্নি-বিষ্ণুর একসঙ্গে উল্লেখের অভাব বিশেষ লক্ষণীয়। ঋগ্বেদের পরিপ্রেক্ষিতে অগ্নির প্রভূত জনপ্রিয়তা অত্যন্ত সপ্রমাণ ; বস্তুত ঋগ্বেদের ব্যাপক উল্লেখের দিক থেকে অগ্নি কেবল-মাত্র ইন্দ্রের থেকে কিছু ন্যূন। ইন্দ্রের সঙ্গে অগ্নির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগ বহু সূক্তে এবং মন্ত্রেই লক্ষ্য করা যায়। ইন্দ্রের সঙ্গে অগ্নির এই যোগ ইন্দ্রের যজ্ঞের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ভিত্তি বলে গণ্য করা যেতে পারে। যদিও ঋগ্বেদে মনুকে যজ্ঞের প্রবর্তক বলা হয়েছে, তা হলেও ইন্দ্রকেই যজ্ঞীয় সমাজের প্রধানরূপে গণ্য করা হত।[১০] ইন্দ্রের এক নাম শক্র ; বহুবার ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে শক্র নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই শক্রশব্দ শত ক্রতু শব্দেরই সংক্ষিপ্ত রূপ এবং ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে শত-ক্রতু নামেও উল্লেখ করা হয়েছে।[১১] ক্রতু শব্দের অর্থ যজ্ঞ এবং শত-ক্রতু বা শক্র নামে ইন্দ্রের পরিচয়ের মূলে তার শত বা বহু যজ্ঞ সম্পাদনের ইঙ্গিতই স্পষ্ট। এই ইঙ্গিত যেন এই অর্থেরই দ্যোতক যে ইন্দ্র বহু যজ্ঞ সম্পাদনের ফলেই ইন্দ্রত্ব অর্জন করেছিলেন। এই শক্রশব্দ অন্য দেবতার ক্ষেত্রেও দু'একবার উল্লিখিত হয়েছে কিন্তু বহুবার ইন্দ্রের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে এটি ইন্দ্রেরই অন্যতম নামে পরিগণিত হয়েছিল। ইন্দ্র শতযজ্ঞের অনুষ্ঠাতারূপে পরিচিত হলেও তাঁকে কখনই যজ্ঞের সঙ্গে এক বা অভিন্ন বলে অভিহিত করা হয়নি। কিন্তু ঋগ্বেদে বিষ্ণুর যজ্ঞের সঙ্গে সংযোগের কোন উল্লেখ না থাকলেও শতপথ ব্রাহ্মণে বিষ্ণু ও যজ্ঞ এক ও অভিন্ন রূপে পরিগণিত হয়েছেন।[১২] ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলিতে যজ্ঞের সঙ্গে বিষ্ণুর এই একত্ব এক বিশিষ্ট রূপ ধারণ করেছে ; এখানে তিনি নিজেই শুধু যজ্ঞ বলে অভিহিত হয়েছেন তা নয়, তাঁকে যজ্ঞের সংরক্ষক এবং যজ্ঞের অনুষ্ঠাতাকেও যজ্ঞের তথা বিষ্ণুর সঙ্গে একত্ব প্রদান করা হয়েছে।

যজ্ঞের সঙ্গে ভগবান বিষ্ণুর এই একত্ব ও অভিন্নত্ব যজ্ঞভিত্তিক বৈদিক সংস্কৃতির এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিণতি বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদে ইতিপূর্বে বর্ণিত বরাহ সম্পর্কিত কাহিনীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।[১৩] এই কাহিনীর সূত্র ধরে তৈত্তিরীয় সংহিতা বলছেন (৬।২। ৪:২-৩) যে ইন্দ্র এই বরাহকে নিধন করলে বিষ্ণু সেই বরাহকে যজ্ঞরূপে দেবতাদের প্রদান করেছিলেন। এই কাহিনীর ভিত্তিতেই বিষ্ণু যজ্ঞবরাহ নামে পরিচিতিলাভ করেছিলেন এবং সেই পরিচয়সূত্রেই বরাহরূপে ভগবান বিষ্ণুর পৃথিবী উদ্ধারের কাহিনী গড়ে উঠেছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ পৃথিবী উদ্ধারকারী বরাহকে এমুষ নামে অভিহিত করায় (শতপথ ১৪।১।২:১১) এই কাহিনী যে ঋগ্বেদের সেই এমুষম্ ঘটিত উপাখ্যানের উপরেই গড়ে উঠেছিল তা উপলব্ধি করা যায়। এই উপাখ্যান থেকে অনুমান করা খুব অযৌক্তিক নয় যে, নিহত পশুকে যজ্ঞে আহুতি প্রদানের রীতি সম্ভবত বৈদিক সংস্কৃতিতে অন্য কোন সংস্কৃতি—সম্ভবত বংশ বা গোষ্ঠীপিতারূপে যাঁরা বরাহের উপাসক ছিলেন, তাঁদের নিকট থেকেই গৃহীত হয়েছিল। এই সূত্রেই যজ্ঞবরাহ, যজ্ঞপুরুষ, যজ্ঞ ও বিষ্ণু এক ও অভিন্নরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। এই পরিণতি, ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত শাস্ত্রগ্রন্থগুলি রচনারকালে সংঘটিত হয়েছিল এই অনুমান করাও খুব অসঙ্গত নয়। কোন কোন ব্রাহ্মণে বিষ্ণু ছাড়া প্রজাপতিকেও যজ্ঞের সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলা হয়েছে দেখা যায়।[১৪] বর্তমান আলোচনায় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি যে বৈদিক সংস্কৃতির প্রবক্তাদের হয়ত প্রথমে যজ্ঞের অধিকর্তা এবং শক্তিরূপে বিষ্ণুকে গ্রহণ এবং স্বীকৃতি দানে দ্বিধা ছিল। তাই এই 'যজ্ঞ' উপলব্ধি বৈদিক সংস্কৃতির দেবতা প্রজাপতিতে আরোপিত হয়েছিল। কিন্তু পরে প্রজাপতিকে অতিক্রম করে ভগবান বিষ্ণুকেই পৃথিবী উদ্ধারকারী বরাহ (এবং জীব-স্রষ্টা কূর্মের) সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলে গণ্য করা হয়েছিল। এই যজ্ঞকে অবলম্বন করে ব্রাহ্মণের যুগে অধ্যাত্মচিন্তারও বিকাশ ঘটেছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হল যজ্ঞই তাবৎ জীবন কারণ,—সর্বভূতের আত্মা (১৪।৩।২:১)।

'যজ্ঞ' যে বিষ্ণুর সেই ত্রি-বিক্রম পদবিস্তারের সম্পর্কেও বিশেষভাবেই ক্রিয়াশীল ছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদিও ঋগ্বেদে বিষ্ণুর ত্রিপাদবিস্তারের সঙ্গে যজ্ঞের কোন সংযোগের উল্লেখ নাই, কিন্তু তৈত্তিরীয় সংহিতাতে বিষ্ণুর এই

পদবিস্তারের সঙ্গে যজ্ঞের সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বিবৃত হয়েছে।[১৫] সমস্তঃ জগতের স্রষ্টা প্রজাপতিকে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে দেবতাদের মধ্যে প্রধানতমঃ স্থান দেওয়ার প্রয়াস ছিল। সেইসঙ্গেই প্রজাপতিকে বলা হয়েছিল যে তিনি নিজেই যজ্ঞ।[১৬] কিন্তু সেই শতপথ ব্রাহ্মণেই প্রজাপতির স্থানে বিষ্ণুকে প্রতিষ্ঠিত করে বলা হল তিনি সকল দেবতার শীর্ষে--অনাদি, অনন্ত ও স্বয়ং ব্রহ্ম।[১৭] পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ সকলকে অতিক্রম করে বিষ্ণুকে তাবৎ জীবের পরমগতি বলে প্রতিষ্ঠিত করল। পরবর্তীকালে ভগবান বিষ্ণু যে সকল দেবতাকে অতিক্রম করে অনাদি-অনন্ত পরমাত্মা ও পরমব্রহ্মরূপে পরিণত হয়েছিলেন, বেদে এবং ব্রাহ্মণে সেই উপলব্ধি এইভাবেই উদ্ভূত হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল। বৈষ্ণবীয় পুরাণগুলিতে ভগবান বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বিশেষভাবে বিবর্তিত হয়ে যে লোকোত্তর উপলব্ধিতে এসে উপনীত হয়েছিল, ঋগ্বেদ থেকে ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে তার ক্রমবিকাশ ও অগ্রগমনের রূপটি এই পথ ধরেই অনুসরণ করা যেতে পারে।

বিষ্ণুকে অবলম্বন করে উদ্ভূত দার্শনিক চিন্তা ও তার বিবর্তন

তাবৎ সৃষ্টিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে উপলব্ধির চেষ্টা অন্যান্য সংস্কৃতির মত ভারতীয় সংস্কৃতিতেও দেখা যায়। অন্য সব সংস্কৃতিতে মোটামুটি স্বর্গ, নরক ও এই পৃথিবী, এই তিন বিভিন্ন স্তরের উপলব্ধিই ব্যাপকভাবে প্রচলিত। ভারত সংস্কৃতিতে স্বর্গ ও নরক কল্পনাকে অতিক্রম করে ভূর্ভুবঃ স্বঃ জন মহ ইত্যাদি সপ্ত-লোক এবং ভূলোক, অন্তরীক্ষ এবং নভোমণ্ডল এই তিন স্তরের চেতনা ঋগ্বেদের কল্পনায়ই আত্মপ্রকাশ করেছিল বলে উপলব্ধি করা যায়। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং দ্যৌ এই তিন স্তর সম্পর্কিত উপলব্ধি থেকে এই তিন স্থানের অগ্নি ও এই তিন লোকের তিন পর্যায়ের দেবতার পরিকল্পনাও সেই সুপ্রাচীনকালেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই ত্রিলোকভিত্তিক উপলব্ধি থেকে তিন লোকের অগ্নিকে যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপ এবং নামে অভিহিত করা হয়েছে, তেমনি পৃথিবী-স্থান, মধ্যস্থান ও দ্যৌস্থানের বিভিন্ন দেবতার পরিকল্পনাও প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। এই লোক বিভাগের উপলব্ধি থেকে যাস্ক 'তিস্র এব দেবাঃ' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। এই তিন লোকের দেবতাদের মধ্যে পৃথিবীস্থানের দেবতাদের প্রমুখ পার্থিব অগ্নি, মধ্যস্থানের দেবগণের প্রমুখ ইন্দ্র এবং দ্যৌ বা নভ-

স্থানের দেবতাদের প্রমুখ সূর্য। কিন্তু এই ঋগ্বেদেই ত্রিলোক-পরিমণ্ডলে সামগ্রিক ব্যাপ্তিসমৃদ্ধ যে পরম অস্তিত্ব ও শক্তি সম্বন্ধে উপলব্ধি জাগ্রত হয়েছিল ভগবান বিষ্ণুর সেই উরুক্রম বা ত্রি-বিক্রম পরিকল্পনায় তারই বীজ লক্ষ্য করা যায়। স্থাবর বিশ্বের আত্মারূপী এই পরমাত্মার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উপলব্ধিরই পরিচয় এই ত্রিবিক্রম চিন্তার মধ্যে বিধৃত হয়েছিল, যে চিন্তা শেষপর্যন্ত বৈষ্ণব সাধনায় পরমাত্মারূপী পরমব্রহ্মের সাধনা ও উপলব্ধিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই বিবর্তনের রূপ-রেখার মূল প্রারম্ভিক পরিবেশ ঋগ্বেদ এবং ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে যেভাবে বিধৃত আছে তা এই আলোচনায় কিছু পরিমাণে তুলে ধরার প্রয়াস করা হল। ভারতবর্ষে প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষেত্রে সাহিত্যভিত্তিক বিবরণগুলিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ইতিহাস ও ভারত সংস্কৃতির ইউরোপীয় গবেষকেরা যেভাবে ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে রূপায়িত করেছেন, সেই ব্যাখ্যান প্রকল্পে তথ্য থেকে তত্ত্বই প্রাধান্যলাভ করেছে বেশি। ভগবান বিষ্ণু-কৃষ্ণ সম্পর্কে পাশ্চাত্য গবেষকদের আকর্ষণ প্রবল বলে প্রতীয়মান হলেও এই বিষ্ণু-কৃষ্ণ জিজ্ঞাসায় সাধ্যানুরূপ তত্ত্বের কুজ্ঝটিকাজাল মূল তথ্যকে আবৃত করে রেখেছে। বিষ্ণু-কৃষ্ণের ক্রমরূপায়ণ যে ভারত মনীষারই এক অভাবনীয় উপলব্ধি ও বিকাশ সে-পরিচয় প্রচলিত বিষ্ণু-কৃষ্ণ সম্পর্কিত গবেষণা ও রচনায় ফুটে ওঠেনি। এই বিষ্ণু-কৃষ্ণ চেতনার মহৎ ও তুলনাহীন সৃষ্টি কি-ভাবে প্রজ্ঞা, জিজ্ঞাসা, সাধনা ও ধ্যানের দ্বারা সৃষ্ট ও প্রসারিত হয়েছিল সে-ইতিহাস অলোকসামান্য ও গভীর রহস্যে সমৃদ্ধ।

ভগবান বিষ্ণুর ইন্দ্রানুগ সমাজে প্রবেশ

অসুর নিধনে ইন্দ্রের দ্বারা সহায়তাদানে আহূত বিষ্ণু কি-ভাবে ইন্দ্রানুগ সমাজে প্রবেশ করেছিলেন সে সম্বন্ধে ঋগ্বেদ ও ঋগ্বেদের পরবর্তী শাস্ত্রগ্রন্থ এবং পুরাণ থেকে যেটুকু আলোক পাওয়া যায় এখানে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হল। ঋগ্বেদে ভগবান বিষ্ণুর উল্লেখ থেকে যেটুকু অনুমান করা যায় তাতে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন ঋগ্বেদীয় সমাজে বিষ্ণুর তেমন স্বীকৃতি ছিল না। ইন্দ্র তথা ইন্দ্রনির্ভর ঋগ্বেদীয়েরা ভগবান বিষ্ণুকে অন্য কোন সম্প্রদায় থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তবে রুবেন বা তাঁর অনুরাগীরা যে বিষ্ণুকে প্রাক্-আর্য বা অনার্য সমাজ থেকে গ্রহণ করা হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করেছেন সে-সম্পর্কে তেমন

কোনই যুক্তি নাই। বংশপিতারূপে পশুকে পবিত্র বলে গণ্য করা এবং সেই পবিত্র পশুকে উদ্দিষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়া, বহু প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মধ্যেই প্রচলিত ছিল। বৈদিক সাহিত্যে এমূষা-বরাহঘটিত কাহিনীতে বরাহ-পূজক কোন জনগোষ্ঠী থেকে এই বরাহ-যজ্ঞ গ্রহণের ইঙ্গিত নিহিত থেকে থাকতে পারে। এখানে ভগবান বিষ্ণু যেমন বরাহের সঙ্গে এক বলে গণ্য হয়েছেন দেখা যায়, তেমনি ঋগ্বেদে বৃষ প্রধানত ইন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি দেবতার সঙ্গে, অজ অগ্নির সঙ্গে, কূর্ম প্রজাপতির সঙ্গে, গর্দভ অশ্বিনদের সঙ্গে, বরাহ রুদ্র, মরুৎ এবং বৃত্রের (এমূষা কাহিনী) সঙ্গে এক ও অভিন্নরূপে উল্লিখিত হয়েছে। এই-সব বিবরণ সমাজে প্রচলিত আদি-পিতা (টোটেম) বিশ্বাসেরই ফলশ্রুতি বলে গণ্য করা যেতে পারে। ঋগ্বেদে যাঁদের দেবতা বলে বর্ণনা বা গণ্য করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সম্ভবত মানুষ থেকে দেবতায় উন্নীত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ইন্দ্রই ছিলেন প্রধান; তা ছাড়া ত্বষ্টৃ, বিবস্বত, বৃহস্পতি, ভৃগু, মনু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যম ইত্যাদি দেবতারাও মানুষ থেকেই দেবতায় উন্নীত হয়েছিলেন। দ্যৌ, পৃথিবী, সূর্য, বরুণ, মিত্র, উষা ইত্যাদি প্রকৃতিভিত্তিক দেবতা। কিন্তু ভগবান বিষ্ণুকে এই উভয় পর্যায়ের কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। বিষ্ণুর পরিকল্পনা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং সেই সুপ্রাচীন বিষ্ণুভিত্তিক পরিকল্পনার মধ্যেই বিষ্ণুর সর্বব্যাপী অস্তিত্ব এবং পরমদেবতারূপে গৃহীত হওয়ার বীজ নিহিত ছিল।

কখনও কখনও বেদের অন্য কোন কোন দেবতার নামের সঙ্গে বিষ্ণুর নামের উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে বিষ্ণুকে সেইসব দেবতার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্তরূপেই বর্ণনা করা হয়েছে; যেমন বলা হয়েছে বিষ্ণু অগ্নি, সূর্য এবং উষার মতই প্রাচীন ও নবীন (১।১৫৬:২-৪), অথবা সবিতৃর মত বিষ্ণু সমস্ত জগৎ পরিমাপ করেন (১।১৫৪:১ ; ৬।৪৯:১৩)। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে বিষ্ণুকে যে-সব দেবতার সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত বলে অভিহিত করা হয়েছে তাঁদের সবাই সূর্য-দেবতারই বিভিন্ন রূপ। নভোমণ্ডলের প্রত্যক্ষীভূত, মানুষের সকল বিস্ময়ের মূল, প্রায় সকল জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম দেবতা বলে স্বীকৃত, সূর্যের সঙ্গে এই সাদৃশ্যগত উপলব্ধি সম্ভবত ভগবান বিষ্ণুকে সেই দেবতা সূর্যের অন্তর্নিহিত মূল সত্তারূপে বিবর্তিত হতে সাহায্য করেছিল। এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে বিষ্ণু সম্পর্কে যে কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায় তার উল্লেখ করা যেতে পারে।[১৮]

এখানে বলা হয়েছে যে বিষ্ণুর চারটি ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে এবং তাঁর নব্বইটি অশ্বকে এক আবর্তনশীল চক্রের মত তিনি পরিচালনা করছেন। বেদের অনেক ব্যাখ্যাতা এই ইঙ্গিতগর্ভ কল্পনার মধ্যে চার ঋতু (ঋগ্বেদের যুগে সম্বৎসরে চারটি ঋতু ধরা হত), প্রতি ঋতুতে নব্বই দিন হিসেবে তিনশ' ছেষট্টি দিনের একটি পূর্ণ বর্ষের উপলব্ধির পরিচয় প্রত্যক্ষ করেছেন, যে বিবরণ-মতে বিষ্ণুকেই মনে করা হত এই বর্ষচক্রের নিয়ন্তা। পরবর্তী পৌরাণিক বিবরণে চক্র এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। এই বিশেষত্ব প্রত্যক্ষ হয় প্রতিমারূপে পরিকল্পিত বিষ্ণুমূর্তির হাতের আয়ুধ হিসেবে। কিন্তু যে চক্র বিষ্ণুর অন্যতম আয়ুধরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল সে-চক্র কেবল আয়ুধ-রূপেই কল্পিত হয়নি। পুরাণে ভগবান বিষ্ণুকে চক্রস্বামী নামেও অভিহিত করা হয়েছে, যা থেকে বিষ্ণুকে চক্রের সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলেও গণ্য করা হয়েছে। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে এই চক্র (সুদর্শনচক্র) দেবতা অগ্নি ভগবান বিষ্ণুকে (বাসুদেব কৃষ্ণকে) দিয়েছিলেন।[১৯] বাসুদেব কৃষ্ণকে এই চক্র শিবের দ্বারা প্রদত্ত হয়েছিল, মহাভারতে এমন উল্লেখও আছে।[২০] বৈদিক পরিকল্পনায় চক্র সূর্যের প্রতীকরূপেই গণ্য হত এবং বাজপেয় যজ্ঞে সুবর্ণ-নির্মিত চক্রের ব্যবহার হত জানা গেলেও (বাজপেয়, ২০।৩৪) সেই চক্রের আকৃতি এবং গঠন সম্পর্কে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। আকাশে পরিদৃশ্যমান বিস্তৃত গতিশীল সূর্য যে চক্র-কল্পনার উদ্ভবের মূলে ক্রিয়াশীল ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই সূর্যই যে সমস্ত গতির মূল, এবং ক্রমপরিবর্তনশীল দিবস ও রাত্রিও যে চক্রের মতই বিবর্তিত হয়ে সমস্ত সম্বৎসরে এক আবর্তন সম্পূর্ণ করে এই উপলব্ধিও তাঁদের হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের একশত চতুঃষষ্টিতম মন্ত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে বিস্তৃতভাবে দিবা-রাত্রির এই বিবর্তন (অহোরাত্র—দিন), মাস, ঋতু ইত্যাদির বিস্তৃত উল্লেখ আছে। তাবৎ বর্ষকে একটি চক্রের সঙ্গে তুলনা করে এই চক্রকে ত্রিনাভি (১।১৬৪:২) দ্বাদশার এবং সপ্তশতানি বিংশতিশ্চ (১।১৬৪:১১) এইসব সংখ্যার উল্লেখের দ্বারা বার-মাসের প্রতীক দ্বাদশার এবং সাতশত বিংশতি দিবস ও রাত্রি (৩৬০ দিন+৩৬০ রাত্রি) নির্দেশ করতে চেয়েছেন। কিন্তু ত্রিনাভির উপযুক্ত ব্যাখ্যা কোথাও হয়েছে মনে হয় না। যাস্ক এই ত্রিনাভিকে তিন ঋতু বলে অভিহিত করেছেন।[২১] এই ত্রি-সংখ্যাটি ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত; তাঁর ত্রি-বিক্রম নাম

এবং বিশেষ করে তিন-পদক্ষেপ বা ত্রি-পদ-প্রসারণ, যে দুটি বৈশিষ্ট্য একমাত্র ভগবান বিষ্ণুর ক্ষেত্রেই এককভাবে ঋগ্বেদে উল্লিখিত দেখা যায়। বিষ্ণুর এই তিন পদক্ষেপ সম্পর্কে যাস্কেরও পূর্ববর্তী টীকাকার ঔর্ণভাব (যে কথা যাস্ক তাঁর নিরুক্তে উল্লেখ করেছেন—নিরুক্ত ১২।১৯) ব্যাখ্যা দিয়েছেন সূর্যের উদয়, মধ্যাহ্ন গগনে আরোহণ এবং অস্তগমনরূপে। এ সম্বন্ধে অন্যতর এক টীকাকার শাকপুণির মতে ত্রি-পদক্ষেপ লোকত্রয়ের উপর সূর্যের বিচরণের প্রতীক।[২২] প্রখ্যাত এই দুই টীকাকারের ব্যাখ্যায় উভয়ের মতেই ভগবান বিষ্ণুকে সূর্য বলেই গ্রহণ করা হয়েছে। বিষ্ণুর এই 'পরম পদের' অস্তিত্বই তাঁকে ত্রি-বিক্রম নামে খ্যাতি দিয়েছে এবং অসুররাজ বলি বিষ্ণুর এই ত্রি-বিক্রম রূপের দ্বারাই পরাজিত হয়েছিলেন, বেদ ও ব্রাহ্মণে এই ত্রি-পদ সম্পর্কিত উল্লেখের ভিত্তিতে পুরাণের আখ্যায়িকা থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায়। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর সহায়তায় ইন্দ্রের 'এমুষ'-বরাহের বা বৃত্রের পরাজয় সাধনের সঙ্গে এই ত্রি-বিক্রম রূপের কোন প্রত্যক্ষ সমর্থন নাই। তবে বৃত্রের পরাজয়ের প্রাক্কালে ইন্দ্রের সেই উক্তি 'হে বন্ধু বিষ্ণু তোমার পদ বিস্তৃতভাবে প্রসারিত' কর—বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ।[২৩] এ ছাড়া অন্য একটি মন্ত্রে শক্তি নিয়েই (ওজসা) বিষ্ণু তাঁর এই ত্রি-পদবিস্তার করেছিলেন এই উল্লেখ থাকায় বিষ্ণুর এই তিন পদক্ষেপের বিক্রম ইন্দ্রের অভ্যু-ত্থানকালেও পরিচিত ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই মন্ত্রটি থেকে মনে হয় ইন্দ্রানুরাগীদের নিকট তখনও সামগ্রিকভাবে বিষ্ণুর প্রাধান্য স্বীকৃত হয়নি, বরং এই শক্তি ইন্দ্রেরই 'ওজস' নির্ভর বলে প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস ছিল। পরে সকল দেবতাকে অতিক্রম করে বিষ্ণু প্রতিদ্বন্দ্বীহীন প্রাধান্য অর্জন করেছিলেন, শতপথ ব্রাহ্মণের সেই বিখ্যাত আখ্যায়িকাটি থেকে নিশ্চিতভাবেই তা উপলব্ধি করা যায়।[২৪] এখানে বর্ণিত আছে যে যজ্ঞরূপী বিষ্ণু দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হলে তাঁর এই প্রাধান্যলাভে দেবতাদের মধ্যে কিছু ঈর্ষার সঞ্চার হয়েছিল। প্রত্যক্ষভাবে বিষ্ণুর কোন ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা দেবতাদের ছিল না; তবে তাঁরা মনে হয় সুযোগের সন্ধানে ছিলেন। একদিন ভগবান বিষ্ণু তাঁর ধনুকের উপর মস্তক রেখে যখন ক্লান্তি অপনোদন করছিলেন তখন দেবতাদের প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কিছু পিপীলিকা সেই ধনুকের জ্যা কেটে ফেলে। সহসা সেই জ্যামুক্ত ধনুক তার বক্রতা ত্যাগ করে সোজা হয়ে উঠলে সেই গতির প্রচণ্ড বেগে বিষ্ণুর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নভোমণ্ডলে উৎক্ষিপ্ত হয়ে সূর্যে

(আদিত্যে) পরিণত হয়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের বর্ণনায় (তৈত্তিরীয় ৫।১:১-৭) আছে যে অশ্বিনেরা সেই মুণ্ডহীন দেহে একটি নূতন মস্তক সংযোজিত করে দিলে বিষ্ণুর দেহ আবার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণুর দেহে যে মস্তকটি স্থাপিত হয়েছিল সেটি ছিল একটি অশ্বের মুণ্ড। এই অশ্বমুণ্ডলাভে ভগবান বিষ্ণু 'হয়মুখ' বা 'হয়গ্রীব' নামে পরিচয়লাভ করলেন।[২৫] অশ্বশিরস এই আকৃতিতে তিনি মধু-কৈটভের হাত থেকে বেদ উদ্ধার করেছিলেন।[২৬] এই আখ্যানের দু'টি অংশ, বিষ্ণুর দেহবিচ্ছিন্ন মস্তকের আকাশে আদিত্য বা সূর্যরূপে পরিণত হওয়া এবং পরে বিষ্ণুর অশ্বমুণ্ড লাভ করা। দেবতারূপে বিষ্ণুর বিবর্তনপথে এই আখ্যানটি বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়।

দেবতাদের মধ্যে যজ্ঞরূপে স্বীকৃত বিষ্ণুর মস্তক আদিত্যে (সূর্যে) পরিণত হওয়ার মধ্যে বিষ্ণুর আদিত্যরূপে গৃহীত হওয়ার ইঙ্গিত স্পষ্ট। অন্যদিকে অশ্ব ঋগ্বেদে বিশেষ করে সূর্যের প্রতীক বলেই স্বীকৃত ছিল। ভগবান বিষ্ণুর এই হয়-গ্রীব বা হয়শীর্ষ-রূপলাভেও বিষ্ণু-সূর্যের একত্বও অভিন্নতার স্বীকৃতি আছে। এখানে এই তথ্যটিও সুস্পষ্ট যে যজ্ঞের সঙ্গে বিষ্ণুর অভিন্নতাই ছিল অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে মুখ্যত ক্রিয়াশীল। আর এই প্রতিদ্বন্দ্বীহীন প্রতিষ্ঠালাভ ভগবান বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম অবতারে অসুর-রাজ বলিকে পরাজিত করার মধ্যেই পূর্ণ স্বীকৃতিলাভ করেছিল। পুরাণমতে অসুররাজ বলির পরাজয়ের পর ভগবান বিষ্ণু দেবরাজ ইন্দ্রকে পুনরায় তাঁর আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বিষ্ণুর এই কৃতিত্বই তাঁকে দেবতাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন শ্রেষ্ঠতায় অধিষ্ঠিত করেছিল, সেই প্রতিষ্ঠার তদবধি আর কখনও বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি বা ন্যূনতা ঘটেনি।

ভগবান বিষ্ণুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং ইতিহাসের পথে তাঁর স্বীকৃতির বিস্তার

ত্রি-বিক্রমরূপে ভগবান বিষ্ণু তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রকাশের দ্বারা অসুর-রাজ বলিকে প্রতিহত করে ইন্দ্রকে তাঁর আধিপত্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বামনরূপী বিষ্ণুর বলিকে পরাভূত করা এবং ইন্দ্রকে তাঁর স্বাধিকারে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করার কাহিনীটির কোন তাৎপর্য আছে বলে বড় একটা মনে করা হয় না বা তেমন কোন ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাচীন কাহিনীগুলিকে

নিছক কল্পনাভিত্তিক বলে মনে করবার প্রবণতা খুব বেশি থাকলেও এইসব কাহিনীর পেছনে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বিবর্তনের ইঙ্গিত নিহিত আছে বলে অনেক বিজ্ঞানপন্থী ঐতিহাসিক ও অনুমান করে থাকেন দেখা যায়। অসুররাজ বলি দানক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ; সুপাত্রে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে দান বিশেষ পুণ্যকর্ম বলে যজ্ঞবাদী সমাজেও স্বীকৃত ছিল, এবং দানবরাজ বলি অসুর হলেও দানকে পুণ্যকর্ম বলে মনে করতেন। দেবতা এবং অসুর সমাজে নানা উপলব্ধির ক্ষেত্রে যে যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল, দান সম্পর্কে সমমনোভাবকে তার একটি প্রমাণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। বিষ্ণু বলিকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করেছিলেন, এবং অতীত যুগে নৃসিংহরূপে তিনি যেভাবে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন সেই ভাবে বলিকেও নিহত করতে পারতেন। কিন্তু বলির ক্ষেত্রে ভগবান বিষ্ণুর আচরণে বৈলক্ষণ্য দেখা গেল। বলির আচরণে কোন দুষ্কার্যের বা পাপকর্মের উল্লেখ নাই, বরং দান আদি পুণ্য আচরণেই বলির প্রবণতা ছিল। ভগবান বিষ্ণু বলিকে পাতালে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পাতাল আখ্যায় কোন কাল্পনিক অঞ্চলকে অভিহিত করা হত না ; পুরাণে পাতালের ভৌগোলিক অবস্থান প্রায় সুনির্দিষ্টভাবেই দেওয়া আছে। সিন্ধুনদের অববাহিকাই পাতাল নামে অভিহিত হত ; আলেকজাণ্ডারের অভিযান বর্ণনায় গ্রীক ঐতিহাসিকেরা সিন্ধুনদের অববাহিকায় Patalini নামে যে অঞ্চলের উল্লেখ করেছেন, পুরাণের বর্ণিত পাতালের সঙ্গে এই নামের সাদৃশ্য বিস্ময়ের উদ্রেক না করে পারে না। সিন্ধু অববাহিকাই যে বৈদিক ও পৌরাণিক উপলব্ধির পাতাল এই সিদ্ধান্ত খুব অযৌক্তিক মনে হয় না। দানবরাজ বলির পাতালে অপসরণ ও দেবরাজ ইন্দ্রের স্বাধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠা ভগবান বিষ্ণুর আনুকূল্যেই সম্ভব হযেছিল।

এর ফলে দেবতা ও অসুরদেব মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হয়ে একটা সহাবস্থানের পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে ঋগ্বেদে দেবতা ও অসুরদের (দানব, দৈত্য ইত্যাদি নামের উল্লেখই পূর্বতন গ্রন্থাদিতে অধিক) মধ্যে বিরোধের যে-সব বিবরণ আছে তার সব ক্ষেত্রেই ইন্দ্র তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এবং শত্রুকে কেবল পরাজিতই করেন নাই, তাদের প্রত্যেককে নিহত করে আপন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দানব বৃত্রকে নিধনই ইন্দ্রের প্রধান কৃতিত্ব বলে বর্ণিত হলেও বৃত্র ছাড়া আরও অনেক শত্রুকেও ইন্দ্র নিহত করেছিলেন। এদের মধ্যে কিছু শত্রুকে ইন্দ্র নিজেই নিহত করেন, যারা ছিল তাঁর নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী। এদের

মধ্যে উল্লেখযোগ্য ত্রি-শির বিশ্বরূপ, যাকে ঋগ্বেদে ত্বষ্টৃর পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যান্য যে-সব অসুর, দস্যু বা দাস শত্রুর ইন্দ্রের দ্বারা নিহত হওয়ার উল্লেখ আছে, তাদের প্রায় প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় যে সেইসব শত্রু মূলত ইন্দ্রের সাক্ষাৎ নিজের ছিল না। ইন্দ্র তাঁর প্রীতিভাজনদের শত্রুকেই নিহত করেছেন। স্বভাবতই অনুমান করা যেতে পারে যে ইন্দ্র এইসব ক্ষেত্রে উপাস্য দেবতারূপেই পরিকল্পিত হয়েছিলেন, তাঁর অনুগ্রহে তাঁর ভক্তেরা তাদের নিজ নিজ শত্রুকে নিধন করেছিল।

অসুররাজ বলির ক্ষেত্রে অবস্থাটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। অসুররাজ বলি দেবতাদের পরাজিত করে তাঁদের রাজ্য অধিকার করে নিয়েছিলেন। ফলে ইন্দ্র তাঁর অধিকার থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েন। ঋগ্বেদ, ব্রাহ্মণ এবং পুরাণে এই ঘটনা যে সময়ে ঘটেছিল তার কিছু নির্দেশ পাওয়া যায়।

প্রধান শত্রু বৃত্রের সঙ্গে ইন্দ্রের যে সংগ্রাম, ইন্দ্রের কর্মজীবনে সেই সংগ্রামই ছিল প্রধান। ইন্দ্রকে যদি ত্বষ্টৃর পুত্ররূপে গণ্য করা যায় তবে ত্বষ্টৃর কন্যা সরণ্যু ও বিবস্বতের পুত্র মনুকে ইন্দ্রের ভগিনীপুত্র বলে গ্রহণ করতে হয়। এইসূত্রে মনু, প্রচলিত বংশাবলীতে ইন্দ্রের একপুরুষ ছোট। বৈবস্বত প্রকল্পে ঋষি কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা দনুর গর্ভে দানববীর হিরণ্যকশিপুর জন্ম হয়। কালের বিচারে হিরণ্যকশিপুকে ইন্দ্রের সমসাময়িক বলে গণ্য করা যেতে পারে। হিরণ্যকশিপুর পুত্র বিরোচন এবং বিরোচনের পুত্র বলি। পুরাণে বর্ণিত এই বংশাবলীর মতে অসুররাজ বলি ঋগ্বেদের ইন্দ্রের অধস্তন চতুর্থ পুরুষের সমসাময়িক। অতএব অসুররাজ বলি যে ইন্দ্রকে অধিকারচ্যুত করেছিলেন সেই ইন্দ্রকে কোনক্রমেই ঋগ্বেদের বৃত্রহন্তা ইন্দ্রের সঙ্গে এক বলে গণ্য করা যায় না। স্বভাবতই উপলব্ধি করতে হয় যে সেই মূল বা আদি ইন্দ্রের পর দেবসমাজে যিনি প্রধান বলে স্বীকৃত হতেন তাঁকেই ইন্দ্র এই আখ্যার অধিকারী বলে গণ্য করা হত।

প্রাচীন বৈদিক এবং সেইসঙ্গে বেদপরবর্তী সংহিতা, ব্রাহ্মণ, ইতিহাস-পুরাণ-ইত্যাদি গ্রন্থে অনেক ঘটনাপ্রবাহ এবং ইতিবৃত্ত কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়। এইসব ঘটনা ও কাহিনীর পারম্পর্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হলে দেবসমাজের অধিপতি বলে বর্ণিত ইন্দ্র সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা একান্তই প্রয়োজনীয়।

এই ইন্দ্র যে অসুরকে নিহত করেছেন সেই অসুর যদি কল্পনার জীব না হয়ে পৃথিবীর মানুষই হয়ে থাকেন তবে সেই ইন্দ্রকেও পৃথিবীর অধিবাসী বলেই গ্রহণ করতে হবে ; সেই ইন্দ্রকে কখনই স্বর্গের দেবতাদের অধিপতি বলে গণ্য করা যেতে পারে না। নরসমাজের ইন্দ্রকে নরেন্দ্র বলে অভিহিত করা হত। এই সূত্রেই স্মরণ করা যেতে পারে যে দেবাসুর সংগ্রামে দেবতাদের পরাজিত করে দিতে পারলে রজিকে অসুর কুলের ইন্দ্রত্ব পাওয়ার দাবি জানালে, অসুরেরা সে প্রস্তাব অস্বীকার করে। অসুরেরা বলেছিল যে তাদের ইন্দ্র প্রহ্লাদ থাকতে তারা অন্য কাকেও ইন্দ্র বলে গ্রহণ করতে পারবে না।

ঋগ্বেদে যে-সব অসুরের সঙ্গে ইন্দ্রের সংগ্রামের উল্লেখ আছে সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই ইন্দ্র তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অসুরকে নিধন করেছিলেন, কোন শত্রুকেই জীবিত থাকতে দেননি। কিন্তু অসুররাজ বলির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভগবান বিষ্ণু বলিকে নিহত করতে সক্ষম হলেও তাঁকে হত্যা করেন নাই। বেদ সম্বন্ধে গবেষণায় বিশেষ খ্যাতি অর্জনকারী পণ্ডিত ম্যাকডোনেল ভগবান বিষ্ণুর এই বামন বা ত্রিবিক্রম অবতার সম্পর্কে এক বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন।[২৭] অথর্ব বেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় ভগবান বিষ্ণুর নিজের শরীরকে বিস্তৃত করে বা পদত্রয় প্রসারিত করে তাবৎ লোকত্রয় পরিব্যাপ্ত করার উল্লেখ থাকলেও সেই-সব আখ্যানে বলির যেমন উল্লেখ নাই, তেমনি বিষ্ণু কর্তৃক অসুর নিধনেরও উল্লেখ নাই। অসুর বলির উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন পুরাণে এবং মহাভারতে। বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুর অদিতির গর্ভে বামন রূপে জন্ম এবং বলির নিকট থেকে ত্রিলোক উদ্ধার এবং ইন্দ্রকে পুনরায় তাঁর আধিপত্যে প্রতিষ্ঠার বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণিত আছে। বিষ্ণুপুরাণে সুস্পষ্টভাবেই উলেখ আছে যে ভগবান বিষ্ণুর বামনরূপে জন্ম এবং ত্রিলোক· বেষ্টন করে ইন্দ্রকে স্ব-আধিপত্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা বৈবস্বত মন্বন্তরেই সংঘটিত হয়েছিল (মন্বন্তরেঽত্র সম্প্রাপ্তে বৈবস্বতে দ্বিজ / বামনঃ কশ্যপাদ্বিষ্ণুরাদিত্যাং সম্বভূব হ)[২৮]। কালের বিচারে ভাগবতপুরাণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক হলেও (রচনাকাল আনুমানিক অষ্টম শতাব্দ বলে গণ্য হয়ে থাকে), এই পুরাণে বলি দমনের বিবরণ অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে প্রদত্ত হয়েছে দেখা যায়।[২৯] অপেক্ষাকৃত আধুনিক হলেও ঋগ্বেদে বিষ্ণুকে যেমন উরুক্রম আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছিল এই পুরাণেও তেমনি বিষ্ণুকে বিশেষ করে বামনরূপের বর্ণনায় 'উরুক্রম' আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে।[৩০] এই বর্ণনায় আছে

যে ভগবান উরুক্রম প্রথম একপায়ে সমস্ত ক্ষিতি এবং সেই সঙ্গে শরীরের দ্বারা নভোমণ্ডল, এবং বাহুদ্বারা সমস্ত দিকসমূহ আবৃত করলেন ; দ্বিতীয় পদক্ষেপে সমস্ত অবশিষ্ট জগৎ সমাবৃত হল, তৃতীয় পদক্ষেপের আর স্থান রইল না। তখন সত্যরক্ষার্থে অসুররাজ বলি আপন মস্তকোপরি বামনরূপী ভগবানের তৃতীয় পদস্থাপন করবার জন্য প্রার্থনা জানালেন। অসুররাজের এই অভূতপূর্ব সত্যসন্ধতায় ভগবান বামনাবতারের বিশেষ প্রীতির উদয় হয়েছিল। তিনি সমস্ত অনুচরাদিসহ অসুররাজ বলিকে সুতল নামক রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর পূর্বতন ত্রিলোকের উপর অধিকার ফিরে পেলেও সুতল ছিল এই ত্রিলোকের অর্থাৎ ইন্দ্রের অধিকারের বাইরে। ভগবান বিষ্ণু অসুররাজ বলিকে পূর্ণ অধিকার বিচ্যুত না করে তাঁকে সুতলে অধিষ্ঠিত করলে ইন্দ্রের অধীনস্থ দেবতাগোষ্ঠী এবং বলির অধীনস্থ অসুরেরা একটা সহাবস্থানে স্থিতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। নিজের মস্তকোপরি ভগবান বিষ্ণুর পদ ধারণ করে আত্মসমর্পণ করার ফলে বলির উপর ভগবান বিষ্ণুর প্রভূত প্রীতি জন্মেছিল। ভগবান অসুররাজ বলির সত্যপালনের বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন এবং সুতলস্থ বলিকে তিনি সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন এই আশ্বাসও দিয়েছিলেন। রক্ষিষ্যে সর্বতোঽহং ত্বাং সানুগং সপরিচ্ছদম্/সদা সন্নিহিতং বীর তত্র মাং দ্রক্ষ্যতে ভবান[৩১]—পুরাণের এই বিবরণে অসুররাজ বলির মহান চরিত্র ও ভগবান বিষ্ণুর সেই অসুররাজের প্রতি প্রভূত অনুগ্রহ বর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিষ্ণু চিন্তার বিবর্তনে অসুররাজ বলির এই উপাখ্যানটি যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। ঋগ্বেদের বর্ণনায় যে সমাজের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, কালের দিকে থেকে তা অতি প্রাচীন। বেদের রচনায় এই সমাজের সংহতি, জীবনের ভোগসুখ, ঐশ্বর্যসম্পদের প্রতি আকর্ষণ, ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ও বণ্টনের বিলিব্যবস্থা, কৃষি ও শিল্প নির্ভর অর্থনীতি সম্পর্কে যেমন নানা তথ্য পাওয়া যায় তেমনি প্রতিবেশী নানা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এই বেদানুগ সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শত্রুতা ও যুদ্ধবিগ্রহের নানা সংবাদেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। বৃত্র নামে পরিচিত দানব সম্প্রদায়, এবং দাস, দস্যু ইত্যাদির সঙ্গে শত্রুতা, যাতুধান, কিমিদিন ইত্যাদিদের সম্পর্কে ভয় ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিতে ইতস্তত ব্যাপকভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। এইসব দ্বন্দ্ববিরোধ সূত্রে শত্রুকে নিহত করা ও নিশ্চিহ্ন করারই প্রবণতা ছিল প্রবল। এই পরিপ্রেক্ষিতেই অসুররাজ বলির সঙ্গে অমিত

শক্তিশালী ভগবান বিষ্ণুর ব্যবহারের পার্থক্য চোখে না পড়ে পারে না। ঋগ্বেদে ইন্দ্র তাঁর শত্রু বৃত্রকে বজ্রপ্রহারে নিহত করেছিলেন এবং বৃত্রের হনন বা নিধন কর্মে বিষ্ণুকে ইন্দ্রের সহায়করূপে উল্লেখ করা হয়েছে। অসুররাজ বলি সম্পর্কিত উপাখ্যানে বলি দেবতাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু হলেও ভগবান বিষ্ণু তাঁর আশ্রিত দেবতাদের দ্বারা বলিকে নিহত হতে দেননি। তিনি বলির সত্যসন্ধতার শুধু প্রশংসাই করেননি, বলিকে উপযুক্ত মর্যাদায় সুতল রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই ঘটনায় প্রবল অসুরসমাজের সঙ্গে দেবসমাজের একটা সহাবস্থানের সূচনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পুরাণ কাহিনীতে বলির এই উপাখ্যানের পরে দেবাসুর দ্বন্দ্ব বা সংগ্রামের আর কোন উল্লেখ না থাকায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অযৌক্তিক বলে গণ্য নাও হতে পারে।

পুরাণের বিবরণে আছে, ইলার পুত্র পুরুরবার বংশোদ্ভূত নহুষের পুত্র যযাতির সঙ্গে অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা এবং অসুরগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর বিবাহ সংঘটিত হয়েছিল। দেবতা ও অসুরে প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও পুরাণের সাক্ষ্যে দেখা যায় যে রাজা নহুষও এক দৈত্যের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন এবং নহুষপুত্র যযাতি কেবলমাত্র অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যাকেই বিবাহ করেন নাই, অসুরগুরু শুক্রাচার্যের কন্যাকেও তিনি বিবাহ করেছিলেন। দীর্ঘপ্রসারী যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অত্যন্ত কঠোর ও প্রবল যুদ্ধ-বিগ্রহ অসুর এবং দেব (পূজক) সমাজকে বিব্রত ও পর্যুদস্ত করে তুলেছিল, ঋগ্বেদেই তার বিস্তৃত উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবতা ও অসুরেরা যে একই জনগোষ্ঠীরই দুই পরস্পর বিচ্ছিন্ন অংশ, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ইন্দ্রকে অবলম্বন করেই এই বিচ্ছিন্নতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত হয়েছিল, বেদের সাক্ষ্য থেকেই তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। ঋগ্বেদে এবং আবেস্তাতে মনুষ্যজাতির প্রবর্তক ও পিতা হিসেবে যে বিবস্বতের উল্লেখ আছে, সেই বিবস্বতের কাল থেকে যে যুগের প্রবর্তন হয়, ঋগ্বেদে উল্লিখিত অধিকাংশ চরিত্র এবং ঘটনা সেই বৈবস্বত যুগেরই বিবরণ। এই বিবস্বতের সঙ্গে ইন্দ্রের নাম ঋগ্বেদে বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। এইসব বিবরণ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে বিবস্বত এবং ইন্দ্র ছিলেন সমসাময়িক। বিবস্বতের আবির্ভাবের পূর্বের ঘটনা বা সমাজ সম্বন্ধে ঋগ্বেদের মন্ত্ররচয়িতাদের তেমন কোন উৎসাহ ছিল না। যে-সব ঋষিকে ঋগ্বেদের বিভিন্ন মণ্ডলের প্রবক্তা বলে অভিহিত করা হয়েছে

তাঁদের সকলেই এই বৈবস্বত যুগেরই ঋষি। এক মন্বন্তর থেকে অন্য মন্বন্তরে বিবর্তনের সময় পূর্বতন মন্বন্তরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির তেমন কোন বিপর্যয় ঘটত এমন ইঙ্গিত ঋগ্বেদে বা পুরাণে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে যে পৃথু-বৈণ্যের উল্লেখ আছে, পুরাণমতে সেই পৃথুবৈণ্য বিবস্বতের যুগের পূর্বেকার চাক্ষুষ মন্বন্তরের মানুষ। ঋগ্বেদের বর্ণিত নানা ইঙ্গিত থেকে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে পুরন্দর নামে পরিচিত ইন্দ্রের আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই যে সমাজে এই ইন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছিল সেই সমাজে যথেষ্ট সভ্যতা এবং সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল। ইন্দ্রের সঙ্গে দানব ও দৈত্যদের এই দ্বন্দ্ববিরোধের কারণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা কিন্তু কোথাও তেমন নাই। ইন্দ্রের সঙ্গে বৃত্রের বিরোধের কাহিনী কালক্রমে বর্ষণ ও বর্ষণ প্রতিরোধকারী শক্তির দ্বন্দ্বের প্রতীকী বলেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সেই সূত্রেই ইন্দ্রকে দেবতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী বৃত্রকে দানবরূপে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু বৃত্র শুধু আকাশের বর্ষণকেই নিরুদ্ধ করে রাখত না ; ইন্দ্র তাকে নিহত করে বৃত্রেব দ্বারা নিরুদ্ধ অন্য বারিরাশিও বিমুক্ত করে দিয়েছিলেন, ঋগ্বেদের একাধিক সূক্তে এই বিবরণ আছে।[৩২] কয়েকটি মন্ত্রে আছে যে ইন্দ্র বৃত্রকে নিহত করে পর্বতের প্রতিবন্ধকতা দ্বারা আবদ্ধ জলরাশিকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। আবদ্ধ (আবৃত, যা থেকে বৃত্র নামের উদ্ভব) জলের অধিকারের দাবিতেই বৃত্রের সঙ্গে ইন্দ্রের বিরোধ, ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্র থেকে এই প্রত্যয়ই নিশ্চিত হয়। বহু অতীতকালের এই প্রতি-দ্বন্দ্বিতার কাহিনী কালক্রমে ইঙ্গিতগর্ভ রূপকে পরিণত হয়ে ইন্দ্রকে দেবতাদের প্রধান এবং ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বীরা দানব, দৈত্য, দাস, অসুর ইত্যাদি নামে পরিচয়লাভ করেছিল। ঋগ্বেদে যেমন ঋষি কশ্যপের উল্লেখ আছে তেমনি দনু, দিতি, অদিতি ইত্যাদি তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের দানব, দৈত্য, আদিত্য নামে পরিচিত সন্ততিরও উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে কোথাও প্রত্যক্ষভাবে দানব বা দৈত্যদের অসুর আখ্যায় অভিহিত করা হয়নি ; সেখানে অসুর বলতে বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের বোঝাত। কিন্তু পুরাণে এই দানব এবং দৈত্যদেরই অসুর নামে আখ্যাত করা হয়েছে। পুরাণের মতে দিতির গর্ভজাত সন্তানদের মধ্যে হিরণ্যকশিপুই প্রথম এবং প্রধান। হিরণ্যকশিপুর বংশধর প্রহ্লাদ, বিরোচন এবং বলি যেমন অসুর খ্যাতিতে পরিচিত তেমনি কশ্যপের অন্যতম পত্নী দনুর গর্ভজাত সন্তানেরাও দানব এবং অসুর নামে অভিহিত হয়ে থাকে। ঋগ্বেদে বৃত্রের

মাতা দনু নামে পরিচিত এবং এইসূত্রে বৃত্রকে দানব নামে অভিহিত করা হয়েছে। বৃত্র ছাড়া ঋগ্বেদে ঔর্ণভাব এবং অন্যান্য আরও কিছু দানবের ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হওয়ার উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণে দনুর সন্তান হিসেবে যে-সব দানবের নামের উল্লেখ আছে তাদের মধ্যে শম্বর, স্বর্ভানু, বৃষপর্বা, বিপ্রচিত্তিই প্রধান।[৩৩] এখানে উল্লিখিত দানবদের মধ্যে শম্বর ও স্বর্ভানুর উল্লেখ ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। দানবদের প্রসঙ্গ উল্লেখসূত্রেই বিষ্ণুপুরাণে বৃষপর্বার শর্মিষ্ঠা, উপদানী এবং হয়শিরা নামে তিন পরমাসুন্দরী কন্যার উল্লেখ আছে।[৩৪] আবার চন্দ্রবংশের বিবরণে ঐ বিষ্ণুপুরাণেই বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠার (এবং শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর) সঙ্গে যযাতির বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৫] কশ্যপপত্নী দিতি ও দনুর মত অদিতির উল্লেখ যেমন ঋগ্বেদে আছে তেমনি অদিতির সন্তান-দের আদিত্য পরিচয়ও সেখানে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে যাদের আদিত্য নামে অভিহিত করা হয়েছে তাদের মধ্যে বরুণ প্রধান (৭।৮৫।৪)। এই বরুণের সঙ্গে ঋগ্বেদে অন্য যাদের আদিত্য নামে অভিহিত করা হয়েছে, মিত্র এবং অর্যমন তাদের অন্যতম (২।২৭)। ঋগ্বেদে ইন্দ্রকেও দু-একবার আদিত্য বলে অভিহিত করা হয়েছে (বালখিল্য, ৪।৭) কিন্তু শতপথব্রাহ্মণে আদিত্যের তালিকায় ইন্দ্রের নাম নাই।[৩৬] অন্যান্য আদিত্যদের মধ্যে ভগ এবং পূষণের নাম ঋগ্বেদে পাওয়া যায়, যাদের নিয়ে ঋগ্বেদে আদিত্য দেবতার সংখ্যা ছয়। ঋগ্বেদেই অদিতিকে দক্ষের কন্যারূপে উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে দক্ষ-কন্যা অদিতি-ঘটিত কল্পনা যে খুবই প্রাচীন সে-কথা উপলব্ধি করা যায়। ঋগ্বেদে আদিত্যদের 'দক্ষপিতরা' নামে অভিহিত করায় দক্ষকে আদিত্যদের পিতারূপেই বর্ণনা হয়েছে; শতপথব্রাহ্মণের মতে দক্ষ এবং প্রজাপতি এক ও অভিন্ন (শতপথ ২।৪।৪।২)। পুরাণে অদিতি, ঋষি কশ্যপের পত্নী। যদিও ঋগ্বেদে প্রদত্ত আদিত্যদের তালিকায় বিবস্বতকে আদিত্য নামে অভিহিত করা হয়নি কিন্তু যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতা (৮।৫) ও মৈত্রায়ণী সংহিতায় (১৬।১২) এবং বিভিন্ন ব্রাহ্মণে বিবস্বতকেও আদিত্য আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে দেখা যায়। আবার বিবস্বত যার কন্যা সরণ্যুকে বিবাহ করেছিল সেই ত্বষ্টৃকেও পরবর্তী অনেক শাস্ত্রগ্রন্থে আদিত্য নামে বর্ণনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদে ত্বষ্টৃকে দেবতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। (দেবস ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ—ঋগ্বেদ ৩।৫৫:১৯)। ঋগ্বেদে অন্যান্য আদিত্যেরা অসুর

নামে খ্যাত হলেও ত্বষ্টৃকে কোথাও অসুর আখ্যায় অভিহিত করা হয়নি ;- বরং একাধিকবার তাঁকে দেবতা আখ্যায়ই অভিহিত করা হয়েছে। ত্বষ্টৃর এই দেবত্বসূত্রেই ত্বষ্টৃপুত্র ইন্দ্র দেবতা এবং ত্বষ্টৃর কন্যা সরণ্যুর সন্তানরাও দেবতা। বিবস্বতের সন্তান যম, মনু এবং অশ্বিনেরাও দেবতা বলে গণ্য হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে অদিতিকে দেবীরূপে অভিহিত করা হয়েছে এবং দেবীর সন্তান হিসেবেই আদিত্যেরা যে দেব আখ্যা অর্জন করেছিলেন, এমন অনুমান করাও অন্যায় নয়। বরুণ, মিত্র, ভগ, পূষণ, অর্যমন এইসব আদিত্য দেবতাদের কেউ মরজগতের অধিবাসী ছিলেন না ; কিন্তু ইন্দ্র এবং বিবস্বত তথা ত্বষ্টৃ এই মরজগতেরই মানুষ ; দিতি এবং দনুর সন্তানেরা যেমন অসুর আখ্যায় অভিহিত হয়েছিলেন, অদিতির পুত্র বিবস্বতের সন্তানরাও তেমনি দেবতা আখ্যায় অভিহিত হয়েছিলেন এই সিদ্ধান্ত করা কিছু অযৌক্তিক নয়। হপকিন্স বলেছেন যে দানব, দৈত্য এবং রাক্ষসেরা পূর্বে মরলোকের অধিবাসী বলেই গণ্য হতো, পরে জনমানসে উগ্রতাসম্পন্ন আধি-ভৌতিক অস্তিত্বে পরিণত হয়। (Danavas, Daityas and Rakshasas were treated as human beings earlier but later as demons. —Hopkins.)[৩৭] এই দানব ও দৈত্য নামে পরিচিত জনগোষ্ঠীই বেদে এবং পরবর্তী গ্রন্থসমূহে অসুর আখ্যায় অভিহিত হয়েছিল। অসুররা রাক্ষস, যক্ষ এবং নাগ সম্প্রদায় থেকে আলাদা ছিল না। রাক্ষসদের মানুষ বলে গণ্য করা হলে যক্ষদেরও মানুষ বলে গণ্য করা উচিত এবং প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে এই যক্ষদেরও বহু উল্লেখ আছে। রামায়ণে রাক্ষসী তাড়কাকে যক্ষকন্যা বলে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে। (পূর্বমাসীৎ মহাযক্ষ সুকেতুর্ণাম বীর্যবান/ অনপত্যঃ শুভাচারঃ স চ তপে মহাতপঃ/পিতামহস্ত সুপ্রীত শুস্য যক্ষপতেস্তদা/ কন্যারত্ন দদৌনাম তাড়কা নাম নামতঃ ॥)[৩৮] জাতি হিসেবে দানব, দৈত্য, রাক্ষস, যক্ষেরা বিলুপ্ত বা বিস্তৃততর 'সংখ্যাগুরু' মানবসম্প্রদায়ের মধ্যে সমীকৃত হয়ে গিয়ে থাকলেও নাগসম্প্রদায় ঐতিহাসিক যুগেও বহুদিন পর্যন্ত নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রেখেছিল—মগধের শিশুনাগ বংশ, পদ্মাবতীর নাগ রাজন্যবর্গ ইত্যাদির সাক্ষ্য থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। যদি বেদ এবং পুরাণের এই দানব, দৈত্য, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ ইত্যাদি নামে পরিচিত সম্প্রদায়কে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বলে গণ্য করা যায়, তবে দেবতা নামে পরিচিত গোষ্ঠীকেও একটি জনগোষ্ঠী বা

মানবসম্প্রদায়ভুক্ত বলে গ্রহণ করতে কোন দ্বিধার কারণ থাকতে পারে না। এই যুক্তিতেই পুরঞ্জয় এবং রজি, যে দেবসম্প্রদায়কে অসুরদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন সেই সেই দেবতা এবং অসুর উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠী সম্ভূত মরজগতেরই অধিবাসী ছিল ; তাদের কল্পিত আধিভৌতিক অস্তিত্বসম্পন্ন সত্তা বলে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয়। এ প্রসঙ্গে রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালেখের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে দেবাসুর, নাগ-যক্ষ এবং রাক্ষসদের কথা উল্লেখ আছে, মনুষ্যপ্রজাতির কোন উল্লেখ নাই।[৩৯] এই তালিকার সঙ্গে ঋগ্বেদের ১০।৫৩:৪ সংখ্যক মন্ত্রের ভাষ্য প্রসঙ্গে যাস্কের নিরুক্তের প্রদত্ত তালিকার সাদৃশ্য একান্তই লক্ষণীয়। (গন্ধর্বা পিতরোদেবা অসুরা রক্ষাংসি ইতি)[৪০]। এখানেও মনুষ্যজাতির কোন উল্লেখ নাই, যা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, কোন কোন সময়ে মনুষ্যসম্প্রদায় অনেকক্ষেত্রে দেবতাগোষ্ঠীরই শামিল বলে গণ্য হত, যদিও দেবতাদের ও মনুষ্যদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বও অপরিজ্ঞাত ছিল না। (মনুষ্যাঃ পিতরো দেবা গন্ধর্বোরগরাক্ষসাঃ / গন্ধর্বাঃ পিতরোদেবা অসুরা যক্ষরাক্ষসাঃ)।[৪১]

যযাতির অসুরকন্যা বিবাহ এবং বিষ্ণু চেতনার বিবর্তন

যযাতির অসুরকন্যা বিবাহের যে বিবরণ পুরাণ গ্রন্থে পাওয়া যায়, বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলনকারীরা এটিকে সাধারণ সংবাদ বলেই গণ্য করেছেন ; তাকে কেউ তেমন কোন গুরুত্ব দেননি। এই ধরনের প্রবল শত্রুতাসম্পন্ন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈবাহিক সংযোগকে সাধারণত ইতিহাসে কিন্তু বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। অবশ্য পুরাণ-বর্ণিত কাহিনীকে ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়ার তেমন আগ্রহ বা প্রবণতা ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে এখনও দেখা দেয়নি। পুরাণবিদ পার্জিটার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য এবং পরিশ্রম স্বীকার করে পুরাণের বর্ণিত ঘটনাবলী থেকে সুপরিজ্ঞাত ইতিহাসের পূর্ববর্তী কিছু রাজন্য ও ঋষি পরিবারের বংশাবলীর পরিচয় রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী অতীতের ইতিহাসকে পরীক্ষিতের অভিষেককাল পর্যন্ত প্রসারিত করবার দুঃসাহস প্রদর্শন করে থাকলেও কোন প্রচলিত ইতিহাসগ্রন্থে এখনও পরীক্ষিতের কাল থেকে ভগবান বুদ্ধের সমকালীন মগধরাজ বিম্বিসার ও অজাতশত্রু এবং কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ভিন্ন অন্য কোন চরিত্রকে ইতিহাসগ্রন্থে গ্রহণ করা হয়নি। অন্য-

রাজন্যবর্গের মধ্যে কৌশাম্বীরাজ উদয়ন এবং উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোত এখনও ঐতিহাসিক চরিত্র অপেক্ষা রম্যকাহিনী বা উপকথার নায়করূপেই পরিচিত। সমসাময়িক যুগের জ্যোতিষ্পুঞ্জ, মহাপুরুষ ভগবান বুদ্ধ বিশ্ববন্দিত স্বীকৃতিলাভ করেছেন ; সেই স্বীকৃতি কিন্তু বুদ্ধ সম্পর্কে পুরাণের উক্তি থেকে গৃহীত হয়নি। প্রত্নতত্ত্ব এবং বৈদেশিক ইতিহাসের সঙ্গে সমকালীনত্বের বিচারে বুদ্ধকে যে কালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, পুরাণে বর্ণিত কালপরম্পরা হিসেবেও ভগবান বুদ্ধ সেই কালেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। পুরাণের বংশানুক্রম বর্ণনায় কল্পনার আশ্রয় আছে, যুক্তিদ্বারা সে সত্য প্রতিষ্ঠিত করা না গেলেও, ভগবান বুদ্ধের পূর্ব-গামী বংশানুক্রম এবং ঘটনার সত্যভিত্তিক স্বীকৃতি দেওয়া তেমন সহজসাধ্য নয়। কারণ এই বংশানুক্রমের ঐতিহাসিকতাকে স্বীকৃতি দিলে এই বংশানুক্রমের সিঁড়ির প্রাচীনতম পাটাতন ঋগ্বেদে উল্লিখিত বিবস্বতের কালে গিয়ে দাঁড়ায় ; ঐতিহাসিকেরা এই প্রাচীনতাকে কোনমতেই গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করতে পারবে না। কারণ বেদের রচয়িতা আর্য নামে পরিচিত জনগোষ্ঠী ম্যাকস্‌মূলারের মতে খ্রীস্টের জন্মের দেড়হাজার বছর এবং মার্টিমার হুইলারের সিদ্ধান্তক্রমে খ্রীস্টের একহাজার বছর আগে ভারতে প্রবেশ করেছিল এই তথ্য অভ্রান্তরূপেই গৃহীত হয়ে রয়েছে। কিন্তু পুরাণের বংশানুক্রম বিবেচনা করলে পরীক্ষিতের জন্ম থেকে মগধের সম্রাট নন্দের অভিষেককাল পর্যন্ত যে বর্ষপরিমাপের উল্লেখ বিষ্ণুপুরাণে আছে তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকলেও এই কালকে সাধারণত একসহস্র পঞ্চশত বর্ষ বলেই ধরা হয়ে থাকে (যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দা-ভিষেচনম্/এতদবর্ষসহস্রং তু জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্তরম্—বিষ্ণুপুরাণ)। পার্জিটার নন্দ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্মনন্দের অভিষেককালকে খ্রীস্টজন্মের ৪০২ বৎসর পূর্বে নির্ধারিত করে মগধের রাজন্যবর্গের একটি বংশানুক্রম রচনা করেছিলেন।[৪২] বিষ্ণুপুরাণের উপরোক্ত বিবরণ স্বীকার করে নিলে পরীক্ষিতের আবির্ভাবকে খ্রীস্টের জন্মের (১৫০০+৪০২=) ১৯০২ বৎসর পূর্বে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু পার্জিটার পরীক্ষিতের জন্মকে পুরাণের উপরোক্ত বর্ণনামতে ১০৫০ বা ১০১৫ বৎসর বলে গণ্য করে পরীক্ষিতের জন্মকে ১৪৫২ বা ১৪১৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দ বলে ধার্য করতে চেয়েছেন। পার্জিটারের এই গণনা স্বীকার করে নিলে ম্যাকস্‌মূলার বা হুইলার দ্বারা নির্দিষ্ট বেদরচয়িতাদের ভারতে অনুপ্রবেশের কালের আর কোনই যৌক্তিকতা থাকে না। সেই কারণেই পার্জিটারের প্রভূত শ্রম ও গভীর

পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা তাঁর স্বজাতীয় ইতিহাসবেত্তাদের দ্বারা কখনও স্বীকৃত বা বিবেচনার যোগ্য বলে গণ্য হয়নি। যেখানে ইতিহাসবেত্তাদের দৃষ্টিভঙ্গী এত বিভিন্ন, সেখানে পুরাণ-বিহিত পথে কালনির্ণয়ের প্রয়াস নিতান্তই পণ্ডশ্রম। এক্ষেত্রে তাই বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে পারম্পর্যের উপর নির্ভর করে কিছু চিন্তা এবং পর্যালোচনাতেই এই আলোচনাকে সীমিত রাখার চেষ্টা করব।

ঋগ্বেদের সূত্রপাতের কাল থেকে ঋগ্বেদ পর্যায়ের অবসান

ইতিহাসের পাতায় মহাপদ্মনন্দের অভিষেককাল নিশ্চিতভাবে কিছু স্বীকৃতি পেয়েছে এবং তারই সূত্র ধরে হয়ত পরীক্ষিত পর্যন্ত পিছনে বা অতীতে যাওয়া যায়। ঋগ্বেদের উল্লিখিত ক্রমপর্যায়ে অবশ্য মহাভারতের যুদ্ধ বা পরীক্ষিতের অস্তিত্বের কোন উল্লেখ নাই। ঋগ্বেদের পরিসরে বিধৃত কালের আরম্ভ ও শেষের কিছু পরিচয় ঐ সংকলনগ্রন্থের দশম মণ্ডলে বিধৃত হয়েছে। এই মণ্ডলে পঞ্চনবতি-তম (৯৫) সূক্তে যে পুরুরবা-উর্বশীর কাহিনীর উল্লেখ আছে সেই পুরুরবাকে ঋগ্বেদবিধৃত কালপরিসরের একেবারে প্রারম্ভিক পর্যায়ে স্থাপিত করা যেতে পারে, বিবস্বতের যুগের মনুর কন্যা ইলার পুত্র হিসেবে। ঐলবংশের প্রথম নরপতি ও আদিপুরুষ এই পুরুরবা ভারতের সংস্কৃতিচিন্তায় এক অভূত-পূর্ব প্রতিষ্ঠায় অধিষ্ঠিত। পুরাণকারেরা সেই পুরুরবাকে আদিপুরুষ ধরে যে বংশানুক্রম রচনা করেছেন সেই বংশানুক্রমে, শেষতম যে রাজন্যের উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়, তার নাম শান্তনু। ঋগ্বেদের ঐ দশম মণ্ডলেই পুরুরবা কাহিনীর অব্যবহিত পরে (১০।৯৮) কুরুবংশের রাজা ঋষ্টিষেণের পুত্র, দুই ভ্রাতা, দেবাপি এবং শান্তনুর কাহিনীর বর্ণনা আছে।[৪৩] জ্যেষ্ঠ দেবাপি সিংহাসন-গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে কনিষ্ঠ শান্তনু রাজপদে অভিষিক্ত হন। পুরাণ এবং মহাভারতে প্রদত্ত বংশতালিকামতে এই শান্তনুর পুত্র ছিলেন ভীষ্ম এবং বিচিত্রবীর্য। বিচিত্রবীর্যের জ্যেষ্ঠপুত্র ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন অন্ধ; ফলে কনিষ্ঠ পাণ্ডু সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অপরিণত বয়সে পাণ্ডুর মৃত্যু হলে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর সন্তানদের মধ্যে রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে প্রবল বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল, যার ফলে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে এক বিধ্বংসী সংগ্রাম ঘটেছিল। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে যুদ্ধকালে অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর মৃত্যু ঘটে। অভিমন্যুর পত্নী উত্তরার গর্ভে পরীক্ষিৎ নামে একটি পুত্র জন্মে। বিধ্বংসী কুরুক্ষেত্র

যুদ্ধের পর পাণ্ডবভ্রাতারা সংসার পরিত্যাগ করলে পরীক্ষিৎ ঐল বংশের সম্রাট-রূপে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। প্রখ্যাত মহাভারত কাহিনীর মূল উপজীব্য ভগবান বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তন; অবশ্য কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধকে এই কাহিনীর প্রেক্ষাপট রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতসংস্কৃতির বিবর্তন ক্ষেত্রে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামে পরিচিত এক মহামনীষাধর পুরুষ মহাভারত গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে প্রখ্যাত। এই ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ব্যাস নামেও পরিচিত। মহামতি এই ব্যাসকে ভগবান বিষ্ণুর অংশ এবং তাবৎ বেদের সংকলক বলেও অভিহিত করা হয়েছে। ভারতের জ্ঞান-প্রজ্ঞা, সাধনা ও উপলব্ধির এক অভূতপূর্ব সৃষ্টি হিসেবে প্রখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রকেও এই বেদব্যাসের রচনা বলে গণ্য করা হয়।[৪৪]

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের এই পরিচিতির পরিপ্রেক্ষিতে ঋগ্বেদের সংকলনের অন্তকাল নির্ধারণে দেবাপি শান্তনুর কাহিনীর গুরুত্ব সমধিক। ঋগ্বেদে রাজন্য-বর্গের যে-সব নামের উল্লেখ আছে তাদের পরিচয়ের সূত্রে যে কালের বিস্তার অনুসরণ করা যায়, বিবস্বতকে তার আদিতে এবং শান্তনুকে তার অন্তে প্রতিষ্ঠিত বলে গণ্য করা যেতে পারে। পুরাণসমূহে প্রদত্ত বংশবিস্তারের ক্ষেত্রেও বিবস্বত-পুত্র মনু থেকে যে ধারাক্রম বিধৃত দেখা যায় তার বহু শাখা প্রশাখার উল্লেখ থাকলেও রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাগ্রন্থে যথাক্রমে মনুর দুই সন্তান ইক্ষ্বাকু ও ইলার বংশানুক্রমকেই প্রধান অবলম্বনরূপে গণ্য করা হয়েছে। ভারতের ইতিহাসবেত্তাদের মতে এই দুই মহাগ্রন্থে বর্ণিত কাহিনী কল্পনা-নির্ভর ও ইতিহাসরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্যতা এর কোনটিরই নাই। নানা অলৌকিক কাহিনীসমৃদ্ধ সম্পূর্ণ কাল্পনিক রাক্ষস-বানর-দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপিত দাশরথি-রামের ঐতিহাসিক বাস্তবতা স্বীকার করতে কোন পণ্ডিতই তেমন রাজি নন। মহাভারতের কুরু-পাণ্ডু পরিবারের বেদে বর্ণিত নহুষ-যযাতি থেকে বিবর্তনও তাঁদের মতে তেমনি গ্রহণের পক্ষে অযোগ্য। বেদের বর্ণনা বিচার করতে গিয়ে প্রখ্যাত বেদবেত্তা ম্যাকডোনেল ও কীথ বলেছেন যে পুরাণে ও মহাভারতে বর্ণিত রাজা পুরু তথা কৌরববংশের সঙ্গে ঋগ্বেদোক্ত নহুষ ও যযাতির কোন যোগই নাই এবং এইসব গ্রন্থে পুরুকে যে যযাতির উত্তরপুরুষ বলে অভিহিত করা হয়েছে তা একান্তই ভুল। (There is no trace, whatever of his (অর্থাৎ যযাতির) connection with Puru as in the epic, the tradition of which must be deemed to

be inaccurate. —Macdonell and Keith)। পার্জিটার কিন্তু যযাতি-পুরু বংশধারার এই অস্বীকৃতি গ্রহণে সম্মত হননি। তিনি বলেছেন যে, ঋগ্বেদে এই যোগসূত্রের কোন উল্লেখ না থাকলেও বিভিন্ন পুরাণে ও মহাভারতে সুস্পষ্ট এবং দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত এই যোগসূত্র অস্বীকার করবার কোন কারণ নাই। পার্জিটার ম্যাকডোনেল এবং কীথের যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে বলেছেন যে বাইবেলের Book of Psalms-এ সোলোমনের সঙ্গে ডেভিডের আত্মীয়তার কোন উল্লেখ নাই কিন্তু Old Testament-এ প্রদত্ত সোলোমন ও ডেভিডের যোগকে তো কেউ নস্যাৎ করে দিতে চায়নি।[৪৫] কিন্তু ভারতীয় ইতিবৃত্ত কাহিনীতে গ্রহণযোগ্য উপকরণসমূহকে নস্যাৎ করবার একটা সুপরিকল্পিত প্রবণতা বেশ লক্ষ্য করা যায় এবং সেই ধারার বেষ্টনী যাঁরাই অতিক্রম কবতে প্রয়াস পেয়েছেন, সে প্রয়াস পার্জিটারের মত পণ্ডিতের হলেও, তাকে অস্বীকাব ও নস্যাৎ কবাতে কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। এইধরনের প্রয়াসকে যেভাবে বিদ্রূপ করা হয়ে থাকে তা দেখেই হয়ত ঐতিহাসিকেরা এইধরনের প্রয়াস থেকে বিরত থেকেছেন।

ঋগ্বেদ তথা পুরাণের বর্ণিত ঘটনাপ্রবাহের গতি অনুসরণ করলে অসুররাজ বলির কাহিনীকে বৈদিক যুগের প্রারম্ভকালের অসুর সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইন্দ্র-পরিচালিত জনগোষ্ঠীর সম্বন্ধের একটি প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। ভগবান বিষ্ণু তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশের দ্বারা বিনা রক্তপাতে অসুররাজ বলিকে প্রতিহত করেন ; ফলে, ইন্দ্র-পরিচালিত জনগোষ্ঠীর ও বলি-পরিচালিত অসুরগোষ্ঠীর মধ্যে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়ার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ভগবান বিষ্ণুর আনুকূল্যেই দেবরাজ অসুরদের দ্বারা বিজিত তাঁর পূর্বতম অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হলেন ; অসুররাজ বলি ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক অবদমিত হলেও বিষ্ণু অসুর বলিকে নিধন না করে তাঁকে সুতল নামক রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই ঘটনার বিশেষ তাৎপর্য অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে পুরাণকারেরা বেদে এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থে বর্ণিত ভগবান বিষ্ণুর ত্রি-জগৎ পরিব্যাপ্ত করবার বিবরণকে এই ত্রি-জগতের উপর ভগবান বিষ্ণুরই পূর্ণ এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্যের প্রমাণ রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ পুরাণের মতে ভগবান বিষ্ণুই তাবৎ চরাচর এই ত্রিলোকের অধীশ্বর এবং তিনিই ইন্দ্র এবং বলিকে আপন মহত্ব ও প্রসাদক্রমে স্ব স্ব আধিপত্যে প্রতিষ্ঠা

করেছেন। শতপথব্রাহ্মণে সর্বপ্রথম ভগবান বিষ্ণুকে সমস্ত দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রূপে স্বীকৃতি দেওয়ার পর বৈষ্ণবীয় পুরাণগুলিতে বিষ্ণুকে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের মূল এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিয়ন্তা বলে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বলি ঘটিত এই উপাখ্যানের তাৎপর্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

যযাতির অসুরকন্যা বিবাহ ও তার ফলশ্রুতি

ঋগ্বেদে নহুষের পুত্র এই পরিচয় না থাকলেও এক বিশেষ প্রতিপত্তিশালী রাজপুরুষরূপে যযাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে বহু নদীর তীরে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সম্ভাব্যতার অন্বেষণ করে শেষপর্যন্ত নাহুষ (অর্থাৎ যযাতি) সরস্বতীর তীরে উপনীত হলে সরস্বতী তাঁকে তাঁর তীরে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানালেন, ঋগ্বেদের যে উপাখ্যানে এই বিবরণ আছে তার উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে।[৪৬] বৃহদ্দেবতায় ঋগ্বেদের এই আখ্যানের বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে সরস্বতী সেই রাজাকে (যযাতিকে) স্বাগত জানিয়ে, তাকে দুগ্ধ এবং ঘৃত দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলেন। (সরস্বতীং প্রপদ্যস্ব সা তে বক্ষ্যতি নাহুষ/তথেত্যুক্তা জগামাশু আপগাং স সরস্বতীম্/সা চৈনং প্রতিজগ্রাহ দুদুহে চ পয়োঘৃতম—বৃহদ্দেবতা, ৬।২২-২৩) ঋগ্বেদের যযাতি সম্পর্কিত এই আখ্যানের প্রবক্তা ঋষি বসিষ্ঠ। এই আখ্যান বিবৃত করবার পরই ঋষি বসিষ্ঠ রচিত কয়েকটি মন্ত্রের উল্লেখ আছে, যে-সব মন্ত্রে যযাতির সেই মহাযজ্ঞে বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, পর্জন্য এবং ভেকের প্রসাদলাভের অভিলাষ আছে। সেই ঋষি বসিষ্ঠের একশত পুত্র যখন রাক্ষসের দ্বারা বিনষ্ট হয়েছিলেন তখন দানব নিধনের জন্য বসিষ্ঠ উপরোক্ত মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করেছিলেন এই কথা বৃহদ্দেবতায় বর্ণিত আছে (ঋষির্দদর্শ রাক্ষোঘ্নং পুত্রশোক-পরিপ্লুতঃ / হতে পুত্রশতে তস্মিন্ সৌদাসৈর্দুঃখিত স্তদা—বৃহদ্দেবতা, ৬/২৮) দানবধ্বংসের জন্য বসিষ্ঠের উচ্চারিত মন্ত্রে যযাতি সম্পর্কে যে বিস্তৃত আখ্যান এবং সেই সঙ্গে ইন্দ্র এবং বিষ্ণুকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে যে মন্ত্রের উচ্চারণ করা হয়েছিল, সেই অনুষ্ঠানের অন্তরালে অতীতের কিছু ঘটনার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে বলে অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। দেবাসুর-বিরোধে অসুররাজ বলির অভ্যুত্থানে দেবতাদের বিশেষ বিড়ম্বনা ঘটেছিল। দেবতাদের সেই দুঃস্থ অবস্থা থেকে উদ্ধার করবার জন্য ভগবান বিষ্ণু বামন রূপ ধারণ করে ত্রি-পাদ বিস্তারে বলির বিজিত সমস্ত রাজ্য অধিগ্রহণ করে ইন্দ্রকে তার স্ব-আধিপত্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন

ঋষি বশিষ্ঠ হয়ত ভগবান বিষ্ণুর সেই ত্রিপদ-উদ্ধারণ-কারী মাহাত্ম্য স্মরণ করেই নিজেকে দুর্বিপাক থেকে উদ্ধারলাভ ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাক্ষসদের শাস্তিবিধানের জন্য সেই মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে নহুষপুত্র যযাতিই ছিলেন মনুষ্যসমাজের সেই ইন্দ্র যাঁকে অসুররাজ বলি রাজ্যচ্যুত করেছিলেন এবং ভগবান বিষ্ণুর অনুগ্রহে যিনি আপন হৃতরাজ্যে পুনরধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এই বিলুপ্তরাজ্য পুনরুদ্ধারের পর যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুর প্রতি যযাতির শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা সেই প্রস্তাবিত মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং ভগবান বিষ্ণুর অনুগ্রহই যযাতি এবং যযাতির বংশধরদের প্রধান নির্ভর ও অবলম্বনে পরিণত হয়েছিল।

ঋগ্বেদের এই আখ্যান থেকে সরস্বতীর তীরে যযাতির প্রতিষ্ঠার বিষয় যেমন পরিজ্ঞাত হওয়া যায় তেমনি বিভিন্ন পুরাণে যযাতির ব্যাপক শক্তিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। বহু পুরাণে এবং মহাভারতে নাহুষ-যযাতিকে (নহুষপুত্র) এক প্রখ্যাত নৃপতি এবং সম্রাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। মহাভারতে প্রতিষ্ঠানপুরীকে যযাতির রাজধানী বলে উল্লেখ আছে। এই প্রতিষ্ঠান নগরী সম্বন্ধে কথিত আছে যে এই নগরী মনুর পুত্র সুদ্যুম্ন (ইলা) পুরুরবাকে দান করেছিলেন। পার্জিটার এই প্রতিষ্ঠানকে গঙ্গাতীরস্থ প্রয়াগের সঙ্গে এক বলে গণ্য করেছিলেন। মহাভারতে আছে যযাতির পুত্র পুরুর বংশে সপ্তম রাজা হস্তী হস্তিনাপুরে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। পরে নীচক্ষু যখন রাজা তখন হস্তিনাপুর গঙ্গার ভাঙ্গনে বিনষ্ট হতে বসলে নীচক্ষু তাঁর রাজধানী প্রয়াগের সন্নিকটবর্তী কৌশাম্বীতে স্থানান্তরিত করেন। রাজধানী হস্তিনাপুরে স্থাপিত হওয়ার পূর্বে যযাতির বংশধরেরা সরস্বতীর তীরেই অবস্থান করতেন এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সরস্বতী যতদিন স্রোতবহ ছিল, যতদিন সরস্বতীর তীর বসবাসের উপযোগী ছিল, ততদিন সেখান থেকে রাজধানী স্থানান্তরের কোন প্রয়োজন ছিল না। এই যুক্তিতেই মনে হয় মূল প্রতিষ্ঠান সরস্বতীর তীরেই অবস্থিত ছিল। প্রয়াগ ত্রিবেণীসঙ্গম নামে পরিচিত। এখানে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গে সরস্বতী নদী মিলিত হয়েছে এবং স্থানটি ত্রিবেণী নামে খ্যাতি অর্জন করেছে। এই সরস্বতীকে কোনমতেই বেদের উল্লিখিত সরস্বতী বলা যায় না। পুরাণে নিশ্চিত ভাবেই উল্লেখ আছে প্রতিষ্ঠান সরস্বতীকূলে অবস্থিত ছিল। এই উপলব্ধি থেকেই পুরাণকারেরা পরবর্তী যুগের প্রখ্যাত প্রয়াগকেই প্রতিষ্ঠান বলে

প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস করেছিলেন। ভগবান বিষ্ণুর অনুগ্রহ যেহেতু পুরুরবা-রূপী ইন্দ্রকে প্রতিষ্ঠালাভে সহায়তা করেছিল, সেই উপলব্ধি থেকেই ভগবান বিষ্ণুর অনুগৃহীত এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাস্থল প্রতিষ্ঠানপুরী বা শুধু প্রতিষ্ঠান নামে খ্যাতিলাভ করেছিল বলে অনুমান করা যায়।

যযাতির বিষ্ণুর প্রতি অনুরাগের বিবরণ বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত আছে। ভাগবত পুরাণে এই অনুরাগের বর্ণনা একটু বিস্তৃত (অযজদ্ যজ্ঞ পুরুষং ক্রতু-ভির্ভূরি দক্ষিনৈঃ/সর্বদেবময়ং দেবং সর্বদেবময়ং হরিম্—ভাগবত পুরাণ)।[৪৭] ত্রি-বিক্রম রূপে বিষ্ণু যে বলিকে দমন করেছিলেন, পুরাণমতে সে বলি ছিলেন দানবরাজ হিরণ্যকশিপুর বংশসম্ভূত। মহর্ষি ভৃগুর সন্তান উশনস-শুক্রকে বলির গুরু হিসেবে উল্লেখ করা করা হয়েছে, যিনি বলিকে বামনরূপধারী ব্রাহ্মণকে ত্রিপাদভূমিদানের প্রতিজ্ঞা থেকে বিরত করতে চেয়েছিলেন। বলির পরাজয়ের পরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠার সঙ্গে যযাতির পরিণয়। যে যযাতি অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন তিনি ভগবান বামন কর্তৃক প্রতিহত বলির মত দৈত্যকুলোদ্ভব ছিলেন না; বৃষপর্বাকে পুরাণে বলা হয়েছে দানব। দানবদেরও দৈত্যদের মত পুরাণে অসুর নামেই অভিহিত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে মহর্ষি ভৃগুর বংশজাত শুক্রাচার্য দৈত্যরাজ বলি এবং দানবরাজ বৃষপর্বা এই উভয়েরই গুরু বলে উল্লিখিত হয়েছেন। তথাপি এই দৈত্য এবং দানব সম্প্রদায়ের মধ্যে নিশ্চিতই কিছু পার্থক্য ছিল। যে অসুর-গুরু শুক্রাচার্য রাজা বলির আচার্য ছিলেন এবং বৃষপর্বার গুরু নামে অভিহিত দেবযানীর পিতা শুক্রাচার্য যদি একই হয়ে থাকেন, তবে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে দৈত্যরাজ বলির পরে অসুরসমাজে বৃষপর্বাই প্রাধান্য অর্জন করেছিলেন। এবং অসুরসমাজের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত বৃষপর্বা এবং অসুরগুরু শুক্রাচার্য উভয়েই যযাতিকে তাঁদের কন্যা সম্প্রদান করায় নর বা মনুষ্য নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে অসুর সম্প্রদায়ের একটা পারস্পরিক রাজনৈতিক বোঝাপড়া হয়ে বৈরতার উপশম হয়েছিল। বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রারম্ভে পুরন্দর বা মঘবন নামে অভিহিত ইন্দ্র এবং দৈত্য সম্প্রদায়ের যে প্রবল বিরোধ এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধবিগ্রহের সূত্রপাত হয়েছিল, ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক দৈত্যরাজ বলির দমনের পর ইন্দ্রানুগামী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অসুরগোষ্ঠীর এই স্থিতাবস্থা এবং মৈত্রী বেশ কিছুকাল স্থায়ী হয়েছিল, বেদ এবং পুরাণের সাক্ষ্যে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়।

অসুরগুরু শুক্রাচার্যের কোপে যযাতির জরাগ্রস্ত হওয়া এবং কনিষ্ঠপুত্র পুরুর সেই জরা গ্রহণ করে পিতাকে স্ব-যৌবন প্রদান করার কাহিনী সর্বজনবিদিত। পুরুর এই মহানুভবতার স্বীকৃতিতে, অন্তহীন ভোগেও মানুষের কখনও তৃপ্তি হয় না এই উপলব্ধির পর, সংসারত্যাগকালে যযাতি কনিষ্ঠপুত্রকেই তাঁর সমগ্র রাজ্যের উপর আধিপত্যে অধিষ্ঠিত করে অন্য চার পুত্রকে রাজ্যের চার অংশের উপর পুরুর অধীনস্থ মণ্ডলাধিকার দিয়েছিলেন। যযাতির এই চার পুত্রের মধ্যে যদু এবং তুর্বসু ছিলেন শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর পুত্র এবং দ্রুহ্যু, অনু এবং পুরু ছিলেন অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠার সন্তান। পুরাণমতে এইধরনের মিশ্র বিবাহের দৃষ্টান্তের ঐল পরিবারে অভাব ছিল না। ইলার পুত্র পুরুরবা গন্ধর্ব-জাতীয় কন্যা অপ্সরা উর্বশীকে বিবাহ করেছিলেন। গন্ধর্বরাও দেব, দানব, দৈত্য, নাগদের মতই দক্ষের বিভিন্ন কন্যার গর্ভজাত সন্তান হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন। উর্বশীর গর্ভজাত পুত্র আয়ু দানবরাজ স্বরভানুর কন্যা প্রভাকে বিবাহ করেছিলেন এবং দানবনন্দিনী প্রভার গর্ভে যাযাতির পিতা নহুষের জন্ম হয়। ঋগ্বেদে এবং পুরাণেও স্বরভানুকে দানব নামেই বর্ণনা করা হয়েছে।

বিষ্ণুপুরাণে স্বরভানুর পরেই বৃষপর্বার নাম দানবদের তালিকায় পাওয়া যায়; যদিও দৈত্যদের ক্ষেত্রে হিরণ্যকশিপু থেকে বংশক্রম যেমন পরপর দেওয়া আছে দানবদের ক্ষেত্রে তেমন নাই। দৈত্যরাজ বলির পর তাঁর পুত্র বাণের উল্লেখ আছে; পুরাণে দৈত্যকুলের অন্য এক শাখা, হিরণ্যাক্ষের বংশধরদেরও উল্লেখ আছে। বামনরূপী বিষ্ণুর নিকট অসুররাজ বলির নতিস্বীকারে মনে হয় অসুরদের মধ্যেও বিষ্ণুর উপাসনা এবং বিষ্ণুর প্রতি শ্রদ্ধার প্রচলন হয়েছিল। পুরাণের বর্ণনায় ভগবান বিষ্ণুকে প্রায়শই দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ ইত্যাদি সকলেরই উপাস্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে দেখা যায়। প্রভূত প্রতিপত্তিশালী ঐল-পুরুরবার বংশের রাজা পুরু অন্যভ্রাতাদের উপর আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই পুরুবংশের প্রাধান্য মোটামুটিভাবে স্বীকৃত হয়ে আসছিল। এই বংশের রাজাদের বংশানুক্রমিক নামের উল্লেখে অধিকাংশ পুরাণেই প্রায় পরিপূর্ণ ঐক্য ও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

যে-সমস্ত পুরাণে প্রাচীন রাজবংশাবলীর উল্লেখ দেখা যায় তার সব-গুলিতেই পুরুবংশের বিস্তৃত বর্ণনা বিধৃত আছে। পুরাণ ভিন্ন মহাভারতে পুরু-বংশের দুটি তালিকা উদ্ধৃত আছে। মহাভারত গ্রন্থে পুরুবংশের প্রাধান্য

বর্ণিত হওয়ার কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। এই মহাগ্রন্থের বিষয়বস্তু পৌরব বংশের ধার্ত-রাষ্ট্র ও পাণ্ডব নামক দুই শাখার প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পরিণামে কুরুক্ষেত্রের মহা-যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই বর্ণিত হয়েছে। মহাভারত গ্রন্থে এই গ্রন্থের পরিচয়সূত্রে গ্রন্থটিকে ইতিহাস আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। মহাভারত গ্রন্থের এই নামটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। সুপ্রাচীনকালের মনু, পুরুরবা-উর্বশী, নহুষ-যযাতি, দুষ্মন্ত-ভরত ইত্যাদি কাহিনী থেকে পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত বহু ঘটনার ইতি-বৃত্ত এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তাছাড়া বিশ্বামিত্র-বসিষ্ঠ কাহিনী, পরশুরাম কাহিনী ইক্ষ্বাকু বংশের হরিশ্চন্দ্র কাহিনী, রাম-রাবণ কাহিনী ইত্যাদিও এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, যার ফলে মনু ও পুরুরবা থেকে পরীক্ষিত পর্যন্ত একটা সামগ্রিক ইতিহাসের ধারণা অনায়াসেই লাভ করা যায়। এই ইতিহাস একদিকে যেমন ভারত নামে পরিচিত ভূখণ্ডের ইতিহাস তেমনি এটি পুরু-ভরত বংশেরও ইতিহাস, যা থেকে পুরু-ভরত বংশের প্রাধান্য এবং গুরুত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মগধরাজ মহাপদ্ম সর্বরাজোচ্ছেত্তারূপে আধিপত্য স্থাপন করলে সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রবহমান পুরু-ভরত বংশের আধিপত্য ও প্রাধান্যের অবসান ঘটেছিল। মনুর কন্যা ইলার বংশধর হিসেবে এই বংশ দেবরাজ ইন্দ্রের অনুগ্রহপুষ্ট, যজ্ঞবাদী এবং ইন্দ্র-উপাসক ছিল। বেদ এবং যজ্ঞসংস্কৃতির ধারক এবং রক্ষক এই পৌরব বংশ বেদ থেকে মহাভারত পর্যন্ত বিধৃত সমগ্র ভারত-সভ্যতারই মূল পৃষ্ঠপোষক। সেই সূত্রেই এই বংশের এত গুরুত্ব। এই কারণেই শুধু মহাভারতে নয়, পুরাণ সাহিত্যেও এই পুরুবংশের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। মহাভারতে পুরুর বংশা-বলীর যে দুইটি তালিকা আছে তাতে প্রধান প্রধান রাজন্যের উল্লেখ এবং তাদের অবির্ভাব-ক্রমও প্রায় একই প্রকার। এইসব বংশাবলীতে তংসু নামে এক রাজ-পুরুষের উল্লেখ আছে, যার পরবর্তী রাজন্য-পঞ্জী কিছু জটিলতাপূর্ণ। উত্তরকালে এই বংশে ইলিনা নামে জনৈক প্রভাবশালী রাজ্ঞীর আভির্ভাব হয়েছিল। মহা-ভারতে কিন্তু রাজ্ঞী ইলিনার পরিবর্তে এলীন নামে এক রাজার উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণ মতে এই এলীন ছিলেন অপ্রতিরথ নামে পৌরব অধিপতির পুত্র এবং এলীনের পুত্র ছিলেন সুবিখ্যাত সম্রাট দুষ্মন্ত। পুরাণের বিস্তৃত বর্ণনা অনুসরণ করে পার্জিটার সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর বংশে হৈহয় নামে একটি নূতন শাখার সৃষ্টি হয়েছিল। এই হৈহয় শাখায় কার্তবীর্যার্জুন এবং তালজঙ্ঘ প্রভৃত শক্তিশালী হয়ে হয়ত কৌরবদের রাজ্যও কিছু পরিমাণে বিপর্যস্ত করে-

ফেলেছিল। যযাতির অন্যতম পুত্র তুর্বসুর বংশে মরুত্ত নামে জনৈক শক্তিধর রাজার আবির্ভাব হয়েছিল। সন্তানহীন এই মরুত্ত যযাতির উত্তরাধিকারী পুরুর বংশধর এলীনের পুত্র দুষ্মন্তকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেছিলেন। মনে হয়, মহাভারত এবং বিষ্ণুপুরাণে এলীন নামে যাঁকে পরিচিত করা হয়েছে তিনি প্রকৃতপক্ষে বায়ু এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বর্ণিত ঐ বংশের সম্রাজ্ঞী ছিলেন এবং নাবালক দুষ্মন্তকে পরাক্রান্ত তুর্বসু সম্রাট মরুত্তের নিকট দত্তকরূপে সমর্পণ করেছিলেন। মূল পুরুবংশে কিছু বিপর্যয়ের ইঙ্গিতই সম্ভবত এই তথ্যে নিহিত রয়েছে, যা থেকে উপলব্ধি করা যায় ইলিনার স্বামীর হয়ত অকালমৃত্যু ঘটেছিল। রাজা দুষ্মন্তের নাম বিভিন্ন পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লিখিত আছে।

দুষ্মন্তের খ্যাতি ও ঐতিহাসিকতা যে সন্দেহাতীত, এ বিষয়ে কোন সংশয় আছে বলে মনে হয় না। প্রখ্যাত অপ্সরা মেনকা ও ঋষি বিশ্বামিত্রের কন্যা শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের প্রণয়কাহিনী কবি কালিদাসের রচনায় যে বিস্তৃতি ও লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছে ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে তার অবদান অতুলনীয়। দুষ্মন্তের পরিচয় কেবল পুরাণ সাহিত্য থেকেই পরিজ্ঞাত হওয়া যায় এমন নয়; বৈদিক সাহিত্যেও দুষ্মন্তের ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ আছে যেখানে দুষ্মন্তের পুত্র সুবিখ্যাত ভরতের পরিচয় দিতে গিয়ে তাকে ভরত দৌষষ্‌ন্তি (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৮।২৩) এবং ভরত দৌঃষন্তি (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৩।৫।৪:১১-১৪) নামে অভিহিত করা হয়েছে। পুরুবংশের মূল শাখায় তংসুর উল্লেখের পরে যে অনিশ্চয়তা পরিলক্ষিত হয়েছিল তার কারণ সম্বন্ধে পার্জিটার সিদ্ধান্ত করেছেন যে একসময়ে এই পৌরবরা কিছু পরিমাণে হীনপ্রভ হয়ে পড়েছিলেন, যার ফলে বংশতালিকায় এই অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। পার্জিটার মনে করেন যে দিগ্বিজয়ী ঐক্ষ্বাক সম্রাট মান্ধাতার অভ্যুত্থানই পুরুবংশের এই নিষ্প্রভতার কারণ। পৌরাণিক বিবরণে মান্ধাতাকে রাজচক্রবর্তী আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। পৌরব বংশে মতিনার নামে জনৈক রাজার কন্যা গৌরীর সঙ্গে ঐক্ষ্বাকু পরিবারের যুবনাশ্বের পরিণয় হয় (বায়ু—৮৮।৬৪।৭)। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (৩।৩৬।৬৬-৬৮) মান্ধাতৃকে গৌরীক নামে অভিহিত করা হয়েছে। অবশ্য মহাভারতে মান্ধাতার জন্ম সম্পর্কে এক অলৌকিক কাহিনীর উল্লেখ আছে। এখানে বলা হয়েছে যে মান্ধাতা তাঁর পিতা যুবনাশ্বের পার্শ্ব থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন (৩।১২৬, ১০৪২৩-৫৩)। বিষ্ণুপুরাণেও এই

আখ্যায়িকারই পুনরাবৃত্তি আছে (৪।২:১৩-১৮)। অপুত্রক যুবনাশ্বের যাতে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে, মুনিগণ তদর্থে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। কিন্তু সেই যজ্ঞপূত বারি ভুলক্রমে যুবনাশ্ব নিজেই পান করে ফেলেছিলেন। যজ্ঞপূত বারি গ্রহণের ফলে তাঁর উদরে গর্ভের সঞ্চার হয় এবং তাঁর কুক্ষি-দেশ ভেদ করে এক পুত্রের জন্ম হয়। এই পুত্রের জন্মের পর সেই পুত্র কি পান করে জীবন ধারণ করবে এই প্রশ্ন উদ্ভূত হলে দেবরাজ ইন্দ্র সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন : "আমিই একে ধারণ করব।" (তথাগত্য দেবরাজোঽব্রবীৎ মাময়ং ধাস্যতীতি—ততো মান্ধাতৃনামা সোঽভবত—বিষ্ণু, ৪।২।৬২)। এই কাহিনীর অলৌকিকত্ব অস্বীকার্য। বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড এবং হরিবংশ পুরাণেও পৌরব সম্রাট মতিনারের কন্যা গৌরীকে মান্ধাতার মাতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। এইসব তথ্য বিচার করলে উপলব্ধি করা যায় যে মহাভারত ও বিষ্ণু-পুরাণের বিবরণের পেছনে কিছু রহস্য ছিল। মহাভারতে যে ষোলজন চক্রবর্তী রাজার উল্লেখ আছে তার মধ্যে পৃথুবৈণ্য ছাড়া অন্য সমস্ত রাজন্যকেই ইক্ষ্বাকু বা ইলার বংশে উদ্ভূত বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কালের বিবেচনায় এঁদের মধ্যে প্রাচীনতম বলে গণ্য করা যেতে পারে নাহুষ ও যযাতিকে। যযাতির পরেই উল্লেখযোগ্য মান্ধাতৃর নাম। মান্ধাতৃর পরাক্রম যে সবিশেষ খ্যাতিলাভ করে-ছিল, প্রথম চক্রবর্তী সম্রাট হিসেবে তাঁর উল্লেখ থেকে এ কথা বোঝা যায়। বিস্তৃত দিগ্বিজয়ের ফলেই তাঁর এই চক্রবর্তীত্বের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর সম্বন্ধে অনুমান করা হয়েছে যে পুরুবংশের সাময়িক ক্ষীয়মাণতার সুযোগ নিয়েই সম্ভবত পৌরবরাজ্য মান্ধাতার দ্বারা অধিকৃত হয়ে গিয়েছিল। ইতিপূর্বে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে পুরুরবার বংশধরেরাই ইন্দ্র—এই আখ্যার দাবি করতেন। স্বর্গস্থ দেবতা ইন্দ্র যে যুবনাশ্বের নবজাত সন্তানের পোষণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে-ছিলেন এই অলৌকিক সংঘটনের পরিবর্তে ইন্দ্র-নামে পরিচিত কোন শক্তিধর পুরুষের দ্বারাই এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এই অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। এই ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে বহুদিন বন্ধ্যাত্বের পরে মান্ধাতৃর মাতা গৌরীর সন্তানের জন্মের পর গৌরীর পিতা, পুরুরবার বংশজাত 'মতিনার' হয়ত কন্যার নবজাত সন্তানের সংবাদ নিতে এসেছিলেন এবং পুরুরবার বংশীয় রাজপুরুষ হিসেবে তিনিই হয়ত ইন্দ্র আখ্যায় অভিহিত ছিলেন। কোন কোন পুরাণের বংশপঞ্জী মতে এই অন্তিনার বা মতিনার (অন্তিনার—বিষ্ণু,

৮।১৯:৩-৪ ; রন্তিনার—বায়ু, ৯৯।১২৮-৯) ছিলেন এলীনের পিতা এবং সেই সূত্রে দুষ্মন্তের পিতামহ। এলীন প্রকৃতপ্রস্তাবে যদি মহাভারতের বর্ণনামত রাজ্ঞী ইলিনারই ভ্রান্তিজনিত প্রদত্ত নাম হয়ে থাকে, সেই সূত্রেই পুরুবংশের বিপর্যয়ের কিছু কারণ অনুমান করা যেতে পারে। যে কোন কারণে হোক দুষ্মন্তের জন্মের পর তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তার উদ্ভব না হলে প্রবল পরাক্রান্ত পুরুবংশের কোন রাজপুত্রকে সমান্তরাল কোন রাজপরিবারে দত্তক প্রদানের প্রশ্ন উঠত না। কিন্তু পুরাণসমূহে প্রদত্ত এই বংশাবলীর প্রায় সবক্ষেত্রেই দুষ্মন্তকে যে তুর্বসু বংশের মরুত্তের নিকট দত্তক দেওয়া হয়েছিল, এই বিবরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজ্ঞী ইলিনার পতির অকালমৃত্যুতেই সম্ভবত এই দত্তকদানের প্রয়োজনীয়তার উদ্ভব হয়েছিল। সন্তানহীন মরুত্তের গৃহে প্রতিপালিত হয়ে পরিণত যৌবনে দুষ্মন্ত তাঁর স্বকীয় রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। পৌরবদের আধিপত্য সম্ভবত দুর্মদ হৈহয় ও তালজঙ্ঘদের অভ্যুত্থানের ফলেই সাময়িক বিনষ্ট হয়েছিল এবং এই নবোত্থিত শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে হয় এলীনের অথবা রাজ্ঞী ইলিনার স্বামীর মৃত্যু ঘটেছিল। এই ঘটনার পরই হয়ত পুরুরাজকুমার দুষ্মন্ত তুর্বসুরাজ মরুত্ত কর্তৃক দত্তকরূপে গৃহীত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ইক্ষ্বাকুবংশীয় খ্যাতনামা নরপতি সগর হৈহয়দের দমন করেছিলেন। দুষ্মন্তের জন্মের কিছুকাল পূর্বেই হয়ত রাজা সগরের তিরোধান ঘটেছিল। ফলে দুষ্মন্তের স্বরাজ্য অর্থাৎ পৌরবরাজ্য পুনরুদ্ধারে বেগ পেতে হয়নি। অধিকার থেকে বিচ্যুত পুরুবংশের সন্তান হিসেবে হৃতরাজ্যে আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন বলেই হয়ত মহাভারতে পৌরব রাজা দুষ্মন্তকে বংশ-কার বলে অভিহিত করা হয়েছে। মহাভারতের এই বর্ণনার সমর্থন ভাগবত পুরাণেও পাওয়া যায় (মরুতোস্তংস্থতোহপুত্রঃ পুত্রং পৌরবমন্বভূত ॥ দুষ্মন্তঃ স পুনর্ভেজে স্বং বংশং রাজ্য কামুকঃ—ভাগবত)।[৪৮]

দুষ্মন্ত বিশেষ পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি হয়ত নিজ ভুজবলেই পৌরব রাজ্য পুনরধিকার করেছিলেন। কিন্তু যে রম্যকাহিনীর জন্য তিনি জনস্মৃতিতে শ্রুতকীর্তি হয়ে রয়েছেন তা ছিল কণ্বদুহিতা শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর প্রণয় ও পরিণয়। কণ্বতপোবনের আশ্রয় থেকে রাজপ্রাসাদে প্রেরিত পুত্রবতী শকুন্তলাকে প্রথমে পত্নী-স্বীকারে গ্রহণ করা হয় নাই। পরে অবশ্য দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে রাজ্ঞীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন এই মনোহর কাহিনী মহাকবি কালিদাসের রচনার গুণে

এক সর্বজন-মনোহারিত্ব অর্জন করেছিল। এই কাহিনীর বিশেষ সরস বর্ণনা ও মনোহারিত্ব কিছু পুরাণগ্রন্থে এবং মহাভারতেও গ্রথিত আছে। পুরুরবার সঙ্গে রহস্যময়ী নায়িকা উর্বশীর পরিণয়-সূত্রে যে বংশের উদ্ভব হয়েছিল সেই বংশে একাধিকবার অনুরূপ ভিন্ন জনগোষ্ঠীর কন্যাকে রাজপত্নীরূপে গ্রহণের বিবরণ পাওয়া যায়। পুরুরবার পুত্র আয়ু, যিনি ছিলেন অপ্সরা উর্বশীর গর্ভজাত, তিনি স্বরভানুর অপরূপ রূপবতী কন্যা প্রভাকে বিবাহ করেন। পুরাণসূত্রে স্বরভানুর অসুররূপে পরিচয় আছে। পুরুসম্রাট যযাতি, অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠা এবং অসুরগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করেছিলেন। আর শকুন্তলা ছিলেন অপ্সরা মেনকার কন্যা। এইসব কাহিনী সম্বন্ধে লক্ষণীয় এই যে, এইরূপ অপ্সরা বা অসুরকন্যা বিবাহের ফলে পৌরব রাজপুরুষেরা যে-সব সন্তান লাভ করেছিলেন, ব্রাহ্মণ্য এবং পৌরাণিক কাহিনীতে সেইসব রাজপুত্র সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং সেই সংস্কৃতির প্রবাহপথে বিশেষ প্রভাববিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার সাক্ষাৎ ও পরিণয়ে কিছু নাটকীয়তা ও ভাবসমৃদ্ধি থাকলেও এই পরিণয়ের ফলে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল সেই চক্রবর্তী সম্রাট ভরত প্রবহমান সংস্কৃতিক্ষেত্রে এক অনতিক্রমণীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন (মহাভারত ১।৭৩।২৮৭০ ; ৭৪, ৩১০৫-৬ ; ১৪।৩।৫০ ; ভাগবত পুরাণ ২০।৮-২২ ; শতপথ ব্রাহ্মণ ৫।৪।১৩)। যথাকালে ভরত রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার পূর্বেই তাঁর বীর্যবত্তা ও বীরত্বের এক ব্যাপক খ্যাতি জন্মেছিল। বাল্যকালে এক সিংহের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে ভরত সর্বদমন নামে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন বলে যে আখ্যায়িকা আছে সেই কাহিনীকে ভরতের ভবিষ্যতে বিস্তৃত মহিমা অর্জনের ভূমিকারূপে গণ্য করা যেতে পারে। রাজ্যলাভের পর ভরত কেবল স্বরাজ্যে নিজের আধিপত্য সুদৃঢ় করেননি, তাঁর পরিচালিত এক দিগ্বিজয়ের বিবরণও মহাভারতে এবং কিছু ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও বর্ণিত আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে ভরত-দৌষ্যন্তিকে সৌদ্যুম্নি নামেও অভিহিত করা হয়েছে (১৩।৫।৪।১২)। ঐতরেয় এবং শতপথ ব্রাহ্মণে ভরত দৌষ্যন্তি বা ভরত-দৌঃষন্তি সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে, মহাভারত এবং পুরাণ কাহিনীগুলির সঙ্গে মিলিয়ে নিলে দুষ্যন্ত এবং ভরত সম্বন্ধে এক বিস্তৃত উপাখ্যান রচনা করা যেতে পারে। এ ছাড়া ঋগ্বেদে ভারত শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ এবং কিছু বিখ্যাত রাজন্যের, বিশেষ করে দাশরাজ্ঞ সমরের বিজয়ী মহাশক্তিধর

ত্রিৎসু-রাজ সুদাসের ভারত আখ্যায় পরিচিতি থাকায় সহজেই প্রতীয়-মান হয় যে ঋগ্বেদের বহু মন্ত্ররচয়িতাই সম্রাট ভরত সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন ; কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে সমগ্র ঋগ্বেদের কোথাও সম্রাট ভরতের প্রত্যক্ষ উল্লেখ বা তাঁর বিপুল খ্যাতির পরিচয় পাওয়া যায় না। ভরতের বিস্তৃত খ্যাতি ও সমৃদ্ধির পরিচয় সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাকে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।২১ ; ২৩)। অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ভরতের অনুষ্ঠিত এক মহাযজ্ঞের উল্লেখ করেছেন, যে যজ্ঞে প্রখ্যাত ঋষি দীর্ঘতমস ভরতের অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন। এই অভিষেককে মহাভিষেক বা ঐন্দ্রাভিষেক নামেও বর্ণনা করা হয়েছে। এই যজ্ঞানুষ্ঠানে বর্ণিত ভরতের ঐন্দ্রাভিষেকের উল্লেখের যে বিশেষ গুরুত্ব ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। ভরতের তো উত্তরাধিকার সূত্রেই সম্রাটরূপে গণ্য হওয়ার অধিকার ছিল। তবে তাঁর এই আনুষ্ঠানিক মহাভিষেক বা ঐন্দ্রাভিষেকের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল কেন —এই প্রশ্ন কোথাও উত্থাপিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

ভরতের এই মহাভিষেক অনুষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি ইন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এই সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয়। এই বিবরণে পুরুরবার একজন বংশধরের আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্দ্ররূপে অভিষিক্ত হওয়ার যে সংবাদ আছে তেমন ঐন্দ্রাভিষেকের উল্লেখ অন্য কোন রাজন্যের সম্বন্ধে পাওয়া যায় না ; বস্তুত সমস্ত ব্রাহ্মণ্য চালিত প্রথার বর্ণনায় এধরনের ঐন্দ্রাভিষেকের দ্বিতীয় কোন উল্লেখও নাই। ইন্দ্রের বিভিন্ন নামের মধ্যে পুরুরবা নামের উল্লেখ আছে, যা থেকে পুরুরবা যে ইন্দ্র নামে অভিহিত হতেন এই সিদ্ধান্ত করা যায়। পুরুরবার পর, বলি কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হওয়ায় ভগবান বিষ্ণু পরমসমারোহে ইন্দ্রকে স্ব-আধিপত্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রজি বা রজিবের যে পুত্র ইন্দ্র হয়েছিল, তাকে পরাজিত করে প্রকৃত ইন্দ্র পুনরায় স্বপদ অধিকার করেছিলেন। এর পর এলীন বা ইলিনার স্বামীর রাজ্যচ্যুতির পর দুষ্মন্ত স্বরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন ; কিন্তু মহাভারতে যে ষোড়শ রাজচক্রবর্তীর নামের উল্লেখ আছে সেই তালিকায় দুষ্মন্তের নামের কোন উল্লেখ নাই,—উল্লেখ আছে ভরত-দৌষ্মন্তির। স্বভাবতই অনুমান করা যেতে পারে দুষ্মন্ত নিজে যথেষ্ট পরাক্রান্ত রাজা হলেও ইন্দ্র বলে স্বীকৃতিলাভ করতে পারেননি। ভরত-দৌষ্মন্তি সিংহাসনে আরোহণের পর ব্যাপক দিগ্বিজয় সমাপন

করে নিজেকে প্রথামত রাজচক্রবর্তী এবং ঐল বা পুরুরবার বংশধর হিসেবে ঐন্দ্রাভিষেকের অনুষ্ঠান করে নিজেকে ইন্দ্র বলে ঘোষণা বা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই ইন্দ্রত্বের স্বাধিকার পুরুরবা থেকে এই বংশেরই একচেটিয়া ছিল। যযাতি তাঁর কনিষ্ঠপুত্রকে পাঁচ পুত্রের মধ্যে প্রাধান্য দিয়ে পুরুকে যে পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেই অগ্রাধিকারের বলে পুরুই অধিরাজ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তদবধি এই পুরুর বংশধরেরাই ইন্দ্রত্বের দাবিদাররূপে গণ্য হতেন। ভরতও এই অধিকারেই ইন্দ্রত্বের দাবিদার ছিলেন। কিন্তু তাঁর বাল্যাবস্থায় তুর্বসুরাজ মরুত্তের দ্বারা দত্তকরূপে গৃহীত হওয়ায় দুষ্মন্ত এই ঐন্দ্রাধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নাই। ভরত বিস্তৃত দিগ্বিজয়ের দ্বারা পুরুরবার বংশের এই দাবি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করলেন; আনুষ্ঠানিকভাবে এক মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হল এবং চক্রবর্তী-রূপে ভরত ঐন্দ্রাভিষেকে অভিষিক্ত হলেন।

ঋগ্বেদে প্রত্যক্ষভাবে ভরত-দৌষ্যন্তির উল্লেখ না থাকলেও ভরতের সঙ্গে পরিচয়ের তথ্যের অভাব নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে যে, ঋষি দীর্ঘতমস ভরতের সেই ঐন্দ্রাভিষেকের পুরোহিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে, পুরাণে এবং মহাভারতে বিশেষভাবে পরিচিত এই ঋষি দীর্ঘতমসের উল্লেখ ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। দীর্ঘতমস ঋগ্বেদের কয়েকটি মন্ত্রের রচয়িতারূপেও প্রখ্যাত। এ ছাড়া দীর্ঘ-তমসের পুত্র নামে পরিচিত কক্ষিবত ঋষির রচিত মন্ত্রও ঋগ্বেদে আছে। এই প্রমাণে ঋষি দীর্ঘতমসকে নিশ্চিতভাবেই একজন ঐতিহাসিক পুরুষরূপে গণ্য করা যেতে পারে। দীর্ঘতমসের জন্ম এবং তাঁর জীবনের কাহিনী একসময়ে বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিল বলে মনে হয়। ঋষি অঙ্গিরসের বংশে দীর্ঘতমসের জন্ম হয়; তাঁর মাতা ছিলেন ভৃগুবংশের কন্যা, নাম মমতা। এই মাতৃপরিচয়ে দীর্ঘতমসকে বলা হয়েছে মামতেয়। তেমনি তাঁর পিতার নাম ছিল উচথ্য, যার থেকে দীর্ঘতমসকে ঔচথ্য নামেও অভিহিত করা হয়েছে। উচথ্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বৃহস্পতির অভিসম্পাতে দীর্ঘতমস জন্মকালে অন্ধ হয়েছিলেন। কোন এক সময়ে পরিচারকেরা দীর্ঘতমসের হাত-পা রজ্জুবদ্ধ করে তাঁকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। গঙ্গায় অবগাহনকালে অঙ্গদেশের অধিপতি রাজা বলির মহিষী সুদেষ্ণা ভাসমান সেই ঋষিকে দেখতে পেয়ে তাঁকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসেন এবং যত্ন ও পারিচর্যা দ্বারা ঋষিকে সুস্থ ও সজীব করে তোলেন। রাজা বলির কোন সন্তান ছিল না; রাজার অনুরোধে ঋষি দীর্ঘতমস রাজ্ঞী সুদেষ্ণার গর্ভে

নিয়োগপ্রথায় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম নামে পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করেন। বলিকে যযাতির পুত্র অনুর বংশধর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুদেষ্ণার এই পঞ্চসন্তান ভারতের বিস্তৃত পূর্বাঞ্চলে আধিপত্যলাভ করেছিলেন এবং তাঁদের অধিকৃত অঞ্চল অধিপতিদের নামানুসারে যথাক্রমে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্ম নামে পরিচয়লাভ করে।

দীর্ঘতমস অঙ্গদেশে বাসকালে রাজ্ঞী সুদেষ্ণার ঔশিনরী নামে এক পরিচারিকাকেও বিবাহ করেন। মহাভারতে এই কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। এছাড়া বিভিন্ন পুরাণেও এই কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১।১৫৮।৫ তম মন্ত্রে গঙ্গাগর্ভের বিপদ থেকে ত্রাণলাভ করার যে কথা দীর্ঘতমস বলছেন তাতে উপরিলিখিত বিবরণের সমর্থন পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ঐ মন্ত্রের ব্যাখ্যাক্রমে বৃহদ্দেবতাতে দীর্ঘতমস ঘটিত পূর্বোক্ত কাহিনীর এক বিস্তৃত বিবরণ গ্রথিত আছে।[৪৯] তিনি যে গঙ্গায় নিমজ্জিত হয়ে যাননি, বরং গঙ্গা তাঁকে বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন এই কথা উপলব্ধি করে দীর্ঘতমস গঙ্গাকে মাতৃতমা বলে অভিহিত করেছিলেন (ন মা গরণ নদ্যো মাতৃতমাঃ)[৫০]। গঙ্গার এই মাতৃতমা আখ্যা সরস্বতীর 'নদীতমে অম্বিতমে দেবীতমে' আখ্যা স্মরণ করিয়ে দেয়। বৈদিক মানসের বিবর্তনকালে এবং পরবর্তী ব্রাহ্মণ্যচিন্তায় পুণ্যতোয়া গঙ্গার মহিমার উদ্ভব ও উপলব্ধি প্রসঙ্গে দীর্ঘতমসের গঙ্গাকে মাতৃরূপে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের মধ্যে গভীর ইঙ্গিত নিহিত আছে বলে মনে হয়। বৃহদ্দেবতা ছাড়া বেদার্থদীপিকা (ঋগ্বেদ ১।১১৬ সম্পর্কে), শতপথ ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ইত্যাদিতেও দীর্ঘতমসের সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে তাতে তাঁর খ্যাতির পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই ভরত-দৌষ্যন্তির মহাযজ্ঞে দীর্ঘতমসের পৌরোহিত্যের বিবরণ বর্ণিত আছে। ভাগবতেও এই কাহিনীর সমর্থন পাওয়া যায়। ভাগবতে ভরত-দৌষ্যন্তির মহিমা অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রতিধ্বনি করে ভাগবত মামতেয় অর্থাৎ দীর্ঘতমসের দ্বারা সম্রাট ভরতের অধিরাজ হিসেবে মহাভিষেকে অভিষিক্ত হওয়ার বিবরণ দিয়েছেন। (ইন্দ্রে মহাভিষেকেন সোঽভিষিক্তোঽধিরাড্ বিভুঃ।।পঞ্চপঞ্চাশতা মেধ্যৈর্গঙ্গায়ামনু বাজিভিঃ।মামতেয়ং পুরোধায় যমুনায়াং অনুপ্রভুঃ।।অষ্টসপ্ততিমেধ্যাশ্বান ববন্ধ প্রদদদ্ বসু।ভরতস্য হি দৌষ্যন্তেরগ্নিঃ সাচীগুণে চিতঃ)[৫১]। এই মহাযজ্ঞ প্রসঙ্গে ঋগ্বেদ সন্নিবিষ্ট দীর্ঘতমস কর্তৃক রচিত (বা দীর্ঘতমসের নিকট আবির্ভূত) কয়েকটি মন্ত্রের

উল্লেখ করা যেতে পারে, যে মন্ত্র স্বভাবতই দীর্ঘতমসের দ্বারা কোন বিশিষ্ট যজ্ঞে উচ্চারিত হয়েছিল। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৪০ থেকে ১৫৬ সংখ্যক এই মন্ত্রগুলি ১৫৮ সংখ্যক ঋকে দীর্ঘতমসের বিবৃত আত্মজীবনীভিত্তিক উক্তির ভূমিকারূপে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল বলেই মনে হয়। যজ্ঞের নানা কৃত্যের ক্রমানুসারে এই মন্ত্রগুলিতে প্রথমে বেদীতে প্রজ্বলিত অগ্নির প্রতি (বেদিষদে, ১।১৪০) ও পরে ইন্দ্র (১।১৪১-৫০), মিত্র-বরুণ (১৫১-১৫৩) ইত্যাদির প্রতি অভিস্তুতি প্রদানের পর আহ্বান করা হয়েছে বিষ্ণুকে, তারপর ইন্দ্র এবং বিষ্ণুকে যুক্তভাবে স্তুতি করে সর্বশেষে বিষ্ণুলোকের উল্লেখ করা হয়েছে (১।১৫৪:৬)। প্রথাগত মিত্র-বরুণের স্তুতি যজ্ঞের অঙ্গ হলেও এই মন্ত্রের স্তুতির মুখ্য উদ্দিষ্ট ইন্দ্র এবং বিষ্ণু, এবং বিষ্ণুর প্রতি স্তুতি নিবেদনে শেষ মন্ত্রটি উদ্গীত হওয়ায় ভগবান বিষ্ণুকেই যে এই যজ্ঞের প্রধান স্তুতব্য বলে গণ্য করা হয়েছে একথাই প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণ ও পুরাণের বর্ণনায় ভরত-দৌষ্যন্তির মহাভিষেক ঘটিত যজ্ঞের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা যেমন বিপুল তেমনি প্রভূত আড়ম্বরপূর্ণ। এই যজ্ঞের পুরোহিত মামতেয়-দীর্ঘতমস যে এই যজ্ঞে ভগবান বিষ্ণুকেই প্রধান স্তুতব্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, এই বিবরণ থেকে তারই সমর্থন পাওয়া যায়। সমাজে রাজার প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতির সঙ্গে ভগবান বিষ্ণুর যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। রাজন এবং সম্রাজ, রাজপদ-জ্ঞাপক এই দুই শব্দ ঋগ্বেদে থাকলেও রাজচক্রবর্তী এবং সার্বভৌম শব্দ ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। এই সার্বভৌমত্ব এবং চক্রবর্তী সম্পর্কিত উপলব্ধি ব্রাহ্মণ, পুরাণ এবং মহাভারতেই প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। ঋগ্বেদে রাজা এবং বিশ শব্দের উল্লেখ আছে, কিন্তু চক্রবর্তী শব্দ ও চক্রবর্তী সম্পর্কে বিশেষ কোন উপলব্ধি নাই। যদিও ঋগ্বেদের সংকলন দেবাপি এবং শান্তনু নামে পরিচিত ভরতবংশীয়দের আবির্ভাব পর্যন্ত প্রসারিত, তথাপি যযাতির কনিষ্ঠপুত্র অসুররাজকন্যা শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত পুরুর অধিরাজত্বের প্রতিষ্ঠা অবধি এই পুরু-ভরত বংশের চক্রবর্তিত্বের যে দাবি ব্রাহ্মণ, পুরাণ বা মহাভারত ইত্যাদিতে দেখা যায়, ঋগ্বেদে তার স্বীকৃতি নাই।

এই অধিরাজত্ব সম্পর্কিত রাজনৈতিক চেতনা সমাজ-বিবর্তনের একটি অত্যন্ত উল্লেখনীয় পদক্ষেপ। ঋগ্বেদের উল্লিখিত বাসব এবং পুরন্দর ইত্যাদি নামে পরিচিত দেবরাজ ইন্দ্র যে সম্প্রদায়ের অধিপতি ছিলেন সেই সম্প্রদায় এক ও অবিভক্ত জনসমষ্টি দ্বারা গঠিত ছিল। এই সম্প্রদায়ে ইলা-সুদ্যুম্নের পুত্র আয়ুর একাধিক পুত্র ছিল। এদের মধ্যে নহুষ জ্যেষ্ঠ হলেও, নহুষের অনুজদের মধ্যে রজি সম্ভবত

নহুষের প্রাধান্য স্বীকার করতেন না। নহুষের পুত্র যযাতি তাঁর কনিষ্ঠপুত্র পুরুকে অন্যান্য ভ্রাতাদের উপর আধিপত্যে অধিষ্ঠিত করলে, সেই আধিপত্য অন্যান্য সব ভ্রাতাদের দ্বারাই স্বীকৃতিলাভ করেছিল বলে মনে হয়। মহাভারতে যে ষোড়শ চক্রবর্তী রাজার উল্লেখ আছে তার মধ্যে যযাতিই ঐল এবং ইক্ষ্বাকু রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রাচীনতম। অবশ্য এই প্রসঙ্গে পৃথুবৈণ্যের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে না, কারণ পৃথুবৈন্য বৈবস্বত মন্বন্তরের মনুর ইলা-সুদ্যুম্ন বা ইক্ষ্বাকু-নৃগ-ধৃষ্ট প্রমুখ কোন বংশের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন না : পুরাণের মতে এই পৃথুবৈণ্য চাক্ষুষ মন্বন্তরে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে কথিত আছে।

ঋগ্বেদেও এই পৃথুবৈণ্যের উল্লেখ থাকায় পৃথুর ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ছিল বলে অনুমান করা যায়। এই প্রসঙ্গে মহাভারত ও পুরাণের বিবরণ বিশেষ কৌতূহল-জনক। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং পৃথুবৈণ্যকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[৫২] পৃথুর এই বৈশিষ্ট্যের সম্পর্কে মহাভারতে মন্তব্য আছে যে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং পৃথুর শরীরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন ; তারই ফলে তাবৎ বিশ্ব রাজাকে দেবতাজ্ঞানে প্রণতি জানিয়েছিল। রাজার এই বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় মহাভারত বলছেন যে পৃথিবীতে রাজা ভগবান বিষ্ণুরই মাহাত্ম্যের ধারক (মহত্ত্বেন চ সমুৎক্তো বৈষ্ণবেন নরো ভুবি)। বিষ্ণুর ললাট থেকে উদ্ভূত একটি কমল থেকে শ্রীদেবীর উদ্ভব হয়েছিল, যিনি পরিণীতা হয়েছিলেন ধর্মের পত্নীরূপে। এই 'শ্রী', ধর্ম এবং অর্থ—একাধারে রাজার সম্পদ বলে গণ্য হয়েছিল।

এই পৃথুই ভূমণ্ডলে প্রথম কৃষি এবং শস্যোৎপাদন এবং গ্রাম-নগর-সমৃদ্ধ সভ্যতার প্রবর্তন করেছিলেন, পুরাণ সাহিত্যে এই বিবরণ বর্ণিত আছে। এই নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে মানুষ বনচারী ছিল এবং স্বচ্ছন্দজাত ফলমূল আহার করে জীবিকানির্বাহ করত। পুরাণের এই বিবরণে সভ্যতার বিবর্তনের একটি গভীর ইঙ্গিত সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় বিধৃত আছে।

মহাভারত ও নানা পুরাণে পৃথুবৈণ্যকে চাক্ষুষ মন্বন্তরের লোক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি এই সংবাদ সত্য হয় তবে স্বভাবতই পৃথুবৈণ্যকে বৈবস্বত মন্বন্তর যুগেরও পূর্বেকার বলে গণ্য করতে হয়। পার্জিটার পৃথুবৈণ্যকে সোজাসুজি কাল্পনিক (Mythical) বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু প্রায় সব পুরাণেই যে-ভাবে পৃথুবৈণ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, মহাভারতে যেভাবে পৃথুবৈণ্যকে সুনিয়ন্ত্রিত জনজীবনের এবং কৃষিভিত্তিক সভ্যতার প্রবর্তক বলে বর্ণনা করা

হয়েছে এবং ঋগ্বেদ যেভাবে বেনকে ভৃগুবংশ জাত (ঋ ১০।১২৩)-বলে উল্লেখ করেছে (ঋ ১০।১২), তা থেকে বেন বা বেনপুত্র পৃথুকে পুরোপুরি কাল্পনিক বলে প্রত্যাখ্যান করা যুক্তিসম্মত বলে মনে হয় না।

পৃথুবৈণ্যের আখ্যানে একদিকে পৃথুর অনুষ্ঠিত যজ্ঞ থেকে সূত এবং মাগধদের উদ্ভবের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক পৃথুকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করার কাহিনীটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। সূত এবং মাগধরা চারণ-বৃত্তিজীবী বিশেষ সম্প্রদায়রূপে সুপ্রাচীন কাল থেকেই পরিচিত। এই সূত এবং মাগধরা সমাজে সংঘটিত ঘটনা এবং রাজন্য ও ঋষিদের কাহিনী অবলম্বন করে কাব্য রচনা করত এবং সেই কাহিনী কাব্য ও সঙ্গীত সহযোগে পরিবেশন করে জীবিকা অর্জন করত। মহাভারত এবং পুরাণসমূহের রচয়িতা বেদব্যাস অনেকটা এই সূত সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রবক্তা এবং নৈমিষারণ্যে অনুষ্ঠীত মহারাজ সৌনকের যজ্ঞকালে ঋষি বৈশম্পায়নের শিষ্য রোমহর্ষণ নামে সূত এই মহাভারত আবৃত্তি করেছিলেন বলে জানা যায়। পুরাণের এবং মহাভারতের কাহিনীসমূহ, মনে হয়, এই সূত এবং মাগধদের দ্বারাই গোড়াতে সংকলিত হয়েছিল এবং চলিত ভাষায় কাব্যাকারে গ্রথিত হয়েছিল। পরে সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান আকারে বিন্যস্ত হয়েছে। ইতিহাস-পুরাণ নামে এইসব সংগ্রহ যে সুপ্রাচীনকাল থেকেই পরিচিত ছিল শতপথ ব্রাহ্মণে ইতিহাস-পুরাণের উল্লেখ থেকেই তা উপলব্ধি করা যায়।[৫৩] মাগধ এবং সূতদের মূল সংকলনই পুরাণ এবং মহাভারত-রামায়ণের উপজীব্য ছিল। বেদের রচয়িতা এবং মন্ত্রকারেরা ইতিহাস এবং ঘটনার পারম্পর্য সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন।

বেদের ঋষিরা ভিন্ন ভিন্ন দেবতার প্রীতি অর্জনের মানসে মন্ত্রের রচনা করেছিলেন। এইসব মন্ত্রের উদ্ভাবনার প্রসঙ্গক্রমে উদ্দিষ্ট দেবতার নামের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি এবং যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা রাজন্যের নামের উল্লেখ ঘটেছে। মন্ত্রের এইসব ঋষি এবং রাজন্যকে ইতিহাসভিত্তিক বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু সংকলিত মন্ত্রসমূহে ঋষি বা রাজন্যদের কোন পারম্পর্য নির্দিষ্ট নাই। তবে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে বর্ণিত পুরুরবা-উর্বশী কাহিনী, দেবাপি-শান্তনু কাহিনীর পূর্বে উল্লিখিত আছে। সূত এবং মাগধেরা তাদের রচিত কাহিনীতে সম্ভবত ঘটনা এবং ঘটনার নায়কদের কালানুক্রমিকভাবে পরপর সাজিয়ে রাখত।

প্রাচীন এইসব কাহিনী যখন পুরাণ সাহিত্যে স্থান পেয়েছিল তখন সেই পারম্পর্যরক্ষার প্রয়াসই ক্রিয়াশীল ছিল। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে সংকলিত প্রাচীন বংশাবলীতে কিছু কিছু অসংলগ্নতা থাকলেও সেগুলির মধ্যে একটা মৌলিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা প্রাচীন বংশাবলীর এই পারম্পর্যকে স্বীকার না করলেও ভারতীয় দৃষ্টিতে এই বংশাবলী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেই গ্রাহ্য হওয়া সমীচীন।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই মনে হয় সংস্কৃতে রূপদানকারী ইতিহাস-পুরাণকারেরা বৈবস্বত মন্বন্তরের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকলেও এই মন্বন্তরের পূর্ববর্তী কিছু ঘটনাকেএকেবারে প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। এইক্ষেত্রেও দেখা যায় যে বৈবস্বত মন্বন্তরের পূর্ববর্তী বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে পৃথুবৈণ্যর আখ্যানটি যেমন কিছু পরিমাণে প্রাধান্য পেয়েছে তেমনি উত্তানপাদ-ধ্রুব উপাখ্যানের গুরুত্বও লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে বলা চলে যে মন্বন্তর-বিভাগ-ভিত্তিতে সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা-প্রজাপতি থেকে উৎপন্ন স্বয়ম্ভুবকেই প্রথম মনু অর্থাৎ মনুষ্যজাতির আদি পুরুষরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই স্বয়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ। উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব পুরাণের আখ্যায়িকা থেকে সবিশেষ পরিচিত। পৃথুর পিতা বেন পুরাণমতে এই ধ্রুবেরই বংশধর।

গোষ্ঠীপতি রাজা ও বিষ্ণু

পুরাণে পৃথুকেই প্রথম রাজা বলে অভিহিত করা হয়েছে। পৃথিবীকে শস্যপ্রদানে বাধ্য করে পৃথু প্রজাদের জীবন রক্ষা করেছিলেন। তাদের ক্ষুধা ও ক্লেশ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। এইভাবে প্রজাদের অনুরঞ্জন করার জন্যই পৃথু রাজা নামে অভিনন্দিত হয়েছিলেন। (এবং প্রভাবস্য পৃথুঃ পুত্র বেনস্য বীর্যবান/জজ্ঞে মহীপতিঃ পূর্বো রাজাভূঞ্জনবন্ধনাৎ)।[৫৪] সেই পৃথুর রাজকীয় যে-সব লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়েছিল তার মধ্যে তাঁর দক্ষিণহস্তস্থিত চক্রচিহ্ন থেকে প্রমাণ হয়েছিল যে পৃথু ভগবান বিষ্ণুরই অংশ। (হস্তেতু দক্ষিণে চক্রং দৃষ্ট্বা তস্য পিতামহঃ/ বিষ্ণোরংশং পৃথুং মত্বা পরিতোষং পরং যযৌ।)[৫৫] চক্রচিহ্ন রাজচক্রবর্তিত্বের সূচক (বিষ্ণুচক্রং করে চিহ্নং সর্বেষাং চক্রবর্তি নাম।) মহাভারতে ষোড়শ রাজচক্রবর্তীর তালিকায় পৃথুবৈণ্যের উল্লেখ পুরাণের এই পরিচয় থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছিল। মহাভারতে এই পৃথুবৈণ্য সম্বন্ধে প্রদত্ত যে বিবরণ

আছে, তাতেও রাজপদের সঙ্গে বিষ্ণুর এই ঘনিষ্ঠ যোগের পরিচয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে বর্ণিত আছে যে বিষ্ণু স্বয়ং পৃথুবৈণ্যকে রাজপদে অভিষিক্ত করেছিলেন। ভগবান বিষ্ণুর প্রসাদগুণেই রাজা বিশ্বজয় করতে পারে এবং বামনরূপী এই বিষ্ণুই বলিকে প্রতিহত করে ইন্দ্রকে তাঁর রাজপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। রাজশক্তির মূল উৎস হিসেবে ভগবান বিষ্ণুর এই প্রসাদের ইঙ্গিত নানাভাবেই ব্রাহ্মণ, পুরাণ এবং মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে।

এখানে এই প্রসঙ্গে বর্ণিত একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করা যেতে পারে। দেবতা এবং অসুরদের দ্বন্দ্বে দেবতাদের বারংবার পরাজয় ঘটছিল। দেবতারা যে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রায়শই পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হচ্ছিলেন, ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতেও সে-কথার উল্লেখ আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভগবান বিষ্ণুর অনুকম্পায় তাঁদের মর্যাদারক্ষা এবং স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। এখানে উল্লিখিত বর্ণনায় আছে যে অসুরদের নিকটে পরাজয়ের কারণ-অন্বেষণে দেবতাদের উপলব্ধি হল যে অসুরেরা যেহেতু তাদের রাজার অধিনায়কত্বে পরিচালিত হয় সেই-হেতুই তারা জয়লাভ করে। দেবতাদের মধ্যে কোন রাজা না থাকায় তাঁরা অসুরদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমর্থ হচ্ছিলেন না। এই উপলব্ধি থেকেই তাঁরা নিজেদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণসম্পন্ন ইন্দ্রকে তাঁদের রাজপদে বরণ করে এবং এই ইন্দ্রের রাজা হিসেবে স্বীকৃতিলাভের পর তাঁরা অসুরদের সঙ্গে সংগ্রামে জয়লাভ করতে থাকেন। এই বিবরণের সঙ্গে ঋগ্বেদ এবং পরবর্তী ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র-গ্রন্থে দেবরাজ ইন্দ্রের ভগবান বিষ্ণুর উপর নির্ভরশীলতার বিষয় মিলিয়ে নিলে বিষ্ণুকেই যে রাজার প্রভাব এবং শক্তিমত্তার মূল উৎস বলে গণ্য করা হয়েছিল তা উপলব্ধি করা যায়। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নৃসিংহরূপী বিষ্ণুর দ্বারা নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিরুদ্ধ কোন শক্তিই তাকে প্রতিহত করতে পারেনি। এই বিবরণের মধ্যেও অসুরদের শক্তিমত্তা, রাজা হিসেবে হিরণ্যকশিপুর অসুর সমাজে স্বীকৃতি, এবং ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক এই অসুরের দমন ইত্যাদি থেকে ভগবান বিষ্ণুকে স্বীকৃতি দেওয়ার এবং শক্তির শীর্ষে বিষ্ণুকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস দেখা যায়। হিরণ্যকশিপুর কাহিনীতে তার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেবরাজ ইন্দ্রের কোন উল্লেখ নাই। ইন্দ্রের এই অনুল্লেখ থেকে মনে হয় দেবসমাজের বিবর্তনে বা দেবসমাজে রাজা হিসেবে তখনও ইন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। হিরণ্যকশিপুর পুত্র

প্রহ্লাদ এবং প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচনও দৈত্যদের অধিপতি এবং রাজারূপে প্রখ্যাত। ঋগ্বেদে বা পুরাণের পূর্বগামী কোন গ্রন্থে কিন্তু এঁদেরও কোন উল্লেখ নাই। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের সঙ্গে যে-সব প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের উল্লেখ আছে তাদের মধ্যে প্রধানরূপে পরিচিত বৃত্র দৈত্য আখ্যায় অভিহিত হননি ; তাঁকে বলা হয়েছে দানব (ঋ ১।৩২।৯)। এইসমস্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে দৈত্য এবং দানব নামে পরিচিত অসুরসমাজে সুপ্রাচীনকাল থেকেই সমাজশীর্ষে রাজার অস্তিত্ব স্বীকৃত ছিল। মূল অসুরসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইন্দ্র তাঁর অনুগামী জনগোষ্ঠী নিয়ে নূতন সমাজ গঠন করলেও সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে রাজা বলে স্বীকার করা হয় নাই। পুরাণের বর্ণনায় হিরণ্যকশিপুকে দৈত্যসমাজের একচ্ছত্র অধিপতি বলা হয়েছে। হিরণ্যকশিপু পুরাণমতে দক্ষপ্রজাপতির কন্যা ও ঋষি কশ্যপের অন্যতমা পত্নী দিতির পুত্র। ঋগ্বেদে আদিত্য দেবতাদের মাতা হিসেবে পরিচিত অদিতির নামের সঙ্গে দিতির নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায় (ঋ ৪।২।১১ ; ৫।৬২।৮ ; ৭।১৫।১২ ইত্যাদি)। অদিতির মত দিতিও সেখানে দেবী নামে অভিহিত হয়েছেন। ঋগ্বেদে কিন্তু দিতির সন্তান বা দৈত্য নামে পরিচিত কারো উল্লেখ নাই। সেখানে ইন্দ্রের প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী বৃত্র দানব নামেই পরিচিত। অথর্ববেদেই প্রথম দিতির সন্তান হিসেবে দৈত্য নামের উল্লেখ আছে (অথর্ব ৭।৭।১)। বৈদিক সাহিত্যে দৈত্যদের এইভাবে উল্লেখ থাকলেও দৈত্যরূপে পরিচিত কারও নাম সেখানে পাওয়া যায় না। পুরাণেই প্রথম বিপুল শক্তিশালী ও বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ, বিরোচন ও বলির উল্লেখ পাওয়া যায়। দৈত্যবংশের এইসব অধিপতির মধ্যে হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ বা বিরোচনের সঙ্গে দেবতাদের বা দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা যুদ্ধবিগ্রহের কোন উল্লেখ পুরাণে নাই। দৈত্যবংশের রাজা বলির সঙ্গেই দেবতাদের প্রবল বিরোধ ঘটেছিল, এবং বামনরূপী বিষ্ণু বলিকে প্রতিহত করে ইন্দ্রকে আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কথিত আছে যে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে বার বার পরাজিত হয়ে দেবতারা তাঁদের সমাজে একজন রাজার অভাবই এই পরাজয়ের কারণ বলে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেইজন্য তাঁদের দলপতি ইন্দ্রকে তাঁরা রাজপদে অভিষিক্ত করেন। অসুররাজ বলিকে প্রতিহত করে ভগবান বিষ্ণু ইন্দ্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, পুরাণের এই বিবরণের উল্লেখ থেকে স্বভাবতই অনুমান করা যায় ইন্দ্র দেব-

সমাজের নেতারূপে স্বীকৃত বিষ্ণু কর্তৃক রাজপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে রাজা বলে অভিহিত হতেন না।

পুরাণে দৈত্যরাজ বলির পরাজয়ের পর দৈত্যকুলের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। বলিদমনের এই ঘটনার সঙ্গে দৈত্যকুল-গুরু শুক্রাচার্যের সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায় তা খুবই কৌতুহলোদ্দীপক। এই বিবরণে শুক্রাচার্যকে দানবরাজ বৃষপর্বার গুরুরূপে অভিহিত করা হয়েছে। দানবরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠার সঙ্গে ঐল বংশের অধিপতি যযাতির পরিণয় হয়েছিল; সেইসঙ্গে শর্মিষ্ঠার সহচরী শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকেও যযাতি বিবাহ করেন। এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন হতে পারে দৈত্যরাজ বলির গুরুরূপে যে শুক্রাচার্যের উল্লেখ আছে তিনি এবং বৃষপর্বার গুরু শুক্রাচার্য কি একই ব্যক্তি? এই পারম্পর্যসূত্রে পুরাণে বর্ণিত ঐল বংশের খ্যাতনামা সম্রাট যযাতি প্রসঙ্গে প্রাচীন যুগের সমাজ-বিবর্তন ও ইতিহাসের বহু রহস্যের উদ্‌ঘাটন হতে পারে বলে মনে হয়।

নির্দেশিকা

১. ঋগ্বেদ, ৫।১৭:৯ ; ১।১০৪:১৭।
২. বৃহদ্দেবতা, ৩।১৩৬।
৩. ঋগ্বেদ, ১০।৬৩:৭।
৪. বৃহদ্দেবতা, ৩।৬১।
৫. ঋগ্বেদ, ৩।২:৪ ; ৩।২৬:২ ; ৬।৮:৪।
৬. তৈত্তিরীয় সংহিতা, ২।৫।৮:৫ ; ১১।৮।
৭. সদ্‌গুরুশিষ্য, নীতিমঞ্জরী, বৃহদ্দেবতা, সায়ন ইত্যাদি।
৮. বৃহদ্দেবতা, ৭।৩৬।
৯. ঋগ্বেদের ১০।৫৪:৪ সম্পর্কে যাস্কের মন্তব্য, ৩।৮।
১০. ঋগ্বেদ, ১।৬৩:৭।
১১. ঐ, ১।১২৬:৬-৭ : ১।১৬৫।
১২. শতপথ ব্রাহ্মণ, ৪।২।৩:১০ ; ৪।৫:১ ; ৫।২।৩:৬।
১৩. ঋগ্বেদ, ১।৬১:৭ ; ৮।৬৬:১০।
১৪. শতপথ ব্রাহ্মণ, ১।১।১:১৩ ; ৩।২:২৪ ; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭।৭:২
মৈত্রায়ণী সংহিতা, ৩।৬:৫।
১৫. তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৫।২।১:১।
১৬. শতপথ ব্রাহ্মণ, ১১।১।৮:৩।
১৭. ঐ, ৬।৩।১:১৭ ; ৭।৩।১:৪২।
১৮. ঋগ্বেদ, ১।১৫৫:৬।

১৯. মহাভারত, ১।১২৫:২৩।
২০. ঐ, ১৩।১৪:৭৪।
২১. যাস্ক, নিরুক্ত, ৪।২৭।
২২. ঐ, ১।১৯:৩২।
২৩. ঋগ্বেদ, ৪।১৮:১১।
২৪. শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৪।১:১।
২৫. মহাভারত, ১।২৩:১৬।
২৬. ঐ, ৩।১১৫:১৪।
২৭. Macdonell, A. A., in Journal of the Royal Asiatic Society (J. R. A. S.), 1895, pp. 165f.
২৮. বিষ্ণুপুরাণ, ৩।১:৪২।
২৯. ভাগবত পুরাণ, ৮।১৮-২৩।
৩০. ঐ, ৮।২০:৩৩।
৩১. ঐ, ৮।২২:৩৫।
৩২. বেদে বর্ণিত ইন্দ্র-বৃত্র কাহিনী সম্পর্কে নিরুক্তকার যাস্কের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যাস্ক এই কাহিনীর দুইপ্রকার ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন। একটি ব্যাখ্যা অনুসারে আকাশের মেঘে আবৃত জলের মুক্ত হয়ে বর্ষণরূপে ধরণীতে অবতরণ। যে শক্তি মেঘের বারিরাশিকে ধরে রাখে তাকে বৃত্র এবং যে শক্তি সেই বারিরাশিকে মুক্ত করে দেয় তাকেই মনে করা হয় ইন্দ্র। এই আখ্যানের প্রাকৃতিক এই ব্যাখ্যা ছাড়া এটিকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বলেও গণ্য করা হত, যাস্ক এই মতও প্রকাশ করেছেন। সায়ন তাঁর ব্যাখ্যায় ঘটনাটিকে ঐতিহাসিক কোন গুরুত্বই দেন নাই। বহু প্রাচীনকালে সংঘটিত ঐতিহাসিক একটি ঘটনা কালক্রমে স্মৃতিবিচ্যুত প্রতীকরূপে পরিণত হয়েছিল বলে অনুমান করা অযৌক্তিক নয়।
৩৩. বিষ্ণুপুরাণ, ১।২১:৪-১২।
৩৪. ঐ, ১।২১:৬-৭।
৩৫. ঐ, ৪।১০:৪।
৩৬. শতপথ ব্রাহ্মণ, ১১।৬।৩.৫।
৩৭. Hopkins, E. W., Epic Mythology, p. 33.
৩৮. রামায়ণ, ১৬।
৩৯. Epigraphia Indica, XVI, p. 24.
৪০. J. R. A. S., 1824, p. 20.
৪১. বৃহদ্দেবতা, ৭।৬৮।
৪২. Pargitar, F. E., A. I. H. T., p. 237.
৪৩. ঋগ্বেদ, ১০।৯৮:৮; 'দেবাপিশ্চার্ষ্টিষেণঃ শান্তনুশ্চ কৌরব্যৌ ভ্রাতরৌ বভূবতুঃ'—যাস্ক, নিরুক্ত ২।১০।
৪৪. অনেক পণ্ডিত ব্রহ্মসূত্রকে ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের পরের রচনা বলে মনে করেন। মহাভারতের বহু অংশকেও ভগবান বুদ্ধের উত্তরকালে সংকলিত বলে গণ্য করা হয়। ব্যাসের রচনা বলে প্রচলিত পুরাণগুলি আরও অনেক পরের। এইসব তথ্যের বিবেচনায়

মনে হয় মহাভারত বা পুরাণের মূল যেমন বহু প্রাচীন, ব্রহ্মসূত্রের মূলকেও তেমনি অত্যন্ত প্রাচীন বলে গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত।

৪৫. Pargitar, F. E., A. I. H. T., p. 18.

৪৬. ঋগ্বেদ, ৭।৯৫.২।

৪৭. ভাগবতপুরাণ, ৯।১৮:৪৮।

৪৮. ঐ, ৯।২৩:১৭-১৮।

৪৯. বৃহদ্দেবতা, ৪।২১-২৫।

৫০. "মহিমান্বিতা মাতৃরূপা নদী আমাকে গ্রাস করে ফেলেননি"—ঋগ্বেদ, ১।১৫৮.৫।

৫১. ভাগবত পুরাণ, ৯।২০:২৪-২৬।

৫২. মহাভারত, ১২।৫৯:১২৭ থেকে।

৫৩. শতপথ ব্রাহ্মণ, ১১।৫।৬:৮।

৫৪. বিষ্ণুপুরাণ, ১।১৩.৯৩।

৫৫. ঐ, ১।১৩:৪৫।

৭

বিষ্ণুমহিমার প্রসার

যযাতির পরে ঐলবংশে চক্রবর্তীরাজা হিসেবে ভরত-দৌষ্মন্তির উল্লেখ পাওয়া যায়, এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাণের বর্ণনামতে যযাতির চক্রবর্তিত্বলাভ যেমন যজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তেমনি ভরত-দৌষ্মন্তির সঙ্গেও যজ্ঞরূপী ভগবান বিষ্ণুর ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। অথর্ববেদ, শতপথ ব্রাহ্মণ এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের বর্ণনা অনুসারে যজ্ঞরূপী ভগবান বিষ্ণুই বামনরূপ ধারণ করে বলিকে প্রতিহত করে ইন্দ্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যে-সব বৈষ্ণবীয় পুরাণে বাসুদেব কৃষ্ণের প্রাধান্য সমধিক সেখানে যযাতি-যদুর বংশজাত সাত্বতদেরই বিবরণ বিস্তৃততরভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পিতার আনুকূল্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুরু সার্বভৌমত্বে প্রতিষ্ঠিত হলেও পুরুর অধস্তন বংশধরদের বিবরণ সেখানে তেমন বিস্তৃত নয়। বরং খুবই সংক্ষিপ্ত বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। মনুর অন্য পুত্রদের মধ্যে ইক্ষ্বাকুর বংশধরদের ধারাবাহিকতার উল্লেখ থাকলেও ইক্ষ্বাকুর অন্যান্য ভ্রাতাদের এবং সেইসঙ্গে পুরুর অন্যান্য ভ্রাতাদের বংশাবলীর বিবরণও পুরাণ কাহিনীতে একান্তই সংক্ষিপ্ত। এর ফলে মনুর অন্যান্য বংশধরদের দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর স্বীকৃতি কিভাবে প্রসারিত হয়েছিল সে তথ্য সুস্পষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। তবে ইক্ষ্বাকু বংশের একাধিক রাজা মহাভারতের মতে চক্রবর্তীরূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন জানা যায়। এই বংশধরদের মধ্যে মান্ধাতাই প্রথম চক্রবর্তীরূপে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন। মান্ধাতার উল্লেখ ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়।[১] ঋগ্বেদের মতে চক্রবর্তী মান্ধাতাও ছিলেন যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা।[২] যেভাবে পুরাণগুলিতে পুরুর বংশের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে যযাতির পরে এবং ভরত-দৌষ্মন্তির মাঝখানে উল্লেখযোগ্য কোন রাজার নামের সন্ধান পাওয়া যায় না।

পুরাণের বর্ণনায় ভরত-দৌষ্মন্তির উল্লেখ এবং তাঁর চক্রবর্তিত্ব খ্যাতির বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। তা হলেও তাঁর সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত বিবরণ মহাভারত ছাড়া অন্য গ্রন্থে তেমন পাওয়া যায় না। ভাগবত পুরাণে অবশ্য ভরত-দৌষ্মন্তিকে ভগবান শ্রীহরির অংশসম্ভূত বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেইসঙ্গে ঐতরেয়

আরণ্যকে বর্ণিত মহাভিষেক কাহিনীর প্রতিধ্বনি করে ভরতের দক্ষিণ হস্তে চক্রচিহ্ন এবং পদদ্বয়ে পদ্মকোশের অস্তিত্বের উল্লেখ করে ভরতের রাজচক্রবর্তিত্বের সমর্থন জানিয়েছে (পিতর্যুপরতে সোঽপি চক্রবর্তী মহাযশাঃ/মহিমা গীয়তে তস্য হরেরংশভুবো ভুবি//চক্রং দক্ষিনহস্তেঽস্য পদ্মকোশঽস্য পাদয়োঃ/ইজে মহাভিষেকেণ সোঽভিষিক্তোঽধিরাড়্বিভুঃ—ভাগবত) ।[৩] ভাগবতের এই বর্ণনায় ভরতের সম্পর্কে ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে চক্রবর্তিত্বের যোগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে সুস্পষ্টভাবেই চক্রবর্তী ভরতকে শ্রীহরি অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণুর অংশসম্ভূত বলে দাবি করা হয়েছে। বৈদিক সূত্রে বর্ণিত আছে যে মামতেয়-দীর্ঘতমসের পৌরোহিত্যে গঙ্গা-যমুনার তীরে ভরত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন।[৪] এই যজ্ঞের সংবাদ ভাগবতেও পাওয়া যায় (পঞ্চপঞ্চাশতা মেধ্যৈর্গঙ্গায়াম বাজিভিঃ/মামতেয় পুরোধায় যমুনায়ানামনু প্রভুঃ)।[৫] এই প্রসঙ্গে ইক্ষ্বাকুবংশের যে কাকুৎস্থের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁর কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। দৈত্যদের দ্বারা পরাজিত দেবতারা তাঁদের দুর্বিপাক থেকে ত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন। বিষ্ণু-ভগবান তখন তাঁদের ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভূত পুরঞ্জয়ের সাহায্য প্রার্থনা করতে বলেন এবং তিনি নিজে পুরঞ্জয়ের দেহে অংশমাত্রে অবতীর্ণ হয়ে দৈত্যদের পরাজিত করবেন এই আশ্বাস প্রদান করেন।[৬] দৈত্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পুরঞ্জয়ের জয়লাভ যেমন ভগবান বিষ্ণুর আনুকূল্যেই সম্ভব হয়েছিল তেমনি এই বংশের প্রথম চক্রবর্তী নামে অভিহিত রাজা মান্ধাতাও অচ্যুত বা ভগবান বিষ্ণুর অনুগ্রহেই সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরার শাসনভার লাভ করেছিলেন (যৌবনাশ্বোঽথ মান্ধাতা চক্রবর্ত্যবনিং প্রভুঃ/সপ্তদ্বীপপতিমেকঃ সশাসাচ্যুত তেজসা —ভাগবত পুরাণ)।[৭] মান্ধাতার এই চক্রবর্তিত্বলাভের সূত্রেও যজ্ঞের সঙ্গে ভগবান বিষ্ণুর একাত্মকতা এবং রাজচক্রবর্তিত্বের পেছনে যজ্ঞের কার্যকারিতার উল্লেখ স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যায়। (ইজে চ যজ্ঞং ক্রতুভিরাত্মবিদ ভূরিদক্ষিণৈঃ/সর্বদেবময়ং দেবং সর্বাত্মকমতীন্দ্রিয়ম্ || দ্রব্যং মন্ত্রো বিধির্যজ্ঞো যজমান স্তথর্ত্বিজঃ। ধর্ম দেশশ্চ কালশ্চ সর্বমেতদ্ যদাত্মকম্ ॥ —ভাগবত)।[৮]

যজ্ঞের সঙ্গে এক ও অভিন্ন অচিন্ত্যরূপী যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণু যে বৈবস্বত যুগের প্রায় প্রারম্ভকাল থেকেই ইক্ষ্বাকু এবং পুরুরবার বংশের দ্বারা স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন, ব্রাহ্মণ তথা পুরাণ গ্রন্থগুলি থেকে সে-কথা নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করা

যায়। দেবরাজ ইন্দ্রের একান্ত নির্ভরস্থল ভগবান বিষ্ণুকে সর্বদেবময় ও সর্বাত্মক রূপে উপলব্ধি করে তাঁকে পরমতম উপাস্যরূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াসে, রাজ্য-বিস্তারে, রাজ্যপালনে, প্রজার মঙ্গলচিন্তা ও দুর্গতিলাঘব তথা সভ্যতা-সংস্কৃতির বিস্তারের সঙ্গে ভগবান বিষ্ণুর এই যোগ যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমনি ভগবান বিষ্ণুকে তাবৎ জগতের স্রষ্টা, পালক ও ধ্বংসসাধনের মূলীভূত শক্তি, সকল অস্তিত্বের ও সকল প্রাণীর পরমগতি ও পরমার্থরূপে অতি প্রাচীন যুগ থেকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। ঋগ্বেদের স্বল্পপরিচিত দেবতা বিষ্ণু যে কিভাবে এক অচিন্ত্যনীয় বিবর্তনপথে অপর সকল দৈবী কল্পনাকে অতিক্রম করে এই বিস্ময়কর মহিমায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এখানে তারই রূপরেখার কিছু অনুসরণ করা হল। যে সংস্কৃতিধারা সারা ভারতে বর্তমানে প্রসারিত, তার মূল ভিত্তি পুরাণসমূহে বিধৃত আছে ; এই উপলব্ধি থেকেই অনেকে সংখ্যাগুরু ভারত জন-গোষ্ঠীর ধর্মকে পৌরাণিক ধর্ম বলে অভিহিত করেছেন। এই পুরাণের আশ্রয়ে যে পরাতত্ত্বের অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায় তার এক বিস্তৃত অংশে এই বিষ্ণুভগবানকেই পরমতত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস ঘটেছিল। সংস্কৃতির এই বিবর্তনপথের অনুশীলনে ইতিহাস-পুরাণ নামে পরিচিত ব্যাপক সাহিত্যসম্ভারকে ভারতমানসের অনন্যসাধারণ সৃষ্টি বলে অভিহিত করা যেতে পারে। বৈদিক সাহিত্যে সংস্কৃতির যে প্রারম্ভিক স্তর পরিলক্ষিত হয় ইতিহাস-পুরাণে তারই বিস্তৃতি ও পরিণতির রূপরেখা বিধৃত আছে।

এখানে যে আলোচনা উপস্থিত করা হল তা থেকে অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে চক্রবর্তী ভরতের অভ্যুত্থানের সঙ্গে বিষ্ণু-ভগবানের জনপ্রিয়তার প্রসারের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বিষ্ণু বামনরূপ ধারণ করে একসময় 'ইন্দ্রকে' তার হৃত রাজ্যে পুনরধিষ্ঠিত করেছিলেন। পুরাণের এই বর্ণনার তাৎপর্য সম্পর্কে তেমন অন্বেষণ হয় নাই। এখানে দেখানো হয়েছে ইন্দ্র-বৃত্র বিরোধের ফলে এক সংগঠিত জনগোষ্ঠী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ইন্দ্র তাঁর অনুগামীদের নিয়ে এক নিজস্ব পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিলেন এবং যৌথ আবাসভূমির একাংশে নিজের আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন। তাঁর আনুকূল্যে মনুর কন্যা ইলার বংশধরেরা এই স্বতন্ত্র রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন ; তাঁদের এই অধিকার-ভোগ শান্তিপূর্ণ হয় নাই। বেশ কয়েকবার তথাকথিত অসুর শত্রুর দল তাঁদের এই অধিকার থেকে বিচ্যুত করেছিল। শেষপর্যন্ত অসুররাজ বলির হাত থেকে ব্রাহ্মণরূপী বিষ্ণু

কৌশলে দেবতাদের এই অধিকার পুনরুদ্ধার করে ইন্দ্রকে তাঁর হৃতরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই ইন্দ্র এবং ঐলবংশের নহুষ সম্ভবত এক ও অভিন্ন ছিলেন। নহুষ অসুরকন্যা বিবাহ করেছিলেন; নহুষের পুত্র যযাতিও অসুর-গুরু-শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী এবং অসুরসম্রাট বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেছিলেন। এই রাজনৈতিক বোঝাপড়ার পর অসুরসমাজের সঙ্গে ইন্দ্রানুগামীদের আর দ্বন্দ্ববিগ্রহ তেমন হয় না; তবে অসুর-অধ্যুষিত অঞ্চলের সঙ্গে তেমন সৌহার্দ্য বা যোগাযোগও ছিল না বলেই অনুমান হয়। অসুরসমাজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা উপাস্য দেবতাকে ইন্দ্রানুরাগীরা তেমন গ্রহণ করে নাই। ইন্দ্রানুগামীদের মধ্যে বামনরূপধারী বিষ্ণুর দ্বারা ইন্দ্রের স্বরাজ্যে পুনরধিষ্ঠানের পরে বিষ্ণুর মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল সন্দেহ নাই। ইন্দ্রানুগামীদের নেতৃস্থানীয় ঐল-পুরুরবার বংশের একসময় ভাগ্যবিপর্যয় ঘটলে ঐ বংশের দুষ্মন্ত তাঁর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু দুষ্মন্তের পুত্র ভরতই পুনরায় ঐ বংশের সার্বভৌমত্ব এবং রাজচক্রবর্তিত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন। ভরতের এই পুনরধিষ্ঠানে ভগবান বিষ্ণুর অনুগ্রহ এবং আনুকূল্য প্রত্যক্ষ করার ফলেই যারা ভরতের আধিপত্য স্বীকার করেছিল তারা ভগবান বিষ্ণুকে উপাস্যদের মধ্যে প্রাধান্য আরোপ করেছিল। এইভাবেই যজ্ঞবাদী সমাজে ভগবান বিষ্ণুর অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আব এই সূত্রেই ভরত চক্রের অধীশ্বররূপী বিষ্ণুর অনুগ্রহপুষ্ট 'রাজচক্রবর্তী' আখ্যায় পরিচিত হয়েছিলেন।

সংস্কৃতিধারার সংরক্ষণ ও পরিচয় প্রসঙ্গে
মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস

অনন্ত অতীতকাল থেকে শ্রুতি-পথে লালিত বেদসংহিতা সংকলন করে ঋষি পরাশরের পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বেদকে চার অংশে বিভক্ত করেন এবং সেই চার অংশ তিনি তাঁর চার শিষ্যকে প্রদান করেছিলেন সেই জ্ঞানের উপযুক্ত সংরক্ষণের জন্য। এরপরে সুদূর অতীত থেকে প্রচলিত আখ্যান-ব্যাখ্যান-উপাখ্যানাদির আর একটি সংকলন সাধন করে সূত নামে পরিচিত এক অন্যতর শিষ্য রোমহর্ষণ বা লোমহর্ষণকে দিয়েছিলেন। এর পর তিনি রচনা করেছিলেন মহাভারত। আদি কবি নামে পরিচিত বাল্মীকির মূল রামায়ণ হয়ত ইতিপূর্বেই প্রচলিত হয়েছিল। অন্যান্য বহু কাহিনীর মত মূল ভারত-কাহিনীর

অঙ্গ হিসেবে রামকথাও মহাভারতে গ্রথিত হল। সমস্ত ভারতসংস্কৃতির বিস্তৃত উৎস এইভাবে বেদ, পুরাণ ও মহাভারতে এক সামগ্রিক রূপ গ্রহণ করল। পরাশর-পুত্র নামে আখ্যাত কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে সন্নিবিষ্ট দেবাপি-শান্তনুর কাহিনীকে অন্তিম প্রান্তবিন্দু বলে ধরে নেওয়া যায়, কারণ এই শান্তনু কাহিনীর পরবর্তীকালের আর কোন উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদের বিবরণে এই কাহিনীও অতীতের কাহিনী বলেই অভিহিত হয়েছে। বেদসংহিতায় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সূক্ত আকারে যা-কিছু পেয়েছিলেন তারই সংকলন করেছিলেন : স্বকীয় রচনা তিনি এই সংহিতা-প্রকল্পে কিছুমাত্র সংযোজন করেন নাই। পুরাণসমূহের বর্তমানে প্রচলিত সবগুলির সংকলন বা রচনা যে ব্যাসকৃত নয়, এ তথ্য প্রতিষ্ঠা করে পাশ্চাত্য পুরাণবিদরা ভারতের প্রজ্ঞাকে পরিহাস করেছেন। বিভিন্ন যুগে রচিত এবং সংকলিত পুরাণসমূহকে ভারতীয়েরা একই রচয়িতার দ্বারা গ্রথিত বলে প্রচার করে এসেছেন ; তাঁদের মতে এই বিশ্বাস ভারতীয়দের জ্ঞান-বুদ্ধির স্বল্পতারই পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যদি কোন পুরাণ রচনা বা সংকলন করে থাকেন তবে একখানি পুরাণই তিনি সংকলন করেছিলেন। 'পুরাণ-সংহিতাং চক্রে পুরাণার্থ বিশারদঃ' বিষ্ণুপুরাণ ও বিভিন্ন অন্য পুরাণে পুরাণসংকলন ব্যপদেশে বর্ণিত এই উক্তিতে একবচনে 'পুরাণ-সংহিতাম্' এই শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে।[৯] এ থেকে সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, যে অষ্টাদশ পুরাণের কথা মহাভারতে পাওয়া যায় (মহাভারত, ১৮।৬:৩০৪) তা ব্যাসদেব নিজেই রচনা করেননি। তাঁর নিজের রচিত পুরাণ একখানিই ছিল ; এই পুরাণখানি তিনি সূত রোমহর্ষণকে সম্প্রদান করেছিলেন। (প্রখ্যাত ব্যাসশিষ্যোৎভূৎসূতো বৈ রোমহর্ষণঃ পুরাণসংহিতাং (এখানেও সেই একবচন লক্ষণীয়) তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামতিঃ—বিষ্ণু)।[১০] মূল এই একখানি পুরাণ থেকেই পরবর্তীকালে, সম্ভবত সেই সূত নামে পরিচিত রোমহর্ষণের পরম্পরার দ্বারা বিভিন্ন উপলক্ষে প্রয়োজন-মত অষ্টাদশখানি পুরাণ রচিত হয়েছিল। সেইহেতুই বিভিন্ন পুরাণে গ্রথিত বিষয়ের বিভিন্নতা আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, বংশানুচরিত এবং মন্বন্তরাদি মূল বিষয়বস্তুর যে বর্ণনা আছে, সেইসব বর্ণনা সব: পুরাণেই পরস্পরের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং সাদৃশ্যপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে সূত নামে পরিচিত রোমহর্ষণকে এই পুরাণসংহিতা দান করার বিবরণটা বিশেষ

গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। পুরাণরচনায় ব্যাস সংকলন করেছিলেন আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা এবং কল্পশুদ্ধি (আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈঃ গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ)। তিনি এইসব উপাদান কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, এ প্রশ্ন অবশ্যই জাগ্রত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে পৃথুবৈণ্যের অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞে সূত ও মাগধের উদ্ভবের আখ্যান স্মরণ করা যেতে পারে। এই সূতেরা বংশপরম্পরা-সমৃদ্ধ অতীত আখ্যান ও উপাখ্যানসমূহ গাথার আকারে সংকলন করে রাখতেন বলে জানা যায়। তেমনি একজন সূতকে মহামতি ব্যাসের দ্বারা নিজ সংকলিত পুরাণ সংহিতা প্রদান করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল কি কারণে প্রশ্ন জাগা কিছু অন্যায় নয়। স্বভাবতই মনে হয় সেই প্রাচীন আখ্যান এবং উপাখ্যান-গুলি নিতান্ত অসংলগ্নভাবেই রক্ষিত ছিল এবং খুবই সম্ভবত সেগুলি রচিত হত নানা কথ্য 'প্রাকৃতে'। ভগবান ব্যাসদেব হয়ত সেই ধরনের আখ্যান-উপাখ্যানের প্রাকৃতে রচিত রচনাগুলিকে সূতদের নিকট থেকে সংগ্রহ করেছিলেন—যারা পুরুষানুক্রমে তাদের পিতা-পিতামহদের নিকট থেকে জীবিকা অর্জনের উপকরণ হিসেবে সেগুলি লাভ করেছিল। ব্যাসদেব তাদের কাছ থেকে পাওয়া সেই-সব উপকরণগুলি সংগ্রহ করেই, একটি আদর্শ মূল পুরাণ রচনা করেছিলেন। যাদের কাছে সংস্কৃতই ছিল অনুশীলনযোগ্য একমাত্র মার্জিত ভাষা তাদের জন্য সেই সংস্কৃত ভাষাতেই এই নূতন পুরাণ-গাথা ব্যাসদেব কর্তৃক রচিত হয়েছিল। রোমহর্ষণ নামে যে সূতকে তিনি তাঁর শিষ্য করে নিয়েছিলেন, হয়ত তার মাধ্যমেই প্রচলিত সেই আখ্যান উপাখ্যানগুলি তিনি পেয়েছিলেন এবং নূতনভাবে রচনার পর সেই রোমহর্ষণকেই তিনি তাঁর নবরচিত পুরাণখানি প্রদান করে-ছিলেন, তার যথাবিহিত প্রচারের জন্য। কথিত আছে ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন ব্যাস-রচিত মহাভারত তক্ষশীলা নগরীতে পৌরব সম্রাট জন্মেজয়ের অনুষ্ঠিত (সর্প-) যজ্ঞ উপলক্ষে প্রথম আবৃত্তি করেছিলেন। পরে রাজা শৌনকের নৈমিষারণ্যে অনুষ্ঠিত অন্য এক যজ্ঞে সেই রোমহর্ষণ (মহাভারতে লোমহর্ষণ) দ্বিতীয়বারে সেই মহাভারত পাঠ করেছিলেন। সে যুগে রাজামহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহতী যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়ত মহাভারত পাঠের উপযুক্ত উপলক্ষ বলে বিবেচিত হত। এইভাবে মহাভারত গ্রন্থের যে অপ্রমেয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারই ফলে মহাভারত গ্রন্থের আর নূতন করে পুনঃসম্পাদন প্রক্রিয়া সম্ভবপর হয়নি। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর এবং ভিন্ন ভিন্ন দেবতার অনুরাগী জনগোষ্ঠীর জন্য সূত এবং

মাগধেরা সেই মূল ব্যাসরচিত পুরাণকে আদর্শ রেখে প্রয়োজনমত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে উদ্দেশ্যানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের রূপদান করেছিলেন। এই ধরনের সম্পাদনা ও পুনর্লেখনের ফলে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে গ্রথিত বিষয়বস্তুরও নানাপ্রকার তারতম্য ঘটেছিল। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়বস্তুর উপরে গুরুত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, যার ফলে এইসব স্বতন্ত্র বিষয়বস্তু বিস্তৃততর রূপ নিয়েছিল; কিন্তু সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ ইত্যাদিতে তেমন বিশেষ তারতম্য বা ব্যতিক্রম সাধিত হয়নি। মূল পুরাণের বংশখণ্ডের, পাণ্ডুবংশীয় অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতের কালেই পরিসমাপ্তি ঘটে, পরবর্তী বংশখণ্ডের রচনা ভবিষ্যদ্বাণীর মত রচিত হয়ে পুরাণের দেহকাণ্ডে গ্রথিত হয়েছিল। পুরাণের এই বিষয়ানুসরণ থেকে এই কথাই প্রতীয়মান হয় যে মূল পুরাণ মহাভারত গ্রন্থের মত ভারতযুদ্ধের অবসানের পর পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেকের পরই সমাপ্ত হয়েছিল এবং এই উভয় সাহিত্যকীর্তিতে পরীক্ষিতের পরবর্তী অংশ কাহিনীকারদের দ্বারা পরবর্তীকালে সংগ্রথিত হয়েছিল।

এই যুক্তিকে স্মরণে রেখে পুরাণগুলিকে অনুশীলন করলে দেখা যায় যে বিভিন্ন পুরাণের অনেকগুলিই ভগবান বিষ্ণুর মাহাত্ম্য এবং ভাবৈশ্বর্য অবলম্বন করেই সংগ্রথিত হয়েছিল। যে অষ্টাদশ মহাপুরাণের পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে ব্রহ্ম, পদ্ম, বৈষ্ণব, গরুড়, ভাগবত, বামন, মৎস্য, কূর্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত ইত্যাদিকে প্রধানত বিষ্ণু-নির্ভর সৃষ্টি বলা চলে। শিব এবং লিঙ্গপুরাণ মূলত শিব-নির্ভর। বৈষ্ণব পুরাণগুলি মূলত বিষ্ণু-নির্ভর হলেও বিষ্ণু, ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত ইত্যাদি পুরাণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বস্তুত এই পুরাণ ও মহাভারত ভিত্তিতে কিভাবে এই বিষ্ণুপ্রবণতা শেষপর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের মাধ্যমে এক অভূতপূর্ব ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি অর্জন করেছিল তার বিবরণ সুন্দরভাবে অনুসরণ করা যায়। ব্যাসদেবের রচিত এই পুরাণ ও মহাভারতের ভিত্তিতে ভগবান বিষ্ণুর প্রভাব-বিবর্তনের যে রূপরেখা বিধৃত হয়েছে তা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি মাহাত্ম্যপূর্ণ। পুরাণ-প্রবাহে যে দু'টি প্রধান রাজবংশের শাখা-প্রশাখার বিস্তৃত পরিচয় আছে তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই ভগবান বিষ্ণুকে স্বীকার ও গ্রহণ করবার প্রমাণ সুস্পষ্ট। এই তথ্যের বিবেচনায় সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয় যে পুরাণ-অনুসৃত সংস্কৃতিতে ভগবান বিষ্ণু এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উত্তুঙ্গ স্থান অধিকার করেছিলেন। দেবতাদের মধ্যে প্রধানরূপে বর্ণিত ইন্দ্রকে ঋগ্বেদেই

ভগবান বিষ্ণুর নিকট সাহায্যপ্রার্থীরূপে বর্ণিত হতে দেখা যায়। ক্রমে ইন্দ্রকে অতিক্রম করে বিষ্ণু যে বিশেষ প্রাধান্যলাভ করেছিলেন সে-তথ্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৫।২৬:৭), ঐতরেয় আরণ্যক (৬।১৫), শতপথ ব্রাহ্মণ (১।২:৫; ১।৯।৩:৯), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১।৬।১।৫), তৈত্তিরীয় সংহিতা (২।১।৩:১), ইত্যাদি গ্রন্থে বিশেষভাবেই বর্ণিত হয়েছে। কি করে ভগবান বিষ্ণু দেবতাদের মধ্যে প্রধান স্থান গ্রহণ করেছিলেন সেই প্রসঙ্গ যেমন শতপথ ব্রাহ্মণ (১৪।১:১) এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (৫।১:১-৭) বর্ণিত হয়েছে, তেমনি ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (১।১:১) দ্বিধাহীনভাবে বিষ্ণুকে দেবতাদের মধ্যে প্রধানতম বলে ঘোষণা করেছে দেখা যায়।[১১] এইভাবে ভগবান বিষ্ণু দেবতাদের মধ্যে কেবল প্রধানতম স্থানেই অধিষ্ঠিত হন নাই তিনি 'সর্বদেবময়' এই আখ্যাও লাভ করে-ছিলেন।[১২] মহাভারতে (১২।৩৩৮:৩৬) ভগবান বিষ্ণুকে অব্যক্ত, অচিন্ত্যনীয় ব্রহ্মের সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলে বর্ণনা করে ভারতীয় মানসচিন্তায় উপলব্ধ পরম সত্তায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। তাবৎ পরিকল্পনার এই অচিন্ত্য ও পরমতম রূপটিকে বিষ্ণুপুরাণে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশিত হয়ে বিষ্ণুপরিকল্পনার চূড়ান্ততম রূপটিকে পরিস্ফুট করা হয়:

ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপস্তং সমষ্টিব্যষ্টিরূপবান্
সর্বজ্ঞস্‌সর্ববিৎসর্বশক্তিজ্ঞানবলর্ধিমান্ ॥
অন্যূনশ্চাপ্যবৃদ্ধিশ্চ স্বাধীনো নাদিমান্বশী
ক্লমতন্দ্রাভয়ক্রোধকামাদিভিরসংযুতঃ ॥
নিরবদ্যঃ পরঃ প্রাপ্তেনির্বাধিষ্ঠোঽক্ষরঃ ক্রমঃ
সর্বেশ্বরঃ পরাধারো ধাম্নাং ধামাত্মকোঽক্ষয়ঃ ॥
সকলাবরণাতীত নিরালম্বনভাবন
মহাবিভূতিসংস্থান নমস্তে পুরুষোত্তম ॥ ৫।১:৪৬ ৪৯

বিষ্ণু-চিন্তা-বিধৃত সমাজের বিবর্তন

ভগবান বিষ্ণুর অংশরূপে বর্ণিত দুষ্মন্তপুত্র ভরতের ঐন্দ্রাভিষেক ও চক্রবর্তী-পদে প্রতিষ্ঠা যেমন পুরাণ-বর্ণিত সংস্কৃতিধারার এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা তেমনি ভগবান বিষ্ণুর স্বীকৃতির ক্ষেত্রেও এই ঘটনা এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। রাজচক্রবর্তী ভরতের উত্তরাধিকারী নামে পরিচিত হস্তি গঙ্গার উপকূলে (বর্তমান

মীরাটের সন্নিকটে) এক পুরী প্রতিষ্ঠা করেন। হস্তিনাপুর নামে পরিচিত এই পুরী সম্রাট হস্তির সময় থেকে পৌরব বংশের রাজধানীতে পরিণত হয়। রাজার এই হস্তিনাম ও তৎপ্রতিষ্ঠিত রাজধানীর হস্তিনাপুর নামকরণে হয়ত সংস্কৃতিগত কিছু ইঙ্গিত ছিল। যদিও ঋগ্বেদে তেমন উল্লেখ নাই কিন্তু পুরাণে গজরাজ ঐরাবত দেবরাজ ইন্দ্রের বাহনরূপে গণ্য হয়। যে বংশের রাজারা ইন্দ্রত্বের দাবি করত তাদের মধ্যে অন্যতম একজনের হস্তি এই নাম এই ইন্দ্রত্বের দাবির পরিচায়ক বলে অনুমান করা খুব অযৌক্তিক মনে হয় না। ইন্দ্রত্বের দাবিদার এই রাজার নিজ রাজধানীকে নিজের নামানুসারে হস্তিনাপুর নামে অভিহিত করার মধ্যেও সেই ইঙ্গিতই নিহিত আছে মনে করা যেতে পারে। পরে ধার্তরাষ্ট্রদের সঙ্গে পাণ্ডবদের যখন বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল, পাণ্ডুর বংশধরেরা তখন রাজ্য বিভাগ করে নিজেদের জন্য একটি নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমারোহ সহকারে রাজসূয় যজ্ঞ করে যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের পর নিজেদের রাজধানীকে তাঁরা ইন্দ্রপ্রস্থ নামে অভিহিত করেন। এই ইন্দ্রপ্রস্থ নামের মধ্যে সেই প্রচলিত ইন্দ্রত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার মানসিকতাই ক্রিয়াশীল ছিল এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই বিবর্তনপথে যিনি স্বয়ং বিষ্ণুরই মানুষী রূপধারী বলে গণ্য হয়েছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেবের যে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছিল তারও বিশেষ তাৎপর্য ছিল বলে মনে হয়। সুপ্রাচীন বিষ্ণুচেতনা থেকে পুরুষোত্তমরূপে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেবের ভগবান বিষ্ণুসত্তায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠাতে ভারতসংস্কৃতির এক মহাবিস্ময়কর পরিণতি পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য ঋগ্বেদ বা আরণ্যক, ব্রাহ্মণ এবং সংহিতা গ্রন্থসমূহে ক্রমপর্যায়ে দেবতা বিষ্ণু অন্য সমস্ত দেবতাকে অতিক্রম করে বিশেষত্ব অর্জনের সূত্রেই সুস্পষ্টভাবে বিভিন্ন পুরাণে এবং মহাভারতে বিষ্ণু ভগবানের 'সর্বদেবময়' অচ্যুতপুরুষে পরিণত হওয়ার বিবরণ লক্ষ্য করা যায়। সেই বিবর্তন ঠিক কোন্ সময়ে এবং কাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল সে-প্রশ্নের উপযুক্ত সমাধান পাওয়া অবশ্য খুব সহজ নয়।

ইন্দ্র-বিষ্ণু অনুগামী সমাজের ভৌগোলিক বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-বিরোধের বহু উল্লেখ পুরাণের বংশপরিচয় থেকে পাওয়া যায়। মনুর সন্তানদের প্রধান দু'টি শাখা, ঐল-পুরুরবার বংশধর একটি, অন্যটি ইক্ষ্বাকুর বংশধর। এই দুই বংশের মধ্যে প্রারম্ভিক কাল থেকেই কিছু কিছু পারস্পরিক রেষারেষি ছিল। অসুরদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে দেববংশকে একবার

ঐ ইক্ষ্বাকু বংশের পুরঞ্জয়-কাকুৎস্থ বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু পুরঞ্জয় বৃষরূপধারী ইন্দ্রের স্কন্ধে আরোহণ করা ভিন্ন অন্য কোন সুবিধা দাবি করেননি। কিন্তু ঐল-পুরুরবার বংশের আয়ুর পুত্র রজি অসুরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইন্দ্রানুগামীদের সাহায্যে বিজয়লাভের পরে দেবসমাজের ইন্দ্রত্ব দাবি করেছিলেন। অবতাররূপধারী বামন ত্রিবিক্রমরূপে বলিকে দমন করবার পর দীর্ঘকাল অসুরদের সঙ্গে ঐল বা ইক্ষ্বাকুদের শক্তিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ইক্ষ্বাকুদের মান্ধাতৃ-যৌবনাশ্ব থেকে রাম-দাশরথীর কাল পর্যন্ত প্রচণ্ড বীর্যবত্তা, তালজঙ্ঘ-হৈহয়দের বিপর্যয়কর সামরিক অভ্যুত্থান, পূর্বাঞ্চলে গয়া (মগধ) এবং অঙ্গ রাজ্যের শক্তিকেন্দ্ররূপে আবির্ভাব, ঐল এবং ইক্ষ্বাকুদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পরস্পরের সংঘর্ষ এক স্থায়ী রূপ ধারণ করেছিল। এদের সকলেরই ভগবান বিষ্ণুর প্রতি আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও এদের পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতেই চক্রবর্তিত্ব এবং ইন্দ্রত্বের দাবি এবং স্বীকৃতিতে সেই চক্রবর্তী সম্রাটের প্রতি অন্যান্যদের আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত হত। রাজনীতির দৃষ্টিতে এই চক্রবর্তিত্ব পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব ছিল। ঋগ্বেদে ঐল-পুরুরবা তথা ইক্ষ্বাকু থেকে দেবাপি এবং শান্তনু পর্যন্ত বহু রাজন্যের নামেরও কোন কোন রাজার ক্রিয়াকলাপেরও বিস্তৃত উল্লেখ আছে। এইসব রাজন্যের শাসনকেন্দ্র বা রাজধানীর কিন্তু কোন উল্লেখ এইসব গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বেদের মন্ত্ররচয়িতাদের জন, বিশ, রাজা ইত্যাদি শব্দ সম্পর্কে কিছু অভিরুচি থাকলেও তাদের রাজ্যের অবস্থান, বিস্তৃতি বা রাজধানী সম্পর্কে তেমন কোন আকর্ষণ বা উপলব্ধির পরিচয় তাঁরা রাখেননি। এইদিক থেকে পুরাণের বংশানুক্রমের সংকলকেরা অনেক বেশি ইতিহাস-চেতনার পরিচয় রেখে গেছেন। এই প্রসঙ্গেই বলা যেতে পারে যে সূত এবং মাগধেরা এই আখ্যান উপাখ্যান ও রাজবৃত্তান্ত সংরক্ষণে বিশেষ তৎপর ছিলেন ; তাঁরা ঋগ্বেদের ঋষিদের দ্বারা গড়ে তোলা সংস্কৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিলেন না। মন্বন্তর-প্রবর্তক বিবস্বতের আবির্ভাবেরও বহু পূর্বে পৃথুবৈণ্যের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে এই সূত ও মাগধদের উদ্ভব হয়। পৃথুবৈণ্যের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা সূত্রেই সূতদের সৌকর্যে প্রাপ্ত পুরাণ কাহিনীতে প্রাক্-বিবস্বত যুগের পৃথুবৈণ্য বা পৃথুবৈণ্যের পূর্বগামী উত্তানপাদ ও ধ্রুবের কাহিনীও স্থান পেয়েছিল। এ ছাড়া মনুর উত্তরপুরুষদের সঙ্গে অত্যন্ত প্রতিপত্তিসম্পন্ন অসুর নামে পরিচিত দানব

ও দৈত্যদের সমাজ এবং যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব এবং নাগসমাজের অস্তিত্বের উল্লেখও শত্রুতা বা বৈবাহিকসূত্র বেদে এবং পুরাণে বর্ণিত হয়ে থাকলেও এইসব জন-গোষ্ঠীর কোন উল্লেখনীয় বিবরণ এমনকি পুরাণেও পাওয়া যায় না। কিন্তু সূতরা সম্ভবত এইসব জনগোষ্ঠী সম্পর্কেও পরিজ্ঞাত ছিলেন, বিশেষ করে বিষ্ণুপুরাণে অত্যন্ত সংক্ষেপে দানবদৈত্যদের যে বংশাবলী বিধৃত আছে তা থেকেও এ-কথা উপলব্ধি করা যায়।[১৩] সেইসব সূত এবং মাগধদের সংরক্ষিত গাথা কাহিনী থেকে যখন পুরাণ এই নামে আখ্যান-ব্যাখ্যান-উপাখ্যানগুলি রচিত ও সংকলিত হয়েছিল তখন ঐ সব সূত গাথাবলী থেকে নিজেদের অভি-রুচিমত এবং যা-কিছু এই পুরাণকারদের সংস্কৃতির পরিপোষক এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেইরকম উপকরণই গৃহীত হয়েছিল, অন্যসব সংবাদ ও তথ্য বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পরিবর্জিত হয়েছিল বলেই প্রতীয়মান হয়। তাই দেখা যায় ঋগ্বেদ এবং পরবর্তী ব্রাহ্মণসমূহে 'বামন'রূপী ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা অসুরদের কবল থেকে রাজ্য উদ্ধার করে ইন্দ্রকে সেই রাজ্যে অধিষ্ঠিত করার উল্লেখকে বিস্তৃততর কাহিনীর সাহায্যে পুরাণে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে; এমনকি বৈদিক সাহিত্যে যার উল্লেখ নাই সেই অসুররাজ বৃষপর্বা এবং অসুরগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা যথাক্রমে শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীর সঙ্গে যযাতির পরিণয়ের কথাও পুরাণকারেরা রক্ষা করেছেন। কিন্তু ঋগ্বেদে বেশ বিস্তৃতভাবেই উল্লিখিত রাজা দিবোদাসের সঙ্গে অসুররাজ সম্বরের সংঘর্ষ এবং রাজা দিবোদাসের পুত্র বা বংশধর সুদাসের সঙ্গে 'দাশরাজ্ঞ' সংগ্রামের কোন উল্লেখ করা পুরাণকারেরা প্রয়োজন মনে করেননি। অতীতের ঘটনাপ্রবাহে দিবোদাস এবং সুদাসের রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের গুরুত্ব সমধিক ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং ভারতসমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধির পক্ষে বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্য।

পুরু-ভরত বংশের সম্রাট হস্তির গঙ্গাতীরে রাজধানী স্থাপন প্রসঙ্গের পরেই দিবোদাস ও সুদাসের কার্যাবলীর অবতারণার কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। ঋগ্বেদে বর্ণিত ঘটনাবলীকে পুরাণের বংশাবলীর ছকে বিন্যস্ত করলে যে-কালবৃত্তে এই বংশাবলীর প্রসার ঘটেছিল সেই সময়ের প্রারম্ভকালে অসুর নামে পরিচিত কিছু শক্তিধর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ইক্ষ্বাকুবংশের পুরুকুৎসের এবং ঐলবংশের রজির প্রবল সংঘর্ষের সংবাদ ইতিপূর্বে বিবৃত হয়েছে। এরপর যযাতির সঙ্গে অসুররাজ বৃষপর্বা ও অসুরগুরু শুক্রাচার্যের কন্যাদ্বয়ের পরিণয়ের ঘটনার উল্লেখ তাৎপর্যপূর্ণ,

কারণ এই ঘটনার পর ইক্ষ্বাকু বা ঐল বংশের কোন রাজন্যের সঙ্গে কোন অসুর অধিপতির শক্তিপরীক্ষার সংবাদ বহুকাল পাওয়া যায় না। অসুরসমাজের সঙ্গে এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান অকস্মাৎ বিঘ্নিত হল 'অতিথিগ্ব' নামে পরিচিত দিবোদাসের কালে। ঋগ্বেদে একাধিকবার দিবোদাসের সঙ্গে অসুর নামে পরিচিত এক দুর্দমনীয় শক্তিধর রাজার সংঘর্ষ ঘটবার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই শক্তিধর অসুরের নাম সম্বর। ঋগ্বেদে প্রায় কুড়িবার সম্বরের উল্লেখ আছে। বহু পুরের বা নগরের অধিপতি, বহু ধনসম্পদে সমৃদ্ধ, প্রভূত শক্তিগর্বে অধিষ্ঠিত, পর্বতের উপরে বসবাসকারী এই সম্বরকে দেবরাজ ইন্দ্র দিবোদাসের সহায়তাকল্পে বধ করেছিলেন, ঋগ্বেদে সম্বরের বহুবার উল্লেখের এটাই ছিল মূল বক্তব্য। ঋগ্বেদে সম্বর ভিন্ন বৈদিক ঋষি এবং রাজন্যদের শত্রুরূপে যাদের বর্ণনা করা হয়েছে দানব, অসুর, দাস বা দস্যু নামে পরিচিত সেইসব শত্রুদের প্রায় সকলকেই বহু পুরের অধিকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ইন্দ্রের প্রধান শত্রু বৃত্রের অধীনেও ছিল অসংখ্য পুর ; এ ছাড়া শুষ্ণ, পিপ্রু, বর্চিন ইত্যাদি ইন্দ্রের প্রতিপক্ষেরাও অনেক পুরের অধিকারী ছিল। এই সমস্ত পুর অধিকার বা ধ্বংস করেছিলেন বলেই ইন্দ্রের নাম পুরন্দর। ইংরাজিতে এই পুর শব্দের fort এই অর্থ করে ইন্দ্রকে 'fort destroyer' এই খ্যাতি দেওয়া হয়েছে। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে বর্ণিত ঘটনার তেমন সত্যভিত্তি পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বড় একটা স্বীকার করেন নাই। দেবরাজ ইন্দ্রের এই 'পুবভিদ' খ্যাতির কোন তাৎপর্য ভারততত্ত্ব অনুশীলনের গোড়া থেকে তেমন দেওয়া হত না। একসময় মহেঞ্জোদরো এবং হরপ্পার আবিষ্কারে প্রাচীন ভারতে এক অত্যন্ত উচ্চস্তরের নগরসভ্যতার অস্তিত্বের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই প্রত্নসম্পদে অধ্যুষিত ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরগুলির সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার কোন যোগ ছিল, এ কথা এখনও তেমন স্বীকৃত হয়নি। কিন্তু প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ মর্টিমার হুইলার অত্যন্ত দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে আর্যজাতির অধিনায়ক পুরন্দর নামে পরিচিত ইন্দ্রের আক্রমণ ও ধ্বংসতৎপরতার ফলেই হরপ্পা সভ্যতার অবসান ঘটেছিল। এই বক্তব্য প্রসঙ্গে তিনি ঋগ্বেদে পুরধ্বংসকারী আর্যগোষ্ঠীর নায়ক ইন্দ্রের কথাই শুধু উল্লেখ করেননি, বিশেষ করে 'দিবোদাসের' নামেরও উল্লেখ করেছেন।[১৪] বৈদিক সংস্কৃতির অনুশীলনের দিক থেকে হুইলারের এই বক্তব্যকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। হরপ্পা সংস্কৃতির ধ্বংসের দায়িত্ব আর্যগোষ্ঠীর

অধিনায়ক ইন্দ্রের উপর ন্যস্ত করা ভিন্ন মর্টিমার হুইলার তাঁর এই গভীর তত্ত্বভিত্তিক প্রস্তাবকে আর বিস্তৃত করেননি বা তার কোন ব্যাখ্যাও প্রদান করেননি। হুইলারের এই অভিমত প্রকাশের পর পোসেন (Possen) প্রমুখ হরপ্পা সভ্যতা সম্পর্কে উৎসাহী কিছু পাশ্চাত্য গবেষক ইন্দ্র কর্তৃক হরপ্পা সভ্যতার নগরীসমূহের ধ্বংসের সম্বন্ধে উল্লিখিত হুইলারের তত্ত্বের বিরুদ্ধতা করেছেন।[১৫] কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রাক্-ঐতিহাসিক ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কিত সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই। হুইলার তাঁর উত্থাপিত প্রস্তাবের কোন বিস্তৃত ব্যাখ্যা না করে থাকলেও তাঁর এই প্রস্তাবে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রেক্ষাপটের উপর বেশকিছু আলোকসম্পাত ঘটেছে বলে মনে করা বিশেষ যুক্তি-যুক্ত। এই প্রসঙ্গে হুইলারের দ্বারা দিবোদাসের নামের উল্লেখ অত্যন্ত তাৎপর্য-পূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে। ঋগ্বেদে দিবোদাসের পরিচয় অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবেই দেওয়া আছে। হুইলারের উল্লিখিত দিবোদাসের সঙ্গে হরপ্পার নগরীধ্বংসের যদি কোন যোগ থেকে থাকে তবে দিবোদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী দাস নামে পরিচিত সম্বরের ঐতিহাসিক অস্তিত্বকেও কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। এই সম্বর ছিলেন ঋগ্বেদের মতে এক প্রবল শক্তিধর রাজপুরুষ যিনি শক্তির দম্ভে নিজেকে দেবতা বলেও দাবি করতেন।[১৬] পাকিস্তানের প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার কর্মকর্তা ডক্টর মুঘলের সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর সন্নিকটবর্তী সিন্ধুনদের অববাহিকাপথে বহু ছোটবড় জনবসতির ধ্বংসাবশেষের সন্ধান আবিষ্কৃত হয়েছে, যে-সব ক্ষুদ্র-বৃহৎ নগরসংস্থান হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোরই অনুবর্তী জনবসতি বলে গণ্য ছিল। দিবোদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী সম্বর সম্ভবত ঐ বিরাট হরপ্পা সাম্রাজ্যেরই অধীশ্বর ছিলেন এবং বৈদিক সমাজের অন্যতম অধিপতি দিবোদাসের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল। এই সংঘর্ষে দিবোদাস কিছু পরিমাণে হয়ত সাফল্যও অর্জন করেছিলেন এবং তারই কিছু প্রতিধ্বনি ঋগ্বেদে প্রতিফলিত হয়েছে। পণ্ডিতবর হুইলার তাঁর দিবোদাস ঘটিত তত্ত্বের প্রবর্তনের দ্বারা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনার এক বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছেন যার সম্ভাব্যতা বা গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি নিজেও কিছুমাত্র সচেতন ছিলেন না। তাঁর এই মন্তব্যের উপর নির্ভর করে অন্য কোন ইতিহাস-বেত্তা কিন্তু বিশেষ কোন চিন্তা করেছেন বলে জানা নেই।

যদি দিবোদাসকে হরপ্পার নগরসমূহের উপর আক্রমণকারী বলে গণ্য

করতে হয় তবে সেই দিবোদাসকে অবলম্বন করে প্রাচীন ভারতের ঘটনা-প্রবাহের কিছু সমীক্ষণ হয়ত অপ্রাসঙ্গিত হবে না। এই আলোচনায় প্রথমেই প্রয়োজন দিবোদাসের পরিচয় প্রতিষ্ঠা। দাস পরিচয়ে প্রখ্যাত বহু নগরীর অধীশ্বর, প্রভূত শক্তিধর সম্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ছাড়া ঋগ্বেদে দিবোদাসের অন্য কোন পরিচয়ের উল্লেখ নাই। তবে দাশরাজ্ঞ যুদ্ধের খ্যাতনামা বিজয়ীরূপে বহুবার উল্লিখিত রাজা সুদাসের পরিচয় প্রদানক্ষেত্রে সুদাসকে দিবোদাসের পুত্র বা বংশধর বলে অভিহিত করা হয়েছে দেখা যায়।[১৭] বেদ সম্পর্কে কোন কোন পাশ্চাত্য গবেষক এই সুদাস ও তার পূর্বপুরুষ দিবোদাসকে ঋগ্বেদে উল্লিখিত অন্যান্য রাজন্যদের মত সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলে অভিহিত না করে কিছু পরিমাণে ইতিহাসভিত্তিক বলে গণ্য কবার অভিমত প্রকাশ করেছেন। (More or less historical worriors of the olden time are King Sudās, Purukutsā and his son Trasadasyu as well as Divodāsa Atithigva. —Macdonell)[১৮] যদি সুদাস এবং দিবোদাসকে ঐতিহাসিক পুরুষ বলে গণ্য করতে হয় তবে সুদাস ও দিবোদাস যে-সব ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন সেগুলিকেও ইতিহাসভিত্তিক বলে গণ্য করা প্রয়োজন। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই সুদাস-দিবোদাসের বংশাবলীকেও সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। ঋগ্বেদে সুদাসকে মূলত ত্রিৎসু বংশের সন্তান বলা হলেও একাধিকবার তাঁকে 'ভরত'বংশীয় বলেও অভিহিত করা হয়েছে। পুরাণের বংশাবলীতেও দিবোদাস ও সুদাসের বংশগত পরিচয় অবগত হওয়া যায়। পুরাণের বর্ণনায় হস্তিনাপুরে রাজধানী স্থাপনকারী ভরতেব বংশধর হস্তীর ছিল তিন পুত্র ; জ্যেষ্ঠ অজমীঢের নালিনী নামা ভার্যার গর্ভে নীল নামে এক পুত্র হয়। এই নীলের বংশে দিবোদাসের উদ্ভব হয়েছিল। পুরাণ মতে এই দিবোদাসের পুত্র মিত্রায়ু, মিত্রায়ুর পুত্র চ্যবন ও চ্যবনের পুত্র সুদাস। ঋগ্বেদে সুদাসকে পৈজবন বলে উল্লেখ করা হয়েছে বা তাকে পীজবনের পুত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। পুরাণ-বিশেষজ্ঞ পার্জিটার অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এই পৈজবন শব্দ প্রকৃতপ্রস্তাবে চ্যবন শব্দেরই রূপান্তর এবং সুদাস চ্যবনের পুত্র ছিলেন এই বর্ণনায় সেই সত্যই প্রতিষ্ঠিত।

এই বংশবিবরণ অনুসারে স্বভাবতই দিবোদাস ও সুদাসকে ভরত বংশের সন্তান বলে দেখানো হয়েছে এবং এই থেকেই ঋগ্বেদের সুদাসের নিজেকে 'ভারত' বলে

দাবি করার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু পুরাণ এবং মহাভারতের মতে অজমীঢ়ের আরও কয়েকটি পুত্র ছিল যার মধ্যে ঋক্ষ নামে পুত্র অন্যতম। এই ঋক্ষের পুত্র সম্বরণ এবং সম্বরণের পুত্র কুরুই ছিলেন বিশেষ প্রখ্যাত। মহাভারত গ্রন্থে এই বংশধারার বর্ণনা প্রসঙ্গে সম্বরণকে ভরতবংশের মূল শাখার অধিপতি এবং মহাভারতের প্রখ্যাত কৌরব-পাণ্ডবের পূর্বপুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়েছে দেখা যায়।

মহাভারতে ঋক্ষের পুত্র সম্বরণ সম্পর্কে একটি কৌতূহলজনক আখ্যায়িকা আছে, প্রাচীন সংস্কৃতি প্রবাহে যার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যদিও পুরাণে এবং মহাভারতে প্রদত্ত একটি বংশাবলীতে সম্বরণকে ঋক্ষের পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু মহাভারতে প্রদত্ত দ্বিতীয় বংশাবলীতে সম্বরণকে ঋক্ষের এক দূর-বর্তী বংশধর বলেই প্রতীয়মান হয়।[১৯] পার্জিটার সিদ্ধান্ত করেছেন যে ঋক্ষের পর হস্তিনাপুরের ভরতবংশ কিছু পরিমাণে হীনপ্রভ হয়ে পড়েছিল। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে সম্বরণ সিংহাসনে আরোহণ করবার পর দেশব্যাপী প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অনাবৃষ্টি এবং অন্নাভাব উপস্থিত হয়েছিল। রাজ্যের এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে অজমীঢ়ের অন্য এক পুত্র নীলের বংশজাত 'পাঞ্চাল' নামে পরিচিত রাজ্যের রাজা তার চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে সম্বরণকে আক্রমণ ও পরাজিত করেন। এই পরাজয়ের পর সম্বরণ তাঁর পুত্র, কলত্র এবং সভাসদজনকে নিয়ে সুদূর সিন্ধুনদীর তীরে এক দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এই অঞ্চল বহুদূর পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেখানে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর ঋষি বসিষ্ঠের সাহায্যে সম্বরণ পুনরায় তাঁর স্বরাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।[২০] পার্জি-টার সম্বরণেব রাজ্যচ্যুতিব জন্য পাঞ্চালরাজ সুদাসকে দায়ী করেছেন।

এই রাজা সুদাস সম্পর্কে ঋগ্বেদে বিশেষ বর্ণনা আছে। বস্তুত সমগ্র ঋগ্বেদে উল্লিখিত রাজন্যবর্গের মধ্যে সুদাস সম্পর্কে যেমন বিস্তৃত বিবরণ সন্নিবিষ্ট হয়েছে অন্য কোন রাজন্য সম্পর্কে তেমন ব্যাপক বর্ণনা পাওয়া যায় না। সুদাসের 'দাশরাজ্ঞ' সংগ্রাম ঋগ্বেদে উল্লিখিত রাজনৈতিক ঘটনাসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনাকে সবিশেষ ঐতিহাসিক স্বীকৃতিও দেওয়া হয়েছে। অসুর সম্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী দিবোদাসের বংশধর সুদাস প্রচণ্ড শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। কথিত আছে ঋষি বিশ্বামিত্রের চক্রান্ত ও পরামর্শের ফলে সুদাসের দ্বারা বিশ্বামিত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী ঋষি বসিষ্ঠের শতপুত্র নিহত

হয়। এর ফলে বসিষ্ঠ সুদাসের পৌরোহিত্য পরিত্যাগ করেছিলেন। এই সময় বসিষ্ঠ সম্ভবত যযাতির বংশধর বিভিন্ন রাজবংশের সকলেরই প্রধান যাজক ও পুরোহিত ছিলেন। পুত্রশোকাতুর বসিষ্ঠ সুদাসকে বর্জন করেই শুধু সন্তুষ্ট থাকেননি ; যদু, পুরু, তুর্বসু, অনু এবং দ্রুহ্যবংশের রাজন্যবর্গকে তিনি সুদাসের বিরুদ্ধে একত্রিত করে তাঁর কৃতকর্মের শাস্তিবিধানের চেষ্টা করেছিলেন। সুদাসের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ এই পঞ্চপরিবারের রাজন্যবর্গের সঙ্গে সুদাসের এক প্রবল সংগ্রাম হয়েছিল এবং পরুষ্ণি নদীর (বর্তমান রাবি) তীরের এই সংগ্রামে সুদাসের প্রতিদ্বন্দ্বীরা সম্পূর্ণভাবে পরাজয়বরণে বাধ্য হয়েছিল।[২১] এ ছাড়া পূর্বে যমুনার তীরবর্তী এক সংগ্রামে সুদাস এক অতি পরাক্রমশালী 'ভেদ' নামে পরিচিত দস্যুরাজকেও পরাজিত করেছিলেন। এইসব সামরিক সাফল্য স্বভাবতই সুদাসকে এক প্রতিদ্বন্দ্বিহীন আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ঋগ্বেদের কয়েকটি মন্ত্র থেকে উপলব্ধি করা যায় যে সুদাস ইন্দ্রের প্রদত্ত বিশেষ সাহায্যই শুধু লাভ করেন নাই, তিনি স্বয়ং ইন্দ্রের মতই শক্তিশালী বলে প্রতিপন্ন হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের একটি উক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ; এই উক্তিতে সুদাসকে ভরত-বংশীয় বলে দাবি করা হয়েছে এবং তিনি যে-সব রাজন্যকে পরাজিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে পুরু নামের অর্থাৎ পুরুবংশীয় রাজার নামেরও উল্লেখ আছে। সুদাসকে পুরাণের বংশাবলীতে অজমীঢ়ের পুত্র নীলের বংশধর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বংশের মুদ্গলের পুত্রেরা 'পঞ্চাল' নামে অভিহিত হয়েছিলেন এবং সুদাস ছিলেন এই মুদ্গলেরই বংশধর। মহাভারতের মতে পুরুবংশীয় রাজা সম্বরণ পাঞ্চালের চতুরঙ্গ বাহিনী দ্বারা রাজ্যচ্যুত হয়ে পরে বসিষ্ঠের আনুকূল্যে পুনরায় স্বরাজ্যে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

সেইসঙ্গে নিশ্চিতভাবে বলা হয়েছে যে অজমীঢ়ের চার মহিষীর গর্ভে বহু পুত্র উৎপন্ন হয়ে ভিন্ন ভিন্ন বংশের উৎপত্তি হয়ে থাকলেও কেবলমাত্র 'সম্বরণের' দ্বারাই পিতৃকুলের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল। অর্থাৎ সম্বরণ এবং তাঁর বংশধররাই ছিলেন ভরতবংশের মূল উত্তরাধিকারী ; অন্যদের এই দাবি মহাভারত স্বীকার করেন নাই। সম্বরণের সঙ্গে সুদাসের এই বিরোধ নিশ্চিতভাবেই মনে হয় সেই পুরু-ভরতের বংশধরদের মধ্যে প্রাধান্য, তথা চক্রবর্তীত্বের দাবির দ্বন্দ্ব। এই চক্রবর্তীত্ব সম্বন্ধে ধারণা ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহ রচিত হওয়ার সময়েই বেশ পরিণতিলাভ করেছিল এবং মহাভিষেকের দ্বারা পুরুবংশে ভরত-দৌষন্তির চক্রবর্তীত্বে

অভিষিক্ত হওয়ার বিবরণ এই ব্রাহ্মণগ্রন্থেই উল্লিখিত আছে। মহাভারত ও পুরাণে মান্ধাতাকে চক্রবর্তী বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং ঋগ্বেদেও মান্ধাতার প্রবল দিগ্বিজয়ী বলে উল্লেখ আছে; কিন্তু কোন ব্রাহ্মণগ্রন্থেই মান্ধাতার চক্রবর্তীত্বলাভ বা অভিষেকের উল্লেখ নাই। পৃথিবীর রাজন্যবর্গের মধ্যে পুরুরবার বংশধরদেরই নরেন্দ্র এই আখ্যার দাবি ছিল এবং ভরত-দৌষ্মন্তির এই অধিকারসূত্রেই ঐন্দ্রাভিষেক হয়েছিল, যা অন্য কোন রাজার বা চক্রবর্তীর ক্ষেত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুদাসও বহু রাজন্যবর্গকে পরাজিত করে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন ঋগ্বেদে তার উল্লেখ আছে। কিন্তু কোন ব্রাহ্মণগ্রন্থে বা পুরাণে সুদাসকে চক্রবর্তী আখ্যা দেওয়া হয়নি। ঋগ্বেদে সুদাসের পূর্বপুরুষ দিবোদাসের সম্বর নামে এক প্রবল দাস শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতে এক সম্বরের উল্লেখ আছে যাকে দানব নামে অভিহিত করা হলেও বলা হয়েছে যে, সে ব্রাহ্মণদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল।[২২]

মহাভারতেই বর্ণিত আছে যে সম্বরণের গুরু বসিষ্ঠ সূর্যের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর কন্যা তপতীকে এনে সম্বরণের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন।[২৩] মহাভারতের এই বিবরণ নানাদিক থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তপতীর পিতা বলে বর্ণিত সূর্যকে নভোমণ্ডলে অবস্থিত সূর্য বলে মনে করা যায় না। পার্জিটার যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন যে এই সূর্য নিশ্চয়ই কোনো মানুষেরই ব্যক্তিগত নাম ছিল। সূর্য বোঝায় এমন অন্য কিছু শব্দও, যেমন তপন, প্রভাকর, দিবাকর বা ভানু, সুপ্রাচীনকাল থেকেই ব্যক্তিগত নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে দেখা যায়।[২৪] এ ছাড়া তিনি আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে ঐ মহাভারতেই সূর্য নামে একজন দানবেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৫] আদিপর্বের ঐ অধ্যায়েই পুরাণবর্ণিত বহু দানবের উল্লেখ আছে যাদের মধ্যে স্বর্ভানু, সম্বর ইত্যাদির নাম ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। ঐল বংশে ভরত-দৌষ্মন্তি থেকে উৎপন্ন পাঞ্চাল রাজ্যের রাজা দিবোদাসের সঙ্গে যে সম্বরের সংঘর্ষ হয়েছিল তাকে ঋগ্বেদে দাস নামে অভিহিত করা হলেও পুরাণে তার পরিচয় অসুর নামে। অজমীঢ়ের পুত্র ঋক্ষের বংশধরদের সঙ্গে অন্যতর পুত্র নীলের বংশধরদের সম্প্রীতি ছিল না। হয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ছিল। ঋষি হিসেবে বসিষ্ঠবংশীয়দের প্রভূত প্রভাব ছিল এবং তাঁরা ভরতবংশের পুরোহিত বলে স্বীকৃত হতেন। বিশ্বামিত্র নামে পরিচিত কোন ঋষির দ্বারা প্রভাবিত হয়েই হয়ত রাজা সুদাস সমসাময়িক বসিষ্ঠ নামে পরিচিত

ঐ বংশের পুরোহিতের বহু পুত্রের হত্যাসাধন করেছিলেন। এই অত্যন্ত দুঃখপ্রদ ঘটনায় ক্লিষ্ট হয়েই সম্ভবত বসিষ্ঠ পুরু এবং যযাতির অন্যান্য বংশধরদের সম্মিলিত করে সুদাসের বিরুদ্ধাচরণে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। দৈত্য এবং দানবদের সঙ্গেও বসিষ্ঠের বংশধরদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর হোতারূপে বসিষ্ঠের উল্লেখ থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। দিবোদাসের সঙ্গে দানবরাজ সম্বরের সংগ্রামকাল থেকেই পাঞ্চালদের সঙ্গে দানবদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। বসিষ্ঠ যেমন যযাতির বংশধরদের সুদাসের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করেছিলেন তেমনি দানবরাজ সূর্যের কন্যা তপতীর সঙ্গে তিনি ভরতবংশের মূল শাখারূপে পরিগণিত হস্তিনা-পুরাধিপতি সম্বরণের বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। ঘটনাপরম্পরায় বিবরণ থেকে অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা চলে যে সিন্ধুতীরস্থ সেই দুর্গ সম্ভবত সম্বরণের মহিষী তপতীর পিতার অধীনস্থ ছিল এবং সেই সূর্যনামধেয় তপতীর পিতা অসুর জাতির অধিপতি ছিলেন। বিপর্যয়গ্রস্ত সম্বরণ নিজরাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে তাঁর শ্বশুরের দুর্গেই আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন।

এইখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করে রাখা চলে যে ভগবান বিষ্ণুর পরিকল্পনা সম্পর্কিত এই আলোচনায় ঋগ্বেদভিত্তিক সমাজ ও হরপ্পা সভ্যতা নামে অভিহিত প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারসম্ভূত বহুবিস্তৃত সভ্যতার পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের কিছু সম্ভাবনা সম্পর্কে অভিহিত হওয়া প্রয়োজন। সূর্যের প্রতীকরূপে পরিকল্পিত চক্র কালক্রমে ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে এক ও অভিন্নরূপে গণ্য হয়েছিল। কেবলমাত্র বিষ্ণুর হাতের আয়ুধ হিসেবেই এই চক্রের ব্যবহার হয়নি, ভগবান বিষ্ণুকে চক্রস্বামী অর্থাৎ চক্রের অধিপতি নামেও অভিহিত করা হয়েছে। হরপ্পায় অত্যন্ত ব্যাপকভাবেই একটি চক্রচিহ্নের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় —অসংখ্য ছাপ্যমুদ্রার গায়ে, লেখতে ব্যবহৃত অক্ষর হিসেবে এবং ছাপ্যমুদ্রায় প্রদর্শিত পশুর দেহে। চক্রপ্রতীক যে হরপ্পা-সংস্কৃতিতেই উদ্ভূত হয়েছিল বিভিন্ন প্রত্নকেন্দ্র থেকে আবিষ্কৃত অসংখ্য ছাপ্যমুদ্রায় তার রূপায়ণ থেকে সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। হরপ্পা-সংস্কৃতিতে পাওয়া এই চক্রের একটি বিশিষ্ট লক্ষণের কথাও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই চক্র কোথাও সম্পূর্ণ গোল নয়, মাঝের দিকে একটু চাপা, এর অভ্যন্তরে তিনটি আড়া (spoke) পরস্পর কেন্দ্রবিন্দুতে একে অন্যকে অতিক্রম করে সংন্যস্ত। এই তিনটি আড়াকে চক্রের তিনটি ক্রীড়নক এবং ঋগ্বেদের বিষ্ণুর তিন-পদের প্রতীক

বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

পাঞ্চালরাজ পরিচালিত চতুরঙ্গ বাহিনী দ্বারা বিতাড়িত সম্বরণের সিন্ধুনদী-তীরস্থ এক দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ সম্পর্কিত মহাভারতের এই তথ্যকে ভারত-সংস্কৃতির বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বলে অভিহিত করা যেতে পারে। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে ঋগ্বেদে নদীমাতা সরস্বতীকে যে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল সেই তুলনায় সিন্ধুনদী ছিল বেশকিছু পরিমাণে অনাদৃত ও উপেক্ষিত। একসময়ে সরস্বতী প্রভৃত সলিলসমৃদ্ধ, প্রশস্ত ও বেগবতী ছিল ; কিন্তু তুলনায় সিন্ধু চিরকালই সরস্বতী থেকে বৃহত্তর এবং অধিকতর প্রশস্ত ও প্রবলতর। পঞ্চনদ অঞ্চল সম্পর্কে পরিচিতি ঋগ্বেদের মন্ত্ররচয়িতাদের যথেষ্টই ছিল। তাঁরা পঞ্চনদ অঞ্চলের অন্যান্য নদীগুলি, এমনকি সুদূর আফ-গানিস্থানে (প্রাচীন গান্ধারে) অবস্থিত কুভা, বর্তমান কাবুল নদী সম্বন্ধেও সুপরিজ্ঞাত ছিলেন। এতৎসত্ত্বেও সরস্বতীকেই বেদের মন্ত্ররচয়িতারা এক বিশেষ অনতিক্রমণীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন 'দেবীতমে, অম্বিতমে, নদীতমে' আখ্যায়। সরস্বতীর এই বিশেষ মর্যাদা কি কারণে উদ্ভূত হয়েছিল, এ সমস্যা বেদের অনুশীলনকারীদের যে বেশকিছু পরিমাণে বিভ্রান্ত করেছিল, তাঁদের আলোচনা থেকে এ-কথা ভালোভাবেই উপলব্ধি করা যায়। এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই রথ মন্তব্য করেছিলেন কোন কোন ক্ষেত্রে ঋগ্বেদে এই নদী সরস্বতীকে বোঝালেও যেখানে নদীদের মধ্যে প্রধান যে নদীর স্রোত সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে এবং যার তীরে বহু রাজন্য এবং ঋগ্বেদের সেই বিখ্যাত 'পঞ্চজনাঃ' বা পঞ্চজাতির নিবাস সেই নদী সিন্ধু ভিন্ন অন্য কোন নদী হতে পারে না।[২৬] এই মত অনুসরণ করে Zimmer, Ludwig ইত্যাদি অন্যান্য অনেক বেদের পাশ্চাত্য প্রবক্তারাও সরস্বতী নামে এই সিন্ধুকেই অভিহিত করা হয়েছিল বলে মন্তব্য করেছেন।[২৭]

সরস্বতীকে সিন্ধুর সঙ্গে এক বলে চিহ্নিত করার দাবি ওয়েবারই প্রথম উত্থাপন করেছিলেন, তাঁর Vajasanei Samhita নামক প্রবন্ধে।[২৮] কিন্তু ল্যাসেন ও ম্যাকসমূলার সিন্ধু আর সরস্বতাকে এক ও অভিন্ন বলে গ্রহণ করতে স্বীকৃত ছিলেন না।[২৯] তবে ঋগ্বেদে সরস্বতীর এই তুলনাহীন মর্যাদা ও গুরুত্ব এবং সেই তুলনায় অনেক বৃহত্তর নদী সিন্ধুর প্রতি অনীহার কোন কারণ তাঁরা নির্দেশ করেননি। যদি সরস্বতীর এই তুলনামূলক প্রাধান্য নিয়ে কিছু গভীরতম

অনুশীলন হ'ত এবং যদি এই অনুশীলনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু পূর্বপরিকল্পিত ধারণা থেকে মনকে বিমুক্ত রাখা যেত তবে এই সমস্যা সম্পর্কে বৈদিক সাহিত্য এবং তদনুবর্তী ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, সূত্র, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ-সমূহ থেকে কিছু নির্দেশ গ্রহণ করা অসম্ভব হ'ত না। হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের পরে এই সমস্যাকে প্রত্নতত্ত্বের আলোকে সমীক্ষণ করবার প্রভূত সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে-পথে তেমন কোন প্রয়াস হয় নাই। ফলে বৈদিক তথা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং হরপ্পা সংস্কৃতি সম্পর্কে অনতিক্রম্য জটিলতার অপসারণ সম্ভবপর হয় নাই।

ঋগ্বেদে সরস্বতীর উল্লেখ বহুবিস্তৃত। সরস্বতীর তীরে বিবস্বতের পুত্র মনু প্রথম বসতিস্থাপন করেছিলেন এই ইঙ্গিত অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাছাড়া যযাতি যে সরস্বতীর তীরেই প্রথম যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন, এই তথ্যও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের একটি ঋকের উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে পর্বত থেকে প্রবাহিত সমুদ্রে প্রবেশকারী মহিমান্বিত সরস্বতীর বর্ণনা আছে, যে-সরস্বতী মানুষের জন্য ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর ঐশ্বর্যময় দুগ্ধের বিপুল প্রবাহ। সরস্বতীর তীরে বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠানে আকাশ যজ্ঞধূমে সমাবৃত হ'ত ; সরস্বতীর তৃণাচ্ছাদিত দুই উপকূলে বসতি করত পুরু-ভরতেরা। দেবীতমে এই সরস্বতী ছিলেন বেদোক্ত সেই পঞ্চজনের পরিপোষক। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে যজ্ঞের বিবরণ প্রসঙ্গে সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের অভ্যন্তর প্রদেশকে বলা হ'ত যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বিশেষভাবে প্রশস্ত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মনুর উক্তিতে মনুর বংশধরদের উপযুক্ত বাসস্থান সরস্বতী এবং দৃষদ্বতীর অন্তবর্তী অঞ্চল বলেই নির্দিষ্ট করা হয়েছিল।[৩০] এইসব প্রমাণ থেকে স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অযৌক্তিক নয় যে মনুর বংশধর, বিশেষ করে নাহুষেরা এই সরস্বতী—দৃষদ্বতীর অন্তর্বর্তী অঞ্চলেই তাঁদের শক্তি-কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। সমগ্র ঋগ্বেদ এবং পরবর্তী সাহিত্য মতে এই মানব (মনুর বংশধর) ইলা ও তাঁর অধস্তন সন্তানেরা এবং ইক্ষ্বাকু এবং তাঁর ভ্রাতাদের বংশধরেরা এই দুই নদীর তীরের আশ্রয়েই প্রথম অভ্যুত্থানলাভ করেছিলেন। দৃষদ্বতী-সরস্বতীর অন্তর্বর্তী অঞ্চলই ব্রহ্মাবর্ত, ঋগ্বেদের 'দেবকৃত যোনি'।[৩১]

তাণ্ড্যব্রাহ্মণে এই সরস্বতী-দৃষদ্বতীর অন্তর্বর্তী অঞ্চলে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের উল্লেখ আছে, তেমনি এই ব্রাহ্মণগ্রন্থে ব্রাত্যস্তোম নামক

এক শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানেরও উল্লেখ আছে। এই ব্রাত্যষ্টোমের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ওয়েবার বলেছেন যে আর্যদের মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুসরণ না করে অন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান করত তাদের জন্য সম্পাদিত অনুষ্ঠানকে ব্রাত্যষ্টোম নামে অভিহিত করা হ'ত।[৩২] এই ব্রাত্যষ্টোমের দ্বারা সেইসব অযাজ্ঞিক ব্রাত্যদের নিজেদের সমাজে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হ'ত। ঋগ্বেদে অব্রত এবং অন্যব্রত আখ্যায় অভিহিত বেশকিছু লোকেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অব্রত বা অন্যব্রত বলতে সাধারণত যজ্ঞসমাজের বহির্ভূত ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের বোঝাত এই অভিমত প্রতিষ্ঠিত আছে। এছাড়া মূঢ়দেব নামে অভিহিত কিছু শত্রুস্থানীয় মানুষের উল্লেখও বেদে আছে।[৩৩] এই মূঢ়দেবরা যাতুধান বা রাক্ষসদের উপাসনা করত বলা হয়েছে। তেমনি ব্রাত্যদের পশ্চিমাশ্রয়ী বলেও বর্ণনা করা হয়েছে; যেহেতু যে লাট্যায়ন সূত্রে এই ব্রাত্যদের উল্লেখ পাওয়া যায় সেই সূত্রকারকে লাটদেশের অর্থাৎ বর্তমান গুজরাটের অন্তর্গত সৌরাষ্ট্র (লাট) দেশের অধিবাসী বলে গণ্য করা হয়েছে।[৩৪] ঋগ্বেদে অব্রত, অন্যব্রত এবং মূঢ়দেবদের কথা থাকলেও ব্রাত্যদের কথা বা যজ্ঞের দ্বারা ব্রাত্যদের পরিশুদ্ধ করে নেওয়া সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। ঋগ্বেদ ও অন্যান্য গ্রন্থে বিশ্বরূপ-ত্রিশির নামে ইন্দ্রের একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর উল্লেখ আছে। বৃহদ্দেবতার মতে এই বিশ্বরূপের মাতা ছিলেন অসুরকন্যা।[৩৫] পুরাণে উল্লেখ আছে যে নহুষের মাতা প্রভা ছিলেন দানবরাজ স্বরভানুর কন্যা।[৩৬] দানবরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠার সঙ্গে যযাতির পরিণয় হয়, এ কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অসুরবংশীয়েরা বৈদিক সমাজ থেকে স্বতন্ত্র হলেও তাদের সঙ্গে বেদানুগ সমাজের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। সম্রাট যযাতি একদিন শিকারব্যপদেশে এক বনে প্রবেশ করলে সেখানে কূপে নিপতিত দেবযানীকে উদ্ধার করেন। এই তথ্য থেকে মনে হয় বৃষপর্বার রাজ্য যযাতির রাজ্য থেকে খুব দূরে ছিল না। হয়ত এই দুই রাজ্যের সীমান্ত পরস্পরের সংলগ্নই ছিল। ঋগ্বেদে দাশরাজ্ঞ যুদ্ধে পরুষ্ণির তীরে সুদাস শত্রুসৈন্যদের পরাজিত করেছিলেন এই সংবাদের উল্লেখ আছে। সুদাসের শত্রুদের মধ্যে যে-সব শক্তির উল্লেখ আছে তাদের কোন কোন জাতি এই পরুষ্ণি নদীর পশ্চিমে বসবাস করত। যদিও পশ্চিমে দৃষদ্বতী ও পূর্বে সরস্বতী বিধৃত অঞ্চলকেই পবিত্রভূমি বলে গণ্য করা হ'ত।

প্রশ্ন উপনিষদে কিছু গভীর ইঙ্গিতের সঙ্গে এই ব্রাত্যশব্দের উল্লেখ আছে।

সমস্ত অস্তিত্বের মূল প্রাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসার সূত্রে বলা হয়েছে যে প্রাণই অগ্নি, সূর্য, পর্জন্য, ইন্দ্র, বায়ু, পৃথিবী সবকিছু ; প্রাণই দেবতা। আবর্তনশীল চক্রের নাভির সঙ্গে আড়াসমূহ যেমন যুক্ত থাকে তেমনি সবকিছুই প্রাণের সঙ্গে যুক্ত। এখানে তাবৎ অস্তিত্বকেই বলা হয়েছে ব্রাত্য (প্রশ্ন উপ—২।৯ ; ১১)। সেইসঙ্গে অথর্ব বেদে বর্ণিত সর্বাধিপতি মহিমাময় ব্রাত্যের উল্লেখও প্রণিধানযোগ্য (৭/৫)।

সরস্বতীর পশ্চিমে বেদ বর্ণিত এই পবিত্র অঞ্চল সম্ভবত পরুষ্ণি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এবং এই পরুষ্ণির পশ্চিমের বিস্তৃত সৈন্ধব অঞ্চল অবৈদিক দৈত্য ও দানবদেরই অধিকারে ছিল। সুদাস দ্বারা সিংহাসনচ্যুত সম্বরণ সুদূর সিন্ধুনদীর তীরে এক দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন ইতিপূর্বে এই তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত এই দুর্গ সম্বরণের পত্নী রাজ্ঞী তপতীর পিতার অধীনস্থ ছিল, এবং তপতীর পিতা রাজা সূর্য সম্ভবত অসুরবংশীয় ছিলেন। এই সূত্রে মনে হয় শুতুদ্রী (বর্তমান শতদ্রু বা শাটলেজ) অথবা পরুষ্ণি বা রাবি নদীই ছিল ভরতবংশীয়-দের দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলির পশ্চিম সীমা। এই নদীর পশ্চিমে অবস্থিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল অসুর জাতিগুলির দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। জাতি ও সমাজগঠনের দিক থেকে বৈদিক এবং অসুর সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য থাকলেও কিছু মূল বিরোধ তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। সিন্ধুর পঞ্চনদী-প্রবাহ বিধৌত অঞ্চল সম্পর্কে যজ্ঞবাদী ইন্দ্র উপাসকদের যে প্রবল বিরূপ ধারণা ছিল ব্রাহ্মণ্য নানা গ্রন্থে তার পরিচয় আছে। ঐসব অঞ্চলে যাওয়াতে বিশেষ নিষেধাজ্ঞা ছিল। সাধারণভাবে অনুমান করা যায় যে বেদানুগামীরা ঐসব অঞ্চলকে বেশ যত্নের সঙ্গে পরিহার করে চলতেন। এ অঞ্চলকে সম্ভবত আরট্ট নামে অভিহিত করা হ'ত এবং এখানে বসবাসকারী সিন্ধু-সৌবীর নামে অধিবাসীরা বিকুৎসিত নামে নিন্দিত হতেন (আরট্টা নাম তে দেশা বহ্লিকা নামতে জনাঃ/ বসাতি সিন্ধু-সৌবীরা ইতি প্রার্যো বিকুৎসিতা—মহাভারত)। শুধু তাই নয়, ঐ পঞ্চনদী অঞ্চলে কোন সভ্যব্যক্তির দুদিনের বেশি থাকা উচিত নয় বলে নির্দেশ ছিল।[৩৭] (পঞ্চনদ্যো বহন্ত্যেত যত্র নিঃসৃত্য পর্বতাৎ/ আরট্টা নাম বহ্লিকা ন তেবার্যো দ্ব্যহং বসেৎ—মহাভারত)[৩৮]। পঞ্চনদী বিধৌত বিস্তৃত অঞ্চল সম্বন্ধে বেদ ও ইন্দ্রানুগামীদের প্রবল বিতৃষ্ণাই সিন্ধু অঞ্চল সম্বন্ধে ও সিন্ধুনদ সম্পর্কে বৈদিক সাহিত্যে বিস্তৃত অনুল্লেখের কারণ। পঞ্চনদী বিধৌত অঞ্চলের অধিবাসীরা সিন্ধু

এবং তার শাখানদীগুলির প্রতি স্বভাবতই অনুরক্ত ছিল কিন্তু তাদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার দরুনই বৈদিক সাহিত্যে সিন্ধু সম্পর্কে অনুরাগের অভাব। যেহেতু ইন্দ্র এবং ইন্দ্রানুরাগীরা প্রধানত সরস্বতীর তীরেই আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন এবং সরস্বতী উপকূল বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়লে তাঁরা ক্রমে ক্রমে ভারতের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ ও উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, সরস্বতীর স্মৃতি তাদের মন থেকে কখনও বিলুপ্ত হয় নাই। বেদানুরাগীদের জলসংশোধন মন্ত্র 'গঙ্গে চ যমুনে চৈব' যখন রচিত হয়েছিল তখন এই মন্ত্রের রচয়িতারা গঙ্গাতীরেই প্রধানত উপনিবেশ স্থাপন করে থাকলেও সরস্বতী তখনও তাদের নদীচেতনার কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল।

পঞ্চাল বংশোদ্ভূত রাজা সুদাসের প্রয়াস ছিল নিজেকে চক্রবর্তীত্বে প্রতিষ্ঠা করা এবং ভরত-বংশের অবতংস হিসেবে ইন্দ্রত্বের অধিকারে নিজেকে অধিষ্ঠিত করা। এই সুদাসের আনুকূল্যে যে-সব মন্ত্র রচিত হয়েছিল ঋগ্বেদের, বিশেষ করে সপ্তম মণ্ডলে সন্নিবিষ্ট সেইসব মন্ত্র থেকে একথা উপলব্ধি করা যায়। যদু, তুর্বসু, দ্রুহ্যু, অনু এবং পুরুবংশের রাজন্যবর্গ সুদাসের দ্বারা পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু সুদাস যে পরুষ্ণির পশ্চিমে আর অগ্রসর হয়েছিলেন, ঋগ্বেদে তেমন উল্লেখ নাই। পূর্বে রাজা ভেদকে সুদাস যমুনার তীরে পরাজিত করেছিলেন। এইভাবে যমুনা থেকে পরুষ্ণি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে রাজা সুদাসের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং নিঃসন্দেহে নাহুষ-যযাতির বংশধরদের মধ্যে রাজা সুদাস অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু যাতুধান এবং কিমিন্দিন নামে পরিচিত রাক্ষস সম্প্রদায়কে সুদাস মনে হয় সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করতে সক্ষম হননি। ঋগ্বেদের ঐ সপ্তম মণ্ডলেই যাতুধানদের বা রাক্ষসদের প্রতিহত করার প্রয়াসে অগ্নি, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে, প্রার্থনা করা হচ্ছে তাঁদের সাহায্য (৭।১০৪—)। এই রাক্ষসদের বারংবার যজ্ঞের বিঘ্নকারক এবং যজ্ঞধ্বংসপ্রবণ বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এরা যে অতিশয় শক্তিমান ছিল এই মন্ত্রগুলি থেকে একথা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করা যায়। এই রাক্ষসেরা কিন্তু নিজেদের ক্ষত্রিয় বলেই দাবি করত (৭।১০৪:১৩)। ঋগ্বেদে নানা অনুরোধের দ্বারা বিভিন্ন দেবতার নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে, তাঁরা যেন ঐ রাক্ষসদের ধ্বংস করেন। কিন্তু সুদাসের অন্যান্য রাজন্যবর্গকে নিশ্চিতরূপে পরাজিত করবার যে সুস্পষ্ট উল্লেখ ঋগ্বেদের এই সপ্তম মণ্ডলে দেখা যায়,

রাক্ষসদের প্রতিহত বা পরাজিত করবার তেমন স্পষ্ট উল্লেখ কিন্তু কোন মন্ত্রে পাওয়া যায় না। তবে এই অত্যন্ত উপদ্রবকারী বনচর রাক্ষসদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য সুদাসকে যে যথেষ্ট শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করতে হয়েছিল এই মন্ত্রগুলিতে তার ইঙ্গিত আছে। ঋগ্বেদে বা অন্য কোন গ্রন্থে শত্রুবিজয়ে সুদাসের পূর্ণ সাফল্যলাভের পর তাঁর চক্রবর্তীত্বে অভিষিক্ত হওয়ার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। বরং মহাভারতে সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ আছে যে ঋষি বসিষ্ঠের আনুকূল্যে ভরতবংশীয় রাজা সম্বরণ স্বরাজ্যে পুনঃ অভিষিক্ত হয়েছিলেন, পরিপূর্ণ সমারোহে।

ভ্রষ্টরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির পর সম্বরণ প্রভূত জাঁকজমক সহকারে নানা যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন, মহাভারতে এ কথারও উল্লেখ আছে।[৩৭] বসিষ্ঠ কর্তৃক সম্বরণের পুনরভিষেক, পূর্বে বর্ণিত দীর্ঘতমসের দ্বারা ভরতের অভিষেকের মতই গুরুত্বপূর্ণ। অজমীঢ়ের পুত্র ঋক্ষের বংশই যে ভরতবংশের মূলশাখার এবং ইন্দ্রত্বের স্বতঃসিদ্ধ দাবিদার, সম্বরণের এই অভিষেকের দ্বারা সেই দাবিই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই অভিষেক অনুষ্ঠানের ফলে ভরতের মতই সম্বরণও 'বংশকার' নামে অভিহিত হয়েছিলেন দেখা যায়। সম্বরণের হস্তিনাপুরের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় অনুষ্ঠিত অভিষেক যজ্ঞে যে পুনরায় এই পরিবারে যজ্ঞের সঙ্গে এক ও অভিন্নরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত ভগবান বিষ্ণুর প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্যই স্বীকৃত হয়েছিল তাই নয়, বসিষ্ঠ বংশের পুনরুত্থানেও এই বিষ্ণুমহিমার অপ্রতিহত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া গেল। যে বসিষ্ঠ সুদাসের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান করেছিলেন, যাঁর শতপুত্র বিশ্বামিত্রের প্ররোচনায় সুদাস কর্তৃক বিনষ্ট হয়েছিল, সেই বসিষ্ঠ সুদাসকে পরিত্যাগ করে সম্বরণের দ্বারা আচার্যরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বসিষ্ঠের পৌত্র ছিলেন পরাশর, যিনি শক্তির পুত্র এবং প্রখ্যাত মহাভারতকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা।

পার্জিটার অনুমান করেছেন যে সম্রাট সম্বরণ যে বসিষ্ঠকে পৌরোহিত্যে বরণ করেছিলেন তিনিই বসিষ্ঠ পরিবারের প্রথম পুরুষ, যিনি ঐল পরিবারের পৌরোহিত্য গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে এই ঐল-ভরত পরিবারে আঙ্গিরস পরিবারের ঋষিরাই পুরোহিত বলে গৃহীত ছিলেন এবং সম্রাট ভরতের ঐন্দ্রাভিষেক যিনি সম্পাদন করেছিলেন সেই দীর্ঘতমসও ছিলেন আঙ্গিরস বংশেরই সন্তান। পার্জিটার অবশ্য মনে করেন যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের পিতা পরাশর সম্বরণের পুরোহিত

বসিষ্ঠের পুত্র শক্তির পুত্র ছিলেন না ; কারণ সম্বরণের বেশ কয়েক পুরুষ পরে শান্তনু ঐ বংশের রাজা হন এবং ব্যাস নামে পরিচিত ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঐ শান্তনুর সমসাময়িক ছিলেন।[৪০] পুরাণ ও মহাভারতের মতে সম্বরণের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর পুত্র কুরু। এই বংশ সম্রাট কুরুর পর থেকে কুরুবংশ নামেও পরিচয়লাভ করেছিল। মহাভারত রচনাকারী কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস সম্রাট শান্তনুর মহিষীর গর্ভে নিয়োগ বিধি মতে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু নামে দুই সন্তান উৎপাদন করেছিলেন। এইভাবে কেবলমাত্র পৌরোহিত্য সূত্র ছাড়াও বসিষ্ঠ পরিবারের সঙ্গে সম্বরণের তথা কুরু বংশের এক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল।

সমগ্র বেদের সঙ্কলক, মূল পুরাণগ্রন্থের রূপদানকারী এবং মহাগ্রন্থ মহাভারতের রচয়িতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব স্থান অধিকার করে আছেন। ভারতের ভাগ্যপ্রবাহের, তথা সমস্ত জগতের নিয়ন্তারূপে 'ভগবান' বিষ্ণুর লোকোত্তর প্রতিষ্ঠার প্রবক্তা হিসেবে ব্যাস স্বয়ং ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলেও গণ্য হয়েছেন। সমস্ত ভারত মনীষার পরিমূর্ত দার্শনিক ঐশ্বর্যরূপে পরিগণিত গ্রন্থ, ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা হিসেবেও যাঁর খ্যাতি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন। বর্তমান ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থে বৌদ্ধ সাধনা সম্পর্কে চেতনার পরিচয় থাকায় এই গ্রন্থকে গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবের পরে রচিত বলে মনে করা হয়। বর্তমানে প্রচলিত ভারতগ্রন্থ এবং পুরাণগ্রন্থসমূহের মতই বর্তমানে প্রচলিত ব্রহ্মসূত্রকেও ব্যাসদেব রচিত মূল গ্রন্থ বলে গণ্য করা যায় না। মূল ব্রহ্মসূত্র নিশ্চিতই বহু প্রাচীনকালে রচিত হয়ে ব্যাসের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

ভারতসংস্কৃতিতে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের প্রজ্ঞা ও বৈদগ্ধ্য

ভারতবর্ষের সংস্কৃতির মূল সূত্রগুলিকে সামগ্রিকতায় সংকলন, সংগ্রথন এবং স্থির ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপনে ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের অবদান অনতিক্রমণীয় এবং তুলনাহীন। যে জ্ঞানসমুদ্র থেকে এই সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত, একসময়ে সেই বেদ নামে পরিচিত প্রজ্ঞাসমুদ্রের বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা ছিল দুরতিক্রম্য এবং সীমাহীন। ভগবান ব্যাস চতুর্বেদের বেষ্টনীতে সেই অন্তহীন মহাসমুদ্রের পরিধি মানুষের উপলব্ধির সীমায় উপস্থাপিত করেছিলেন। এই অলোকসামান্য কার্যসমাধানের পূর্বে বেদের মন্ত্রগুলি, সেই মন্ত্রসমূহ যে যে ঋষির মানসদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছিল সেই সেই ঋষিপরিবারেই আবদ্ধ হয়ে থাকত।

ঋষিদের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণাধীন মন্ত্রসমূহকে সংগ্রহ করে, তৎসমুদয় মন্ত্রকে যথাযথ-রূপে সন্নিবদ্ধ ও গ্রন্থন করে ভগবান ব্যাস যে অসাধ্যসাধন করেছিলেন বর্তমান জ্ঞান ও উপলব্ধিব পরিপ্রেক্ষিতে তার কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। ভগবান ব্যাস যদি সেই অতীত প্রজ্ঞার উপাদান, মন্ত্ররূপী রত্নসমূহ বিভিন্ন ঋষি-পরিবার থেকে সংকলন করে বিজ্ঞানভিত্তিক সূত্রে গ্রথিত না করতেন তবে ভারত-সংস্কৃতির সেই তুলনাহীন ঐশ্বর্যসম্ভারের সবকিছুরই হযত কালগর্ভে বিলুপ্তি ঘটত। এই অকল্পনীয় কর্ম তিনি কিভাবে সম্পন্ন করেছিলেন, কি অপরিমেয় প্রয়াস, পরস্পর অসংহত ঋষিপরিবারগুলির চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদন ও তাদের স্মৃতির সযত্নবদ্ধ পেটিকা থেকে সেই রত্নসম্ভার আহরণ ও একত্রে গ্রথিত করে সমাজের যৌথ সম্পদে পরিণত করা, সেই সুদূর অতীত যুগের পরিপ্রেক্ষিতে কি অসমসাধ্য কর্ম ছিল বর্তমানে সে-কথা উপলব্ধি করা সহজ নয়। বেদের মন্ত্ররাজির এই রত্ন-ভাণ্ডার সংগ্রথিত করেই ভগবান ব্যাসদেবের কর্মের অবসান ঘটে নাই। ঋষি-পরিবারসমূহের সঞ্চয়ে যে প্রজ্ঞার ঐশ্বর্য ছিল, সেই পরিধির বাইরেও ছিল এক বিস্তৃত চর্যার সম্পদ—আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কাহিনী বিধৃত সংস্কৃতির এক পরিমাপহীন রূপরেখা। এই আখ্যান-উপাখ্যান-গাথা ও কাহিনীগুলি ছিল সূত এবং মাগধদের দ্বারা সংরক্ষিত, একান্ত পরিবারগত সম্পদ, যা এই সূত এবং মাগধেরা তাদের নিজস্ব জীবনচর্যার সঙ্গে একীভূত করে রেখেছিল, জীবিকা অর্জনের অবলম্বনরূপে। এইসব আখ্যান-উপাখ্যান সূত ও মাগধদের কথ্য সাধারণ চলিত ভাষাতেই রচিত ছিল, এ অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। ব্যাসদেব সেই আখ্যান-উপাখ্যানের বিপুল সংগ্রহকে সুসংবদ্ধ করে সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ এবং বংশানুক্রম পর্যায়ে সজ্জিত করে একখানি বৃহৎ সংকলন সৃষ্টি করেছিলেন, যে সংকলনটিই ছিল মূল পুরাণ। এই মূল পুরাণ অবলম্বন করেই পরে বিভিন্ন সময়ে অষ্টাদশ মহাপুরাণের উদ্ভব হয়েছিল। ভগবান ব্যাস রচিত মূল পুরাণ বর্তমানে আর নাই, কিন্তু অষ্টাদশ পুরাণে গ্রথিত বিভিন্ন অংশ যত্ন এবং অভিনিবেশ সহকারে বিচার করলে সেই মূল পুরাণ সম্পর্কে উপলব্ধি করা হয়ত অসম্ভব নয়।

সীমাহীন বিস্তৃতিসম্পন্ন বেদসমূহ এবং পুরাণসৃষ্টির পর ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যে দুর্ধর্ষ কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে যে কীর্তিকে কোন-দিনই অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। হিমালয়সদৃশ মহান ও বিপুল সৃষ্টি

মহাভারত গ্রন্থ এমন এক অনন্যসাধারণ কীর্তি, যার কোন তুলনা কোথাও নাই। এই ক্ষেত্রেও মনে হয় শত-সহস্র শ্লোক সম্বলিত এই মহাভারত গ্রন্থ একসময় ভারত এই আখ্যায় পরিচিত ছিল। পরে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সংযোগকারীর দুঃসাহসে এই মহাগ্রন্থেরও কিছু স্ফীতি ঘটেছিল; কিন্তু এই গ্রন্থের কোন মৌলিক পরিবর্তনের দুঃসাহস সম্ভবত কখনও কারো হয়নি; ফলে পরমচৈতন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করবার দাবি যখন সমাজে উদ্ভূত হয়েছিল তখন মহাভারতের খিল স্বরূপ 'হরিবংশ' পুরাণের সৃষ্টি এবং সংযোজনের প্রয়োজন ঘটেছিল।

সমগ্র বেদতত্ত্বের নির্যাস উপলব্ধির যে প্রয়াস উত্তুঙ্গ প্রজ্ঞাধর বিভিন্ন ঋষিরা করেছিলেন, উপনিষদ নামে প্রখ্যাত গ্রন্থগুলিতে যার পরিচয় বিধৃত আছে, সেই প্রজ্ঞা অবলম্বন করে সর্বশেষে ভগবান ব্যাস রচনা করেছিলেন ভারতপ্রজ্ঞার সেই পরিশ্রুত নির্যাস, যার নাম 'ব্রহ্মসূত্র'। জ্ঞান-প্রজ্ঞা, ধ্যান ও উপলব্ধির সারাৎসার এই ব্রহ্মসূত্র ভারতীয় সাধনা ও উপলব্ধির এক পরমবিস্ময়কর সৃষ্টি—স্বভাবতই যে সৃষ্টির মাহাত্ম্যের রচয়িতা এই বাদরায়ণ ব্যাসকে তাঁর গুণগ্রাহীরা স্বয়ং ভগবান-রূপেই স্বীকৃতিদান করে নিজেরাই মহিমান্বিত হয়েছিল।

ভগবান ব্যাসদেবের যে কীর্তি তাঁর অন্য সমস্ত কৃত্যকে অতিক্রম করে এক উত্তুঙ্গ চূড়ায় উপনীত হয়েছিল, সেই কীর্তি প্রত্যক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণের পরমসত্তার উপলব্ধি ও সেই উপলব্ধির প্রসার। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের আবির্ভাবকালে তাবৎ ভারতসত্তায় অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান বিষ্ণু সম্পর্কিত চেতনা ব্যাপক স্বীকৃতি ও ব্যাপ্তিলাভ করেছিল। নারায়ণরূপী অনন্ত সত্তা সেই বিষ্ণুকে নর এবং নরোত্তম রূপেরই অখণ্ড লীলা বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। প্রজ্ঞামণ্ডলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর করুণায় রচিত, নারায়ণরূপী বিষ্ণু নর এবং নারায়ণরূপী অখণ্ড লীলার উপলব্ধিতে সৃষ্ট ভগবান ব্যাসের অনুপম সৃষ্টি এই মহাভারতের ভেতর দিয়ে অপরূপ এক দিব্য অবয়ব নিয়ে প্রকাশলাভ করেছিলেন জ্যোতির্ময় মায়াদেহ নিয়ে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। নর-রূপে প্রকট এক ব্যক্তিসত্তার মধ্যে পরিপূর্ণ ব্রহ্মরূপী ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা এবং সেই উপলব্ধি একটা সমগ্র জাতি, একটা সংস্কৃতি এবং একটা সামগ্রিক জনমানসের মধ্যে কালজয়ীরূপে সঞ্চারিত করে দেওয়াই ছিল ভগবান কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসের দুর্লঙ্ঘ্য কীর্তি। শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানকে পরাশরপুত্র ব্যাসই অক্ষয়

এক উপলব্ধির হৃদয়মন্দিরে পরম উপাস্য বিগ্রহরূপে স্থাপন করে গিয়েছেন অনন্ত কালের এক তুলনাহীন সম্পদরূপে।

যুগের পর যুগ এই শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে ভারতের মানস সত্তা; জগৎরহস্যের পরিশেষ সন্ধানে নিরত প্রজ্ঞা উপলব্ধি করেছে প্রান্তবিন্দুরূপে সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যসমৃদ্ধ সংস্কৃতির উচ্চচূড়ায়, উপলব্ধি করেছে সর্বৈশ্বর্যের কারণ সেই বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের, বিপর্যয়কালের সমুপস্থিতিতে অবলম্বন করতে চেয়েছে সেই বিপত্তারণ শ্রীকৃষ্ণের, প্রতিদিনের অস্তিত্বে যশোদানন্দন কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষের জগতে উপলব্ধি করেছে শিশু, কিশোর, সখা ও পরমপ্রেমাস্পদের আকারে। ভগবান ব্যাসের দিব্যনেত্রে উপলব্ধ এক অনন্ত সত্তা—সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ধন্য মহামুনি ব্যাস! তিনি তাঁর অখণ্ড উপলব্ধির অংশীদার করে গিয়েছেন জগৎসংসারের সমস্ত মানুষকে, প্রদান করে গিয়েছেন তাদের জন্য মধুময় এক অনন্ত রূপলোক, পরম ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ এক মহা উত্তরাধিকার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপী মহাসম্পদ এবং পরম ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারিত্বের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের নিকট জগৎ একান্তভাবেই ঋণগ্রস্ত ও কৃতজ্ঞ।

নির্দেশিকা

১. ঋগ্বেদ, ৮।৪০:১২; মান্ধাতর যৌবনাশ্ব; ঐ, ১০।১৩৪।
২. ঐ, ৮।৩৯।
৩. ভাগবত পুরাণ, ৯।২০:২৩-২৪।
৪. ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৮।২১-২৩।
৫. ভাগবত পুরাণ, ৯।২০:২৫।
৬. বিষ্ণু পুরাণ, ৪।২:২৬; ভাগবত পুরাণ, ৯।৬:১২-১৯।
৭. ভাগবত পুরাণ, ৯।৬:৩৪।
৮. ঐ, ৯।৬:২৫-২৬।
৯. বিষ্ণু পুরাণ, ৩।৬-১৫।
১০. ঐ, ৩।৬:১৬।
১১. অগ্নির্বৈ দেবানাম অবমো বিষ্ণুঃ পরমঃ—ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১।১:১।
১২. মহাভারত, ৩।২৭২:৩১।
১৩. বিষ্ণু পুরাণ, ১।২১।
১৪. **Wheeler, R. E. M., Ancient India, No 3, New Delhi, 1946, pp. 75-83; also see Heine-Geldern, Robert, The coming of the Aryans and the end of the Harappa civilization, Man, No. 56, 1965, pp. 186f.**

Fairservis, W. A., The Chronology of the Harappan Civilization and the Aryan invasions, recent archaeological research, Man, No 56, 1956, pp. 153f.

১৫. Possehl, G. L., American Anthropologist, Vol. 69, No 1, 32-40.

১৬. ঋগ্বেদ, ৭।১৮:১০ ; সম্বরের অধীনস্থ পুরের সংখ্যা ঋক্ ১।১৩০:৭-এ নব্বই ; ঋক ২।১৯:৬-এ নিরানব্বই এবং ঋক্ ২।১৪:৬-এ একশত।

১৭. ঋগ্বেদ, ৭।১৮:৩৩ ; ৩।৩৩:৫৩।

১৮. Macdonell, A. A., Vedic Mythology, p. 147.

১৯. মহাভারত, ১।৯৪-৯৫।

২০. ঐ, ১।৯৪।

২১. ঋগ্বেদ, ৭।১৮:১৯-৩৩ ; Macdonell, A. A. and Keith, A. B., Rigvedic Index, i, 499 ; ii, 186.

২২. মহাভারত, ১৩।৩৬।

২৩. ঐ, ২।১৭৩ : ৬৫৯৬-৬৬১০।

২৪. Pargitar, F. E., op. cit., p. 66.

২৫. মহাভারত, ১।৬৫:২৫৩৪-৩৫।

২৬. Roth, Zur Litteratur und Geschichte des weda, Stuttgart, 1846, pp. 86f.

২৭. Zimmer, H., Altindische Leben, p. 51 ; Griffiths, Ludwig, A., Translation of the Rigveda, p., 301-302.

২৮. Waber, A., History of Indian Literature, (London, 1904), p. 44.

২৯. Maxmuller, Sacred Books of the East, p. 32।60.

৩০. মনুসংহিতা, ২।১৭।

৩১. ঋগ্বেদ, ৩।৩৩:৪।

৩২. Waber, A., op. cit., p. 67.

৩৩. ঋগ্বেদ, ১০।৮৭:৫।

৩৪. Waber, A., op. cit., p. 106.

৩৫. বৃহদ্দেবতা, ৬।১৪৯।

৩৬. বিষ্ণুপুরাণ, ১।২১।

৩৭. মহাভারত, ৮।৩০.৪৭।

৩৮. ঐ, ৮।৩০:৪৩।

৩৯. ঐ, ১।৯৪:৩৭২৫-৩৭।

৪০. Pargitar, F. E., op. cit., p. 211.

৮

হস্তিনাপুরের প্রতিষ্ঠা ও ইতিহাসের বিবর্তন

ভরতবংশের সম্রাট হস্তী যখন তাঁর পূর্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করে গঙ্গাতীরে হস্তিনাপুরে রাজধানী সংস্থাপন করেছিলেন সেই দিনটি ভারতসংস্কৃতির ইতিহাসে নিশ্চিতরূপেই একটি যুগসন্ধির দিন বলে গণ্য হতে পারে। একথা অনুমান করা তেমন কষ্টসাধ্য নয় যে কোন বিশেষ বিপর্যয়ের ফলেই ভরতবংশের সম্রাট হস্তীকে তাঁর পূর্বতন রাজধানী পরিত্যাগ করে গঙ্গাতীরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা গেছে যে সম্রাট হস্তীর বংশ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিবস্বতের পুত্র মনুর সময় থেকে ঋগ্বেদে বর্ণিত প্রথিতকীর্তি মহা-স্রোতস্বিনী সরস্বতীর তীরেই উপনিবিষ্ট ছিল। আদিপিতারূপে কীর্তিত মনুর যজ্ঞ-ধর্মী সমাজের উদ্ভব ও বিবর্তনে শতক্রতু মঘবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ইন্দ্র নামে পরিচিত এই মহাশক্তিধর নেতার সঙ্গে নানা বিরুদ্ধ শক্তির সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিবরণ ঋগ্বেদের অন্যতম উপজীব্য। দানব, দৈত্য, অসুর নামক সমাজের সঙ্গে এই বিরোধের ফলেই হয়ত ইন্দ্রানুগ সমাজ তথা মনুর বংশধরদের সরস্বতীর উপকূলে অধিষ্ঠিত হতে হয়েছিল। দেবতাদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদের অবস্থান পূর্বে বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে দেখা যায়। পশ্চিমে অবস্থিত সমজাতীয় অধিবাসীরা অসুর, গন্ধর্ব এবং নাগ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। অবশ্য ইলার বংশধরদের সঙ্গে এই অযজ্ঞ সম্প্রদায়ের যোগ খুব শিথিল ছিল না। পুরুরবার সঙ্গে অপ্সরা উর্বশীর পরিণয় হয়; উর্বশীর স্বজাতীয়েরা এই পরিণয়কে খুব সুনজরে দেখেননি এবং নানা কৌশল অবলম্বন করে তাঁরা উর্বশীকে পুরুরবার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। বস্তুতন্ত্রবাদী পণ্ডিত কোশাম্বী এই পুরুরবা-উর্বশী কাহিনীর পেছনে দুই স্বতন্ত্র আদিবাসী গোষ্ঠীর বিবাহ বিষয়ক সমাজব্যবস্থার প্রতিফলন লক্ষ্য করেছিলেন।[১] ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই কাহিনীকে নির্ভেজাল কাল্পনিক কাহিনী বলেই গণ্য করেছেন। এঁদের অনেকের নিকটই পুরুরবা এবং উর্বশী উভয়েই কাল্পনিক। কোন কোন লেখক প্রতীক-রূপে পুরুরবাকে পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে এবং উর্বশীকে অমরলোকের অধিবাসী বলে এই কাহিনীর ব্যাখ্যা করতে প্রয়াস করেছেন।[২] আলিগড় মুসলিম বিশ্ব-

বিস্তালয়ের অধ্যাপক গৌর পুরুরবা-উর্বশী কাহিনীর এক বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণে তিনি পুরুরবাকে আর্যগোষ্ঠীর মানুষ এবং উর্বশীকে আর্যেতর ভিন্ন গোষ্ঠীর রমণী বলে অভিহিত করেছেন।[৩] অধ্যাপক গৌর অবশ্য তাঁর আলোচনার প্রারম্ভে উল্লেখ করেছেন যে সুপ্রাচীনকালের বিশেষ অভিজ্ঞ বেদের ব্যাখ্যাতা শৌনক উর্বশীকে ইতিহাসভিত্তিক বলেই গণ্য করেছিলেন।[৪] গৌর লক্ষ্য করেছেন যে উর্বশী বিবাহবন্ধন স্বীকার করবার চার বৎসর পূর্বেই পুরুরবা ও উর্বশী পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়েছিলেন এবং এই প্রণয় ক্রমে গাঢ়তর হলে শেষ পর্যন্ত উর্বশী পুরুরবাকে স্বামিত্বে বরণ করে তাঁর সংসারে প্রবেশ করেন (১০।৯৫:১৬)। প্রাচীন অন্য কয়েকটি আখ্যানেও বৈদিক যজ্ঞবাদী সম্প্রদায়ের পরিচিত ঋষি বা রাজন্যের সঙ্গে অপ্সরারমণীর পরিণয়ের উল্লেখ আছে। বৈদিক ঋষি বিশ্বামিত্র একবার মেনকা নাম্নী জনৈক অপ্সরার প্রতি অনুরক্ত হয়ে তাকে বিবাহ করেছিলেন। এই পরিণয়ের ফলে মেনকার গর্ভে যে কন্যার জন্ম হয় সেই কন্যা শকুন্তলা নামে পরিচিত। পুরুবংশের দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার পরিণয় কাহিনী পুরুরবা-উর্বশী কাহিনীর মতই সুপরিচিত। অধ্যাপক গৌর নানা তথ্য বিচার করে এইসব অপ্সরা-গন্ধর্বদের বাসভূমি, বাল্মীকি নির্দিষ্ট সিন্ধু নদীর পশ্চিম-তীরে নির্দেশ করেছেন (রামায়ণ, উত্তর ১০০।১০-১১)। এই গন্ধর্ব সম্প্রদায় সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদেও উল্লেখ আছে (ছান্দোগ্য, ৬।২৪)। সেইসঙ্গে পাকিস্থানের অন্তর্গত সোহন নদীর (প্রাচীন বেদোক্ত সুষমা) অববাহিকায় আবিষ্কৃত সমাধি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে (Dani A. N., Timargarh and Gandhara grave culture, Ancient Pakistan, III) অধ্যাপক গৌর প্রাচীন গান্ধার (তক্ষশিলা থেকে আফগানিস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত) অঞ্চলকেই গন্ধর্ব দেশ এবং গন্ধর্ব-অপ্সরসদের আর্যেতর কোন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ বলে ধার্য করেছেন।[৫]

ঋগ্বেদের বর্ণনায় মনুকে নিশ্চিতভাবেই সরস্বতীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে এবং পুরুরবার রাজধানী প্রতিষ্ঠান সম্ভবত ঐ সরস্বতীর তীরেই অবস্থিত ছিল। সিন্ধু-সরস্বতী অঞ্চলে বহু শহরের (পুরের) অস্তিত্ব ছিল এবং এইসব নগরের কোন কোনটিতে দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব, নাগ, ইত্যাদি সম্প্রদায়ের আধিপত্য ছিল। এই সূত্রেই মনে হয় সিন্ধুর তীরেই কোথাও গন্ধর্বদেরও উপনিবেশ ছিল। কিন্তু কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর আধিপত্য থাকলেও কোন বিশিষ্ট অঞ্চল বা নগরে অন্য

কোন গোষ্ঠীর মানুষ একেবারেই থাকতে পারে না একথা যুক্তিসম্মত বলে মনে করা যায় না। এই সূত্রেই মনে হয় পুরুরবা হয়ত নিজের রাজ্যের মধ্যেই উর্বশীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন; যদি উর্বশীর আবাসস্থল পুরুরবার স্বকীয় বাসস্থানের সন্নিকটবর্তী না হ'ত তবে দীর্ঘ চার বৎসর যাবৎ তাঁরা প্রাক্-পরিণয় কালে প্রণয়াসক্ত থাকতে পারতেন না। এই যুক্তিতেই মনে হয় বিস্তৃত সিন্ধু-সরস্বতী অঞ্চলের পূর্বে একান্তভাবে সরস্বতীর উপকূলে যজ্ঞবাদী সম্প্রদায়ের আধিপত্য থাকলেও এই সরস্বতী অধ্যুষিত অঞ্চলের সান্নিধ্যে অযজ্ঞবাদী অসুর, গন্ধর্ব, নাগ এবং রাক্ষসদেরও বসবাস ছিল। এত নিকট সান্নিধ্য না থাকলে ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁর তপস্যাস্থলের সন্নিকটেই মেনকাকে দেখতে পেতেন না।

সংস্কৃতিগত বিভিন্নতা বর্তমান থাকলেও যজ্ঞবাদী দেবপূজক সরস্বতী আশ্রয়ী জনগোষ্ঠী আর অসুর, গন্ধর্ব, নাগ, যক্ষরা যে শরীরগঠন তথা জাতিপর্যায়ে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র ছিল, এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পক্ষে তেমন কোন প্রবল যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। গন্ধর্বরা গাত্রবর্ণের দিক থেকে সাধারণ যজ্ঞবাদীদের থেকে একটু স্বতন্ত্র ছিল বলে মনে হতে পারে। তাদের শরীরগঠন এবং দেহের উজ্জ্বলতার যে বিবরণ পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় গন্ধর্বসমাজ হয়ত ছিল মাতৃতান্ত্রিক, কারণ মনুষ্য (দেব-উপাসক বা দেব), দৈত্য, দানব, যক্ষ, নাগ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের নারীদের কোন স্বতন্ত্র আখ্যা বা আলাদা করে উল্লেখের প্রচলন ছিল না। কিন্তু গন্ধর্বসমাজে নারীদের বিশেষ অধিকার ও মর্যাদা ছিল এবং সেইসূত্রেই গন্ধর্বসমাজের নারীরা বা গান্ধর্বীরা (মেনকা—গান্ধর্বী রামায়ণ বাল, ৬৩।৫) স্বতন্ত্রভাবে অপ্সরা নামে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন দেখা যায়। এই গন্ধর্বদের মধ্যে নারী (অপ্সরারা) যেমন দেহগত সৌন্দর্যে অন্য সম্প্রদায়ের নারীদের অপেক্ষা অধিকতর সুশ্রী ও আকর্ষণীয় ছিলেন তেমনি নৃত্য-গীত-বাদ্য ইত্যাদির চর্চায়ও এই সমাজের পারঙ্গমতা ছিল। এই নৃত্য-গীতাদি বিদ্যা তাই গান্ধর্ববিদ্যা নামেও খ্যাতিলাভ করেছিল।

অসুর সম্প্রদায় গন্ধর্বদের মত একান্তভাবে স্ব-পরিমণ্ডল নিবিষ্ট ছিল না। উল্লেখ আছে যে ত্বষ্টৃর পুত্র ত্রিশির-বিশ্বরূপের মাতা ছিলেন অসুরকন্যা। তেমনি পুরাণে উল্লেখ আছে যে নহুষের মাতা ছিলেন স্বর্ভানু নামে জনৈক দানবের কন্যা, নাম প্রভা। ঋগ্বেদে এই দানব স্বর্ভানুর উল্লেখ পাওয়া যায় ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে। পুরাণে রাজা নহুষের ব্রাহ্মণ ও দেবতাবিদ্বেষের এবং তাঁর রাজ্যচ্যুতির উল্লেখ

আছে। নহুষের মাতামহ স্বর্ভানু ছিলেন দানব এবং তিনি সংস্কৃতির দিক থেকে হয়ত ইন্দ্রানুরাগী যজ্ঞপন্থীদের বিরোধী ছিলেন। এই বিবরণ থেকে সন্দেহ জাগা অযৌক্তিক নয় যে নহুষের সঙ্গে যজ্ঞবাদী ব্রাহ্মণদের বিরোধের মূলে তাঁর মাতা অসুরকন্যা প্রভার কিছু প্রভাব ছিল। নহুষের বিপর্যয়ের পরই হয়ত অসুরদের সঙ্গে ইন্দ্রানুগ সমাজের পুনরায় প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল। এই সংঘর্ষে ইন্দ্রানুরাগীরা হয়ত দৈত্যরাজ বলি কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন। বামনরূপী বিষ্ণুর দ্বারা অসুররাজ বলি প্রতিহত হওয়ার পর নহুষের পুত্র যযাতি তাঁর পিতার সিংহাসনের অধিকারলাভ করেছিলেন। অসুর সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই সময় যে পারস্পরিক বোঝাপড়া হয়েছিল তারই ফলশ্রুতি রূপ নিয়েছিল যযাতির সঙ্গে দানবপতি বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠার বিবাহে। এইসঙ্গে অসুরগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীরও পরিণয় ঘটে। যজ্ঞবাদীদের অগ্রণী সম্রাট যযাতির সঙ্গে অসুররাজ ও অসুরগুরুর কন্যাদ্বয়ের পরিণয়ে, অসুর সম্প্রদায়ের সঙ্গে যজ্ঞবাদী মনুষ্য সম্প্রদায়ের দীর্ঘ এবং বিধ্বংসী যুদ্ধবিগ্রহের অবসান হয়েছিল এবং যজ্ঞবাদী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অসুর নামে অভিহিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি স্থিতাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যার পূর্ণ প্রতিফলন সরস্বতী উপকূলবর্তী নগর-সভ্যতায় এবং সিন্ধু অববাহিকায় অবস্থিত বহু নগরীতে সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যায়। ভরতবংশের সম্রাট হস্তীর মনু-যযাতি পরম্পরা বহুপুরুষের অধ্যুষিত পরমনির্ভরের ক্ষেত্র সরস্বতীর অববাহিকা পরিত্যাগ করে সম্রাট হস্তীর গঙ্গাতীরে আশ্রয় গ্রহণের পশ্চাতে কি কারণ ছিল সে সম্বন্ধে তেমন কোন অন্বেষণ হয় নাই।

সিন্ধু ও সরস্বতী উপত্যকার প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণের সাংস্কৃতিক ফলশ্রুতি

গঙ্গার ভাঙন থেকে প্রাচীন হস্তিনাপুরের খানিকটা অংশ রক্ষা পেয়েছিল, যেখানে কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণ ও খননকার্য পরিচালিত হয়েছে। এই খননকার্যে প্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষগুলির প্রাচীনতম নিদর্শন বলে যে-সব পুরাবস্তুকে চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে কাল নির্ধারণের জন্য মাটির তৈরি নানাপ্রকারের পাত্রের গুরুত্বই প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিকট সমধিক বলে বিবেচিত হয়েছে। এখানে খোদাইয়ের ফলে সৃষ্ট বিবরের (trench) নিম্নতম ভূসংস্থানে (layer) আবিষ্কৃত এক শ্রেণীর ফিকে লালরঙের পাত্রকে (ochre-coloured ware)

হরপ্পায় আবিষ্কৃত এইজাতীয় পাত্রের সমগোত্রীয় বলে মনে করা হয়েছে।[৬] এই ফিকে লাল পাত্রের ঠিক পূর্বেকার সংস্কৃতি-বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য হয়েছে এক শ্রেণীর রঙিন ধূসর পাত্র (Painted grey ware), যে শ্রেণীর পাত্রকে চিহ্নিত করা হয়েছে ভারতের লৌহযুগের সংস্কৃতির সঙ্গে। প্রত্নতত্ত্বের যুক্তি প্রয়োগ করে হস্তিনাপুরকে অভিহিত করা হয়েছে হরপ্পা সংস্কৃতির অব্যবহিত পরের যুগের বিকাশের ধারকরূপে।

ভারতে সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত সাহিত্য বেদ তথা ইতিহাস-(মহাভারত) পুরাণে হস্তিনাপুরে নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠার তথ্য পাওয়া গেলেও সেই তথ্য থেকে সংস্কৃতিপ্রবাহের রূপরেখা চিহ্নিত করবার প্রয়াস হয়নি। পুরাণ ও মহাভারতে পাওয়া তথ্য থেকে হয়ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অযৌক্তিক নয় যে হস্তিনাপুর নগরী হরপ্পা সংস্কৃতির অবসানকালেই গড়ে উঠেছিল। উপরে বর্ণিত সাহিত্যে যে-সব তথ্য আছে তা থেকেও উপলব্ধি করা যায় যে, ভরতবংশীয় সম্রাট হস্তী কোন বিশেষ কারণেই তাঁর পুরাতন অবস্থান-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে এই নূতন নগরের পত্তনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। গঙ্গার ভাঙনের হাত থেকে এই নগরীর যে অংশ রক্ষা পেয়েছিল মাত্র সেই অংশেরই সীমিত প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষার ফল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রকাশ করেছেন। সেইসঙ্গে আছে তথাকথিত অঙ্গার পরীক্ষার (Carbon 14 test) সূত্রে নির্দিষ্ট তারিখ, ১০২৫—১১০ (?) খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। এই অঙ্গারতত্ত্বে তারিখের হেরফের খুবই কৌতুকজনক। এই পরীক্ষার ফলে কোন প্রত্নবস্তুর উৎপত্তিকাল খ্রীষ্টপূর্ব ১০২৫ থেকে ১১০ অঙ্কের ব্যবধানে অর্থাৎ ৯১৫ বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ের হতে পারে। মহাভারত এবং পুরাণের মতে ভরতবংশীয় সম্রাট নীচক্ষু তাঁর রাজত্বকালে গঙ্গার প্রবল ভাঙনের দরুন হস্তিনাপুর ত্যাগ করে কিছুদূরে যমুনাতীরে কৌশাম্বী নগরীতে তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। (অধিসীমকৃষ্ণান্নিচক্ষুঃ যো গঙ্গায়াপহৃতে হস্তিনাপুরে কৌশম্ব্যাং নিবৎস্যতি—বিষ্ণুপুরাণ।)[৭]। ঐ অঙ্গার পরীক্ষাসূত্রে কৌশাম্বীতে আবিষ্কৃত কিছু প্রত্নবস্তুর তারিখ ৮৪৫ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। হস্তিনাপুরের প্রত্নখননে কাঁচা ইটের (অগ্নিতে যে ইট পোড়ানো হয়নি) গাঁথুনির কিছু বাড়িঘরের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া কোন পাকা ইটের অট্টালিকার অস্তিত্বের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব-বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তিতে কৌশাম্বীতে পাওয়া গেছে হরপ্পা সংস্কৃতির অনুরূপ প্রতিরক্ষাকল্পে নির্মিত দৃঢ়সংবদ্ধ পোড়া ইট

ও মাটির প্রাচীরের সন্ধান। এই ধরনের প্রতিরক্ষা প্রাচীরকে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীর বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন।[৮] মহাভারতের বিধ্বংসী যুদ্ধের অবসানের পরে পাণ্ডবেরা রাজ্যপুনরুদ্ধারের অনতিকালের মধ্যে সংসারত্যাগ করলে অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কৌশাম্বীতে রাজধানী স্থানান্তরকারী সম্রাট নীচক্ষু ঐ পরীক্ষিতের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। হস্তিনাপুর নগরীর প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট হস্তী থেকে এই নীচক্ষুর ব্যবধান পঞ্চাশ পুরুষ। বেদ, পুরাণ এবং মহাভারত থেকে যে বংশতালিকা পাওয়া যায়, তার উপর নির্ভর করেই পার্জিটার তাঁর বংশতালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। বর্তমানে হস্তিনাপুর ও কৌশাম্বীর প্রত্নপ্রকল্পের সমীক্ষণে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে বেদ এবং পুরাণে যে তথ্য সন্নিবিষ্ট আছে তার বেশকিছু সমর্থন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রত্নতাত্ত্বিক সমর্থন সত্ত্বেও বহির্দেশ থেকে ভারতে তথাকথিত আর্য আগমন তত্ত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী পণ্ডিতেরা এখনও পুরাণে বর্ণিত কোন তথ্য স্বীকার করে নিতে প্রচণ্ড দ্বিধাগ্রস্ত। হস্তিনাপুরের ধ্বংসাবশেষ যদি আর্য আগমনের পরেকার সৃষ্টি বলে গণ্য করতে হয় তবে বেদরচনাকারী আর্যদের পূর্বেও কিছু আর্যের ভারতে আগমন ও উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল একথা স্বীকার না করে পারা যায় না। সিন্ধু-সরস্বতী অধ্যুষিত অঞ্চলে যে নগর-সভ্যতাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রাক্‌বৈদিক বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেই সিন্ধু-সরস্বতী অঞ্চলের বাইরে, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলে, সেই সভ্যতার সঙ্গে অত্যন্ত সৌসাদৃশ্যযুক্ত প্রত্ন-উপকরণের (পাথরের তৈরি হাতিয়ার, হরপ্পাজাতীয় মাটির পাত্র ইত্যাদি) প্রাচ্যভারতে যজুর্বেদ ও অথর্ব সংহিতাতে উল্লিখিত নানা ভৌগোলিক কেন্দ্র এবং নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় আর্য ও আর্যপূর্ব ধারণায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, যার ফলে ঐ বেদরচনাকারী আর্যগোষ্ঠীর পূর্বেও অন্য একদল আর্য অনুপ্রবেশকারীর অস্তিত্বের কল্পনা করতে হচ্ছে। এইসব কালবিচার সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক, ব্রিটিশ ভারততত্ত্ববিদ অলচিনেক তাই মন্তব্য করতেদেখা যায়: Where therefore Chalcholithic cultures are found to the east of the geographical regions of the Rigveda, they may either indicate pre-Aryan settlements or settlements of Aryans who had arrived and dispensed before the arrival of those who brought the Rigveda.[৯] কৌশাম্বী নগরীর

প্রতিষ্ঠাতা নীচক্ষু যদি হস্তিনাপুরের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট হস্তী থেকে অধস্তন পঞ্চাশ-তম পুরুষ হন তবে হস্তিনাপুরের প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য কালের ধারণা খুব কষ্টসাধ্য হয় না। আর সম্রাট হস্তীকে ঐ বংশতালিকামতে বংশের প্রতিষ্ঠাতা মনু থেকে পঞ্চাশত্তম পুরুষ ধরলে সুদ্যুম্ন কর্তৃক পুরুরবাকে প্রদত্ত প্রতিষ্ঠান নগরীর প্রতিষ্ঠাতা মনুর কাল সম্পর্কেও একটা ধারণা গড়ে নেওয়া চলে।

উর্বশী-পুরুরবা কাহিনী ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলে সংস্থাপিত করে বেদের সংকলক সম্ভবত যুগসঞ্চিত স্মৃতির পুরশ্চরণ করেছিলেন, বেদের কালবৃত্তের প্রারম্ভকে স্মরণ করে। মানবসত্তার সমগ্র রূপটিকে প্রজ্ঞাব দৃষ্টি থেকে উত্তুঙ্গ রসের পরিমণ্ডলে বিন্যস্ত করে মায়াপ্রপঞ্চ এই বিশ্বজগতের যে চিত্রটি বেদের বর্ণনায় এখানে তুলে ধরা হয়েছে, তা মূলত মন্ত্রের সংগ্রহরূপ সেই ঋগ্বেদের অন্যান্য কাহিনীর বর্ণনা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের যে গভীর বিশ্লেষণমূলক চিত্র এই উর্বশী-পুরুরবা কাহিনীতে মুরিকুত হয়েছে, প্রভূত কাব্য-শক্তিসমৃদ্ধ অন্তর্দর্শী রূপকারের সৃষ্টিতে ভিন্ন তা সম্ভব হ'ত না। মহাভারতে এই কাহিনীকে অবলম্বন করে যে বিস্তৃত আখ্যায়িকা চিত্রায়িত হয়েছে ঋগ্বেদের এই কাহিনীচিত্রের সঙ্গে তার আশ্চর্য সাদৃশ্য বিস্ময়ের উদ্রেক না করে পারে না। ঋগ্বেদের এই কাহিনীর বর্ণনার পরেই সন্নিবিষ্ট হয়েছে দেবাপি-শান্তনুর আখ্যায়িকা, যা এক অত্যন্ত উন্নত এবং জটিল সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় সমুদ্ভূত অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও অস্থিরতার পরিবেশে সংস্থাপিত। উর্বশী-পুরুরবার কাহিনীতে যে সরল ও প্রত্যক্ষ আদিমতা জনিত জীবনবৃত্তের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, সেই জীবন-পরিবেশ থেকে দেবাপি-শান্তনুর জীবন-পরিবেশ অনেক পরিণত, অনেক ছোটবড় বন্ধনে আবদ্ধ এবং জটিলতাপূর্ণ। এই দেবাপি-শান্তনু কাহিনীতেই ঋগ্বেদের সময়ের পরিধির অবসান ; এই ঘটনার পরবর্তী অন্য কোন ঘটনা বা আলেখ্যচিত্রের সমাবেশ ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে বর্ণিত ঘটনাসমূহের কালের ব্যাপ্তি এই দুই কাহিনীর অভ্যন্তরস্থ সময়ের মধ্যে সংগ্রথিত ও সীমায়িত।

নহুষের উত্তরাধিকারীরূপে উল্লিখিত যযাতি সরস্বতীর উপকূলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, ঋগ্বেদে সেই তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু অসুরকন্যা বিবাহের দ্বারা যযাতি যে রাজনৈতিক স্থৈর্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার কোন উল্লেখ ঋগ্বেদে নাই। যদু, তুর্বসু, দ্রুহ্যু, অনু, পুরু, ভরত, দিবোদাস, সুদাস ইত্যাদির উল্লেখ ঋগ্বেদে থাকলেও তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের কোন পরিচয় নির্দিষ্ট করা

ঋগ্বেদের মন্ত্রকর্তারা প্রয়োজন বলে মনে করেননি। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, পুরাণ এবং মহাভারতের বিস্তৃতির মধ্যে যে-সব ইতিহাসভিত্তিক তথ্য আছে সেইসব তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ও সাহায্যে যে-সব পারম্পর্য এই আলোচনায় গড়ে তোলা হয়েছে তাকে ইতিহাস বলে স্বীকৃতিলাভ করতে এখনও বহু প্রতিবন্ধকতা পার হতে হবে। তবে ভারতের সমাজ-বিবর্তন উপলব্ধি করতে হলে এই পারম্পর্যকে উপেক্ষা করা চলবে না। এইসব তথ্য উপেক্ষা করলে যে কেউ সেই সমাজবৃত্ত রচনা করুন না কেন তা নিতান্তই একদেশদর্শী না হয়ে পারবে না।

ঋগ্বেদে সরস্বতীই কেন 'দেবীতমে অম্বিতমে নদীতমে' বলে অভিহিত হয়েছেন, সরস্বতী এবং দৃষদ্বতীর অন্তর্বর্তী অঞ্চলই বা কেন পবিত্রতম অবস্থানস্থল বলে বিহিত হয়েছে, বিস্তৃত সিন্ধু অববাহিকার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় থাকা সত্ত্বেও, কেন সিন্ধু বৃহত্তম হয়েও নদীতমে নয় এইসব প্রশ্নের উত্তর উল্লিখিত সাহিত্যিক উপকরণে প্রায় সুস্পষ্টভাবেই নির্দিষ্ট আছে। সে-তথ্য যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করা ইতিহাস-রচয়িতাদের ইচ্ছা এবং মানসিকতা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হবে, সন্দেহ নাই।

প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞেরা এতাবৎ প্রাপ্ত প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণাদি থেকে স্বীকার করছেন যে তাম্রপ্রস্তর যুগে উদ্ভূত প্রাচীন সভ্যতা হরপ্পা সংলগ্ন সিন্ধু অঞ্চলে, রাজস্থানের কালিবঙ্গান ও সন্নিহিত অধুনা শুষ্ক ঘগ্‌ঘরের খাত বরাবর, গুজরাটের লোথাল ইত্যাদি অঞ্চলে পূর্ণ বিকাশলাভ করে থাকলেও এই সভ্যতার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত প্রতিরক্ষা বেষ্টনী, ইটের তৈরি বাড়িঘর, মাটির বাসনপত্র ও অন্যান্য বহু টুকিটাকি জিনিসের অনেক কিছুই পঞ্জাবের রূপার, উত্তরপ্রদেশের হস্তিনাপুর, কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, বিহারের রাজগীর, এমনকি পশ্চিমবঙ্গের পাণ্ডু রাজার ঢিবিতেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বেদ-পরবর্তী গ্রন্থাদিতে পুরু-ভরতদের হস্তিনাপুরে রাজধানী প্রতিষ্ঠার সংবাদ বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত সমাজের পূর্বমুখীন বিস্তার প্রচেষ্টারই সাক্ষ্য বহন করছে। ঋগ্বেদে ইক্ষ্বাকুর যেমন উল্লেখ আছে তেমনি পরবর্তীকালের বিভিন্ন গ্রন্থে ইক্ষ্বাকুর বংশধরদের সম্পর্কে বিস্তৃত উল্লেখে তাঁদের পূর্বাভিযান এবং মূল ইক্ষ্বাকু বংশের শ্রাবস্তী ও অযোধ্যায় শক্তিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং অন্য এক প্রধান শাখার মিথিলাতে উপনিবিষ্ট হওয়ার উল্লেখ আছে। শতপথব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে যে বিদেঘ-মাঠব নামক জনৈক ব্যক্তি

বৈদিক যজ্ঞের অগ্নিকে নিয়ে সরস্বতীর তীর থেকে পূর্বে সদানীরা নদীর (বিহারের গণ্ডকী বলে বর্ণিত) তীরে উপনীত হয়েছিলেন। ইতিহাসবেত্তারা এই ঘটনাকে পূর্বাঞ্চলে বৈদিক সভ্যতার বিস্তারের নিদর্শন হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যজ্ঞবাদীদের এই সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে অযজ্ঞবাদী অব্রত, ব্রাত্য, অসুর, যাতুধান (রাক্ষস) ইত্যাদির উল্লেখও এইসব সাহিত্যে আছে। এই অযজ্ঞবাদীরা অতীতে প্রধানত পশ্চিমে উপনিবিষ্ট ছিলেন কিন্তু ভারতখণ্ডের পূর্বেও এই অযজ্ঞবাদীদের প্রাধান্য কম ছিল না। সূত এবং মাগধেরা নিশ্চিতই মনুপ্রবর্তিত যজ্ঞের অনুসরণকারী ছিলেন না। এইসব সূত এবং মাগধ নামে পরিচিত ব্যক্তিরা কুলবৃত্তি হিসেবে আখ্যান-উপাখ্যান সম্বলিত গাথার রচয়িতা, সংকলক এবং সংরক্ষণকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা প্রযুক্ত যজ্ঞপন্থী ছিলেন না বলে সমাজে তাঁদের স্থান খুব ভাল ছিল না। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসই সম্ভবত এই সূত সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁদের হাতে পুরাণ সংরক্ষণের ভার দিয়েছিলেন। এই সূতদের সৌকর্যেই পুরাণে অতীতের বংশপরম্পরা এবং অন্য কোন উপকরণে অপ্রাপ্য বহু তথ্য বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে। তা ছাড়া ব্রাত্যষ্টোমের দ্বারা শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে অনেক অযজ্ঞবাদীও যজ্ঞীয় সমাজে স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। এই ব্রাত্যষ্টোম যজ্ঞের অধিকারে স্বীকৃত পুরোহিত দ্বারা অযজ্ঞবাদীদের যজন করবার অধিকারলাভ ঘটেছিল। যজ্ঞবাদীদের রক্ষণশীলতা ক্রমে শিথিল হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে পারস্পরিক মেলামেশাও ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে এবং অন্যান্য অযজ্ঞবাদীরাও যজ্ঞবাদীদের প্রতিবেশী-রূপে সমাজের অংশভুক্ত বলে গণ্য হতে থাকে। মহাভারতে বিস্তৃতভাবেই অসুর, নাগ, যক্ষ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারত উল্লেখ করছেন যে অতীতের খ্যাতিমান ঐসব অসুরেরা পরবর্তী সময়ে (অর্থাৎ লেখকের সমকালে) সুপরিচিত গোষ্ঠীনায়ক রাজন্য হিসেবে পুনরাবির্ভূত হয়েছেন, যেমন দেবতাদের অংশে জন্ম নিয়েছেন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব যথাক্রমে ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অংশে। তেমনি সূর্যের অংশে জন্মেছিলেন কুন্তীপুত্র কর্ণ, শেষনাগের অংশে বলভদ্র এবং অন্যান্যের মধ্যে দেবদেব নারায়ণের (বিষ্ণুর) অংশে মহাভারত কর্ণধার ভগবান কৃষ্ণ। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় এই যে মহাভারতের এই তালিকায় যে-সব অসুরের নাম পাওয়া যায় তাদের অনেকের নাম পুরাণ গ্রন্থগুলিতেও উল্লিখিত আছে। দিতির পুত্র হিরণ্যকশিপু ও তাঁর

পুত্র প্রহ্লাদ এবং প্রহ্লাদপুত্র বলির বিবরণ বিস্তৃতভাবেই পুরাণে বর্ণিত আছে। এ ছাড়া দনুর সন্তান নামে খ্যাত বিপ্রচিতি, স্বর্ভানু, বৃষপর্বা ইত্যাদি বহু অসুরের নামের উল্লেখ থেকে মনে হয় যে এঁদের সম্পর্কিত বিবরণও প্রাচীন গাথা-রচনাকারী সূত এবং মাগধদের সংগ্রহে ছিল, কিন্তু যজ্ঞপন্থী মনুর সন্তানদের সঙ্গে এঁদের বিরোধ থাকায় পরে এদের সম্বন্ধে সমাজে আর কোন উৎসাহ দেখা যায়নি। এইসব অসুরদের অনেকেই অত্যন্ত পরাক্রমশালী ছিলেন। কোন কোন অসুরকে দানবশ্রেষ্ঠ, দানবেন্দ্র, দৈত্যেন্দ্র ইত্যাদি আখ্যাও দেওয়া হয়েছে যা থেকে অনুমান করা যায় যে এই অসুরেরা নিজেদের জীবনকালে বিশেষ শক্তিধর এবং বৃহৎ বৃহৎ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। মহাভারতের আদিপর্বের পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে যে জন্মেজয় ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নের নিকট দেব, দানব, গন্ধর্ব, অপ্সরা, মানব ও যক্ষরাক্ষস প্রভৃতির জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাত হতে চাইলে বৈশম্পায়ন বলেন যে একসময় দেবতাদের দ্বারা পরাজিত হয়ে অসুরেরা ভূমণ্ডলে বিভিন্ন রাজাদের ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করে ভীষণ উৎপীড়ন আরম্ভ করলে ইন্দ্র এবং নারায়ণ-বিষ্ণুর পরামর্শে দেবতারাও অংশক্রমে ভূতলে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই অসুরদের দমন করবার জন্য। লোকপিতামহ ব্রহ্মার ছয় পুত্র জন্মেছিলেন; তাঁদের মধ্যে মরীচির কশ্যপ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। প্রজা-সৃষ্টির জন্য কশ্যপের সঙ্গে দক্ষ প্রজাপতির ত্রয়োদশটি কন্যার পরিণয় হয়। এই কন্যাদের মধ্যে অদিতির গর্ভে আদিত্য নামে দেবতারা, দিতি ও দনুর গর্ভে দৈত্য ও দানব নামে অসুরেরা এবং অন্যান্য কন্যাদের গর্ভে যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, নাগ, সুপর্ণ ইত্যাদিদের জন্ম হয়। এই বিবরণমতে স্বভাবতই বোঝা যায় যে দৈত্য দানব-গন্ধর্ব-নাগ ইত্যাদিদের মত দেবতারাও মনুষ্যদেহে পৃথিবীর জীব হিসেবেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই প্রাচীন পরিবেশে ভগবান বিষ্ণু জন্মে-ছিলেন অদিতির কনিষ্ঠ পুত্ররূপে, কিন্তু তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা গুণজ্যেষ্ঠ। কিভাবে তিনি অসুরদমনে ইন্দ্রকে সাহায্য করেছিলেন এবং বলিকে দমন করে পৃথিবীতে স্থৈর্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং কিভাবে সকল দেবতার অগ্রণী পরম সত্তারূপে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন সেই কাহিনী ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। সেই কাহিনীর জের টেনেই শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব জগৎকারণ ভগবান বিষ্ণুর পুনরায় নরদেহে অবতীর্ণ হওয়ার বিবরণ গ্রন্থন করেছিলেন, পুরাণ এবং মহাভারতে।

মহাভারতে কিন্তু ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণের জন্ম এবং সেই জন্মকাল থেকে আরম্ভ করে যৌবনাবস্থায় পাঞ্চালরাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিতি-কাল পর্যন্ত জীবনের ঘটনাবলীর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তেমনি যে-সব পুরাণে শ্রীকৃষ্ণজীবনবৃত্তান্ত বিধৃত আছে তার কোনটিতেই মহাভারতে বর্ণিত কুরুপাণ্ডবঘটিত ঘটনাবলীর তেমন কোন উল্লেখ নাই।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, যে-মহাভারতকে বর্তমানে প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণের সবক'টি থেকেই প্রাচীন বলে ধার্য করা হয় সেই মহাভারতে বিষ্ণু-ভগবানের নরদেহে প্রকটরূপ বাসুদেব-কৃষ্ণের পূর্ণ জীবনলীলার পরিচয়, বিশেষ করে তাঁর বাল্য ও প্রথম যৌবনকাহিনী কেন অনুল্লিখিত ছিল? আবার পরবর্তীকালের রচনা পুরাণসমূহে সেই প্রাথমিক জীবনের বিস্তৃত পরিচয় নিবদ্ধ হওয়ারই বা কারণ কি? বাসুদেব-কৃষ্ণের জীবনকে এই দুই অংশে বিভক্ত করে এক অংশে তাঁর প্রাথমিক জীবনকে পুরাণের অন্তভুক্ত এবং বৃহত্তর পরবর্তী অংশকে মহাভারতের মধ্যে সন্নিবেশিত করার ফলে যে সমস্যা এবং তৎসম্ভূত যে-সব তত্ত্ব প্রচারলাভ করেছে তা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি অনেক ক্ষেত্রে নিতান্তই যুক্তিহীন বলে গণ্য করা যেতে পারে। হয়ত বা এগুলির পেছনে কিছু উদ্দেশ্যপ্রবণতাও ক্রিয়াশীল ছিল।

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন সম্পর্কে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না এই যুক্তিতে বিভিন্ন পুরাণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-কৈশোর ও প্রাথমিক জীবন সম্পর্কিত কাহিনীকে অনেকে কাল্পনিক ও বহু পরবর্তী যুগে উদ্ভূত বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। জার্মান ভারততত্ত্ববিদ ওয়েবার ভগবান কৃষ্ণের দেবতারূপে স্বীকৃতি ও উপাসনার মূলে সামগ্রিকভাবে খ্রীষ্টীয় প্রভাব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। (Krishna worship proper i.e. the sectarian worship of Krishna as the one God probably attained its perfection through the influence of Christianity.)[১০] এই সিদ্ধান্ত প্রচারে ওয়েবার সম্ভবত (probably) শব্দ ব্যবহার করে সামান্য দ্বিধার পরিচয় দিয়ে থাকলেও ব্যাপক স্বীকৃতিধন্য ভারতীয় পণ্ডিত ভাণ্ডারকার গোপালকৃষ্ণ উপাসনার পশ্চাতে খ্রীষ্টীয় প্রভাবের অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।[১১] সুপরিচিত ছান্দোগ্য উপনিষদ গ্রন্থে তত্ত্ববেত্তা ঋষি ঘোর অঙ্গিরসের সঙ্গে দেবকীপুত্র কৃষ্ণ নামে জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তির তত্ত্ববিচার সম্পর্কিত কথোপকথনের উল্লেখ আছে। এই

দেবকীপুত্র কৃষ্ণের পরিচয় নিয়ে বেশকিছু বিতর্ক আছে ; পুরাণকাহিনীতে প্রখ্যাত যদুবংশের বহু শাখার উদ্ভব ও বিস্তারের বিবরণ অন্যান্য বংশসমূহের পরিচয় থেকে অনেকাংশে বিস্তৃত। কালক্রমে এই যদুবংশে সাত্বত নামে এক শাখার উদ্ভব হয়। এই সাত্বত শাখায় বসুদেব নামে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করলে দেবতারা ভগবান বিষ্ণুর আবির্ভাব সম্ভাবনায় আনক এবং দুন্দুভি বাদ্যের দ্বারা বসুদেবের জন্মকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এই সূত্রে সেই বসুদেব আনক-দুন্দুভি নামেও খ্যাতি অর্জন করেন। আনক-দুন্দুভি - বসুদেবের সঙ্গে যদুবংশের অন্যতর এক শাখার দেবকী নামা এক কন্যার পরিণয় হয়েছিল। দেবকীর খুল্লতাত উগ্রসেনকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁর পুত্র কংস মথুরার সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। এই কংসের প্রত্যয় জন্মেছিল যে ভগ্নী দেবকীর গর্ভের কোন সন্তানের হাতে তাঁর মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সেই কারণে কংস ভগিনী দেবকীসহ বসুদেবকে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল।

বর্ষা ঋতুতে সেদিন আকাশে ঘন মেঘের সমারোহ, ভাদ্রপদ অষ্টমী তিথিতে রজনী ঘোর তমসাবৃত ; বিশ্বের বহুপ্রতীক্ষিত সেই মহাক্ষণটিতে অন্ধকারে রুদ্ধ কারাগারে অভূতপূর্ব এক আলোকের প্লাবনে দেবকীজঠর থেকে অচ্যুতরূপী শিশু কৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটল (ততোঽহং সম্ভবিষ্যামি দেবকীজঠরে শুভে/প্রাবৃট কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যাতুমহং নিশি অর্ধরাত্রে অখিলাধারে জায়মানে জনার্দনে)।[১২] নবজাতকের নাম হল কৃষ্ণ ; বিষ্ণুপুরাণের মতে এই নবাবির্ভূত সত্তা সূর্যদেব স্বয়ং। (ততোঽখিল জগৎপদ্মবোধায়াচ্যুতভানুনা/দেবকী পূর্বসন্ধ্যায়ামাবির্ভূতং মহাত্মনা —বিষ্ণু) ।[১৩] ভানু বা সূর্যের সঙ্গে কৃষ্ণের এই একত্ব ও অভিন্নতা সম্পর্কে ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে সূর্যকে কৃষ্ণ নামে অভিহিত করা হয়েছে দেখা যায়। (অনন্তমন্যদ্রুপদস্য পাগঃ কৃষ্ণমন্যদ্ধাবতঃ সংভরন্তি)।[১৪] এই মন্ত্রটি অথর্ববেদ (২০।১২৩:২), যজুর্বেদ (৩৩।৩৮) ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও উদ্ধৃত হয়েছে, যা থেকে সূর্যের সম্বন্ধে এই প্রতীকী কৃষ্ণ শব্দের ব্যবহার যে অত্যন্ত পরিচিত ও জনপ্রিয় ছিল সে কথা উপলব্ধি করা যায়।

বিভিন্ন পুরাণে কৃষ্ণজন্মের বর্ণনায় যে বিস্তৃত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় তা থেকে এমন সিদ্ধান্ত করা কিছু অযৌক্তিক নয় যে, ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে বর্ণিত এই কাহিনী ও বর্ণনা কোন একটি মূল সূত্র এবং বর্ণনা থেকেই পরিগৃহীত হয়েছিল। প্রধান পুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশখানি হলেও এইসব পুরাণে গ্রথিত বিষয়বস্তু এবং বর্ণনা

ধারায় যে নিকট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় তা থেকে স্বভাবতই প্রতীয়মান হয় যে মূলে পুরাণ নামে একখানি গ্রন্থেরই সৃষ্টি হয়েছিল ; পরে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন তাগিদে সেই মূল পুরাণকে আদর্শ করে ভিন্ন ভিন্ন স্বাতন্ত্র্য সন্নিবিষ্ট করে নূতন রূপ দিয়ে নূতন নূতন নামে অভিহিত করা হয়েছিল। এইসব মৌলিক সাদৃশ্যের যে বিষয়টির অলৌকিত্ব এবং গভীর সাদৃশ্য বিশেষ করে বৈষ্ণবীয় পুরাণসমূহের মূল উপজীব্য সেই বিষ্ণুভগবানের নররূপে আবির্ভাব তথা জন্মগ্রহণের বিবরণটি বিশেষভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই পুরাণসমূহে ভগবান বিষ্ণুর পুরুষোত্তমরূপে ধরায় অবতরণ ও লীলাই ছিল মুখ্য বক্তব্য।

শিশু ভগবান কৃষ্ণ জন্মগ্রহণমাত্রই যে অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করেছিলেন বিভিন্ন পুরাণে তার উল্লেখ আছে। হরিবংশের মতে এই শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র শঙ্খ-চক্র-পদ্মহস্ত চতুর্ভুজ রূপ প্রদর্শন করেন, ফলে ভয়ত্রস্ত পিতা বসুদেব তাঁকে সেই রূপ সংবরণ করবার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। এই প্রার্থনা শ্রবণান্তর স্বাভাবিক শিশুরূপ গ্রহণ করে নবজাতক পিতাকে অনুজ্ঞা করেছিলেন তাঁকে যমুনার বিপরীত কূলে নন্দগোপগৃহে রেখে আসতে। (ফুল্লেন্দীবরপত্রাভং চতুর্বাহু-মুদীক্ষ্যতম্—বিষ্ণুঃ ; তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদার্যুদায়ুধম্/শ্রীবৎ-সলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্—ভাগবত পুরাণ)[১৫] নবজাতকের আবির্ভাবের পর পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীর ভগবানের স্তুতি এবং শিশু ভগবানের প্রত্যুত্তরে এই মহানজন্মের সম্ভাব্যতার গভীর ইঙ্গিত নিহিত আছে এবং পুরাণ বর্ণনার মুখ্য উদ্দেশ্যটিকে গভীরভাবে সুস্পষ্ট করে তোলা হয়েছে বলে উপলব্ধি করা যায়। ভগবানের জন্মের এই ঘটনাটিকে পুরাণসমূহে যেভাবে এক অনতিক্রমণীয় নাটকীয়ত্ব আরোপ করা হয়েছে, কল্পনার সীমাহীন সেই বিস্তৃতির তুলনা অন্য কোথাও আছে বলে মনে হয় না। যিনি কৃষ্ণজন্ম ও কংস-কৃষ্ণ উপাখ্যানে নবজাত খ্রীষ্ট ও রোমক শাসনকর্তা হেরড ঘটিত বাইবেলে উল্লিখিত উপাখ্যানের নৈকট্য দৃষ্টে কৃষ্ণজন্ম কাহিনীর উপর অত্যন্ত পুলকের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় প্রভাবের ক্রিয়াশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন সেই জার্মান ভারততত্ত্ববিদ ওয়েবারের সীমিত দৃষ্টিতে পুরাণকর্তার কল্পনার ব্যাপকতা, গাম্ভীর্য, ইঙ্গিতগর্ভতা ও মনুষ্যচিত্তে গ্রহণযোগ্য সুগভীর ভাবপ্রবণতার কোন উপলব্ধিই খুঁজে পাওয়া যায় না।

বস্তুত শিশুভগবানের আবির্ভাবের পরিপ্রেক্ষিতটিকে পুরাণের ভাববিমুগ্ধ

প্রবক্তা যেভাবে উপস্থিত করেছেন তার কল্পনার অনন্যসাধারণ বিস্তৃতি এবং গভীর নাটকীয়তার সংবেদন তুলনাহীন। অবশ্যম্ভাবী নিয়তিকে প্রতিরোধ করবার মানসে রাজা কংস ভগ্নী দেবকীর জঠরসম্ভূত প্রতিটি জাতককেই বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে বসুদেব দম্পতিকে কারারুদ্ধ করে রেখেছিলেন। সেই বদ্ধ কারাগারের একান্তে ভগবানের আবির্ভাবে মাতা-পিতার শৃঙ্খলই শুধু স্খলিত হয়ে পড়ে নাই, উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল বদ্ধগৃহের অর্গলও। আকাশে ঘন মেঘের গর্জন এবং প্রবল বর্ষণে উর্মিক্ষুব্ধ কল্লোলিনী যমুনা ফেনোচ্ছল মহা ঘূর্ণি-বাত্যায় পরিপূর্ণ। সেই বিক্ষোভসমাকুল নদী আপনার স্রোতকে সংহৃত করে পথ করে দিল ; মহাবিক্রমে নাগরাজ বিস্তার করে দিলেন আপন বৃহৎ ফণা। বসুদেব ক্রোড়স্থিত শিশুকে নিয়ে নিশ্চিন্তে নদীর স্রোত অতিক্রম করে নিদ্রাচ্ছন্ন নন্দপুরের সূতিকাগৃহ থেকে মাতা যশোদার সদ্যোজাতা কন্যার সঙ্গে স্বকীয় শিশু-পুত্রকে বিনিময় করে কারাগার বন্ধনে পুনঃপ্রত্যাবর্তনের বিবরণের অপূর্ব কল্পনা ও নাটকীয়তা কবিকল্পনার এমন এক অনতিক্রমণীয় নিদর্শন যা অতিপারঙ্গম কবির পক্ষেই সম্ভব। পুরাণকার ভগবান ব্যাসের বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণজন্মের এই কাহিনী অনির্বচনীয় ভাবগাম্ভীর্যে ও তুলনাহীন কাব্যসম্পদে সমৃদ্ধ।

বর্ষতং জলদানাং চ তোয়মত্যুল্বণং নিশি।
সংবৃত্যানুযযৌ শেষঃ ফণৈরানকদুন্দুভিম্॥
যমুনাং চাতিগম্ভীরাং নানাবর্তসমাকুলাম্।
বসুদেবো বহন্বিষ্ণুং জানুমাত্রবহাং যযৌ॥ বিষ্ণু[১৬]
ববর্ষ পর্জন্য উপাংশুগর্জিতঃ শেষোঽন্বগাদ বারি নিবারয়ন্ ফণৈঃ॥
মঘোনি বর্ষত্যসকৃদ যমানুজা গম্ভীরতোয়ৌজবোর্মিফেনিলা।
ভয়ানকাবর্তশতাকুলা নদীমার্গ দদৌ সিন্ধুরিব শ্রিয়ঃ পতেঃ॥
নন্দব্রজং শৌরিরুপেত্য তত্র তান্ গোপান্ প্রসুপ্তানুপলভ্য নিদ্রয়া।
সুতং যশোদাশয়নে নিধায় তৎসুতামুপাদায় পুনর্গৃহানগাত্॥ ভাগবত[১৭]

তাবৎকালের নাভিকেন্দ্রসম কৃষ্ণজন্মের এই অলৌকিক ঘটনাটির ঐশ্বর্যগম্ভীর বিবরণ যেভাবে এই বৈষ্ণবীয় পুরাণগুলিতে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে এই কৃষ্ণবৃত্তান্তই ছিল পুরাণকারের ইতিবৃত্তকাহিনীর মূল অনুপ্রেরণা। এই বৈষ্ণবীয় পুরাণসমূহে তাই উপক্রমণিকা-স্বরূপ পূর্ববৃত্তান্ত একান্ত সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ঘাটন করে শ্রীকৃষ্ণবৃত্তান্তে উপনীত হয়ে পুরাণকার হয়ে

উঠলেন বহুবাচী, বিস্তৃত বর্ণনাপ্রিয় এবং শ্রীকৃষ্ণজীবন সমারোহ সম্পর্কে উদ্বেলিত এবং মুখর। এই শ্রীকৃষ্ণবৃত্তান্তে উপনীত হওয়ার পূর্বেও বাসুদেব-কৃষ্ণের আবির্ভাবের সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করেই ঘটনাপ্রবাহে বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্রের বিষ্ণু-চেতনা যেন কৃষ্ণ-বাসুদেব চেতনারই একান্ত প্রকারভেদ বলে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

নির্দেশিকা

১. Kosambi, D. D., Myth and reality, (Bombay, 1962), pp. 42f.
২. Goldman, Robert, Mortal man and immortal woman, in J. O. I. B., No 4, 1969, pp. 163f.
৩. Gaur , R. C., Pururava and Urvasi in Journal of the Royal Asiatic Society, (London 1974), pp. 142f.
৪. বৃহদ্দেবতা, ৭।১৪৭।
৫. Gour, R. C., op. cit.
৬. Lal, B. B., Excavations at Hastinapura, Ancient India, Vols. 10 & 11, 1954-55.
৭. বিষ্ণুপুরাণ, ৪।২১:৭-৮।
৮. Sarma, G. R., Excavations at Kausambi, 1957-59 ; (Alahabad) 1960 ; Indian Anchaeology Review, 1963-64, pp. 64-65.
৯. Allchin, Bridget and Raymond, Birth of Indian Civilization, (Penguin, 1965), p. 206.
১০. Waber, A., The History of Indian Literature, (4th Ed, 1904), p. 71.
১১. Bhandarkar, R. G., Vaishnavism, Saivism and minor Indian sects, (Starssburg. 1912), p. 56.
১২. বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১:৭৬-৭৭।
১৩. ঐ, ৫।৩:২।
১৪. ঋগ্বেদ, ১।১১৫:৫।
১৫. হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ৪।২২-২৫ ; বিষ্ণুপুরাণ, ৫।৩:৮ ; ভাগবতপুরাণ, ১০।৩।৯।
১৬. বিষ্ণুপুরাণ, ৫।৩:১৭-১৮।
১৭. ভাগবতপুরাণ, ১০।৪:৪৯-৫১।

৯

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্পর্কিত তথ্য যে-সব রচনায় পাওয়া যায় সেই-সব তথ্যবাহী রচনার কোনটিরই কালনির্দেশ সহজ নয়। এই ভারত ভূখণ্ডের সর্বত্র ইতিহাসের এক সুপ্রাচীনকাল থেকে শ্রীকৃষ্ণ অগণিত জনগণের দ্বারা এক গভীর আবেগপূর্ণ উপাস্যরূপে গণ্য হয়ে আসছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদ গ্রন্থটিকে রচনার দিক থেকে বিশেষ প্রাচীন বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। এই গ্রন্থে অঙ্গিরস পরিবারের ঘোর নামে এক প্রজ্ঞাবান ঋষির সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত কৃষ্ণ নামে জনৈক জ্ঞানী পুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই কৃষ্ণের পরিচয় প্রসঙ্গে এখানে তাঁকে দেবকীপুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১] যে পুরাণগ্রন্থগুলিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে সেইসমস্ত পুরাণেই শ্রীকৃষ্ণের জননীকে দেবকী নামেই অভিহিত করা হয়েছে।

স্বভাবতই এই জননীনামসূত্রে পরিচিত ছান্দোগ্য উপনিষদের কৃষ্ণ পরবর্তী যুগে বিভিন্ন পুরাণের কাহিনীর বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ, গোকুল এবং বৃন্দাবনে গোপ-গৃহে লালিত কৃষ্ণ, মথুরায় কংসনিধনকারী কৃষ্ণ এবং দ্বারকায় উপনিবেশ স্থাপন-কারী যদুবংশনায়ক কৃষ্ণ এবং সর্বশেষে মহাভারতের কৃষ্ণকে এক ও অভিন্ন বলে গ্রহণ করা হয়েছে, যদিও এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধতার কিছু অভাব নাই। পণ্ডিত কোলব্রুক সর্বপ্রথম ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত এই কৃষ্ণকে মহাভারতের কৃষ্ণের সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলে মত প্রকাশ করেছিলেন।[২] মহাভারতে ভগবান কৃষ্ণের বহু নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এইসমস্ত নামের মধ্যে 'বাসুদেব' নামে তাঁর পরিচিতিই ব্যাপকতম। বসুদেবের পুত্র বাসুদেব হিসেবে পিতৃনামে তাঁর এই পরিচয় ব্যাকরণকার পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে প্রথম উল্লিখিত আছে। অষ্টাধ্যায়ীই প্রাচীনতম গ্রন্থ বা উপকরণ যেখানে বাসুদেব যে দেবতারূপে গণ্য হতেন, সে তথ্যও সংকলিত আছে।[৩] পাণিনি কবে আবির্ভূত হয়েছিলেন সে-সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তবে তিনি যে ভগবান বুদ্ধের পূর্বগামী একথা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত।[৪] শুঙ্গ রাজত্বকালে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে বিখ্যাত দার্শনিক পতঞ্জলি অষ্টাধ্যায়ীর যে ভাষ্য রচনা করেছিলেন সেই গ্রন্থে

বাসুদেবকে নিশ্চিতরূপেই দেবতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫] প্রায় সমসাময়িক-কালেই ভারতে বৈষ্ণবীয় সাধনার এতাবৎ আবিষ্কৃত প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ বিদিশার (ভূপালের সন্নিকটবর্তী বেশনগর) গরুড়স্তম্ভ। এই শিলাস্তম্ভে, যিনি নিজেকে যবন নামে পরিচিত করেছেন, তক্ষশিলার সেই গ্রীক অধিপতি অন্তলিকিতের (Antialkidas) দ্বারা রাজা কাসীপুত্র ভাগভদ্রের সভায় প্রেরিত হেলিয়োডোর নামে দূতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লিপিতে হেলিয়োডোর নিজেকে 'ভাগবত' নামে অভিহিত করেছেন এবং স্তম্ভটিকে দেবদেব বাসুদেবের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত গরুড়স্তম্ভ নামে বর্ণনা করেছেন।[৬]

এই শিলাস্তম্ভটি ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। বহু প্রাচীনকাল থেকে অসংখ্য বৈদেশিক ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন; খ্রীষ্টপূর্বযুগে রচিত বৌদ্ধগ্রন্থ মিলিন্দ পঞ্‌হো-গ্রন্থে উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক অধিপতি মিনেনডারের সঙ্গে বিদগ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত ভিক্ষু নাগসেনের আলোচনার যে বিবরণ আছে তা থেকে মিনেনডারের বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু হেলিয়োডোর যেভাবে নিজেকে ভাগবত নামে অভিহিত করেছেন এবং ভগবান বাসুদেবকে দেবদেব অর্থাৎ পরমতম উপাস্য বলে ব্যক্ত করেছেন, এই প্রত্ন-উপকরণের পূর্বেকার কোন উপকরণে তেমনটি পাওয়া যায় না। এই লেখটি থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে তখনই ভগবান বাসুদেবের উপাসকেরা ভাগবত নামে পরিচিত হতেন; অর্থাৎ বাসুদেব অনুরাগী সম্প্রদায়, যাঁদের বৈষ্ণব নামেও অভিহিত করা হয়, তাঁরাই ভাগবত নামে পরিচিত হতেন। দেবদেব বাসুদেব ছিলেন তাঁদের পরমতম উপাস্য। ঐ লেখতে একটি উদ্ধৃতি আছে যার পাঠ: 'ত্রিনি অমুত পদানি…অনুঠিতানি/নেয়ংতি দম চাগ অপ্রমাদ'। এই উদ্ধৃতিটিকে মহাভারতের 'দমস্ত্যাগোঽপ্রমাদশ্চ এতেষ্বমৃতমাহিতম্'[৭]-এর প্রায় হুবহু প্রতিরূপ বলে গণ্য করা যায়। দম-ত্যাগ ও অপ্রমাদ-অনুষ্ঠানকে বাসুদেব আরাধনার মূল এবং মহাভারতের ব্যাপক কর্মযজ্ঞের ঐটিই যে মূলসূত্র-রূপে চিহ্নিত হয়েছিল এখানে তা সুপ্রতিষ্ঠিত। এই লেখ থেকে সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে সংস্কৃতি ও সভ্যতায় বিশেষ সমুন্নত গ্রীক সমাজসম্ভূত হওয়া সত্ত্বেও হেলিয়োডোর দেবদেব বাসুদেবের প্রতি প্রভূত অনুরাগবশত ভগবান বাসুদেব চেতনাভিত্তিক ভাগবত ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। হেলিয়োডোর অনুসৃত এই ভাগবতধর্ম যে মহাভারতভিত্তিক ছিল উপরিলিখিত উদ্ধৃতি থেকে

সুস্পষ্টভাবেই সে-কথা উপলব্ধি করা যায়। অবশ্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের (৬।২৩) শ্লোকটিকেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভক্তি শব্দের প্রথম উল্লেখ বলে গণ্য করা যেতে পারে। (যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ/তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ)।

'ভাগবত' শব্দটি ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভব। ভাগবত বলতে উদ্দিষ্ট উপাস্যের অনুগত বা ভক্তকে বুঝিয়ে থাকে। শব্দটির অর্থের ব্যাপকতা থাকলেও ভাগবত শব্দে সাধারণত ভগবান বিষ্ণুর অনুগামী সম্প্রদায়, যাঁরা বৈষ্ণব বলে অভিহিত হয়ে থাকেন তাঁদেরই পরিচয়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভারতীয় সাধনধারার উদ্ভব বেদ থেকেই হয়েছিল বলে মনে করা হয়। বেদের ধর্ম মূলত যজ্ঞভিত্তিক কর্মকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তী উপনিষদ নামে পরিচিত সংকলনগ্রন্থসমূহে জ্ঞানমার্গের উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। ভক্তির পথ কর্ম এবং জ্ঞানের পথ থেকে স্বতন্ত্র; ভক্তি সম্পর্কিত উপলব্ধিতে উদ্দিষ্ট উপাস্যের প্রতি পরম আত্মনিবেদনই ভক্তির এক-মাত্র পথ। বেদ যেমন যজ্ঞভিত্তিক কর্মসাধনার উৎস এবং উপনিষদ জ্ঞানমার্গের নির্দেশক, ভক্তিমার্গের তেমন কোন প্রাচীন সুনির্দিষ্ট উৎসমূলের সন্ধান পাওয়া যায় না। নারদ ভক্তিসূত্র নামে পরিচিত একখানি গ্রন্থে ভক্তিমার্গের বিস্তৃত নির্দেশ আছে; কিন্তু এই নারদ ভক্তিসূত্রের কাল এখনও নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট হয়নি। অন্যান্য নানা সূত্রের কথা এই প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয়ে থাকলেও শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতাতেই এই ভক্তিমার্গের সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভগবদ্গীতাতে জ্ঞান, কর্ম, সন্ন্যাস ইত্যাদি যোগের উপযোগিতা বর্ণনা করা হয়ে থাকলেও ভক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে; এই ভিত্তিতেই গীতা ভগবদ্গীতা। সুপ্রাচীন 'ভগ' শব্দকে অবলম্বন করে ভগবান সম্পর্কিত উপলব্ধির উদ্ভব হয় এবং ভক্তিকে ভগবানপ্রাপ্তির ঐকান্তিক মার্গ বলে নির্দিষ্ট করা হয়। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে ভগবান বুদ্ধের প্রতি ভক্তির তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না, যদিও সেই সাহিত্যে অগণিত জনসাধারণকে বুদ্ধের প্রতি অনুরক্ত ও শ্রদ্ধা-পরায়ণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভারহুতের স্তূপপ্রাচীরে উৎকীর্ণ কয়েকটি লিপিতে বুদ্ধের নামের পূর্বে ভগবৎ শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। (ভগবতো সক মুনিনো বোধো—ভগবান শাক্যমুনির বোধিবৃক্ষ; ভগবতো ধমচকম্—ভগবান-এর ধর্মচক্র ইত্যাদি—)। পরবর্তী যুগে শাক্যমুনি বুদ্ধের নামের সঙ্গে ভগবান

শব্দের ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। তা ছাড়া কিছু শিবভক্ত যে নিজেদের শিব ভাগবত নামে পরিচিত করতেন তারও সাক্ষ্য আছে। ধর্ম সম্পর্কিত কোষ-গ্রন্থ Encyclopaedia of Religion গ্রন্থের রচয়িতা জেমস হেস্টিংস ধর্মের গণ্ডিতে 'ভক্তি' শব্দের উদ্ভব ও প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলে মন্তব্য করেছেন।[৮] তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে ভক্তি শব্দের উল্লেখ যেমন পাণিনিতে পাওয়া যায় (অষ্টাধ্যায়ী ৪।৩।৯৫), তেমনি বৌদ্ধ সাহিত্যেও এর উল্লেখ আছে। হেস্টিংসের মন্তব্যে যেন এই ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে যে কোন উপাস্যের উদ্দেশ্যে ভক্তির বিকাশ ভগবান বুদ্ধকে আশ্রয় করেই উদ্ভূত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তৃতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পূর্বে নিশ্চিতভাবে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কিত কোন দলিলে ভগবৎ শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় না। শাক্যমুনি বুদ্ধের প্রবর্তিত অষ্টাঙ্গিক মার্গে ভক্তির কোন স্থান নাই এবং বৌদ্ধমার্গে ত্রিশরণের প্রবর্তনও বুদ্ধঘোষের পূর্বে হয়েছিল বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, বুদ্ধের অনুরাগীরা কখনও শিবভাগবতদের মত নিজেদের বুদ্ধভাগবত নামে পরিচিত করেননি। ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের অনেক পূর্বেই পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ীতে নিশ্চিতভাবেই ভক্তি সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন।[৯] দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্বাব্দের বৌদ্ধচৈত্য ভারহুতের প্রাচীরে বুদ্ধ সম্পর্কে ভগবত শব্দের ব্যবহার থাকলেও ঐ সময়ে বিদিশার কাসীপুত্র ভাগভদ্রের রাজসভায় যবনদূত হেলিয়োডোর বাসুদেবকে নিজের প্রতিষ্ঠিত গরুড়স্তম্ভে সুনিশ্চিতভাবে দেবদেব এবং নিজেকে বাসুদেবভক্ত ভাগবত বলে উল্লেখ করেছেন দেখা যায়। এইসব প্রমাণ থেকে দ্বিধাহীনভাবেই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে ভগবান বাসুদেব, এই যুগের বহু আগে থেকেই পরমতম উপাস্য, দেবদেবরূপে স্বীকৃতি-লাভ করেছিলেন এবং ভক্তিধর্ম-আশ্রিত ভাগবত সম্প্রদায় এই দেবদেব বাসু-দেবকে অবলম্বন করেই উদ্ভূত এবং বিবর্তিত হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণে ভগ শব্দ সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত শ্লোকের উল্লেখ করা যেতে পারে :

> ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য ধর্মস্য যশসশ্রিয়ঃ।
> জ্ঞানবৈরাগ্য যোশ্চৈবষণ্ণাং ভগ ইতীরনা॥ বিষ্ণু ৬।৫।৭৩

প্রায় সমসাময়িক কালেই মহর্ষি পতঞ্জলি তাঁর রচিত মহাভাষ্যে যেভাবে বাসুদেবের উল্লেখ করেছেন তাতেও সেই সময়ে ভগবান বাসুদেবের দেবত্ব এবং

মাহাত্ম্য যে তর্কাতীতভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা উপলব্ধি করা যায়। সুপ্রাচীন এইসব ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় বাসুদেব নামে। প্রাচীন সূত্রসমূহে এই বাসুদেব নামের উল্লেখ থেকে বিভিন্ন প্রকারের সমস্যার উদ্ভব হয়েছে এবং বিভিন্ন পণ্ডিত সেইসব সমস্যার ভিন্ন ভিন্ন সমাধানের প্রস্তাব করেছেন।

এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সাধারণত বসুদেবের পুত্র এই অর্থেই বাসুদেব নামের উদ্ভব হয়েছিল বলে গণ্য করা হয়। মহাভারত গ্রন্থে এই বাসুদেব নামেই ভগবান কৃষ্ণকে মুখ্যত উল্লেখ করা হয়েছে (বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে/বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ—ভগবদ্গীতা ৭।১৯)। সেই মহাগ্রন্থে বাসুদেবের দেবকীপুত্র নামে পরিচয় পাওয়া যায় না। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই কোন কোন পণ্ডিত বলতে চেয়েছেন যে ছান্দোগ্য উপনিষদের দেবকীপুত্র নামে পরিচিত কৃষ্ণ এবং মহাভারতের কর্ণধার ভগবান বাসুদেব কৃষ্ণ এক নন।[১০] এই যুক্তির ভিত্তিতেই একথাও বলা হয়েছে যে পুরাণসমূহে কৃষ্ণকে দেবকীর গর্ভের সন্তান বলা হয়েছে আর ঐ পুরাণের বিবরণেই নন্দগোপগৃহে লালিত কৃষ্ণের আখ্যানসমূহ বিধৃত আছে। মহাভারতে ভগবান কৃষ্ণের গোকুলে ও বৃন্দাবনে গোপসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক তথা সেইসূত্রে প্রাপ্ত গোপাল বা অন্য কোন নামের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই যুক্তিতেই একথাও বলা হয় যে মহাভারতের বর্ণিত বাসুদেব কৃষ্ণ বহু প্রাচীনকালেই দেবতা বলে গণ্য হয়ে থাকলেও ভগবান কৃষ্ণের গোপাল নামে পরিচয় অনেক পরে উদ্ভূত। এই ধরনের নানা যুক্তিকে ভিত্তি করেই অনেকে পুরাণে বর্ণিত গোপাল কৃষ্ণ কাহিনীকে অনেক পরবর্তী যুগের সংযোজন বলে অভিহিত করেছেন।

এইসব যুক্তি থেকে ভগবান কৃষ্ণ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি সমস্যার উদ্ভব হয়েছে দেখা যায়। এগুলির অন্যতম সমস্যা হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণ বাসুদেবের ব্যক্তি-নাম কৃষ্ণ ছিল, না এটি গোত্রনাম। ছান্দোগ্য উপনিষদের উল্লিখিত কৃষ্ণ থেকেই সম্ভবত এই গোত্রের প্রবর্তন হয়েছিল কোন কোন পণ্ডিত এই সিদ্ধান্ত করেছেন।[১১] এই যুক্তিতে আরও বলা হয়েছে যে ভগবান কৃষ্ণের ব্যক্তিনামই ছিল বাসুদেব ; গোড়াতে তাঁকে বসুদেব নামে পিতার পুত্র বলে গণ্য করা হত না ; পরে বাসুদেব শব্দ বসুদেবের পুত্র অর্থে উদ্ভূত হতে পারে এই ধারণা থেকেই বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের পিতা বলে প্রচার করা হয়েছিল। কারণ পতঞ্জলি তাঁর

মহাভাষ্যে বাসুদেব শব্দ বসুদেবের পুত্র হিসেবে নিষ্পন্ন হয়েছে বলে দেখিয়েছেন। এই উভয় যুক্তি মেনে নিলে অত্যন্ত সহজেই পুরাণসমূহে বর্ণিত বসুদেব-দেবকী কাহিনীকে কাল্পনিক কাহিনীরূপে প্রতিষ্ঠিত করা এবং গোকুল ও বৃন্দাবন সম্পর্কিত সকল কাহিনীকেও কল্পনাভিত্তিক রূপকথা হিসেবে গণ্য করা সম্ভব হয়। কিন্তু অন্তত দু'টি কারণে পুরাণবর্ণিত কাহিনীর প্রাচীনত্ব ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। প্রথমত পুরাণের গোবর্ধন কাহিনীর ভিত্তিতেই শ্রীকৃষ্ণের 'গোবিন্দ' নামের প্রচলন হয়েছিল এবং মহাভারতে তথা গীতায় বহুবার শ্রীকৃষ্ণের 'গোবিন্দ' নামের উল্লেখ আছে দেখা যায়। (কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা / যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ॥ ভগবদ্গীতা ১।৩২ ইত্যাদি) দ্বিতীয়ত উল্লেখ করা যেতে পারে পতঞ্জলির অষ্টাধ্যায়ীর একটি উক্তি (২।৩।৩৬), যেখানে বলা হয়েছে 'অসাধুর্মাতুলে' কৃষ্ণ এবং 'জঘান কংসং কিল বাসুদেবাৎ' (অষ্টাধ্যায়ী-৩।২।৩)। এ ছাড়া অষ্টাধ্যায়ীর আর একটি উক্তিকে অন্য একটি পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। এখানে বলা হয়েছে 'যে তাবৎ এতে সৌভনিকে নাম এতে প্রত্যক্ষম্ কংসং ঘাতয়ন্তি, বলিম্ চ বন্ধান্তি চিত্রেষু কথম্' (অষ্টাধ্যায়ী ৩।২।৩)। এটি ইতিহাসভিত্তিক ঘটনার বর্তমানকালে প্রতিস্থাপনমূলক সূত্র যেখানে ঘটনাটি অতীতে সংঘটিত হয়ে থাকলেও চিত্রপটে তার রূপায়ণসূত্রে বর্তমানকাল ব্যবহৃত হয়েছে। সূত্রটির গুরুত্ব নানা কারণে। পতঞ্জলির মতে ঘটনাগুলি ইতিহাস-ভিত্তিক। এই ঘটনাগুলির উপস্থাপনা করা হয়েছে চিত্রপটে। বর্ণিত ঘটনা কংসকে আঘাত করা বা বলির নিধন। অষ্টাধ্যায়ীরই অন্য এক জায়গায় আছে কৃষ্ণ অসাধু মাতুলকে এবং বাসুদেব কংসকে হত্যা করেছিলেন। মথুরার অধিপতি কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত কংস কৃষ্ণ তথা বাসুদেবের মাতুল অষ্টাধ্যায়ীর এই তথ্য সুনিশ্চিতভাবে পতঞ্জলি কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে। মহাভারতে কিন্তু এই ঘটনার কোন উল্লেখ নাই ; এই ঘটনার উৎস বৈষ্ণবীয় পুরাণসমূহ এবং পতঞ্জলির মতে ঘটনাটি ইতিহাসভিত্তিক।

কংস যে কৃষ্ণ তথা বাসুদেবের মাতুল ছিলেন, পুরাণের এই তথ্য স্বীকার করতে হলে মহাভারত রচনাকালে পুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণের বাল্যলীলাবিবরণ, কৃষ্ণের মাতা যে কংসের ভগিনী ছিলেন, কংস যে অসাধু অর্থাৎ পুরাণ বর্ণনামতে দুষ্কৃতকারী ছিলেন, এবং কৃষ্ণ কর্তৃক তিনি নিহত হয়েছিলেন এইসব ইতিবৃত্ত

পতঞ্জলির কালে শুধু পরিজ্ঞাতই ছিল না, সেসব কাহিনী ইতিহাস বলেই গণ্য হ'ত। এইসব সিদ্ধান্ত যাঁরা পুরাণবিধৃত শ্রীকৃষ্ণজীবনলীলাকে মহাভারত রচনার পরবর্তীকালে (ওয়েবার ও ভাণ্ডারকারের অভিমত অনুসারে খ্রীষ্টের আবির্ভাবের বহু পরে) উদ্ভূত কাল্পনিক উপাখ্যান বলে গণ্য করেছেন তাঁদের বক্তব্য নিতান্তই দুর্বল হয়ে পড়ে।

তা ছাড়া পতঞ্জলি বর্ণিত অন্য যে তথ্যটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে তা হচ্ছে চিত্রপটে সেই কংসবধ কাহিনীর রূপায়ণ। চিত্রপটে কাহিনী রূপায়ণের প্রবণতা ভারতে বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত রয়েছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে 'মঙ্খ' ও 'চরণচিত্র' নামে পরিচিত কাহিনী-চিত্রের উল্লেখ আছে। মঙ্খচিত্র অঙ্কন ও প্রদর্শন এক শ্রেণীর মানুষের জীবিকার উপায়রূপে প্রচলিত ছিল। ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক একজন বিখ্যাত পরিব্রাজক সন্ন্যাসী 'গোশাল', মঙ্খ-ব্যবসায়ীর পুত্র (মঙ্খলীপুত্র) নামে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তী যুগের বহু সাহিত্যিক উপকরণে এই চিত্রপটের উল্লেখ পাওয়া যায়। অত্যন্ত জনপ্রিয় ধর্মভিত্তিক আখ্যানকে ভিত্তি করে চিত্রপট রচনার প্রচলন এখনও বর্তমান আছে। এখনও যে-সব পটচিত্র বিশেষ জনপ্রিয় তার মধ্যে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা থেকে কংসবধ পর্যন্ত কাহিনী-নির্ভর চিত্রপটের ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়। পতঞ্জলি তাঁর অষ্টাধ্যায়ীতে নিঃসন্দেহে এইধরনের চিত্রপটেরই উল্লেখ করেছেন। পতঞ্জলির পর দুই হাজার বৎসরকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। কৃষ্ণলীলাপট এই দ্বিসহস্র বৎসর ধরে ভারতের ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠীর নিকট বিশেষ উপভোগের উপকরণ বলে গণ্য হয়ে আসছে। সাধারণত ইতিহাসভিত্তিক কাহিনীই চিত্র-পটে রূপায়িত হয়ে থাকে, এবং তার ধর্মীয় ভিত্তি ও জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত হলে তেমন আখ্যায়িকা বহু দীর্ঘকাল ধরেই পটচিত্রের উপকরণরূপে প্রচলিত থাকতে পারে। কথাকার নামে পরিচিত এক শ্রেণীর মানুষ, যাঁরা বহু অতীতকাল থেকে সূত, মাগধ, কুশীলব, চারণ ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়ে আসছেন তাঁরাও তাঁদের আখ্যান কাহিনী সমসাময়িককালে সংঘটিত ঘটনা থেকেই আহরণ করে থাকেন। এই যুক্তিতেই দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে রাম কাহিনী (বালিবধ) ও কৃষ্ণ কাহিনী (কংসবধ), যার চিত্ররূপায়ণ ঋষি পতঞ্জলি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেইসব কাহিনী সদ্য সদ্য পতঞ্জলির সমকালেই পটে গৃহীত হয়নি ; বহু অতীত-কাল থেকে, প্রচলিত রীতি ভিত্তিতে, ঐসব ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কাল থেকেই

গাথা কাহিনী এবং চিত্রপটের ভিত্তিরূপে গৃহীত হয়েছিল।

ভগবান কৃষ্ণের আবির্ভাবের কোন নির্দিষ্ট কাল এখনও সর্বজনগ্রাহ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অবশ্য এখনও ভগবান কৃষ্ণকে অনেকে কল্পিত ব্যক্তিত্ব বলেই মনে করে থাকেন। এখানে কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ-বাসুদেবকে ইতিহাস-ভিত্তিক ব্যক্তিসত্তা বলেই গ্রহণ করে আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার প্রয়াস করা হয়েছে। এই সূত্রেই কালনির্ণয়ের জন্য সেই পুরাণেরই কিছু তথ্যকে ভিত্তি করা যেতে পারে, যেখানে বলা হয়েছে যে নন্দ নামে খ্যাত মগধের সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের এক হাজার পনেরো, বা এক হাজার পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে, মহাভারত যুদ্ধের অবসানের পর পাণ্ডববীর অর্জুনের পৌত্র, তথা ঐ যুদ্ধে নিহত অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতের জন্ম হয়েছিল।

যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষ সহস্রংতু জ্ঞেয়ং পঞ্চশতোত্তরম্ ॥ বিষ্ণু ৪/২৪/১০৪

বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত কালনির্ণয় সম্পর্কে এই সুনির্দিষ্ট তথ্যটি ভিন্ন অন্য কোন কাল নির্দেশক তথ্য পুরাণসমূহে বড় একটা পাওয়া যায় না। বিষ্ণু-পুরাণের এই তথ্যটি কতটা নির্ভরযোগ্য তা নিয়ে মতদ্বৈধতা আছে। পুরাণে বর্ণিত এই তথ্যটি ইতিহাসভিত্তিক বলে স্বীকার করে নিলে মহাভারত ও পুরাণের উপর ভিত্তি করে কিছু সিদ্ধান্ত করা যায়। প্রথমত পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্তের সঙ্গে ভগবান কৃষ্ণের কিছু সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামার আক্রমণের ফলে অভিমন্যুর পত্নী উত্তরার গর্ভস্থ সন্তানের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যু ঘটে। পাণ্ডববংশের ঐ সম্ভাব্যজাতকই ছিল কুরুক্ষেত্রের বিধ্বংসী সংগ্রামের অবসানে পুরু-ভরত বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী। উত্তরার গর্ভস্থ সেই জাতকের মৃত্যু ঘটলে পাণ্ডবরা অলৌকিক শক্তিধর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পাণ্ডবদের এই বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করবার জন্য প্রার্থনা জানায়। এই অনুরোধের ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার গর্ভস্থ অভিমন্যুর সন্তানকে পুনর্জীবিত করেন (মহাভারত, ১৪।৫০-৫৩)। এই সন্তানই জন্মের পর পরীক্ষিৎ নামে খ্যাত হন এবং কুরু-ভরত বংশের উত্তরাধিকারীরূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পার্জিটারের হিসেবমতে মগধের রাজা নন্দ খ্রীষ্টপূর্ব ৪০২ অব্দে সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। গাইগারের (Geiger) মতে এই তারিখ ৩৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।[১২] এই ঘটনার এক হাজার পনেরো (বা পঞ্চাশ)

বৎসর পূর্বে পরীক্ষিতের জন্ম হয়েছিল। ভারত আক্রমণকারী গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িকত্বসূত্রে মৌর্যবংশের চন্দ্রগুপ্ত খ্রীষ্টপূর্ব ৩২২ অব্দে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন বলে ধার্য করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতের কালনির্ণয়ে এই তারিখটিকেই অন্যতম প্রধান, স্থির ও গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করা হয়েছে। এই তারিখের ভিত্তিতেই পার্জিটার নির্ধারণ করেছিলেন যে নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্মনন্দ খ্রীষ্টপূর্ব ৪০২ অব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন[১৩]। পার্জিটারের দ্বারা নির্ধারিত নন্দাভিষেকের এই তারিখটি গ্রহণযোগ্য বলে ধার্য করলে বিষ্ণুপুরাণের বক্তব্যমতে ১৪৫২ বা ১৪০৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পরীক্ষিতের জন্ম হয়েছিল বলে গ্রহণ করা যায়। এই তারিখটিকে ভগবান কৃষ্ণের জীবনের শেষ অবস্থার একটি তারিখ বলেও গণ্য করা যেতে পারে। অর্থাৎ খ্রীষ্টের জন্মের আনুমানিক ১৪০০ বৎসর পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরদেহে বিদ্যমান ছিলেন এমনি একটি ধারণা করে নেওয়া খুব অযৌক্তিক বলে গণ্য হবে না, যদিও অনেক বৈষ্ণবধর্মানুরাগীর মতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই কালনির্ণয় বাতুলতামাত্র। অন্যদিকে পার্জিটার নিজেও মহাভারতের যুদ্ধকে খ্রীষ্টজন্মের আনুমানিক ৯৫০ বৎসরেব পূর্বে সংস্থাপিত করতে চাননি।[১৪]

পূর্ববর্ণিত অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্যকার ঋষি পতঞ্জলি আনুমানিক ১৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বর্তমান ছিলেন। এই গণনামতে শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব পতঞ্জলি থেকে আনুমানিক ১২০০ বছর অতীতের ঘটনা। ঋষি পতঞ্জলির প্রত্যক্ষীভূত কংসবধের চিত্রপট যদি অনুরূপ সেই পতঞ্জলির কাল থেকে আনুমানিক ১১০০ বৎসরকাল তার জনপ্রিয়তা থেকে বিচ্যুত না হয়ে থাকে তবে পতঞ্জলির পূর্ববর্তী আনুমানিক ১২০০ বৎসর পূর্বে সংঘটিত ঘটনার উপর নির্ভর করেই ঐ চিত্র প্রথম অঙ্কিত হয়ে পতঞ্জলির কাল পর্যন্ত তার জনপ্রিয়তা সংরক্ষণ করে আসছিল এইরূপ সিদ্ধান্ত করা কোনমতেই খুব অযৌক্তিক বলে গণ্য হতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে একটি অন্যতর সমস্যার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পতঞ্জলির সাক্ষ্য থেকে পটচিত্রে কংসবধের কাহিনী যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান যুগ পর্যন্ত প্রচলিত পটচিত্রে এই কংসবধের উপাখ্যান সহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে তাবৎ বাল্যলীলারই প্রতিরূপায়ণ দেখা যায়, যে কাহিনীর অবসান হয় শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে মথুরায় আগমন ও কংসবধ দিয়ে। পটচিত্রে বড় একটা মহাভারতের কাহিনীর রূপায়ণ লক্ষ্য করা

যায় না। দৃশ্যচিত্রে আখ্যানধর্মী কৃষ্ণলীলার প্রস্তরভাস্কর্যের বেশকিছু রূপায়ণও আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসমস্ত কৃষ্ণলীলা চিত্রায়নের এপর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রাচীনতম নিদর্শন দেখা যায় মথুরায় প্রাপ্ত কৃষ্ণ-গোবর্ধনধারীর মূর্তি।[১৫] রমাপ্রসাদ চন্দ মূর্তিটিকে খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকের সৃষ্টি বলে অভিহিত করেছেন।[১৬] ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন জীবনের কাহিনীতে গোবর্ধনধারণের ঘটনাকে একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সংঘটনরূপে গণ্য করা উচিত, কারণ এই ঘটনার পরই দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে আপনার আনুগত্য জ্ঞাপন করেন এবং তাঁকে গোবিন্দ আখ্যায় অভিহিত করেন। এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ উপাখ্যানটিতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ভগবৎসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ইঙ্গিত অত্যন্ত সুস্পষ্ট ; এবং সেই বিশেষত্বসূত্রেই এই ঘটনার ব্যাপক জনপ্রিয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—যার ফলে শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের জীবনকাহিনীচিত্রে এই ঘটনার বারংবার প্রতিরূপায়ণ দৃষ্টিগোচর হয়। এ ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের জীবনচিত্র-প্রকল্পে অন্যান্য যে-সব আলেখ্য বা ঘটনার সমাবেশ নজরে পড়ে তার প্রায় সবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রারম্ভিক জীবনপ্রকল্পের রূপায়ণ, যে জীবনপ্রকল্পে তিনি নন্দ-যশোদা প্রতিপালিত গোপাল নামে অভিহিত ছিলেন। মহাভারত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের এই প্রারম্ভিক জীবনের ও গোপাল পরিচয়ের অনুল্লেখের ফলে প্রাক্‌খ্রীষ্টীয় যুগে গোপাল-কৃষ্ণ কাহিনীর অস্তিত্বের অভাব ছিল বলে গণ্য হয়ে থাকলেও এই গোপাল-কৃষ্ণ কাহিনী যে সাধারণ জনসমাজে যথেষ্টই জনপ্রিয় ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

এই গোপাল-কৃষ্ণ সমস্যা ছাড়া আরও কয়েকটি প্রশ্ন সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা যেতে পারে, যে-সব প্রশ্নের সুপ্রযুক্ত সমাধান হয়েছে বলে মনে হয় না। বৈষ্ণব ধর্মের সম্পর্কে আলোচনাকারীরা সাধারণত এই ধর্মের ক্রমবিবর্তন পর্যালোচনা করতে গিয়ে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতককেই তাঁদের আলো-চনার প্রারম্ভিক সীমারূপে নির্দিষ্ট করেন। কারণ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণে এই সময়ের পূর্বেকার কোন নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়নি। এই যুগে বিদিশার সেই বিখ্যাত গরুড়স্তম্ভ ছাড়া পরপর কয়েকটি প্রত্ন উপকরণে বাসুদেবের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এইসব প্রত্ন উপকরণের মধ্যে প্রাচীন মেবার রাজ্যের রাজ-ধানী চিতোরগড়ের সন্নিকটে গোষুণ্ডি নামক একটি স্থানে একটি লেখ পাওয়া গিয়েছে, যাতে উল্লেখ আছে যে সর্বতাত নামে জনৈক অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী রাজার রাজত্বকালে সংকর্ষণ ও বাসুদেবের জন্য নারায়ণ বাটকে একটি পূজা-শিলা-

প্রাকার নির্মাণ করা হয়েছিল। (ভগব (দ্) ভ্যাং সংকর্ষণ বাসুদেবাভ্যাং···পূজা-শিলা-প্রাকারো)।[১৭] এই লেখতে বৃষ্ণিবংশের দুই ভ্রাতা সংকর্ষণ ও বাসুদেবের নাম 'ভগব (দ) ভ্যাং' এই বিশেষণ সহ উল্লিখিত হওয়ায় এই তথ্যই প্রতীয়মান হয় যে রাজা সর্বতাত উভয়কেই যৌথভাবে উপাস্যরূপে ভজনা করতেন। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে এখানে রাজা নিজেকে ভাগবত আখ্যায় অভিহিত করলেও ভগবান বাসুদেবই এখানে একমাত্র উপাস্য ছিলেন না, যৌথভাবে সংকর্ষণ এবং বাসুদেব ছিলেন উপাস্য এবং উভয় ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ সংকর্ষণের নামই লেখতে প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। এই তথ্য থেকে অনুমান করা অন্যায় নয় যে, ভ্রাতৃ-দ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সংকর্ষণেরই মর্যাদা এই কীর্তি-প্রতিষ্ঠাতার নিকট কিছু বেশি ছিল। সংকর্ষণের অনুরূপ প্রাধান্য অন্য আর একটি লেখতেও লক্ষ্য করা যায়, যে লেখটি কিছুকাল পরের। এই লেখটি আবিষ্কৃত হয়েছিল মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত পুণের সন্নিকটবর্তী নানাঘাটের একটি গুহায়। লেখটিতে শাতবাহন বংশের জনৈক অধি-পতির অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে প্রদত্ত প্রভূত দানকর্মের উল্লেখ আছে। লেখটির প্রারম্ভেই আছে 'সিদ্ধং···ধংমস নমো ইদস নমো সংকসন-বাসুদেবান চংদ-সুরানং মহিমাবতানাং চতুনংচ লোকপালান যম-বরুণ কুবের বাসবানং নমো' —ইত্যাদি। এই লেখতে সংকর্ষণ-বাসুদেবের উল্লেখ ধর্ম, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য এবং চতুর্দিকপালের সঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে। এখানে সংকর্ষণ-বাসুদেবের প্রতি একনিষ্ঠ ঐকান্তিকতার কোন পরিচয় নাই। তবে এঁরা দুজন মূলত মানবজন্মধারী হলেও ধর্ম, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য এবং চতুর্দিকপতিদের মতই দেবতারূপে পরিগৃহীত হয়েছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায়। নানাঘাটের এই লিপিটি শাতবাহন বংশের সাম্রাজ্ঞী নাগম্ণিকার বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।[১৮] নানাঘাটে প্রাপ্ত প্রথম শাতকর্ণির অন্য একটি লেখতে রাজ্ঞী দেবী নায়নিকার নামের উল্লেখ আছে।[১৯] শাতবাহন সাম্রাজ্যের গোড়ার দিকে সাম্রাজ্ঞী নাগনিকা সবিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন এবং তিনি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুগামী ছিলেন। নামসূত্রে অনুমান হয় যে, রাজ্ঞী নাগমনিকা বা নায়নিকা নাগসমাজের দুহিতা ছিলেন।

জন্মসূত্রে কৃষ্ণ-বাসুদেব বৃষ্ণিবংশের সন্তান। পুরাণে এই বংশকে বেদে উল্লেখিত যদুবংশের সাত্বতশাখা থেকে উদ্ভূত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গোড়াতে যদুরা সরস্বতীর উপকূলে বসবাস করতেন। ঋগ্বেদের উল্লেখ থেকে এ তথ্য অনুমান করা যায়। পুরাণে যদুদের মথুরায় উপনিবেশ স্থাপনের কথা বর্ণিত

আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই মথুরায়ই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ; গোকুল ও বৃন্দাবনে শৈশব ও কৈশোরলীলার অবসানে মথুরায় ফিরে এসে তিনি মাতুল কংসকে নিধন করেন। এরপরে কিছুকাল তিনি মথুরাতেই ছিলেন। পরে যদুবংশের এক বিরাট অংশকে নিয়ে বাসুদেব পশ্চিমসাগর উপকূলে দ্বারকায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে পশ্চিমসাগর উপকূলে উপনিবিষ্ট যদুসমাজ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছুকাল পরে পরস্পর হানাহানি করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং দ্বারকা নগরী সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে উৎকীর্ণ মথুরায় আবিষ্কৃত একটি শিলালেখতে এই বৃষ্ণিবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। লেখটি কুষাণ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ শাসনকর্তা মহাক্ষত্রপ রাজুবুলের পুত্র মহাক্ষত্রপ সোদাসের আমলে মথুরার সন্নিকটবর্তী মোরা গ্রামের একটি কূপের প্রাচীরে উৎকীর্ণ হয়েছিল। এই লেখটিতে একটি শৈলদেব-গৃহে বৃষ্ণিবংশের পঞ্চবীরের প্রতিমা স্থাপনের উল্লেখ পাওয়া যায়। (ভগবতাং বৃষ্ণীনাং পঞ্চবীরাণাং প্রতিমাঃ শৈল-দেবগৃহে)।[২০] লেখটি আবিষ্কারের পরে লুডার্স (H. Luders) কিছু জৈনসূত্রের উপর নির্ভর করে এই পঞ্চবৃষ্ণিবংশীয় বীরকে বলদেব, অক্রুর, অনাধৃষ্টি, সারণ এবং বিদুরথ নামে নির্দিষ্ট করেছিলেন। পরে অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বায়ুপুরাণের একটি শ্লোকের উপর নির্ভর করে এই পাঁচজন বৃষ্ণিবীরকে সংকর্ষণ, বাসুদেব, প্রত্যুম্ন, সাম্ব এবং অনিরুদ্ধ বলে প্রতিষ্ঠিত করেন। (বায়ুপুরাণ ৬৯।১-২)[২১] মহাক্ষত্রপ সোদাসের রাজত্বকালে মোরা গ্রামের পূর্ববর্ণিত লেখের প্রায় সমকালে মথুরা থেকে আবিষ্কৃত অন্য একটি লিপিতে ভগবান বাসুদেবের দেবকুলে একটি তোরণ ও বেদিকা স্থাপনের সংবাদ পাওয়া যায় (ভগবতো বাসুদে-বস্য মহাস্থানকে দেবকুলং তোরণং বেদিকা প্রতি-স্থাপিতং)।[২২] এই লিপিতে উল্লিখিত 'বাসুদেবস্য মহাস্থানকে দেবকুলং তোরণং বেদিকা প্রতিষ্ঠাপিতং' এই বক্তব্য থেকে বাসুদেবের দেবত্ব সম্পর্কিত স্বীকৃতি, এবং বাসুদেবের জন্য নির্মিত একটি মহাস্থান সম্পর্কে তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বস্তুত এককভাবে বাসুদেবের অর্চনা ও বাসুদেব উপাসনার জন্য নির্মিত বৃহৎ মন্দিরের (মহাস্থান দেবকুল) অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের মধ্যে এই লিপিটিকেই অন্যতম প্রধান বলে ধার্য করা যেতে পারে। বিদিশায় যবনদূত হেলিয়োডোরের দ্বারা সংস্থাপিত গরুড়স্তম্ভে বাসুদেবকে দেবদেব অর্থাৎ প্রধানতম আরাধ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে মন্দিরের অস্তিত্বের কোন উল্লেখ নাই।

ঘোষুণ্ডিতে আবিষ্কৃত লেখতে উল্লিখিত পূজা-শিলা-প্রাকার এই উল্লেখে সম্ভবত কোন উন্মুক্ত দেবস্থানের চারদিকে প্রাকার নির্মাণের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে ; এখানে এবং নাসিক লিপিতে উল্লিখিত দেবতা সংকর্ষণ-বাসুদেব। এখানে বাসুদেবের সঙ্গে সংকর্ষণের উল্লেখই কেবল লক্ষণীয় নয়, সংকর্ষণের নাম বাসুদেবের আগে উল্লেখিত হওয়ায় বাসুদেব অপেক্ষা সংকর্ষণকে যে এই দুই লিপিতেই অধিকতর প্রাধান্য আরোপ করা হয়েছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। সেইসঙ্গে মথুরায় প্রাপ্ত বৃষ্ণিবংশের পঞ্চবীরের প্রতিমার উল্লেখ থেকে এই দেবস্থানে সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব ও অনিরুদ্ধের সঙ্গে বাসুদেবের মূর্তির অস্তিত্বের অনুমান করা যায় ; এখানেও বাসুদেবের একক প্রাধান্যের কোন ইঙ্গিত নাই।

বৈষ্ণবধর্মের বিবর্তন নিয়ে যাঁরা গভীর চিন্তা ও ব্যাপক গবেষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাসুদেব-কৃষ্ণ উপাসনার উদ্ভব ও বিবর্তন সম্পর্ক কিছু বিস্তৃত তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করার প্রযত্ন করেছিলেন। বিশেষ করে প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক কাল পর্যন্ত বৃষ্ণিবংশের পঞ্চবীরের পূজা, যৌথভাবে সংকর্ষণ ও বাসুদেব এই দুই দেবতার উল্লেখ ও পূজার অস্তিত্ব এবং এককভাবে ভগবান বাসুদেবের দেবদেবরূপে প্রতিষ্ঠা ও উপাসনার যে-সব তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে একটি যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তও তিনি উপস্থিত করেছেন।

তিনি বলেছেন যে একসময়ে বায়ুপুরাণে উল্লিখিত বৃষ্ণিবংশের সংকর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব ও অনিরুদ্ধের পূজার প্রচলন হয়েছিল। বাসুদেব-কৃষ্ণের পূজা যে প্রথমে বৃষ্ণিদের মধ্যেই উদ্ভূত হয়েছিল, এ সিদ্ধান্ত অবশ্য অনেকেই করেছেন। কিন্তু অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ই মোরা গ্রামের কূপপ্রাচীরস্থ লেখতে উল্লিখিত 'বৃষ্ণি' বংশের পঞ্চবীর যে সংকর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব ও অনিরুদ্ধ, বায়ুপুরাণ থেকে এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। জৈনসূত্র থেকে লুডার্স যে পঞ্চবৃষ্ণি-বীরের নাম উল্লেখ করেছিলেন সেই তালিকায় বাসুদেবের নাম ছিল না। বৃষ্ণিবীর-পঞ্চকের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করবার পর অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন যে কিছুকাল পরে বায়ুপুরাণে প্রাপ্ত তালিকা থেকে সাম্বের নাম বিলোপ পায় এবং সংকর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধকে নিয়ে বৈষ্ণব ব্যূহবাদ প্রবর্তিত হয়। (Shortly afterwards, Sámba was eliminated from their list of deified heroes by the theologians of the cult, and the remain-

·ing four (Vāsudeva as the fountain head, the other three being his successive emanatory forms) were regarded as typifying the different aspects of the one great god Parā-Vāsudeva.)[২৩]
এইভাবে অতীতের বীর-পূজা ব্যূহবাদে এবং ব্যূহবাদ থেকে বিভব (অর্থাৎ অবতার)-বাদের বিবর্তন ঘটেছিল। এই ধারণা অবলম্বন করেই ক্রমে পাঞ্চরাত্র সাধনা বা পরাব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামিন ও অর্চার উদ্ভব হয়েছিল। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ভগবদ্গীতা, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ, নারদ পাঞ্চরাত্র, অহির্বুধ্নসংহিতা, বৃহৎসংহিতা ইত্যাদি নানা প্রাচীন গ্রন্থ থেকে ব্যাপক প্রমাণ ও উদ্ধৃতি সংগ্রহ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা যেতে পারে যে কিভাবে, কেন এবং কখন পাঁচজন বৃষ্ণিবীরের ভেতর থেকে সাম্বকে অপসারণ করা হয়েছিল সে-সম্পর্কে কোন তথ্য বা ব্যাখ্যা অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যে পাওয়া যায় না। বায়ুপুরাণে বৃষ্ণিদের পঞ্চবীরের যে তালিকা আছে তাতে সংকর্ষণের নাম প্রথম উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু ব্যূহবাদের নামের তালিকায় বাসুদেবের নামের উল্লেখই প্রথম ; তা ছাড়া ব্যূহবাদের উপলব্ধিতে বাসুদেবই প্রধান। তাঁকে বলা হয়েছে পরা বাসুদেব। অন্য তিনজন পরা বাসুদেবেরই বিভিন্ন অভিব্যক্তি। ব্যূহবাদে এই চারজনই এক এবং অদ্বিতীয় বাসুদেবের মূর্তরূপ। পাঞ্চরাত্র নামে পরিচিত বৈষ্ণব চেতনায় বহু অবতারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে অহির্বুধ্ন সূত্র এবং নারদ পাঞ্চরাত্রই প্রধান প্রামাণ্য বলে উল্লিখিত। যদিও অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর একটি উক্তির পতঞ্জলিকৃত ব্যাখ্যা—জনার্দনস্ত্বাত্মা চতুর্থ এব (মহাভাষ্য ৬।৩।৫) এই উক্তির উপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু পতঞ্জলির এই উক্তি থেকে কোনমতেই চাতুর্ব্যূহ পরিকল্পনার সমর্থন পাওয়া যায় না। আর যে অহির্বুধ্ন সংহিতা বা নারদ পাঞ্চরাত্র (ভরদ্বাজসংহিতা পরিশিষ্ট, ৪।৪।২৮, ৩০-৩১) বা বৈখানসাগম, যাকে পাঞ্চরাত্র চর্চার একটি প্রাচীন উৎস বলে অভিহিত করা হয়, এইসব গ্রন্থের কোনটিকেই গুপ্ত আমলের পূর্বের বলে গণ্য করা হয়নি। এইসমস্ত সাহিত্যিক উপকরণ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব যুগে ব্যূহবাদের উদ্ভব হয়েছিল এবং সেই ব্যূহবাদের পরা বাসুদেব পরিকল্পনা থেকেই যে বাসুদেব পূজার উদ্ভব ও বিবর্তন ঘটেছিল এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বোধহয় খুব যুক্তিযুক্ত নয়।

মোরার কূপপ্রাচীরে উৎকীর্ণ লেখতে যে পাঁচজন বৃষ্ণিবীরের প্রতিমার উল্লেখ আছে, ব্যূহভিত্তিক চতুর্ব্যূহের সঙ্গে তার কোন যোগ ছিল বলে মনে হয় না। এই প্রতিমার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তোষা নাম্নী জনৈক মহিলা। এই তোষাকে ঐতিহাসিকেরা শকবংশসম্ভূত একজন অভিজাত মহিলা বলে অনুমান করেছেন। বিদেশাগত শক সম্প্রদায় বিশেষ ক্ষমতাশালী শাসকরূপে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে, মথুরা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল শাসন করতেন। তাঁদের অনেকে ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম, এমনকি ব্যক্তিগত নাম হিসেবে ভারতীয় নাম (উদাহরণ: কুষাণ-সম্রাট বাসুদেবের নাম) গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক অভিজাত মহিলা বৃষ্ণিবংশের পঞ্চবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এমন সম্ভাবনা অস্বীকার না করলেও এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। এই লেখটির আনুমানিক একশতবর্ষ পরবর্তী, মথুরায় প্রতিষ্ঠিত অন্য একটি লেখ লুডার্সের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছিল। লেখটিকে এই প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে ধার্য করা যেতে পারে। এই লেখতে 'তোষা' নাম্নী জনৈক মহিলার একটি প্রতিমা প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে (যস্তোষায়াঃ শৈলং শ্রীমদগৃহমতুলমুদধসমধার)। এই লেখতে বর্ণিত তোষাকে লুডার্স এবং রমাপ্রসাদ চন্দ উভয়েই পূর্বোক্ত মোরা কূপপ্রাচীরের লেখতে উল্লিখিত তোষার সঙ্গে এক ও অভিন্ন গণ্য করে মন্তব্য করেছেন যে, তোষার এই প্রতিমা, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কোন বংশধরের দ্বারা শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[২৪] এ তথ্য যথার্থ হয়ে থাকলে অনুমান করা হয়ত অন্যায় হবে না যে তোষা মথুরার তেমনি এক সমাজের মহিলা ছিলেন যে-সমাজে মৃত্যুর পর প্রয়াত বিশিষ্ট পূর্বপুরুষ এবং মাতাপিতার প্রতিমা গঠন ও প্রতিষ্ঠা করার রীতি প্রচলিত ছিল। মথুরা ছিল সাত্বত বৃষ্ণিদের অধ্যুষিত নগরী এবং সংকর্ষণ-বাসুদেবরা এই নগর পরিত্যাগ করে মথুরায় উপনিবেশ স্থাপন করে থাকলেও সাত্বত-বৃষ্ণি বংশের তাবৎ মানুষই মথুরা পরিত্যাগ করে যায় নাই। এই সমাজের কিছু মানুষ পরবর্তী যুগেও মথুরায় বসবাস করত।

এই প্রসঙ্গে মহাভারতে বর্ণিত একটি তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বারকায় পরস্পর দ্বন্দ্বে বৃষ্ণিবংশ বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার পর পাণ্ডব বীর অর্জুন কিছু যাদব রমণীকে হস্তিনাপুরে নিয়ে আসেন। এরপর পাণ্ডবেরা 'বজ্র' নামে পরিচিত যাদববংশসম্ভূত শ্রীকৃষ্ণের এক বংশধরকে মথুরার রাজপদে অভিষিক্ত

করেছিলেন। মথুরার সন্নিকট থেকে 'বৃষ্ণি' বংশের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, যে-সব মুদ্রা ঐ অঞ্চলে খ্রীষ্টীয় প্রথম থেকে তৃতীয় শতক কালে প্রচলিত ছিল বলে ধার্য হয়েছে। এইসব তথ্য থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, শ্রীকৃষ্ণের নামের সঙ্গে সংযুক্ত বিশেষ অভিজাত ও মর্যাদাসম্পন্ন বলে গণ্য কিছু জনগোষ্ঠী মথুরা অঞ্চলে বসবাস করতেন, যাঁরা বৃষ্ণি নামেই পরিচিত ছিলেন।

আলেকজাণ্ডারের অনুগামী ও পরবর্তী কোন কোন গ্রীক লেখকের রচনায় মথুরায় বসবাসকারী অধিবাসীদের 'সৌরসেনয়' বলে অভিহিত করা হয়েছে।[২৫] সৌরসেনয় (Sourasenai) বলতে যাদের বোঝানো হয়েছে তারা পুরাণবর্ণিত যাদববংশসম্ভূত গোষ্ঠীপতি শূরসেনের বংশধর এবং সাত্বত-বৃষ্ণিদের সঙ্গে অভিন্ন বলেই গণ্য। গ্রীক লেখকদের মতে সৌরসেনয়রা হেরাক্লিস নামে দেবতার উপাসক ছিলেন। পণ্ডিতগণের মতে বাসুদেব-কৃষ্ণকেই গ্রীকরা হেরাক্লিস বলে বর্ণনা করেছেন। রাজস্থানের ইতিহাস রচয়িতা কর্নেল টড হেরাক্লিস শব্দ ভারতীয় 'হরিকুলেশ' শব্দেরই গ্রীক প্রতিরূপায়ণ বলে বর্ণনা করেছিলেন। মহাভারত গ্রন্থের খিল বলে প্রচলিত হরিবংশ পুরাণে বাসুদেব-কৃষ্ণকে হরি এই আখ্যায় অভিহিত করে যে বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই বংশকে মূলত হরিবংশ বলে অভিহিত করা হয়েছে ; এই সূত্রে ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণের স্বয়ং হরিবংশের প্রধান হিসেবে হরিকুলেশ নামে পরিচিত থাকা তেমন অসম্ভব ছিল না।

শূরসেনবংশোদ্ভূত সাত্বত-বৃষ্ণি পরিবারে দেবতারূপে স্বীকৃত সংকর্ষণ-বাসুদেব এবং সেইসঙ্গে বাসুদেবের পুত্র ও পৌত্রের প্রতিষ্ঠা ও অর্চনা এই সাত্বত-বৃষ্ণিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এই তথ্য এইসব প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলেও ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণের একক সর্বদেবাগ্রগণ্য বলে পূজার প্রচলন সাত্বত-বৃষ্ণিদের মধ্যে পঞ্চবীর পূজার সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত ছিল এবং তাদের মধ্যেই আলাদা করে বাসুদেব-কৃষ্ণের পূজারও উদ্ভব হয়েছিল, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। বৃষ্ণি পরিচয়ের পঞ্চবীরদের মধ্যে বাসুদেবের একক প্রাধান্যের কোন ইঙ্গিত নাই ; তিনি অন্যান্য প্রধানরূপে গণ্য বংশবীরদের সঙ্গে বা উল্লেখযোগ্য পিতৃপুরুষ সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব এবং অনিরুদ্ধের সঙ্গে একই পর্যায়ে গণ্য হয়েছেন। কিন্তু হেলিয়োডোরের একান্ত আরাধ্য, দেবদেব নামে অভিহিত প্রতিদ্বন্দ্বিরহিত বাসুদেব বৃষ্ণিপরিবারের পূর্বপুরুষ বা বৃষ্ণিবীর হিসেবে এই বিশিষ্ট মর্যাদায়

অধিষ্ঠিত হননি। তাঁর এই অনন্যত্বের উদ্ভব ও বিস্তৃতি অন্য কোন সূত্র থেকেই ঘটেছিল এবিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। মথুরাতে যখন কিছু সাত্বত-বৃষ্ণি (গ্রীকদের বর্ণিত সৌরসেনয়) পঞ্চবীরের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা ও পূজা করছিলেন, তখনই বা তার বহুপূর্ব থেকেই ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণের এককভাবে 'দেবদেব' ও অনন্য উপাস্য হিসেবে পূজার প্রচলন হয়েছিল। এককভাবে বাসুদেব-কৃষ্ণের বৈদিক বিষ্ণু এবং ব্রাহ্মণ্য চিন্তার নারায়ণের সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলে গণ্য হওয়ার মধ্যেই এই বাসুদেব-কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বিহীন দেবদেব পরিচয়ে অধিষ্ঠিত হওয়ার সূত্র নিহিত ছিল। কিঞ্চিৎ প্রয়াস করলে এই অপরিজ্ঞাত সূত্রের রহস্য উদ্ঘাটন করা খুব দুষ্কর নয়।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকেই বাসুদেব সর্বপ্রথম নারায়ণ এবং বিষ্ণুর সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলে গণ্য হয়েছিলেন। সেই গ্রন্থে উল্লিখিত নারায়ণ-বাসুদেব-বিষ্ণুর গায়ত্রী মন্ত্র থেকে এ তথ্য স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যায়।

ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বিহীন দৈবী সত্তার পরিচয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেই প্রথম একান্তভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতসংস্কৃতিমন্থনজাত সমস্ত সত্তার নির্যাসরূপে পরিগণিত এই গীতা গ্রন্থেই বাসুদেব-কৃষ্ণকে অনন্য সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নাই। এই গ্রন্থেই ভগবানের মুখে উক্ত হয়েছে :

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

বা

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াঽন্বিতাঃ
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥

এই ধরনের বহু তথ্য ভগবদ্গীতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বাসুদেব-কৃষ্ণের পূর্ণ-ব্রহ্মত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রমাণরূপে দেখানো যেতে পারে। গীতা গ্রন্থের 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি' এই উপলব্ধিরই প্রতিফলন হেলিয়োডোরের গরুড়স্তম্ভের দেবদেব নামে বাসুদেবের পরিচয়ে। এছাড়া হেলিয়োডোর তাঁর স্তম্ভগাত্রে যে উদ্ধৃতি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন সেই উক্তিটিকে সমগ্র ভারতসংস্কৃতির প্রজ্ঞাভূয়িষ্ঠ শিক্ষার

সূত্র বলে অভিহিত করা যেতে পারে, এবং সেই উক্তিটি মহাগ্রন্থ মহাভারত থেকেই গৃহীত হয়েছিল। দম-ত্যাগ-অপ্রমাদ এই আদর্শ বৈষ্ণব ধর্মের মূল নির্দেশ বলে গণ্য করে, যে গীতা মহাভারতেরই অংশ সেই গ্রন্থকেই বাসুদেব সাধনার মূল উৎস বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই গ্রন্থে বাসুদেব-কৃষ্ণকে 'সর্বদেবময় হরি' এই আখ্যায় পরমব্রহ্মস্বরূপ প্রত্যক্ষ ভগবানরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তাঁর এই ভগবৎসত্তা 'বিশ্বরূপদর্শনযোগ' পর্যায়ে তিনি পাণ্ডব-বীর অর্জুনের নিকট অভিব্যক্ত করেছিলেন এবং তাঁর প্রসাদক্রমে সঞ্জয়ও সেই রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং কুরুসম্রাট ধৃতরাষ্ট্র বাসুদেবের এই 'বিশ্বরূপ' প্রকাশের কাহিনী সঞ্জয়ের নিকট শুনেছিলেন। ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণের এই ব্রহ্মস্বরূপত্ব, পাণ্ডবপক্ষে যেমন অর্জুন কর্তৃক প্রচারলাভ করেছিল, কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্রের দ্বারা সেই তথ্য প্রতিদ্বন্দ্বী কুরুপক্ষেও নিশ্চয়ই শ্রুত হয়েছিল।

প্রত্যাসন্ন মহাবিপর্যয়ের মুখে ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণের দ্বারা সমগ্র উপনিষদীয় জ্ঞানের প্রকাশ যেমন এই গীতার মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল, সমগ্র মহাভারত গ্রন্থের এখানে সেখানে বিচ্ছিন্নভাবে বাসুদেব-কৃষ্ণের দৈবী সত্তার মূর্ত অভি-ব্যক্তিও তেমনি প্রকাশ করা হয়েছিল দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে অবশ্য লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে ভগবান বাসুদেব যে 'বিশ্বরূপ' প্রদর্শন করেছিলেন সেই বিশ্বরূপ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহভাজন শিষ্য এবং সখা অর্জুন এবং সঞ্জয় ভিন্ন অন্য কোন মানুষের দ্বারা পরিদৃষ্ট হয়নি। এই বিশ্বরূপ প্রদর্শন ছাড়া তাঁর আর যে-সব অলৌকি-কত্বের প্রকাশ ঘটেছিল সেইসব অলৌকিকত্ব তাঁর একান্ত অন্তরঙ্গ পাণ্ডব-কৌরব পরিবারের গণ্ডির বাইরে বড় কেউ প্রত্যক্ষ করেনি।

ভারত এবং ভারতের বাইরে বিস্তৃত জনসমাজে ভগবান বুদ্ধ লোকোত্তর ভগবৎসত্তার আধার বলে গণ্য হয়েছেন। নির্বাণলাভ করবার জন্য তাঁর দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন হয়েছিল; নির্বাণলাভের পর তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের ভিক্ষু এবং উপদেশপ্রার্থী অসংখ্য রাজপুরুষ এবং সাধারণ মানুষের সামনে তাঁর জ্ঞান ও উপলব্ধিনির্ভর নির্দেশাবলী প্রচার করেছিলেন। পালি সাহিত্যে বর্ণিত আছে যে নিজের অলৌকিক ক্ষমতার তিনি বহুবার প্রকাশ করেছিলেন। এইসব তথ্যের উপরেই ভগবান বুদ্ধের ধর্মের প্রসারলাভ ঘটে। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের প্রবর্তনকারীদের ধর্মপ্রচারের ধারাও প্রায় একই প্রকার।

মহাভারতের কাহিনীতে বর্ণিত বাসুদেব-কৃষ্ণকে আশ্রয় করে ভাগবত সাধনা বা বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব ও প্রচার ঘটে থাকলেও ভগবান বাসুদেবের দ্বারা অনুরূপ অলৌকিকত্ব প্রকাশের সাহায্যে ভাগবত ধর্মের প্রচার ঘটে নাই। বিপুল মর্যাদাসম্পন্ন তাঁর ব্যক্তিত্ব, জীবনকালে তাঁকে সাধারণের সঙ্গে তেমন কোন যোগাযোগে আসবার সুযোগ দিয়েছিল বলে জানা যায় না। বৌদ্ধ ধর্মের (এবং জৈন ধর্মের) প্রচারকাহিনী যে-সব সাহিত্যগ্রন্থে বর্ণিত আছে সেইসব কাহিনীতে জীবনকালেই এইসব ধর্মপ্রচারকদের সাধারণ্যে স্বীকৃতির সাক্ষ্য পাওয়া যায়। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ অনুরূপভাবে সাধারণ সমাজে ভাগবত ধর্মের প্রবক্তা বা প্রচারক বলে কখনও বর্ণিত হননি। তাঁর নিজস্ব সাত্বত-বৃষ্ণি সমাজেও ভগবান কৃষ্ণ-বাসুদেবকে যে এককভাবে পূর্ণদেবত্বে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল সে-কথা উপলব্ধি করা যায় না।

বরং বৃষ্ণিরা নাকি তাঁকে তেমন স্বীকৃতি বা মর্যাদা দিত না বলেই প্রচলিত আছে। বৃষ্ণিরা যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারে নাই সেইজন্য ভাগবত পুরাণে তাদের একান্ত দুর্ভাগ্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই কারণেই মনে হয় বৃষ্ণিদের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের জীবনকালে তাঁর কোন প্রতিষ্ঠা স্বীকৃত হয় নাই। পরে শূরসেন নামে পরিচিত সাত্বত অধিপতির নামের সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের নামের ঘনিষ্ঠতর যোগ লক্ষিত হয়। গ্রীকরা লক্ষ্য করেছিলেন যে মথুরা ও ক্লাইসবোরার (কৃষ্ণপুর ?) সৌরসেনয়রা হেরাক্লিস বা বাসুদেব-কৃষ্ণের উপাসনা করত। পরবর্তী যুগে যখন কৃষ্ণ-বাসুদেব সাধনা সাত্বত পঞ্চরাত্র সাধনা নামে বিশেষ বিস্তৃতিলাভ করেছিল তখন এই সাধনার সঙ্গে 'সাত্বত' নামটিরই গোষ্ঠী-যোগ পরিদৃষ্ট হয়। এই যোগাযোগের কারণ ও পরিপ্রেক্ষিত পরে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে।

মহাভারতে বর্ণিত, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জড়িত যে-সব ঘটনার উল্লেখ আছে সেই-সব ঘটনার সঙ্গে সাত্বত-বৃষ্ণি বংশের যোগাযোগের কোন বিস্তৃত বর্ণনা নাই। বৈষ্ণবীয় পুরাণ গ্রন্থগুলিতে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, যেমন স্যমন্তকমণি সম্পর্কিত কাহিনী, পারিজাত হরণ, রুক্মী হরণ, বাণাসুর, পৌণ্ড্রক ইত্যাদি ঘটিত কাহিনী এবং মুনিগণের অভিশাপে যদুবংশ ধ্বংসের বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। এইসব বর্ণনার কোথাও প্রত্যক্ষভাবে বৃষ্ণিরা যে শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেবকে তাঁর জীবনকালে পূর্ণ ভগবান সত্তা বলে উপলব্ধি

করেছিল তেমন উল্লেখ নাই। তবে সংকর্ষণ-বলরাম এবং কৃষ্ণ-বাসুদেব যে বৃষ্ণি সাত্বতদের অগ্রণী নায়ক, এ স্বীকৃতি তাদের ছিল; এবং এই সূত্রেই শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন ও সাম্ব এবং পৌত্র অনিরুদ্ধ তাদের মধ্যে মরণোত্তরকালে পূর্বপুরুষ হিসেবে দেবত্বে বৃত হয়েছিলেন। মথুরায় এই সাত্বত-বৃষ্ণিদের অবস্থান ছিল, এবং প্রত্নতাত্ত্বিকসূত্রে এপর্যন্ত এই মথুরা থেকেই বৃষ্ণি বংশের পঞ্চবীরের প্রতিমার অস্তিত্বের প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে, অন্য কোথাও থেকে তা পাওয়া যায়নি। সাত্বত-বৃষ্ণি সমাজের বাইরে এই পঞ্চবীরের উপাসনার কোন প্রচলন হয়েছিল বলে কোন তথ্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

সংকর্ষণ-বাসুদেব উপাসনার সঙ্গে নাগজাতির ভূমিকা

এর পরেই উল্লেখ করা যেতে পারে সংকর্ষণ-বাসুদেবের উপাসনার কথা, যার উল্লেখ পাণিনি ও পতঞ্জলির রচনায় আছে। এ ছাড়া প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রে চিতোরের সন্নিকটবর্তী ঘোষুণ্ডিতে আবিষ্কৃত সর্বতাতের লেখ এবং নানাঘাটের রাজ্ঞী নাগমূণিকার লিপি থেকেও দুই ভাই সংকর্ষণ-বাসুদেবের দেবত্বের স্বীকৃতির সম্বন্ধে জানতে পারা যায়। এইসব উপকরণের কোথাও সাত্বত-বৃষ্ণি গোষ্ঠীর কোন উল্লেখ কিংবা যোগসূত্র নাই।

এই প্রসঙ্গে বৈষ্ণবীয় পুরাণসমূহে বর্ণিত কালিয়দমন কাহিনীর উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কালিয়দমন শ্রীকৃষ্ণের শৈশবজীবনে বৃন্দাবনবাসকালীন লীলাসমূহের মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অলৌকিক ঘটনা। গোপসমাজ গোকুল পরিত্যাগ করে বৃন্দাবনে যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল তারই কিছু উত্তরে ছিল যমুনা নদীর দ্বারা সৃষ্ট এক মহাহ্রদ। এই হ্রদের উপকূলভাগে কালিয় নামে এক সর্পরাজের আধিপত্য ছিল এবং এই হ্রদের জলকে সেই সর্পরাজ অন্য কাকেও ব্যবহার করতে দিত না। নূতন বাসস্থাপনকারী গোপেদের ছিল সংখ্যাহীন ধেনু যারা যথেচ্ছ বিচরণ করত এবং সর্বত্র তৃণশস্য খেয়ে নিত। নাগরাজের অধিকৃত অঞ্চলে এই অনুপ্রবেশের ফলেই হয়ত নাগরাজের অনুচরেরা গোপসমাজের ধেনু নষ্ট করত। শিশু কৃষ্ণ নাগরাজের এই অত্যাচারের প্রতিবিধান করবার জন্য সেই হ্রদে ঝাঁপ দিয়ে জলক্রীড়া আরম্ভ করলে নাগরাজ কালিয় সরোষে শিশু কৃষ্ণকে সমুচিত শিক্ষা দিতে আসেন। শিশু কৃষ্ণকে দৈত্যস্বরূপ নাগের দ্বারা

আক্রান্ত দেখে পিতা নন্দ, মাতা যশোদা প্রমুখ গোপ-গোপীগণ মহা আর্তনাদ করতে শুরু করে। ভ্রাতা সংকর্ষণের কিন্তু অন্য গোপদের মতো ত্রাসের পরিবর্তে প্রভূত ক্রোধেরই সঞ্চার হয়। তিনি এবং কৃষ্ণ তো একই সত্তা এবং একই ভাব। কৃষ্ণকে সংকর্ষণ সেই কথা স্মরণ করিয়ে সর্পরাজের দর্পচূর্ণ করবার জন্য উৎসাহিত করলেন।

একভাবশরীরস্তু একদেহ দ্বিধাকৃতঃ
সংকর্ষণস্তু সংক্রুদ্ধো বভাষে কৃষ্ণমব্যয়ম্ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো গোপানাং নন্দিবর্ধনঃ
দম্যতামেব বৈ ক্ষিপ্রং সর্পরাজো বিষায়ুধঃ ॥
ইমে নো বান্ধবাস্তাত ত্বাং মত্বা মানুষং বিভো
পরিবেদন্তি করুণং সর্বে মানুষবুদ্ধয়ে ॥ (হরিবংশ ১২।২৯-৩১)

এরা (অর্থাৎ গোপগণ) তোমাকে মানুষ ভেবে সেই মানুষবুদ্ধি থেকেই বিলাপ করছে। কিন্তু তুমি তো তা নও। দুই দেহে আবির্ভূত একই ভাব ও উভয়ের একত্ব সম্পর্কে পরিজ্ঞাত সংকর্ষণ যে কৃষ্ণকে তাঁর নিজস্ব সত্তা স্মরণ করে সর্পরাজকে দমন করতে বলছেন, হরিবংশের এই বিবরণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। জ্যেষ্ঠ সংকর্ষণের দ্বারা উৎসাহিত শিশু কৃষ্ণ অবহেলাভরে নাগরাজের ফণার উপর আসীন হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। মৃত্যযন্ত্রণায় কাতর নাগরাজের পত্নীরা কালিয়ের প্রাণভিক্ষা দেওয়ার জন্য সকাতর অনুনয় করতে থাকলে সেই হ্রদের সীমানা ত্যাগ করবার স্বীকৃতি দিয়ে নাগরাজ কালিয় মুক্তিলাভ করল।

বিভিন্ন পণ্ডিত এই কাহিনীর নানা ব্যাখ্যা করেছেন। সেইসব ব্যাখ্যার মধ্যে আর্য-অনার্য তত্ত্ব সম্পর্কে দৃঢ়মনস্ক অনেক পণ্ডিত এখানে আর্যসমাজের প্রতীক শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অনার্য নাগসমাজের উপর আধিপত্য বিস্তারের ইঙ্গিত প্রত্যক্ষ করেছেন। এই কাহিনীতে অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণ-পূজার নিকট নাগপূজার পরাভবের ইঙ্গিত আছে বলে অনুমান করেছিলেন।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তের পেছনে যুক্তি থাকলেও কিভাবে এই বিবর্তন ঘটেছিল তার ব্যাখ্যা তিনি দেন নাই। ইতিপূর্বে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে নাগ-উপাসনা হরপ্পা সভ্যতা নামে পরিচিত তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতা থেকেই প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদে অহি নামে অভিহিত দানবরাজ বৃত্রকে দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান বিষ্ণুর সহায়তায় দমন করেছিলেন। এই কালিয়দমন কাহিনীতেই জ্যেষ্ঠ

সংকর্ষণের সঙ্গে কৃষ্ণের অভিন্নতা সূত্রে কৃষ্ণকে তার মানুষী অস্তিত্বের অতীত স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন করিয়ে দেওয়ার যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে তারই মধ্যে নাগসমাজে সংকর্ষণ-বাসুদেবের যৌথভাবে দেবত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণ নিহিত ছিল বলে মনে করা অযৌক্তিক নয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে নাগপূজক গোষ্ঠীভুক্ত অধিবাসীদের বসবাস ছিল। এইসমস্ত নাগপূজকেরা নিজেরাও নাগ নামে অভিহিত হতেন। প্রাচীন ইতিবৃত্ত কাহিনীতে মহাভারত এবং পুরাণে যেমন নাগদের বিবরণ পাওয়া যায়, ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ও নাগ নামে পরিচিত মনুষ্যগোষ্ঠীর প্রাধান্য অর্জন এবং রাজ্যপ্রতিষ্ঠা ও শাসনাধিকারের নানা তথ্য আছে। মথুরা অঞ্চলে সাত্বত বংশীয় শূরসেনরা প্রাধান্যলাভ করে থাকলেও মথুরার সান্নিধ্যে নাগ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল। মথুরা অঞ্চলে নাগফণাযুক্ত অনেক প্রাচীন মূর্তির অস্তিত্বে হয়ত তারই প্রমাণ নিহিত আছে।

কালিয় নাগের উপাখ্যানকে এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে কাহিনীর অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা অসম্ভব নয়। বৃন্দাবন সন্নিকটবর্তী একটি অঞ্চলে নাগদের উপনিবেশ ছিল এবং প্রবল প্রতাপান্বিত কালিয় সেই নাগ সম্প্রদায়ের অধিপতি ছিলেন। এই নাগ সম্প্রদায় শকটচারী অর্থাৎ যাযাবর গোপজাতির উপনিবেশ স্থাপন ও এই গোপ ঔপনিবেশিকদের সংখ্যাতীত গো-বৃষ বৎসের স্বচ্ছন্দ বিচরণ ও সম্ভাবিত শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট করা প্রীতির চক্ষে দেখে নাই। এই নিয়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে শক্তিমদমত্ত কালিয় শিশু কৃষ্ণের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত হয় এবং নাগ সম্প্রদায় সংকর্ষণ এবং কৃষ্ণকে তাদের উপাস্য অনন্ত এবং বাসুকীর অবতার বলে গ্রহণ করে। রোহিণীনন্দন সংকর্ষণ এবং দেবকীপুত্র কৃষ্ণ-বাসুদেব এইভাবেই নাগসম্প্রদায়ের নিকট পরম দৈবত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং যৌথভাবে যেখানে এই সংকর্ষণ-বাসুদেবের উপাসনার উল্লেখ আছে তার পেছনে নাগ সম্প্রদায় কর্তৃক তাদের অবতাররূপে স্বীকৃতিই ক্রিয়াশীল ছিল বলে গণ্য করা অযৌক্তিক নয়।

কিন্তু বিদিশায় আবিষ্কৃত হেলিয়োডোরের লেখতে যে দেবদেব বাসুদেবের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং মথুরায় আবিষ্কৃত মহাক্ষত্রপ সোদাসের আমলের অন্যতম শিলালিপিতে যে বাসুদেবের উল্লেখ দেখা যায়, একক পরমোপাস্য দেবদেব সেই বাসুদেবের সঙ্গে বৃষ্ণিবীরের তালিকার বাসুদেব বা নাগসম্পর্কযুক্ত সংকর্ষণসহ বাসুদেবের কোন যোগ নাই। এই ভগবান বাসুদেবকে একান্তই মহাভারতে

প্রতিষ্ঠাপিত সর্বদেবময় ব্রহ্মস্বরূপ বলেই গ্রহণ করা যেতে পারে। এই বাসুদেবের অনুরাগী হেলিয়োডোর যে স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন সেটিকে বলা হয়েছে গরুড়-ধ্বজ। সেই গরুড়ধ্বজ লাঞ্ছনসূত্রে এই বাসুদেবকে বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন বলেই গণ্য করা হয়েছে উপলব্ধি করা যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি তত্ত্বকথার অবতারণা করা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ভগবান বাসুদেব বিষ্ণুর অবতার বলেই অভিহিত হয়েছেন দেখা যায়। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনায় কিভাবে অবতারদের উদ্ভব ও বিবর্তন ঘটেছিল সে-সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২৭] বিভিন্ন পুরাণে এবং পঞ্চরাত্র পরিকল্পনা উদ্ভূত 'বিভব' চেতনায় ভগবান বিষ্ণুর ভিন্ন ভিন্ন অবতারের উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় প্রজাপতির মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি বিভিন্ন রূপধারণের বর্ণনা আছে। পরে মহাভারতে, পুরাণে এবং অন্যান্য গ্রন্থে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ও ভৃগুরাম, দাশরথি রাম, সাত্বত রাম প্রভৃতি ভগবান বিষ্ণুরই অবতাররূপে বর্ণিত হয়েছেন। মহাভারতে বিভিন্ন অবতারের নাম থাকলেও ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণকে কোথাও অবতার হিসেবে উল্লেখ করা হয় নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জ্ঞানযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য হিসেবে উল্লিখিত কিছু তথ্যকে এই অবতারচিন্তার ভিত্তি বলে গণ্য করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে ভগবানের উক্তি :

> ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্
> বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ —এই বাক্য

অর্জুনের মনে গভীর বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। অর্জুন উল্টে প্রশ্ন করেছিলেন :

> অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ
> কথমেতদ্‌বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥

শ্রীভগবান এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন :

> বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন
> তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥

—হে অর্জুন তোমার এবং আমার বহুবার জন্ম হয়েছে। আমি সে সবই (অতীত জন্মের কথা) জানি, কিন্তু তুমি তা জান না।

> অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন
> প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

আমি জন্মরহিত, আমার জ্ঞান কখনও লুপ্ত হয় না, সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও (ইচ্ছামতো) আমার যে (ত্রিগুণাত্মক) প্রকৃতি তা অবলম্বন করে স্বীয় মায়ার দ্বারা অবতীর্ণ হই। এই ধারণার ভিত্তিতেই তাঁর এই আবির্ভাবকে মায়া শরীর বলা চলে। পুরাণে বারংবারই এইজন্য শ্রীকৃষ্ণকে 'মায়ামানব' বলে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন :

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ

মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ (৭।২৫)

যোগমায়া সমাবৃত আমি সকলের নিকট প্রকাশ হই না অর্থাৎ সকলে আমার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে যারা মোহগ্রস্ত (মূঢ়) তারা আমার জন্মরহিত ও অব্যয় (স্বরূপ) চিনতে পারে না। গীতার এই সূত্র অবলম্বন করেই বলা যেতে পারে যে বাসুদেব যে ভগবানই স্বয়ং মায়াদেহে অবতীর্ণ এ বোধ অন্যদের তো দূরে থাকুক যিনি নিজেকে ভগবান বাসুদেবের শিষ্য এবং সখা বলে গণ্য করতেন সেই পাণ্ডববীর অর্জুনেরও ছিল না (ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ —গীতা ৪।৩)। কালের গতিনির্ধারক প্রত্যাসন্ন মহাসমরে অর্জুনকে স্বকর্তব্যে প্রবৃত্ত করবার প্রয়োজনে ভগবান তাঁর অলৌকিকত্ব প্রদর্শন করেন এবং সেই বিশ্বরূপদর্শনে মহাশক্তিধর অর্জুন প্রবল ভীতিব্যাকুল চিত্তে ভগবানকে সেই রূপ সংহরণ করে সহজ পরিচিত রূপে আত্মপ্রকাশ করতে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন :

অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে

তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ গীতা—১১।৪৫

এর পরেই বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন ভগবান বাসুদেবের প্রকৃতপরিচয় পরিজ্ঞাত হয়ে তাঁকে 'দেবেশ জগন্নিবাস' আখ্যায় অভিহিত করেছিলেন। এই মহাযুদ্ধের পরে পাণ্ডবদের সংসারত্যাগের পূর্বে অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎ চক্রবর্তিত্বের অধিকারী পুরু-ভরত সিংহাসনে উপবেশন করেন। ভগবান বাসুদেব তাঁর তুলনাহীন 'বিশ্বরূপ' একমাত্র অর্জুনকেই অনুগ্রহ করে দেখিয়েছিলেন এবং স্বভাবতই অনুমান করা যেতে পারে যে অর্জুন কর্তৃক আলব্ধ বাসুদেবের প্রকৃতরূপের সম্বন্ধে একমাত্র উত্তরাধিকারী পরীক্ষিৎকে অর্জুনই সেই লোকোত্তর পরিচয় প্রদান করে গিয়েছিলেন। সেই থেকে ভগবান কৃষ্ণ-বাসুদেবের লোকোত্তর পরিচয় সম্বন্ধ ঐশ্বর্য সেই পুরু-ভরত বংশাবতংস পরীক্ষিৎ বংশেরই উত্তরাধিকাররূপে

পরিগণিত হয়েছিল। এই পুরু-ভরত বংশে বিষ্ণুই কুলদেবতারূপে গণ্য হয়ে আসছিলেন। মনু, পুরুরবা, যযাতি, ভরত ইত্যাদি কুলপ্রধানদের পরে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের অবসানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সাহায্য ও আনুকূল্যে পাণ্ডবরা সিংহাসন পুনরধিকার করলেন এবং পাণ্ডবেরাই বিষ্ণু-কৃষ্ণকে এক ও অভিন্ন উপলব্ধি করে বাসুদেব-বিষ্ণুরূপী পরম দেবতাকে কুলদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত করে-ছিলেন এমন অনুমান করা কিছুমাত্র অযৌক্তিক মনে হয় না।

রাজা পুরু ও পুরুর রাজকীয় ধ্বজে বিষ্ণু-কৃষ্ণ প্রতীক

এই প্রসঙ্গের সমর্থনে একটি তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। তথ্যটি অবশ্য বহুকাল পরের কিন্তু তার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। গ্রীক বীর আলেক-জাণ্ডারের ভারত অভিযান পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসের একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। তাঁর এই ভারত অভিযান অবলম্বনে বহু গ্রীক লেখক নানা বিবরণ রচনা করেছিলেন। এইসব বিবরণে উল্লেখ আছে যে এই অভিযানে আলেকজাণ্ডার উত্তর-পশ্চিমের পথে ভারতে প্রবেশ করলে তক্ষশিলার অধিপতি 'অম্ফিস' আলেকজাণ্ডারের আনুগত্য স্বীকার করে তাঁকে তক্ষশিলা রাজ্য অতিক্রম করে আরও পূর্বদিকে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সহায়তা করেছিলেন। আলেকজাণ্ডার পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে হাইডাসপিস নদীর তীরে এক প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। এই প্রতিরোধের নায়ক ছিলেন 'পোরাস' নামে একজন রাজা। যে-সমস্ত গ্রীকরচনার ইংরেজি অনুবাদ প্রচলিত আছে তাতে আলেকজাণ্ডারের নিকট পোরাসের পরাজয় এবং বন্দী পোরাসের আলেকজাণ্ডারের নিকট উপস্থিতির বিবরণ আছে। আলেকজাণ্ডার পোরাসকে তাঁর নিকট কিরূপ ব্যবহার আশা করেন জিজ্ঞাসা করায় পোরাস উত্তর করে-ছিলেন 'রাজার মতো'। এই বীরত্বব্যঞ্জক উত্তরে প্রীত হয়ে আলেকজাণ্ডার পোরাসের মুক্তিবিধান করেন ও তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।[২৮] গ্রীক লেখকদের এইসব বিবরণের উপর নির্ভর করে প্রাচীন ভারতের প্রথম সামগ্রিক ইতিহাস 'Early History of India' পুস্তকের রচয়িতা, ভিন্সেন্ট স্মিথ (Vincent Smith) আলেকজাণ্ডারের প্রতিরোধকারী গ্রীকদের দ্বারা যাকে পোরাস (Porus) নামে অভিহিত করা হয়েছে সেই ভারতীয় রাজপুরুষকে তাঁর রচিত ইতিহাসে ভারতের কোন একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর 'রাজা পুরু' ন্যায়

অভিহিত করেছেন। স্মিথ একথাও অবশ্য বলেছেন যে, পুরু নামধেয় এই রাজা হয়ত সুপ্রাচীন পুরুবংশেরই কোন শাখার অধিপতি ছিলেন। যে যুগ থেকে ভারতের ইতিহাস রচনায় পারম্পর্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে ভগবান বুদ্ধের কাল থেকেই বর্তমানে ইতিহাসগ্রাহ্য বলে গণ্য হচ্ছে। ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক কালে মগধ, কোশল, বৎস ও অবন্তী রাজ্যের বিশেষ খ্যাতি ছিল এবং বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীতে এই চারটি রাজ্যের, ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক অধিপতিরূপে অজাতশত্রু, প্রসেনজিৎ, উদয়ন ও প্রদ্যোতের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আশ্রিত পুরাণগ্রন্থগুলির কয়েকটিতে প্রাচীন-কালের রাজন্য পরম্পরার যে তালিকা আছে সেগুলিতেও সিদ্ধার্থ নামে বুদ্ধের এবং মগধের অজাতশত্রু, কোশলের প্রসেনজিৎ এবং কৌশাম্বীর উদয়নের নাম পাওয়া যায়। ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের আনুমানিক দুইশত বৎসর পরে, ৩২৬ খ্রীস্টপূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার ভারতে প্রবেশ করেছিলেন।[২৯] ভিন্সেণ্ট স্মিথ বিস্তৃতভাবে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে পুরুর বাহিনীর রাবি নদীর তীরে প্রচণ্ড সংগ্রামের বিবরণ ও পুরুর বন্দী হওয়া ও মুক্তিলাভের কাহিনীর বর্ণনা করেছেন।

আলেকজাণ্ডারের অভিযানের বিবরণ অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, মেসিডোনিয়া থেকে বিপুল গ্রীক বাহিনী মিসর, সিরিয়া ও পারস্যের তিনটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিপতিদের পরাজিত ও নিহত করে দুর্বার গতিতে ভারতে প্রবেশ করেছিল। পথে অম্ফিসের (সম্ভবত অম্ভী নামে পরিচিত) মতো ক্ষুদ্র শক্তিধর রাজন্য বশ্যতা স্বীকার করলে তাদের তেমন ক্ষতি করা হত না। কিন্তু প্রতিরোধকারীর দুঃসাহসকে আলেকজাণ্ডার কখনই মার্জনা করেননি, তুলনাহীন নৃশংসতার সঙ্গে তিনি সমস্ত প্রতিরোধকারীকে নিহত করেছেন, নিশ্চিহ্ন করেছেন। সেইসঙ্গে আরও লক্ষণীয় যে আলেকজাণ্ডার প্রত্যেক পরাজিত এবং বশ্যতা-স্বীকারকারীর রাজধানীতে বিজেতার দর্প নিয়ে প্রবেশ করেছেন, এবং সেই রাজধানীর রাজপ্রাসাদে সমবেত অভিজাতদের সম্মুখে নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে তাঁর বিজয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। আলেকজাণ্ডারের অভিযানের এই প্রেক্ষাপটে, তিনি কি কারণে তাঁর সর্বক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত আচরণ অনুসরণে বিরত থেকে ভারতের ঐ দুঃসাহসী রাজা পুরুর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেছিলেন এবং কি কারণে তিনি পরাজিত পুরুর রাজধানীতে প্রবেশ এবং

অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতীকী রাজসভার অনুষ্ঠানে বিরত হয়েছিলেন, সে প্রশ্ন কোন প্রামাণ্য ভারতীয় ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আলেকজাণ্ডারের প্রবল বিক্রম ও বিধ্বংসী বিজয় অভিযানের সংবাদ ভারতে কিছু অজানা ছিল না, এবং এই সংবাদনির্ভর ভীতির ফলেই তক্ষশিলার রাজা অম্ভী আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। এই সংবাদ নিশ্চিতভাবেই রাজা পুরুরও অজ্ঞাত ছিল না। গ্রীকদের রচনা থেকেই জানা যায় যে তারাও পূর্বভারতের Agrames বা Xandrames নামে এক রাজার অমিতবিক্রম ও বিপুল সৈন্যবাহিনীর সংবাদ পরিজ্ঞাত ছিলেন। এবং সেই অঞ্চল থেকেই Sandracottas নামে একজন দুঃসাহসী যুবক আলেকজাণ্ডারের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে তার সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। এই পূর্বদেশীয় শক্তিমান রাজপুরুষকে পাটলিপুত্রের উগ্রসেন ও ভাগ্যান্বেষী যুবককে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত নামে পরিচিত করা হয়েছে। পুরাণের সাক্ষ্যমতে ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন হস্তিনাপুরের কুরুবংশীয় রাজা নীচক্ষুর বংশধর ছিলেন। পুরাণে উল্লেখ আছে যে গঙ্গানদীর ভাঙনে হস্তিনাপুর ধ্বংস হলে নীচক্ষু কৌশাম্বীতে রাজপাট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নীচক্ষু কুরুবংশীয় রাজা হলেও কৌশাম্বী কিন্তু কুরুরাজ্য বলে পরিচয় পায় নাই। এই রাজ্য বৎসরাজ্য নামে পরিচয়লাভ করেছিল। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থসমূহে সেই অতীতকালে ভারতের ষোলটি রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় যেগুলি মহাজনপদ নামে অভিহিত হত। এই ষোড়শ মহাজনপদের তালিকায় যে নামটিকে প্রত্যেক তালিকায় প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে সেটি কুরুরাজ্য। পরীক্ষিতের অন্যতম বংশধর নীচক্ষু হস্তিনাপুর ত্যাগ করে কৌশাম্বীতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকলেও রাজ্য হিসেবে কুরুরাজ্যের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে নাই।

প্রাচীন সংস্কৃতিধারায় এই কুরুরাজ্যের একটি বিশেষ মর্যাদা ছিল। প্রাচীন পুরু-ভরতবংশের অন্যতম বংশধর 'বংশকার'রূপে পরিচিত সম্বরণ নামে এক রাজার কাহিনী ইতিপূর্বে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি সম্ভবত কিছুকালের জন্য স্বরাজ্যচ্যুত হয়ে পররাজ্যে আশ্রয়গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে ঋষি বসিষ্ঠের সহায়তায় স্বরাজ্য উদ্ধার করে তিনি প্রভূত যাগযজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। সম্বরণের পর হস্তিনাপুরে তাঁর পুত্র কুরু সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। এরপর থেকে হস্তিনাপুর রাজ্য 'কুরু'রাজ্য নামে অভিহিত হতে থাকে।

বস্তুত কুরুর বংশধর এবং কুরুরাজ্যের অধীশ্বরেরা সেই প্রাচীন পুরু-ভরত বংশেরই উত্তরাধিকারী এবং সেইসূত্রে চক্রবর্তিত্বের দাবিদার বলে গণ্য হতেন। এই বংশের দুই শাখা ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর সন্তানেরা যখন প্রকৃত উত্তরাধিকারিত্বের দাবিতে মহাসংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন, মহাভারত গ্রন্থের সাক্ষ্য বিশ্বাস করলে ধরে নিতে হয় যে সমগ্র ভারতভূমির তাবৎ রাজন্যবর্গ বিবদমান সেই দুই পক্ষের কোন একটির সমর্থনে নিজেকে জড়িত করেছিলেন। দূর দূর প্রান্ত থেকে বিবদমান শক্তি দু'টির সমর্থনে অর্থ, সামর্থ্য, সৈন্যবল এবং নিজ নিজ জীবন সংকট করে এই রাজন্যবর্গের কুরুক্ষেত্রের মহাসংগ্রামে যোগ দেওয়ার কি যুক্তি, প্রয়োজনীয়তা বা কারণ ছিল সে-সম্বন্ধে তেমন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। মহাভারত কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলে ধরে নিলেও যিনি এই কাহিনীর রচয়িতা তিনি নিশ্চয়ই কোন বিশেষ যুক্তিতেই সারাভারতের রাজন্যবর্গকে তাঁর বর্ণিত ভারতযুদ্ধের সামিল করেছিলেন। এই মহাসংযোগের একটিমাত্রই যুক্তি ছিল যাকে বলা যেতে পারে কুরুবংশের চক্রবর্তিত্বের দাবি।

বৃহৎ ভারতভূমি বহু প্রাচীনকাল থেকেই ছিল ভিন্ন ভিন্ন বহু রাজ্যে বিভক্ত; মূলত ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য এই রাজ্যগুলির নিজস্ব বিভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত করে থাকলেও জনগোষ্ঠীসমূহের মূল দৈহিক গঠন এবং ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের সংগঠন এই রাজ্যগুলির স্বতন্ত্রতার মূলে ক্রিয়াশীল ছিল। দেবপূজক যজ্ঞধর্মী আদিপিতারূপে স্বীকৃত মনুর সন্তানদের মধ্যে ইক্ষ্বাকু এবং ইলা-পুরুরবার অবতংস দু'টি মূল জনগোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিবৃত্ত বৈদিক সাহিত্য থেকে উপলব্ধি করা যায়। মনুর জ্যেষ্ঠ সন্তান জন্মসূত্রে কন্যা হলেও ইলার রাজনৈতিক স্বীকৃতি ছিল এবং ইলার সন্তান পুরুরবাকেই মনুর বংশধরদের মধ্যে প্রাধান্য ও আধিপত্য দেওয়া হয়েছিল। পুরুরবার বংশে দুর্বলতা আত্মপ্রকাশ করলে ইক্ষ্বাকু বংশের মান্ধাতা নিজেকে চক্রবর্তীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু ইক্ষ্বাকুবংশের চক্রবর্তিত্বের দাবি দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। অচিরকালের মধ্যেই পুরুরবা-যযাতি-পুরুবংশের সন্তান ভরত-দৌষ্মন্তি পুরুবংশের চক্রবর্তিত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই চক্রবর্তিত্বের দাবিই হস্তী-সম্বরণ-কুরুর সূত্রে নেমে এসেছিল কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের অবসানে অর্জুনপুত্র পরীক্ষিতে। পূর্বাঞ্চলের মগধরাজ জরাসন্ধ হস্তিনাপুরের ভরতবংশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, পুরাণে ও মহাভারতে তার উল্লেখ আছে। জরাসন্ধের এই দাবি

কার্যকর হয় নাই। কিন্তু মগধের এই উচ্চাভিলাষের প্রবহমানতা জরাসন্ধের ব্যর্থতায় লোপ পায়নি। কালের গতিতে বিম্বিসার-অজাতশত্রুর প্রয়াসে মগধের অভ্যুত্থানের যে সূচনা হয়েছিল, 'অখিলক্ষত্রান্তকারী' মহাপদ্মনন্দের দ্বারা সেই অভ্যুত্থান এক বিশেষ পরিণতিলাভ করে। পুরাণের বর্ণনামতে এই মগধরাজ মহাপদ্মনন্দ একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জন করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণের হিসেব মতে আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণকালে এই মহাপদ্মনন্দ, যিনি হয়ত উগ্রসেন নামেও পরিচিত ছিলেন, তিনিই মগধের অধীশ্বর ছিলেন। প্রবল শক্তিধর হিসেবে পরিচিত থাকলেও এই মগধরাজ ভারত সীমান্তে আলেকজাণ্ডারের অগ্রগতিকে বাধা দিতে অগ্রসর হন নাই। আলেকজাণ্ডারকে প্রতিরোধের জন্য যিনি দুর্দান্ত প্রয়াস করেছিলেন তাঁকেই গ্রীক ইতিহাসকারেরা 'পোরাস' নামে অভিহিত করেছেন এবং ভারতের ইতিহাস-রচয়িতারা সেই পোরাসকে প্রাচীন পুরুবংশের সন্তান বলেই অনুমান করেছেন।

এই পুরুবংশীয় নৃপতিরা ক্ষুদ্র কুরুরাজ্যের অধিপতি হলেও তাঁরা নিজেদের তাবৎ ভারত রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিরাজ চক্রবর্তী বলে গণ্য করতেন। এই অধিরাজত্বের দায়িত্ব স্বীকার করেই সম্ভবত রাজা পুরু প্রবল শক্তিধর দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারকে বাধাদানে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং নিশ্চিতভাবে আলেকজাণ্ডারের ভারত-অধিকারের প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ভারতের স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদার সংরক্ষণে তৎকালীন ভারতীয় রাজন্যবর্গের অন্য কারা তাঁদের দায়িত্বপালনে চক্রবর্তী রাজা পুরুর এই মহান্ প্রয়াসের সহায়তায় অগ্রসর হয়েছিলেন, গ্রীক বিবরণ থেকে তার কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না।

ভারতীয় ঐতিহাসিক চেতনা কিন্তু আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণ সম্পর্কে কোন সাক্ষ্যই রাখেনি। তবে নন্দরাজ মহাপদ্ম যে পুরুর সহায়তায় আপন শক্তি প্রয়োগ করেন নাই গ্রীক ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে তা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়। আর মহাপদ্মের 'সর্বক্ষত্রান্তক'রূপে পুরাণে উল্লিখিত হওয়ায় উপলব্ধি করা যায় যে তিনি ক্ষত্রিয় শাসনের অবসান ঘটিয়ে একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জন করেছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত আছে যে পরীক্ষিতের জন্মের পঞ্চশতোত্তর এক সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হলে নন্দরাজার অভিষেক ঘটেছিল (বিষ্ণু ৪।২৪ : ১০৪)। পুরাণের এই উক্তি থেকে মগধে নন্দরাজার আধিপত্যলাভ যে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে গণ্য হয়েছিল তারই পরিচয় পাওয়া যায়। আলেকজাণ্ডারের

প্রবল শক্তির যিনি প্রতিরোধ করেছিলেন সেই পুরুর সঙ্গে মগধরাজ নন্দের কোন সংঘর্ষের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। তবে নন্দের সর্বক্ষত্রান্তক আখ্যা এবং তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জনের যে বিবরণ পুরাণে আছে তা থেকে অনুমান করা সম্ভব যে পুরুরাজের একচ্ছত্র চক্রবর্তিত্বের স্বীকৃতি মহাপদ্ম কর্তৃকই উন্মূলিত হয়েছিল। এই বিশ্লেষণ থেকে এমন অভিমতে আসা কিছু অযৌক্তিক নয় যে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষে পুরুর সামরিক শক্তি বিশেষভাবে ব্যাহত হওয়ার ফলে উচ্চাভিলাষী মগধরাজের একচ্ছত্র প্রাধান্য অর্জনের প্রয়াসকে পুরু প্রতিহত করতে পারেননি। সহস্র বৎসরেরও পূর্বে জরাসন্ধের চক্রবর্তিত্ব অর্জনের যে অভিলাষ ফলপ্রসূ হয়নি, মহাপদ্মনন্দের অভ্যুত্থানে মগধের সেই অভিলাষ পরিপূর্ণ সাফল্যে পরিণত হল। ভারতের ইতিহাসের এক দীর্ঘপ্রসারিত জীবননাট্যের অবসান ঘটল, একটা নূতন যুগের আবির্ভাব ঘটল।

রাজা পুরুর প্রসঙ্গে এখানে একটি বিশেষ তথ্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন। গ্রীক লেখক কুইন্টিয়াস কার্টিয়াস উল্লেখ করেছেন যে পুরুর যুধ্যমান সমর-বাহিনীর পুরোবর্তী ধ্বজাবহনকারীর হাতে একটি মূর্তি পরিলক্ষিত হয়েছিল, যে মূর্তিটি ছিল হারকিউলিসের (Herculis) মূর্তি। হারকিউলিস গ্রীক ইতিহাসে একজন বিশেষ শক্তিধর পুরুষ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর অন্য নাম ছিল হেরাক্লিস (Heracles)। মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় গ্রীক রাজদূত মেগাস্থেনিস বলেছেন, যমুনানদীর তীরবর্তী মথুরার অধিবাসী সৌরসেনরা (শূরসেনবংশীয় যাদবেরা) হেরাক্লিসের উপাসনা করে থাকে।[৩০] আর. জি. ভাণ্ডারকারই সর্বপ্রথম সেই হেরাক্লিসকে বাসুদেব-কৃষ্ণ বলে সিদ্ধান্ত করে-ছিলেন।[৩১]

এইসব তথ্যের ভিত্তিতে পুরুর সেনাবাহিনীর ধ্বজাবাহকের দ্বারা হারকিউ-লিসের মূর্তিবহনের যে উল্লেখ আছে সেটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। ভারতীয় ধ্বজপতাকায় কখনও কোন দেবতার মূর্তির প্রতি-রূপায়ণের প্রচলন ছিল বলে মনে হয় না। এইধরনের ধ্বজপতাকাতে উদ্দিষ্ট দেবতার প্রতীকেরই প্রতিরূপায়ণ করা হয়ে থাকে। এই যুক্তিতেই মনে হয় কার্টিয়াস হারকিউলিস অর্থে যে বাসুদেব-বিষ্ণুর উল্লেখ করেছেন সেই ধ্বজ-পতাকাটি বিষ্ণুর প্রতীক গরুড়ের প্রতিরূপায়ণে চিহ্নিত ছিল। এই তথ্যের

ভিত্তিতে সহজেই অনুমান করে নেওয়া চলে যে রাজা পুরুর উপাস্য দেবতা ছিলেন ভগবান বিষ্ণু এবং ভগবান বিষ্ণুই সেই ভারতযুদ্ধকাল থেকে 'দেবদেব বাসুদেব'রূপে ঐ পৌরববংশে উপাস্য কুলদেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সেই মহাভারতীয় যুগ থেকে বিষ্ণু-বাসুদেবই চক্রবর্তীরূপে স্বীকৃত পুরু-ভরত বংশের কুলদেবতারূপে ভারতভূখণ্ডের রাজশক্তির পরিপোষক শক্তিরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভগবান বিষ্ণু এবং বাসুদেব-কৃষ্ণ এই পুরু-ভরত বংশের আনুকূল্যেই 'যজ্ঞ সংস্কৃতি'র সঙ্গে সমার্থক পরমতম ঐশীসত্তারূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন এবং মহাভারতে সমুদ্ভূত প্রজ্ঞাচৈতন্যই বিষ্ণুর এই বাসুদেব-কৃষ্ণরূপ সত্তাকে তাঁর বিপুল মহিমান্বিত আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল।

নির্দেশিকা

১. ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৩।১৭:৬।
২. Colebrooke, Miscellaneous Essays, II, p. 177.
৩. পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী, ৪।৩:৯৮।
৪. বাসুদেবশরণ অগ্রোয়াল অবশ্য মনে করতেন যে, পাণিনি ভগবান বুদ্ধের পরবর্তী।
৫. অষ্টাধ্যায়ীর ৪।৩:৯৮ সূত্রের টীকায় পতঞ্জলি বাসুদেবকে 'ভগবন্ত' অর্থাৎ উপাস্য এই আখ্যায় অভিহিত করেছেন।
৬. Vogel, J. Ph., A.S.I., A.R., 1908-09, p. 129 ; Sircar, D. C., Select Inscriptions, Vol I, (Calcutta), pp. 83-89.
৭. মহাভারত, ৫।৮৪:২।
৮. Hastings, J., Encyclopaedia of Religion, pp. 539f.
৯. পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী, ৫।২.৭৬।
১০. Dey. S. K., Aspect of Sanskrit Literature, pp. 32-33.
১১. Bhandarkar, R. G., Vaishnavism, Saivism etc, p. 12.
১২. Mahavamsa, ed. Geiger, p. XLVI.
১৩. Pargitar, F. E., Ancient Indian Historical Tradition, (Delhi, 1962), p. 286.
১৪. ঐ, pp. 183 ; 318.
১৫. Coomaraswami, A. K., H.I.I.A., pl. XXIX, fig. 102.
১৬. Chanda, R. P., in A.S.I., A.R. 1921-22, p. 103, pl. XXXVI, C.
১৭. Epigraphia Indica, XVI, pp. 27f ; Sircar, D. C., Select Inscriptions, p. 91.
১৮. Sircar, D. C. ঐ, p. 192-93.
১৯. ঐ, p. 190.

২০. Epigraphia Indica, XXIV, pp. 194f.
২১. Banerjee, J. N., Development of Hindu Iconography, p. 113.
২২. Ep. Indica, XXIV, p. 208.
২৩. Banerjee, J. N., Development etc., p. 386.
২৪. Chanda, R. P. in Memoir of Archaeological Survey of India, No. 5, pp. 200-202.
২৫. McCrindle, J. W., Ancient India, as described by Megasthenis and Arrian, (Westminster, 1901), p. 201.
২৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ, পঞ্চোপাসনা, (কলিকাতা, ১৯৬৪), পৃ ৭।
২৭. Banerjee, J. N., Development etc., pp. 180f.
২৮. McCrindle, Ancient India, p. 180.
২৯. Cambridge History of India., Vol. 1, pp. 300f.
৩০. McCrindle, ঐ।
৩১. Bhandarkar, R. G.. Vaishnavism etc. pp., 10f.

১০

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—মহাভারতে ও পুরাণে

বাসুদেব-কৃষ্ণভাবনার উদ্ভব বিচারে মহাভারত সম্পর্কে যে দাবি এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সে সম্পর্কে অবশ্য নিশ্চিত কোন তথ্যপ্রমাণ উপস্থিত করা যায় না। তেমনি গোপাল-কৃষ্ণ ভাবনার উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে যে বিতর্ক আছে তারও নিশ্চিত কোন সমাধান আছে বলে মনে হয় না। মহাভারত যে পুরাণসাহিত্যের পূর্বগামী বা পূর্বেকার রচনা এ তথ্য অবিসংবাদী রূপেই গৃহীত হয়েছে। এই তথ্যের উপর নির্ভর করেই গোকুল-বৃন্দাবন কাহিনীর সঙ্গে জড়িত নন্দ-যশোদা লালিত গোপাল-কৃষ্ণ সম্পর্কিত ধারণা বাসুদেব-কৃষ্ণ সম্পর্কিত ধারণার অনেক পরে উদ্ভূত হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া হয়ে থাকে। যে বৈষ্ণব সাধনায় গোপাল নামে পরিচিত কৃষ্ণকে পরম আশ্রয় বলে গণ্য করা হয়ে থাকে সেই বৈষ্ণব-ধারাকে তো খ্রীস্টীয় যুগের বহু পরবর্তী সময়ে, এমনকি একসময় খ্রীস্টীয় প্রভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত বলেও অভিহিত করা হয়েছিল। মহাভারত এবং পুরাণের পারস্পরিক সম্বন্ধ এই দ্বিবিধ সূত্রকে ভিত্তি করে যে বৈষ্ণবীয় চিন্তা-কল্পনার বিবর্তন ঘটেছিল সে সম্বন্ধে খুব সুস্পষ্ট কিছু ধারণা করা সহজ নয়।

মহাভারতের রচনাকাল নিয়ে যেমন বেশকিছু বিতর্ক আছে, পুরাণসমূহের রচনাকাল নিয়ে বিতর্ক ততোধিক। মহাভারতের রচনাকাররূপে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের নাম যেমন প্রচলিত, পুরাণগুলির রচনাও তেমনি ব্যাসেই আরোপিত হয়ে থাকে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালের গোড়ায় কোম্পানির কর্মচারী হোরেস হেমান উইলসন একটি বিস্তৃত ভূমিকাসহ বিষ্ণুপুরাণ গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই ধারার অনুসরণ করেই পুরাণ নিয়ে আলোচনার সূত্র-পাত হয়েছিল (Horace Hayman Wilson—Vishṇu Purāṇa)। উইলসন সম্পাদিত বিষ্ণুপুরাণের প্রকাশের কিছু পূর্বে চার্লস উইলকিন্স কৃত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার অনুবাদ ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। বৈষ্ণবসাধনার প্রধানতম উৎস, মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অংশ (অনেকের মতে প্রক্ষিপ্ত) গীতা অনুবাদ-সূত্রে মহাভারতের আলোচনারও তখনই সূত্রপাত হয়েছিল বলা যেতে পারে। উইলকিন্স সম্পূর্ণ মহাভারত গ্রন্থেরও একটি ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন।

সেই অনুবাদটির পাণ্ডুলিপি এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহশালায় রাখা আছে।

আধুনিক ধারায় মহাভারত ও পুরাণচর্চার আরম্ভকাল থেকে এপর্যন্ত অসংখ্য পুস্তক লেখা হয়েছে এবং নানা মত ও সিদ্ধান্ত প্রচারিত হয়েছে। এইসমস্ত মতের মধ্যে বিভিন্ন গ্রন্থের ভিত্তিতে মহাভারতের সূত্রে উদ্ভূত বাসুদেব-কৃষ্ণ আশ্রিত বৈষ্ণব সাধনা এবং পুরাণ-আশ্রিত গোপাল-কৃষ্ণ সাধনার পারস্পরিক সম্পর্ক, কোন্‌টি পূর্বগামী এবং কোন্‌টি পরবর্তী ইত্যাদির উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ ছাড়া ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে বৈষ্ণব সাধনার বিবর্তন এবং প্রসার নিয়েও বেশকিছু কাজ হয়েছে। কিন্তু এই বিস্তৃত আলোচনায় মহাভারতে পরিদৃষ্ট কৃষ্ণভাবনার সঙ্গে পুরাণে বিধৃত কৃষ্ণ-ভাবনার পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতার এবং ভারতের তাবৎ সামাজিক বিবর্তন ও রাজনৈতিক ঘটনা বিবর্তনের কোন যোগসূত্র আছে কিনা সে বিচার করা হয় নাই। এই উভয় চিন্তা সম্পর্কে এখানে কিছু সমীক্ষা করবার প্রয়াস করব।

প্রচলিত মহাভারত গ্রন্থ ও এই গ্রন্থের রচনার কৃতিত্ব ব্যাসদেবকেই আরোপ করা হয়েছে। ব্যাসদেব যেমন মহাভারত ও পুরাণের রচয়িতা, তেমনি তিনি বেদেরও সংকলক। মহাভারত এবং পুরাণে মহর্ষি বেদব্যাসকেই এই কৃতিত্বের অধিকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে (মহাভারত ১।৬৩:২৪১৭, ১০৫:৪২৩৬; বায়ুপুরাণ ৬০:১১-১২; বিষ্ণুপুরাণ ৩।৪:২ ইত্যাদি)। দেবতা গণেশকে লিপি-কারের দায়িত্ব দিয়ে দেবী সরস্বতীর অনুজ্ঞায় মুনিবর ব্যাস মহাভারত রচনা করেছিলেন। প্রারম্ভের এই কাহিনী এবং অলৌকিকত্বের প্রতি ভারতমানসের যে প্রবল-আকর্ষণ আছে তারই উপর ভিত্তি করে এই সামগ্রিক কাহিনীটিকেই অনেকে কল্পনাবিলাসের নিদর্শন বলে গণ্য করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু সতর্ক-ভাবে পরীক্ষা করলে, এই ধরনের আপাতদৃষ্টিতে কাল্পনিক হিসেবে প্রতিভাত কাহিনী বা আখ্যায়িকাগুলি যে গভীর ইঙ্গিতের দ্যোতক সে কথা উপলব্ধি করতে তেমন অসুবিধা হয় না।

মহাভারত গ্রন্থকে সাধারণত ইতিহাস বলে অভিহিত করা হয় এবং ভারতীয় পরিকল্পনায় ইতিহাস কেবলমাত্র পূর্বাবৃত্ত কথার বিবরণই নয়; এই পূর্বাবৃত্ত কথাবিধৃত ইতিহাসের মূল উদ্দেশ্য মানুষকে ধর্মার্থকামমোক্ষরূপ চতুর্বর্গ সাধনায় সহায়তা করা (ধর্মার্থ কামমোক্ষাণামুপদেশ সমন্বিতম্‌/পূর্বাবৃত্ত কথাযুক্ত-মিতিহাসং প্রচক্ষতে)। কথার সাহায্যে কাহিনী চিত্রায়ণের বিপুল সমারোহে মহা-

ভারত এক তুলনাহীন সৃষ্টি। এই গ্রন্থে ব্যক্তিমানুষ, ভিন্ন ভিন্ন স্তরের নরনারী, বিভিন্ন স্বার্থপ্রবুদ্ধ ছোটবড় গোষ্ঠী এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্রসম্ভার, গুণত্রয়ের সমাবেশ এবং ঘটনার অনিবার্য গতিস্রোতের অনুসরণ, গভীর-প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণপ্রবণতা এই কাহিনীর প্রবাহের প্রত্যেকটি খণ্ডিত অংশে এবং সমগ্রতায় যে মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তার কোনই তুলনা নাই। ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীনতম বলে গণ্য ঋগ্বেদ গ্রন্থেই এই বিশ্লেষণধর্মী কাহিনীচিত্রায়ণের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের মূল ও প্রধান কাহিনী ইন্দ্রের সঙ্গে বৃত্রের বিরোধ ও দ্বন্দ্বের কাহিনী। এই কাহিনী অবলম্বনেই দেবতা ও অসুর চিন্তা এবং ভারতের মানস-ক্ষেত্রের বিস্তার ও সংহতির সূত্রপাত হয়েছিল। ঋগ্বেদে ইন্দ্র-বৃত্রঘটিত মূল কাহিনী ছাড়া শুনঃশেপের কাহিনী (ঋ ১।২০।১৬), ঋষি অঙ্গিরসপুত্র কুৎসের কাহিনী (১।৯৪), ঋষি দীর্ঘতমস (১।১৪০) এবং দীর্ঘতমসের পুত্র কক্ষীবতের কাহিনী (১।১২৩), ভৃগু, অঙ্গিরস, অত্রি ইত্যাদি ঋষি সম্পর্কে কাহিনী, বিশ্বামিত্র-বসিষ্ঠ কাহিনী, সুদাস এবং দাশরাজ্ঞ কাহিনী (৭।১৮), ইন্দ্র বৃষাকপির কাহিনী (১০।৮৬), পুরুরবা-উর্বশী কাহিনী (১০।৮৯) ও দেবাপি-শান্তনু কাহিনী (১০।৯৮) ইত্যাদি অসংখ্য কাহিনীর সমাবেশ দেখা যায়। বিভিন্ন দেবতা এবং নানা মন্ত্রের সমাবেশসূত্রে ঋগ্বেদে বিধৃত কাহিনীগুলির মধ্যে সুদাসের দাশরাজ্ঞ যুদ্ধের কাহিনীটির কিছু সম্ভাব্য ঐতিহাসিকতা ম্যাকডোনেল প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন। (The accounts of the conflicts of King Sudas have all the appearance of a historical character)।[১] রাজশক্তির বিকাশ এবং যুদ্ধবিগ্রহভিত্তিক কাহিনী ভিন্ন অন্যধরনের কাহিনীর ঐতিহাসিকতা পাশ্চাত্য ইতিহাসবেত্তারা প্রায় সাম্প্রতিককাল পর্যন্তও কখনই স্বীকার করেননি। ধর্মার্থকামমোক্ষের মধ্যে অর্থ বা economic চিন্তাভিত্তিক ইতিহাসের ব্যাপক স্বীকৃতি মার্কস প্রমুখ পণ্ডিতদের দ্বারা প্রবর্তিত হওয়ার পর সম্পদ, সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টন এবং সমাজের এক স্তরের মানুষের দ্বারা অন্যস্তরের শোষণের ইতিবৃত্তান্তই ইতিহাসবুদ্ধির ভিত্তি বলে পরিগণিত হচ্ছে। ভারতীয় ইতিহাসচিন্তায় মানুষের চতুর্বর্গ সাধনার যে উপলব্ধি জাগ্রত হয়েছিল সেই বুদ্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত রাজা এবং ঋষিদের কাহিনীতে মানবিক বোধ ও প্রবণতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠারই প্রয়াস দেখা যায়।

এইসব কাহিনীকে সামগ্রিক রূপ দিয়ে এক মহান্ আলেখ্যচিত্র রচনার ক্ষেত্রে মহাভারতকে এক অনন্যসাধারণ সৃষ্টি বলে গণ্য করা যেতে পারে। উপদেশ-ভিত্তিক ঘটনা চিত্রায়ণের ব্যাপক পরিচিতি বিধৃত আছে বৌদ্ধ জাতকমালায়, পঞ্চতন্ত্রকথামুখে, গুণাঢ্যের বৃহৎকথায় এবং কথাসরিৎসাগরে। এইসমস্ত কাহিনী চিত্রায়ণের ঘটনাসমূহকে কাল্পনিক বলেই গণ্য করা হয়েছে। মহাভারত-কাহিনীও এই যুক্তিতেই যে কাল্পনিক বলে গণ্য হবে তাতে আর বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

কাহিনী একান্তই কল্পনাভিত্তিক হলেও কাহিনীর উদ্ভবকালের কিছু প্রমাণ পাওয়া গেলে, সেই যুগভিত্তিক সমাজ ও জনচিত্তের কিছু পরিচয় তা থেকে আহরণ করা সম্ভব। মহাভারতের উদ্ভব ও বিবর্তনের সম্বন্ধে বিস্তৃত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহু আলোচনা হয়েছে। এখানে যে বক্তব্য রাখার প্রয়াস করা হচ্ছে, কৃষ্ণ-চিন্তার উদ্ভব ও বিকাশভিত্তিক প্রয়োজনীয় তথ্যের মধ্যেই তা সীমিত রাখা হবে। মহাভারতে যে তথ্য আছে তাতে মহর্ষি ব্যাস ভারতযুদ্ধের অবসানের অব্যবহিত পরেই মহাভারত রচনা সমাপ্ত করেছিলেন এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেননা ব্রহ্মশাপে সম্রাট পরীক্ষিতের মৃত্যু ঘটলে জনমেজয় তক্ষশিলায় যে সর্পযজ্ঞ করে-ছিলেন সেই উপলক্ষে মহর্ষি ব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন মহাভারত আবৃত্তি করে-ছিলেন বলে বর্ণিত আছে। মহাভারতের রচনাকাল নির্ধারণের জন্য অভ্যন্তরীণ নানা তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়। রচনার সূত্রপাত থেকে মহাভারতের বর্তমান রূপ গ্রহণ করতে খ্রীস্টের জন্মের কিছুকাল পূর্বে আরম্ভ হয়ে খ্রীস্টজন্মের কিছু পরের দু'একশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। হপকিন্স (E. W. Hopkins) মহাভারত সম্পর্কিত তাঁর বিখ্যাত The Great Epic গ্রন্থে শুধু মহাভারতের রচনার কালই নির্দেশ করেন নাই ; তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন, শত সহস্র শ্লোকযুক্ত বলে প্রচলিত মহাভারতে শ্লোকের সংখ্যা অনেক বেশী এবং বর্তমানের মহাভারতে বহু নতুন সংযোজন আছে। ক্ষুদ্রাকার একটি রচনা, একসময় যে রচনা কেবল 'ভারত' নামে পরিচিত ছিল, তাই ছিল মূল উৎস। পরে নানা সংযোজনের ফলে কলেবর স্ফীত হয়ে তা বর্তমানের মহাভারতে পরিণত হয়েছে। পুণার প্রখ্যাত গবেষণা-সংস্থা ভাণ্ডারকার গবেষণা প্রতিষ্ঠান মহাভারতের একটি প্রামাণ্য সংস্করণ প্রকাশ করে গবেষকদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

পুরাণে অতীত যুগের রাজবংশসমূহের যে অনুক্রম আছে সেই তালিকায় পুরু-ভরত বংশে শান্তনু নামে এক রাজার নামের উল্লেখ আছে। শান্তনুর জ্যেষ্ঠ দেবাপি এবং কনিষ্ঠ বল্হীক নামে দুই ভ্রাতা ছিল। জ্যেষ্ঠ দেবাপি সিংহাসনে অনাসক্ত ছিলেন ; ফলে শান্তনু সিংহাসনলাভ করেন। পুরাণের এই কাহিনী ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দেবাপি-শান্তনু কাহিনীর সঙ্গে প্রায় হুবহু এক। শান্তনুর বংশে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর জন্ম হয়। পুরাণে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন আদি শতপুত্র এবং পাণ্ডুর যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব নামে পাঁচ পুত্রের উল্লেখ আছে। অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর পত্নী উত্তরার গর্ভস্থ সন্তান অশ্বত্থামার দ্বারা বিনষ্ট হলে মায়ামানব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই গর্ভস্থ সন্তানকে পুনর্জীবিত করেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে এই তালিকা যখন গ্রথিত হয় তখন সেই উত্তরা-অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতের রাজত্ব চলছিল। বিষ্ণুপুরাণ গ্রন্থে এ সম্পর্কে যে তথ্য আছে তা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এখানে পরীক্ষিতের রাজত্বকালকে গ্রন্থ সংকলনের কাল বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থে সংকলিত ইতিহাসকে পরীক্ষিতের কালে এনে পরিসমাপ্ত করে দেওয়া হয় নাই। পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের রাজ্যাভিষেক থেকে আরম্ভ করে গুপ্তকাল পর্যন্ত রাজবংশগুলির পরিচয়ও এখানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে। অন্য আরও কিছু পুরাণ আছে যেখানে গুপ্তযুগের পরেরও কিছু রাজবংশের পরিচয় আছে। ভাগবতপুরাণকে বিষ্ণুপুরাণেরও বেশ কিছুকাল পরে রচিত বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। ভাগবতেও পরীক্ষিতের জন্মকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে যেভাবে পরীক্ষিতের কালেই রাজন্যবর্গের বংশতালিকার সমাপ্তি করে পরবর্তী যুগের বংশতালিকাকে ভবিষ্যৎ কালে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, ভাগবতপুরাণে তেমনভাবে করা হয় নাই। এখানে পরীক্ষিতের পরে জনমেজয়ের রাজ্যলাভ থেকে 'নীচক্ষুর' আমলে গঙ্গা কর্তৃক হস্তিনাপুরের বিনাশ ও হস্তিনাপুর ত্যাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। (গঙ্গাহৃয়ে হৃতে নগ্যা কৌশম্ব্যাং সাধু বৎস্যতি / উক্তস্ততশ্চিত্ররথস্তস্মাৎ কবিরথঃ সুতঃ ॥ ভাগবত ৯।২২:৪০)।

পুরাণে বিধৃত বংশতালিকায় দেবাপি-শান্তনু কাহিনী, শান্তনুর উত্তরাধিকারীদের বংশতালিকা, ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডুর সন্তানসন্ততির সংবাদ, গর্ভবাসকালে অশ্বত্থামার অভিশাপে পরীক্ষিতের মৃত্যু ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পরীক্ষিতের পুনর্জন্মলাভ ও তাঁর রাজ্যপ্রাপ্তির বিবরণ রক্ষিত হয়ে থাকলেও কুরুক্ষেত্র

যুদ্ধের কোন উল্লেখই তাতে পাওয়া যায় না। পুরাণসমূহের মধ্যে যেগুলিকে বৈষ্ণব পুরাণ বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে সেগুলির মধ্যে, বিশেষ করে বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ভাগবতপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বংশানুক্রম বর্ণনার অবসানে যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র যদুর বংশাবলীর বিস্তৃত বিবরণ প্রদানের বিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যদুবংশের উপর এই গুরুত্ব আরোপ করবার কারণও এই পুরাণগুলিতে পরিষ্কারভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবান নরদেহধারী পরমাত্মারূপী বাসুদেব-কৃষ্ণের এই বংশে আবির্ভাবের কারণেই এই বংশকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। (যযাতের্জ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোর্বংশং নরর্ষভ ॥ বর্ণয়ামি মহাপুণ্যং সর্বপাপহরং নৃণাম্। যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ পরমাত্মা নরাকৃতিঃ—ভাগবতপুরাণ ৯।২৩:১৮-২০)

যদুবংশের বিভিন্ন শাখার বিস্তৃত বিবরণ গ্রথিত করার পর এই পুরাণসমূহে বসুদেবপত্নী দেবকীর গর্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে গোকুল, বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকাপুরীতে সেই ভগবানরূপী কৃষ্ণের জীবনের বহু কর্মকাণ্ডের বিস্তৃত কাহিনীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে শ্রীকৃষ্ণ-জীবনকাহিনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এই পুরাণসমূহে গ্রথিত হয়ে থাকলেও মহাভারতকাহিনীতে বিধৃত ভগবান শ্রীকৃষ্ণঘটিত কাহিনীর বিশেষ কোন উল্লেখ এগুলিতে পাওয়া যায় না। মহাভারতের রচনাকাল নিশ্চিতভাবেই পুরাণসমূহের রচনাকালের অনেক পূর্বে বলে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। এই যুক্তিতেই মহাভারতে অনুল্লিখিত এবং পুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণজীবনকাহিনী মহাভারত রচনার বহু পরে উদ্ভূত এবং কাল্পনিক বলে অভিহিত করার প্রয়াস দেখা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনের আশ্রয়ে যে বিপুল চেতনার উদ্ভব হয়েছিল সেই চেতনার মূল উৎস মহাভারত বলে গণ্য করে পুরাণবর্ণিত কৃষ্ণকাহিনীকে কেবলমাত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলেই গণ্য করা হয় নাই, মহাভারত ও পুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ-কাহিনীর স্বতন্ত্রতা এক প্রবল সমস্যারূপেও গণ্য হয়েছে।

মহাভারত ও পুরাণের বিবর্তন

ইতিপূর্বে মহাভারত ও পুরাণের উদ্ভব নিয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস শুধু মহাভারত ও পুরাণসাহিত্যের রচয়িতা নন, তিনি বেদ নামে পরিচিত গ্রন্থাবলীর সংকলক এবং ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা

বলেও প্রখ্যাত। বহুখ্যাতিতে অভিষিক্ত এই মহামনীষীকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল স্বয়ং বিষ্ণুর অবতাররূপে। (ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে / নমো বৈ ব্রহ্মবিধায় বসিষ্ঠায় নমো নমঃ)। ভারতবর্ষে উদ্ভূত চিন্তা ও জীবন-চর্যার উৎস হিসেবে যে গ্রন্থের পরিচয় অগ্রগণ্য, সেই বেদ এবং মহাভারত-পুরাণের প্রবর্তন প্রয়াসের সঙ্গে ব্যাসদেবের নামের যোগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নাই।

পুরাণে ব্যাসদেবের জন্ম এবং কর্মকাণ্ডের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। সুপ্রাচীন কাল থেকে ঋষি বসিষ্ঠ ও তাঁর উত্তরপুরুষদের ভারতসংস্কৃতিতে গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান ছিল। এই বসিষ্ঠবংশে শক্তি নামে এক ঋষি ছিলেন। শক্তির পুত্র ছিলেন পরাশর। আর পরাশরের পুত্র কৃষ্ণ। ভাগীরথীবক্ষে এক দ্বীপে জন্ম হয়েছিল, সেইসূত্রে তাঁকে দ্বৈপায়ন নামেও অভিহিত করা হয়। মহাভারতে রক্ষিত বংশপঞ্জী এবং কালানুক্রমের অনুসারে এই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কুরুবংশের শান্তনুর পুত্র এবং সিংহাসনের অধিকারত্যাগকারী ভীষ্মের সমসাময়িক। মহাভারতের কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে নিয়োগ প্রথানুসারে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস অকাল-মৃত কুরুসম্রাট বিচিত্রবীর্যের মহিষীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু নামে দুই সন্তানের জন্মবিধান করেছিলেন। মহাভারত যুদ্ধের বিবদমান দুই পক্ষ ধৃতরাষ্ট্রের সন্তান কৌরব ভ্রাতৃবর্গ এবং পাণ্ডুর সন্তান যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবেরা কার্যত এই কৃষ্ণদ্বৈপায়নেরই পৌত্র। এইসূত্রে মহাভারত রচনার কালকে সেই মহাযুদ্ধের সমকালীন এবং অব্যবহিত পরবর্তী বলে অভিহিত করা যেতে পারে। ভগবান ব্যাসদেব পুরাণেরও সংকলন করেছিলেন। মূলত ব্যাসদেব সংকলিত পুরাণ একখানিই ছিল বলে মনে করা হয়। পরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে সেই মূল পুরাণকে অবলম্বন করে নূতন নূতন পুরাণ রচিত হয়েছিল। পুরাণ-গুলির বিষয়বস্তুর কাঠামো মূলত এক। তবে বিভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিষয়বর্ণনা, বিশেষ করে বংশানুক্রমের তালিকা পুরাণগুলিতে প্রায় একভাবেই দেওয়া হয়েছে। এইসব বর্ণনায় ভাষার এবং বিষয়ানুক্রমের সাদৃশ্য থেকে এগুলি যে একটি মৌলিকসূত্রকে অবলম্বন করেই রচিত হয়েছিল একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করা যেতে পারে।

মূল পুরাণকাহিনীগুলির বংশানুক্রম সূত ও মাগধ নামে পরিচিত কাহিনী-কারদের দ্বারাই রক্ষিত হয়েছিল একথা উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না।

মহামনীষী বেদব্যাস যেমন বিভিন্ন ঋষি পরিবারদের দ্বারা উদ্গীত ও রক্ষিত বেদের মন্ত্রগুলি সংকলন করে মহাগ্রন্থ বেদ রচনা করেছিলেন, সূত এবং মাগধদের কাছ থেকে পুরাণের বিবরণগুলিও তেমনি সযত্নে সংগ্রহ করে তিনি মূলপুরাণ রচনা করেছিলেন। তিনি স্বয়ং কুরুবংশের সঙ্গে নিকট ঘনিষ্ঠতায় এসেছিলেন এবং এই বংশের কার্যকলাপের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ থাকায় তাঁর মহাভারত কাহিনী বস্তুত ঐ কুরু-ভরত বংশের ইতিবৃত্ত অবলম্বনে ভারতসংস্কৃতির এক অচিন্ত্য কোষগ্রন্থে পরিণত হয়েছিল।

মহাভারত রচনা যেমন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের তুলনাহীন কীর্তি, পুরাণসমূহের রচনার কৃতিত্বও তেমনি ব্যাসকেই দেওয়া হয়ে থাকে। বিভিন্ন কালের এবং ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ অষ্টাদশখানি মহাপুরাণই যে একসময়ে এবং একই গ্রন্থকর্তা দ্বারা রচিত হয়নি, এ সম্বন্ধে কোন মতানৈক্যের সুযোগ নাই। বিভিন্ন উদ্দিষ্ট দেবতার প্রতি আরোপিত প্রাধান্য, ভূগোল, বাস্তু ও শিল্পবিদ্যা, জ্যোতিষ, নানা দেবদেবীর পরিচয় ইত্যাদি বিষয়গুলি বিভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু প্রধান প্রধান পুরাণগুলিতে বিধৃত প্রাচীন ঘটনাবলী এবং ঋষি ও রাজন্য পরিবারের বংশতালিকায় যে ধরনের ঘনিষ্ঠ সামঞ্জস্য দেখা যায় তা থেকে অনুমান করা অসম্ভব নয় যে, প্রাচীনকাল থেকে এইসব তথ্য এবং বংশতালিকা যত্নের সঙ্গে সংরক্ষিত হত। ভগবান ব্যাস সম্ভবত এইসমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে একখানিই পুরাণ রচনা করেছিলেন। পরে সেই পুরাণখানি অবলম্বনে বিভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে বর্তমানে প্রচলিত পুরাণগুলি গ্রথিত হয়। এই অষ্টাদশসংখ্যক পুরাণে সেই মূল পুরাণ সন্নিবদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে, কিম্বা প্রয়োজনভিত্তিক সংগঠিত সমাজ পরিবেশে সেই আদিপুরাণের প্রতি আর কোন প্রয়োজনবোধ না থাকায় সেই মূল পুরাণ বিলুপ্ত হয়েছে এবং পরবর্তীকালে রচিত সবগুলি পুরাণই ব্যাসদেবের রচিত বলে গণ্য হয়েছে।

বৈষ্ণবীয় পুরাণ হিসেবে পরিচিত বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থে ভগবান কৃষ্ণবাসুদেবের পরবর্তীকালের রাজন্যবর্গেরও বংশতালিকার সমাবেশ আছে। এই মূল বংশতালিকায় যদুবংশের কিছু বিস্তৃততর বিবরণ থাকলেও কৃষ্ণবাসুদেবকে নিয়েই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অংশ সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে, যে অংশসমূহ মূল বংশতালিকা থেকে অনেক বিস্তৃত এবং যার উপর অনেক

বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভগবান বাসুদেব ও সংকর্ষণের বংশ হিসেবে সবিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন এই কথা উল্লেখ করে, বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ খণ্ডের একাদশ অধ্যায় থেকে চতুর্দশ অধ্যায়ে যযাতির পুত্র যদু থেকে বাসুদেব-সংকর্ষণের জন্ম পর্যন্ত বংশাবলীর বিবরণ দেওয়ার পর এই পুরাণের পঞ্চম অংশ নামে বর্ণিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পুস্তকের আকারের অংশ সম্পূর্ণভাবে বাসুদেব-কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে বর্ণিত কাহিনী নিয়েই রচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে ভাগবতপুরাণে নবম স্কন্ধ পর্যন্ত রাজন্যবংশাবলীর বিবরণ প্রদান ব্যপদেশে যদুবংশের অবতারণা করে দশম এবং একাদশ স্কন্ধে সুবিস্তৃতভাবে ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণের লীলাপ্রকরণ বর্ণিত হয়েছে। হরিবংশ-পুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের বর্ণনাও প্রায় অনুরূপ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে একাধিক এইসব বৈষ্ণবীয় পুরাণে ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণের সামগ্রিক জীবনের প্রায় সম্পূর্ণ বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়ে থাকলেও মহাভারতে বর্ণিত কৌরব-পাণ্ডব দ্বন্দ্বভিত্তিক কাহিনীতে বাসুদেব-কৃষ্ণের সংযোগের কোন বিবরণই গ্রথিত হয়নি। ফলে পুরাণবিধৃত বাসুদেব-কৃষ্ণ কাহিনী এবং মহাভারতে সন্নিবিষ্ট ভগবান কৃষ্ণের ক্রিয়াকলাপ যেন দুই স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে প্রসারলাভ করেছে। অনেকে মহাভারতের কৃষ্ণকে এবং পুরাণে বর্ণিত, বিশেষ করে গোকুল এবং বৃন্দাবনভিত্তিক শিশু ও কিশোর কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে অভিহিত করেছেন। মহাভারত ও পুরাণসূত্রে পাওয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেবকে অবলম্বন করে এর ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে বহু গবেষণা ও অভিমতের উদ্ভব হয়ে থাকলেও কেন পুরাণ ও মহাভারতে এই বিভিন্নতার উদ্ভব হয়েছিল তার কোন দিক্‌নির্দেশ বা তেমন কোন সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা যায় না।

বর্তমানে প্রচলিত পুরাণসমূহের মূল উৎস ছিল যে আদিপুরাণ এবং বর্তমানে প্রচলিত মহাভারতেরও আদিরূপ যে ভারতকথা, এই উভয় রচনাই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের দ্বারা রচিত হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। পুরাণের রচনার উদ্দেশ্য ছিল সূত এবং মাগধ সম্প্রদায়ের দ্বারা রক্ষিত প্রাচীন ইতিবৃত্ত কাহিনী ও বংশাবলীকে একটি সুষ্ঠু রূপ দিয়ে সংকলন করা। সম্ভবত সূত ও মাগধদের দ্বারা রক্ষিত উপকরণ কথ্য ভাষায় সংকলিত ছিল ; ভগবান ব্যাসদেব সেই কাহিনীপ্রবাহকে মার্জিত করে দেবভাষায় (সংস্কৃতে) রূপান্তরিত

করে অভিজাত সমাজের গ্রহণের উপযোগী করে দিয়েছিলেন। এই মূল পুরাণ যখন সংকলিত ও রচিত হয় তখন সেই সংকলনে বংশাবলীর ধারাবাহিকতাই সংক্ষিপ্তভাবে সংকলিত হয়েছিল ; নিতান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্র ভিন্ন, বংশাবলীতে উল্লিখিত কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কেই বিস্তারিত কোন বিবরণ সন্নিবিষ্ট করার সুযোগ ছিল না। কিন্তু সেইসব বৃত্তান্তে যে-সব আকর্ষণীয় ও দ্যোতনাপূর্ণ ঘটনার সংযোগ সাধারণ্যে ঔৎসুক্য ও আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারত সেইসব ঘটনা ও ইতিবৃত্তের স্বতন্ত্রভাবে কাহিনীরূপে প্রচলিত হওয়ার ঘটনা হয়ত সকল দেশে সর্বকালেই ঘটেছে। ঋগ্বেদে এই ধরনের বহু প্রাচীন কাহিনীর বর্ণনা আছে। উদাহরণস্বরূপ, পুরুরবা-উর্বশীর কাহিনী, (১০।৯৫) সরস্বতীর তীরে নহুষের যজ্ঞানুষ্ঠানের কাহিনী (৭।৯৫, ৯৬), আঙ্গিরসপুত্র কুৎসের শুষ্ণ নামে দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধের কাহিনী (১।৯৪), সুদাস ও দাশরাজ্ঞ যুদ্ধের কাহিনী (৭।১০৪), দেবাপি-শান্তনুর কাহিনী (১০।১৮), শুনঃশেপের কাহিনী (১।২৪-১০) এবং দীর্ঘতমস্ ঋষির কাহিনীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

এখানে বর্ণিত এইসব কাহিনীগুলি পরে জনপ্রিয় আখ্যান হিসেবে মহাভারতে সংকলিত হয়েছিল। ঋগ্বেদে সংকলিত এইধরনের বহু মন্ত্রই বিভিন্ন রাজা এবং ঋষির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা বা তাঁদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ উপলক্ষে উচ্চারিত হয়েছিল, যেসব কাহিনী ঋগ্বেদের সংকলকের নিশ্চিতই জানা ছিল, ফলে সেসব কাহিনী বিস্তারিতভাবে বলার প্রয়োজন বোধ হয়নি। কিন্তু সে-ধরনের বহু কাহিনীই জনগণের স্মৃতিতে ছিল এবং সেইসব কাহিনীর কিছু কিছু মহাভারতে উদ্ধৃত হয়ে মহাকালের গর্ভে বিলুপ্ত না হয়ে ভারতের সংস্কৃতির ভাণ্ডারে সংরক্ষিত হয়েছে।

ঋগ্বেদে যেমন ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রসমূহ সংকলিত আছে, কিন্তু সেখানে কাহিনীগুলির প্রতি তেমন কোন আগ্রহ প্রকাশ পায়নি, তেমনি বংশতালিকার সংরক্ষণে পুরাণগুলিতে রাজা এবং ঋষিদের বংশধরদের পারম্পর্যই বিশেষভাবে সংরক্ষিত হয়েছে, সেখানে ভিন্ন ভিন্ন রাজাদের ক্রিয়াকলাপ কাহিনীর আকারে গ্রন্থবদ্ধ করবার তেমন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয় নাই। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। দেবাসুর যুদ্ধে ইক্ষ্বাকুবংশের পুরঞ্জয় ও ঐল বংশের রজির ভূমিকা, মান্ধাতা সম্পর্কিত বিস্তৃত কাহিনী ইত্যাদির কথা এই উপলক্ষে স্মরণ করা যেতে পারে। এ ছাড়া, মূল পুরাণ থেকে যখন অষ্টাদশ

পুরাণের উদ্ভব হয়েছিল তখন বিভিন্ন পুরাণে কোন কোন বিশেষ কাহিনী বিস্তারিতভাবে সংযোজিত করা হয়েছিল, বিভিন্ন দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে। হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত ইত্যাদিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেবের জীবনলীলার বিবরণকে এই ধরনের উদাহরণরূপে গণ্য করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে দুটি উল্লেখযোগ্য কাহিনীর কথা স্মরণ করা যেতে পারে, যার প্রাসঙ্গিক কোন বিবরণ বেদে বা পুরাণে নাই। এর প্রথমটি হচ্ছে 'রাম কথা', যে কাহিনী অবলম্বনে মহাকবি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন। অন্যটি ধার্তরাষ্ট্র (ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র—কৌরব)-পাণ্ডব বিরোধ ও কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের কাহিনী। বিভিন্ন পুরাণে এবং রামায়ণে ইক্ষ্বাকুর বিস্তৃত বংশতালিকা পাওয়া যায়; অবশ্য রামায়ণে এবং বিভিন্ন পুরাণে প্রদত্ত এই বংশতালিকায় বিশেষ মিল নাই। পুরাণে দশরথ, দশরথপুত্র রাম এবং রামের পুত্র লব ও কুশের উল্লেখ থাকলেও সেখানে রামায়ণ কাহিনীর মূল উপজীব্যরূপে বর্ণিত রাক্ষসদের, বিশেষ করে রাক্ষস-অধিপতি দশানন রাবণের সঙ্গে রামচন্দ্রের যুদ্ধের কাহিনীর কোন উল্লেখ নাই। যেমন বসিষ্ঠ বংশের কৃষ্ণদ্বৈপায়ণকে ব্যাস নামে অভিহিত করা হয়েছে তেমনি ভার্গব বংশের ঋষি বাল্মীকিকে পুরাণে দ্বাপর যুগের ব্যাস বলে উল্লেখ করা হয়েছে (ঋক্ষোঽভূদ্ভার্গবস্তস্মাদ্বাল্মীকির্যোঽভিধীয়তে / তস্মাদস্মৎ পিতা শক্তির্ব্যাসস্তস্মাদহং মুনে)[২]। বাল্মীকির আশ্রমে লালিত ও তাঁর শিষ্য, রামের সন্তান লব ও কুশ বাল্মীকি রচিত রামায়ণ রামের সভায় গান করে শুনিয়েছিলেন। কাহিনী বর্ণনাকারীদের সেই সময় থেকে কুশীলব নামে পরিচয় প্রচলিত হয়। অনুরূপভাবেই উল্লিখিত হয়েছে যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রচিত ভারতকাহিনী ব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন নিজ পুত্র উগ্রশ্রবাকে শিখিয়েছিলেন এবং তক্ষশিলায় সর্পযজ্ঞ উপলক্ষে এই ভারতকাহিনী প্রথম আবৃত্তি করা হয়েছিল।[৩] মূল পুরাণের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছে যে ব্যাসদেব সেই বৈশম্পায়নকেই প্রথম পুরাণ শিক্ষা দিয়েছিলেন।[৪] স্বভাবতই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে বাল্মীকি প্রথম যে রামকথা রচনা করেছিলেন সেই কাহিনী যেমন বিস্তৃতিলাভ করেছিল তেমনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রচিত ভারতকথাও পরে বিস্তৃতিলাভ করে ক্রমে বর্তমান আকার ধারণ করেছে। সেই প্রাচীন ভারতকথাতে কেবল কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধ কাহিনীরই বিস্তৃতি ঘটে নাই, এই সংকলনে অন্যান্য বহু আখ্যান

বিবরণও সংযোজিত হয়েছিল। কিন্তু যখন মূল ভারত আখ্যান রচিত হয় তখন সেই উপাখ্যানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেব প্রধানতম চরিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে থাকলেও সেই কাহিনী মূলত কুরু-পাণ্ডব কাহিনীরূপেই গড়ে উঠেছিল, সেখানে শ্রীকৃষ্ণের এই কুরু-পাণ্ডব কাহিনী থেকে স্বতন্ত্র যে জীবনকাহিনী তার সংযোজনের কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু মূলত কুরু-পাণ্ডব কাহিনী হলেও ভারতকাহিনীর বিবর্তনপথে এই কাহিনীতে ভগবান কৃষ্ণই মুখ্য চরিত্র হিসেবে গুরুত্ব অর্জন করবার পর শ্রীকৃষ্ণজীবনের এই কুরু-পাণ্ডব সংস্রব নিরপেক্ষ বিস্তৃত ঘটনাবলী সম্পর্কেও কাহিনীজীবীদের সচেতনতা দেখা দিয়েছিল। এই সচেতনতার ফলে শ্রীকৃষ্ণের বিস্তৃততর জীবনকাহিনী ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে সংযোজিত হতে থাকে, স্বয়ংপূর্ণ আখ্যায়িকা হিসেবে। কালক্রমে যখন মহাভারতকাহিনীকে একান্তভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচারকল্পে বর্তমান রূপে সংগঠিত করা হয়েছিল, তখনই কোন উৎসাহী কাহিনীকার বিস্তৃত শ্রীকৃষ্ণজীবনকে অবলম্বন করে রচিত পরমমহিমামণ্ডিত শ্রীহরি নামে অভিহিত পরমব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে মহাভারতের অংশ (খিল) রূপে সংযোজন করে হরিবংশপুরাণের সৃষ্টি করেছিলেন। এই প্রয়াসের ফলে হরিবংশপুরাণ সহ মহাভারত কাহিনী শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবের জীবনের সামগ্রিক রূপের ধারক বলে পরিগণিত হল। এই সামগ্রিক কাহিনী যে বহু অতীতকাল থেকেই ব্যাপক পরিচিতি অর্জন করেছিল, পাণিনির অষ্টধ্যায়ী, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বৌদ্ধ এবং জৈনদের রচনায় বিধৃত বাসুদেব-কৃষ্ণ সম্পর্কে নানা তথ্য, গ্রীক ঐতিহাসিকদের রচনা এবং সর্বশেষে হেলিয়োডোরের গরুড়স্তম্ভের সাক্ষ্য বিচারে তা উপলব্ধি করা যায়। ইতিপূর্বে সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করা হয়েছে যে বৃষ্ণি নামে পরিচিত সমাজে মহত্ত্বসম্পন্ন পূর্বপুরুষ হিসেবে সংকর্ষণ (বলরাম), বাসুদেব ইত্যাদি 'পঞ্চবৃষ্ণিবীরের' উপাসনা প্রচলিত হয়েছিল; এই পঞ্চবীর উপাসনায় ভগবান কৃষ্ণ-বাসুদেব এককভাবে নন, অন্যান্য বৃষ্ণিবীরদের সঙ্গেই উপাসিত হতেন। প্রায় অনুরূপ সময়েই অন্য কিছু অনুরাগীদের দ্বারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সংকর্ষণ এবং বাসুদেবের উপাসনাও প্রচলিত হয়েছিল। একক পরমতম উপাস্য হিসেবে ভগবান দেবদেব বাসুদেবের সম্ভবত একদিকে বৃন্দাবনের গোপ-সমাজে শিশু এবং কিশোর গোপালের উপাসনারূপে এবং অন্যদিকে হস্তিনাপুরের রাজপরিবারে বিষ্ণুরূপী ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণের উপাসনারূপে প্রকাশ ও বিকাশ-

লাভ করেছিল। বৃষ্ণিবংশীয় পঞ্চবীর বা সংকর্ষণ-বাসুদেব এই যুগ্ম উপাসনা কী সূত্রে প্রবর্তিত হয়েছিল তার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নাই। কিন্তু শিশু-কিশোররূপী গোপাল-কৃষ্ণ বা পুরু-ভরত বংশের দ্বারা কুলদেবতা বিষ্ণুর অবতার-রূপে পরিগৃহীত বাসুদেব-কৃষ্ণের পরমদেবত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার মূলসূত্র অত্যন্ত সুনিশ্চিতভাবেই পুরাণকাহিনী এবং মহাভারতে বিধৃত আছে।

পুরাণে গোপাল-কৃষ্ণের পূর্ণ ভগবৎসত্তায় প্রতিষ্ঠা

ঘোর দুর্যোগময়ী রাত্রির ঘন অন্ধকারে সদ্যোজাত সন্তানকে যমুনার পূর্বতীরে নন্দগোপের গৃহে রেখে পিতা মথুরায় ফিরে গেলে গোপগৃহে শিশু কৃষ্ণের জীবনের সূত্রপাত হয়। পুরাণ-বিধৃত এই কাহিনীর কিছু সমর্থন বৌদ্ধ এবং জৈন শ্রুতিতেও পাওয়া যায়। বৌদ্ধ পালি সাহিত্যে সংরক্ষিত ঘটপণ্ডিত জাতকের কাহিনীকে কৃষ্ণভিত্তিক আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[৫] পালি ভাষায় কৃষ্ণকে কন্‌হ বলে অভিহিত করা হয়েছে। পালি কন্‌হ, প্রাকৃত ভাষার কান এবং কানু, বাংলায় কানাই, রাজস্থানীতে কানীয়া এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বিভিন্ন রূপ নিয়েছিল। জাতকের মতে কৃষ্ণ-উত্তর মথুরার অধিপতি মহাসাগরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপসাগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। উত্তরাপথের অসিতাঞ্জন নগরের অধিপতি মহাকংসের কন্যা দেবগব্ভা ছিলেন উপসাগরের পত্নী এবং কন্‌হের মাতা। দেবগব্ভার নন্দ-গোপা নামে এক দাসী ছিল। কংসের সম্বন্ধে এক দৈববাণী ছিল যে দেবগব্ভার এক পুত্রের হাতে তার মৃত্যু ঘটবে। দেবগব্ভার পুত্র জন্মান মাত্র নন্দগোপা সে-সন্তানকে নিজের গৃহে অপসারণ করে নিজের এক কন্যাকে দেবগব্ভার সন্তান-রূপে লালন করতেন। এইভাবে দেবগব্ভার দশটি পুত্র হয় এবং এই সবকয়টি পুত্রই নন্দগোপার স্বামী অন্ধকবেণুর পুত্র রূপে লালিত পালিত হতে থাকে। ক্রমে অন্ধকবেণুর এই দশপুত্র সবিশেষ শক্তিশালী ও দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। ঘটনাচক্রে কংস জানতে পারলেন যে এরা আদতে অন্ধকবেণুর পুত্র নয়, দেবগব্ভার সন্তান। এই সংবাদ শ্রুতিগোচর হলে কংস ভগিনীর পুত্রদের স্বসমীপে আমন্ত্রণ জানালেন। এই আমন্ত্রণলাভের পর তারা নগরে উপস্থিত হয়। সেখানে তাদের হত্যা করবার জন্য প্রেরিত দুই কুস্তিগীর, চানুর এবং মুট্‌ঠিককে নিধন করে বাসুদেব শেষপর্যন্ত চক্রের দ্বারা কংসের মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দেন। এরপরে তাঁরা দ্বারাবতীর রাজ্য অধিকার করে সেখানে বসবাস করতে থাকেন।

যদুকুলের পরস্পর হানাহানি ও শ্রীকৃষ্ণের এক ব্যাধের শরাঘাতে মৃত্যুর উল্লেখও এই জাতকে পাওয়া যায়। এছাড়া মহাউম্মগ্‌গ জাতকে কথিত আছে যে দ্বারাবতীতে আধিপত্যে অধিষ্ঠিত দশ ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন বাসুদেব। এঁরা ছিলেন কৃষ্ণ গোত্রের সন্তান। একদিন বাসুদেব রাজপথে পরমাসুন্দরী এক চণ্ডাল-কন্যাকে দেখতে পান। এই চণ্ডালকন্যার নাম ছিল জাম্ববতী। বাসুদেব সেই চণ্ডালকন্যাকে বিবাহ করে অপর রাজ্ঞীদের মধ্যে প্রধানারূপে প্রতিষ্ঠিত করে-ছিলেন। এই জাতকে বাসুদেবের ষোড়শ-সহস্র রানী ছিল বলেও উল্লেখ আছে। (জাতক সংখ্যা ৫৪৬)। অম্বট্‌ঠ্‌ সুত্ত নামে অন্য একটি বৌদ্ধ সূত্রে কন্‌হ নামে এক খ্যাতনামা ঋষির উল্লেখ আছে। এই কন্‌হ ছিলেন ওক্‌কাক নামে জনৈক রাজন্যের দিসা নামে দাসীর সন্তান। ঋষি হিসেবে খ্যাতিলাভ করবার পর কন্‌হ রাজা ওক্‌কাকের কন্যা মদ্দরূপীকে বিবাহ করেছিলেন।

এইসব উপাখ্যান থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে বৌদ্ধ সমাজে বাসু-দেব-কৃষ্ণের সম্পর্কে ব্যাপক পরিচিতি ছিল। যেভাবে এই কাহিনীগুলি বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত হয়েছে তার সঙ্গে পুরাণ বর্ণিত কৃষ্ণ-কাহিনীর বেশ কিছু মৌলিক সাদৃশ্য থাকলেও কিছু কিছু গুরুতর পার্থক্যও আছে। প্রথমত, কন্‌হ কৃষ্ণের মাতা ও পিতার নাম এখানে যথাক্রমে দেবগব্ভা ও উপসাগর বলে অভিহিত হয়েছে। দেবগব্ভা বা দেবগর্ভার সঙ্গে দেবকী নামের সাদৃশ্য থেকে এই উভয়কে এক এবং অভিন্ন বলেই স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের পিতা হিসেবে পরিচিত বসুদেবকে এই পালি সাহিত্যে উপসাগর নামে অভিহিত করা হয়েছে। পুরাণে কৃষ্ণের পিতার বসুদেব ছাড়াও আনক-দুন্দুবি নামের উল্লেখ আছে। আর জৈনসূত্রে উল্লেখ আছে যে কেশব বা কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের সমুদ্রবিজয় নামে এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।[৬] পালি সাহিত্যেও উল্লেখ আছে যে কন্‌হের পিতা উপসাগরের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, যাঁর নাম ছিল মহাসাগর। পালি সূত্রের এই মহাসাগর এবং জৈন প্রাকৃত সূত্রের সমুদ্রবিজয় শব্দদ্বয়ের নৈকট্য থেকে এই অনুমান জাগ্রত হওয়া কিছু অযৌক্তিক নয় যে, কৃষ্ণ-বাসুদেবের পিতার নাম হয়ত আদৌ বসুদেব ছিল না, অন্য কিছু ছিল, যে নামের সঙ্গে সাগর বা সমুদ্র শব্দের কোন শব্দগত বা ভাবগত সাদৃশ্য ছিল।

পুরাণমতে শ্রীকৃষ্ণ মাতার অষ্টম গর্ভের সন্তান। কিন্তু জাতকমতে তিনি মাতা পিতার দশটি সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। পুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের বংশতালিকায় যযাতির

পুত্র যদুর একজন উত্তরপুরুষের উল্লেখ আছে, যার নাম ছিল শূরসেন। শূরসেনের মারিষা নাম্নী পত্নীর গর্ভে বসুদেব আদি দশটি পুত্রের জন্ম হয় (বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৪:২৭)। শূরসেনের পিতার নাম ছিল দেবগর্ভ। পুরাণ ও বৌদ্ধ জাতককাহিনী বিচার করে দেখলে উপলব্ধি করা যায় যে কৃষ্ণ বাসুদেবের বংশ-তালিকা নিয়ে জাতক-রচয়িতাদের বেশকিছু বিভ্রান্তি ঘটেছিল। শ্রীকৃষ্ণ যে তাঁর মাতার অষ্টম গর্ভের সন্তান এই তথ্য পুরাণসংস্কৃতিতে দৃঢ়বদ্ধ। প্রাচীনকালে আট এই সংখ্যাটিকে গভীর তাৎপর্যসম্পন্ন বলে গণ্য করা হত বলে মনে হয়। ভগবান কৃষ্ণ-বাসুদেব মাতার 'অষ্টম' গর্ভের সন্তান। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে তাঁর জন্ম হয়। শ্রীকৃষ্ণের পত্নীর সংখ্যা রুক্মিণী, জাম্ববতী ইত্যাদি আটজন বা আটের গুণিতক চতুঃষষ্টিতী সহস্র! গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রকৃতির সংখ্যা বলেছেন আট :

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেবচ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ গীতা, ৭।৪

শূরসেনের দশ পুত্রের জ্যেষ্ঠপুত্র বসুদেবকেই জাতককারেরা বাসুদেব নামে প্রখ্যাত কৃষ্ণ-কন্‌হের সঙ্গে এক বলে ধরে নিয়েছিল বলে অনুমান করা খুব অযৌক্তিক নয়। মূল পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের পিতা কী নামে পরিচিত ছিলেন তা অনুমান করা দুরূহ। জাতকমতে দেবগর্ভার পিতা মহাকংস এবং দেবগর্ভার দুই ভাই ছিল কংস ও উপকংস। পুরাণের মতে দেবকীর পিতার নাম ছিল দেবক; দেবকের ছিল চার পুত্র—দেববান, উপদেব, সহদেব এবং দেবরক্ষিত। দেবকীর আরও ছিল ছয় ভগিনী—বৃকদেবা, উপদেবা, দেবরক্ষিতা, শ্রীদেবা, শান্তিদেবা এবং সহদেবা। নামের শেষে দেব শব্দের ব্যবহার শ্রীকৃষ্ণের মাতুল পরিবারেই বিশেষ প্রচলিত ছিল; বসুদেবের ভ্রাতাদের মধ্যে দুজনের নামের প্রথম অংশে দেব শব্দ দেখা যায়, যেমন দেবভাগ ও দেবশ্রবা। এই সাদৃশ্য থেকে শ্রীকৃষ্ণের বাসুদেব এবং সংকর্ষণের বলদেব নাম প্রচলিত হওয়ার মধ্যে দেবক নামে মাতামহ এবং মাতুল, মাতা ও বিমাতাদের নামের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এই যুক্তিতেই শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব পরিবার প্রদত্ত নাম বাসুদেব ছিল বলেই মনে হয়। পরে আনক-দুন্দুভি নামে পরিচিত তাঁর পিতা বাসুদেবের পিতা বসুদেব নামে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুব অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। একটি অন্য যুক্তিও এই প্রসঙ্গে মনে আসে। যদি

বসুদেবের পুত্র হিসেবেই বাসুদেব নামের উৎপত্তি হয়ে থাকে তবে জ্যেষ্ঠ পুত্র সংকর্ষণেরই বাসুদেব নামে পরিচিত হওয়ার দাবি ছিল বেশী। কিন্তু তাঁকে কোথাও বাসুদেব নামে অভিহিত হতে দেখা যায় না। এই নামের যুক্তি থেকেই মনে হয় বাসুদেব, বলদেব উভয় নামই এই শৌরসেনী ভ্রাতৃদ্বয়ের নিজ নিজ ব্যক্তিগত নাম ছিল, পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত নাম ছিল না। বৌদ্ধ অম্বট্‌ঠ সুত্তে কথিত আছে যে ওক্কাক নামে এক রাজার 'দিসা' নাম্নী এক দাসীর গর্ভে একটি কৃষ্ণকায় শিশুর জন্ম হয়েছিল। এই নবজাত শিশু জন্মের পরই মাতাকে বলেছিলেন—'হে মাতা আমাকে স্নান করিয়ে দেও।' এই অলৌকিক ঘটনা লক্ষ করে নবজাত শিশুকে কৃষ্ণবর্ণের দৈত্য বলে অভিহিত করা হয়েছিল। এই থেকে অম্বষ্ঠজাতীয় (সংকর বর্ণের) শ্রেণী কানহায়ন (কৃষ্ণ=কান্‌হ= কানহায়ন) নামে পরিচয় লাভ করে। অম্বট্‌ঠ সুত্তের এই কাহিনীর ভিত্তিতে আর. জি. ভাণ্ডারকার বাসুদেবের 'কৃষ্ণ' নামটিকে গোত্রনাম বলে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।[৭] বৌদ্ধ অম্বট্‌ঠ সুত্তে ওক্কাকের দাসীগর্ভজাত বলে বর্ণিত কন্‌হ এবং শৌরসেন বংশের 'কৃষ্ণ' যে এক, এ সিদ্ধান্ত কোন মতেই সুনিশ্চিত করা যায় না। বিভিন্ন সূত্রে বাসুদেব-কৃষ্ণকে ঋষি আখ্যায়[৮] (মহাভারত ৩৬।১২) অভিহিত করা হয়ে থাকলেও কৃষ্ণ নামের হয়ত একাধিক ঋষি ছিলেন, যাঁদের মধ্যে একজনের রচিত কিছু মন্ত্রের উল্লেখ ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। (কৃষ্ণ আঙ্গিরস—৮।৮৫, ৮৬, ৮৭—অয়ম্ ভাম্ কৃষ্ণ অশ্বিনাইবতে)। এ ছাড়া সায়ন তাঁর ঋগ্বেদের ভাষ্যে অংশুমতী নদীর তীরে বসবাসকারী 'কৃষ্ণ' নামে এক মহাবলপরাক্রমশালী অসুরের উল্লেখ করেছেন (৮।৯৬ ; ১৩-১৫)। ব্যক্তিনাম হিসেবে 'কৃষ্ণ' শব্দের প্রচলনের কথা ঋগ্বেদে উল্লেখ থাকায় অতি প্রাচীনকাল থেকেই ব্যক্তিনাম হিসেবে কৃষ্ণ শব্দের প্রচলন ছিল এবং বর্ণ হিসেবে অর্থবহ শব্দটির অন্য কোন গূঢ় অর্থও ছিল, এ কথা মনে হওয়া কিছু অযৌক্তিক নয়। ঋগ্বেদেই এক জায়গায় সূর্যকে 'কৃষ্ণ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। দেবতা হিসেবে সূর্য যে ইন্দ্র অনুরাগী সমাজে খুব প্রিয় ছিলেন না, এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৯৬ সংখ্যক মন্ত্রে উল্লিখিত এক 'কৃষ্ণকে' অসুর আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজের মানুষেরা প্রায়শ অসুর, দাস ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েছেন দেখা যায়। ইন্দ্রের অনুগত আঙ্গি

—ংসের পুত্র ঋষি কুৎসের প্রতিদ্বন্দ্বী দাস কৃষ্ণ সম্ভবত সূর্যের উপাসক ছিলেন। এই সূত্রেই মনে হয় কৃষ্ণ শব্দকে সূর্যেরই প্রতিরূপ বা সূর্যেরই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ নাম বলে গণ্য করা হত। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সম্বন্ধে পরাশর মুনির কথিত একটি শ্লোকের উল্লেখ করা যেতে পারে :

তত্তোঽখিলজগৎপদ্মবোধায়াচ্যুতভানুনা।
দেবকীপূর্বসন্ধ্যায়ামাবির্ভূতং মহাত্মনা॥ (বিষ্ণু ৫।৩:২)

—অর্থাৎ সকল জগৎরূপ কমলকে উদ্বোধিত করবার জন্য অচ্যুতরূপ ভানু (বা সূর্য) দেবকীগর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন। এই শ্লোকেই ভগবান অচ্যুত ভানু অর্থাৎ স্বয়ং সূর্যদেবই যে দেবকীগর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন এই প্রত্যয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সূত্রেই নবজাতকের নাম হিসেবে কৃষ্ণ শব্দের প্রয়োগ হয়েছিল বলে সিদ্ধান্ত করা হয়ত খুব অযৌক্তিক হবে না। সূর্যের অভ্যন্তরস্থ পরমপুরুষই পুরুষোত্তম বাসুদেব কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভাগবতপুরাণেও দেবকী-গর্ভস্থ জাতককে জগন্মঙ্গলস্বরূপ অচ্যুতাংশ বলে অভিহিত করা হয়েছে—

ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্বাত্মকমাত্মভূতং কাষ্ঠা যথাঽনন্দকরং মনস্তঃ॥
(ভাগবত ১০।২:১৮)

এখানেই জন্মক্ষণে চতুর্ভুজ শঙ্খগদাধর শ্রীবৎসলক্ষণযুক্ত নবজাতককে কৃষ্ণাবতাররূপে বর্ণনা করা হয়েছে। (ভাগবত ১০।৩:১১)

এই কৃষ্ণাবতার আখ্যাসূত্রেই তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে পরিচয় ও খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এই কৃষ্ণ যে স্বর্গস্থিত সূর্যরূপী পরিদৃশ্যমান জ্যোতিঃপুঞ্জ, ভাগবতের অন্য একটি শ্লোকেও যেন সুস্পষ্টভাবে সেই ইঙ্গিত করা হয়েছে :

স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া বিভর্ষি শুক্লং খলু বর্ণমাত্মনঃ।
সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং কৃষ্ণঞ্চ বর্ণে তমসা জনাত্যয়ে॥
(ভাগবত ১০।৩:২০)

বৌদ্ধ সাহিত্যের ভিত্তিতে শ্রীকৃষ্ণকাহিনীর প্রাচীনত্ব

সদ্যোজাত পুত্রকে আনক দুন্দুবি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ যমুনা নদী অতিক্রম করে নন্দগোপগৃহে রেখে এলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যের বর্ণনায় এই গোপগৃহের অধিপতির নাম ছিল অন্ধকবেণু এবং তাঁর পত্নী ছিলেন নন্দগোপা, যিনি পুরাণের

বর্ণনায় শিশু কৃষ্ণের পালিকা মাতা যশোদা। বহুকাল ধরে প্রচলিত এইসব কাহিনীতে সন্তান-বিনিময়রূপ মূল ঘটনার তেমন ব্যতিক্রম ঘটে না থাকলেও নবজাতকের পিতামাতা এবং পালক দম্পতির নামের কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে।

উপদেশমূলক কাহিনী বর্ণনার মাধ্যমে ভগবান বুদ্ধের মাহাত্ম্য প্রচারে যে জাতককাহিনীগুলি গ্রথিত হয়েছিল সেই জাতককাহিনীর পেছনে সূত ও মাগধদের দ্বারা রক্ষিত প্রাচীন বহু ঘটনাভিত্তিক উপাখ্যানই যে উপজীব্য ছিল, একটু অভিনিবেশের সঙ্গে পরীক্ষা করলে সহজেই সে কথা বুঝতে পারা যায়। জাতকে বর্ণিত দশরথকাহিনী, শিবিকাহিনী, বিদুরপণ্ডিতকাহিনী ইত্যাদি বহু কাহিনীই যে মহাভারত, রামায়ণ এবং পুরাণে গ্রথিত নানা কাহিনী-রূপ উৎস থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ আসতে পারে না। সূত ও মাগধ জাতীয় কথাকারদের মতই মঙ্খচিত্র রচনাকারী সম্প্রদায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিল, জাতকের কাহিনী গ্রন্থনে এবং পট-চিত্রের রীতিতে উৎকীর্ণ ভারহুতের স্তূপপ্রাচীরে, বোধগয়ার চক্রমবেষ্টনীর স্তম্ভ-সমূহে এবং সাঁচীর স্তূপতোরণে উৎকীর্ণ ব্যাপক দৃশ্যচিত্রণ থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। ঘটপণ্ডিত জাতকে কন্‌হ-কৃষ্ণ সম্পর্কে যে বিবরণ আছে তাতে ভগবান কৃষ্ণের জন্ম, কংসের ভয়ে তাঁকে গোপগৃহে সমর্পণ, সেখানে তাঁর দৌরাত্ম্যের কথা এবং কংসের আমন্ত্রণে কংস-রাজধানীতে এসে প্রথমে চাণূর এবং মুষ্টিককে হত্যা ও পরে চক্র-নিক্ষেপে কংসের শিরশ্ছেদন পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এই বিবরণ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনভিত্তিক, যার সমর্থন পুরাণগুলিতে বিধৃত শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, তাঁকে নন্দগৃহে সমর্পণ ও বৃন্দাবন থেকে মথুরায় উপনীত হয়ে চাণূর ও মুষ্টিক এবং কংসবধের কাহিনী থেকে সুস্পষ্টভাবেই পাওয়া যায়। এই জাতককাহিনীগুলি নিশ্চিতভাবেই খ্রীস্টের জন্মের বেশ কয়েক শতাব্দী আগে থেকেই প্রচলিত ছিল, যার প্রমাণ খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে উৎকীর্ণ ভারহুতের স্তূপপ্রাচীরের জাতককাহিনী থেকে সুস্পষ্ট। ভারহুতে বা অন্য কোন বৌদ্ধ রূপশিল্পে 'কৃষ্ণ' কাহিনীর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না; তার কারণ সম্ভবত এই যে শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনাভিত্তিক ভাগবতধর্ম সাধারণ মানুষের সমাজে অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ ছিল এবং প্রতিদ্বন্দ্বী এই ধর্মপ্রবাহকে শিল্পের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা দেওয়ার কোন উৎসাহ শিল্পীদের ছিল না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-জীবনলীলার কাহিনী যে খ্রীস্টের জন্মের বহু পূর্ব থেকেই জনসমাজে প্রচলিত

ছিল জাতকে বিধৃত ঘটপণ্ডিতকাহিনীতে তার সাক্ষ্য সুস্পষ্ট। এছাড়া মহা-উম্মগ্‌গ জাতকে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক জাম্ববতীকে বিবাহের যে আখ্যান বিবৃত হয়েছে তাতে বিস্তৃত শ্রীকৃষ্ণজীবনই যে জনসমাজে পরিচিত ও প্রচলিত ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে নিদ্দেশ নামে পরিচিত গ্রন্থে বাসুদেব এবং বল-দেবের যে দেবতা হিসেবে পূজার প্রচলন ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়; পাণিনি ও পতঞ্জলির রচনায় এবং পূর্বে বর্ণিত খ্রীস্টপূর্ব কালের লেখগুলি থেকেও তার প্রমাণ সুস্পষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন যে খ্রীস্টজন্মকালের পূর্বে ভারতে পরিজ্ঞাত ছিল না এবং পরবর্তীকালে কিছু বহিরাগত মানুষের দ্বারা নিয়ে আসা খ্রীস্টজীবন-কাহিনী অবলম্বনেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যজীবনের উপাখ্যান গড়ে তোলা হয়েছিল—এই প্রচার যে নিতান্তই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ভিত্তিহীন তা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

গোকুল ও বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ

ভগবান ব্যাসদেবের সংকলিত পুরাণের পুরু-ভরতবংশের তালিকা ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু, এঁদের সন্তানবর্গ ও পরীক্ষিতের রাজ্যলাভে পরিসমাপ্তিলাভ করেছিল। ব্যাসদেব স্বয়ং এই পরিবারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন, এবং ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু নিয়োগপ্রথায় উৎপন্ন ভগবান ব্যাসেরই সন্তান। ভৃগুবংশীয় বাল্মীকি যেমন ইক্ষ্বাকুপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাসূত্রে রামায়ণ রচনা করেছিলেন, সেইমত ভগবান বেদব্যাস ভারতকাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। বাল্মীকির রামায়ণ-কাব্যে ইক্ষ্বাকুনায়ক রামচন্দ্রই ভগবান বিষ্ণুর অবতাররূপে বর্ণিত মূল চরিত্র। বেদব্যাস রচিত কাহিনীর আধার ভরতবংশ হলেও এই কাহিনীতে ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণকেই বিষ্ণুর পূর্ণ প্রকাশ বলে রূপায়িত করা হয়েছে। বেদ পরি-কল্পনার বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে সূর্য, যম, বায়ু, ইন্দ্র, নাসত্য ইত্যাদি নানা দেবতার লীলাপ্রকরণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, সেইসঙ্গে ভগবান বিষ্ণুকে সকল দেবতার অগ্রগণ্য ও আশ্রয়স্থল হিসেবেও কীর্তিত করা হয়েছে। ভারতকাহিনী যেন বেদবিধৃত এই দৈবীলীলারই প্রতিরূপায়ণ, যেখানে মাতা অদিতির গর্ভজাত দেবতাদের মত মাতা কুন্তীর গর্ভে দেবতারাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আর সেই-সঙ্গে দেবকী নামা অদিতির গর্ভে ভগবান বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

দেবতারা যেমন ভগবান বিষ্ণুর আনুকূল্যে অসুর নিধন করে পৃথিবীকে ভারমুক্ত করেছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তেমনি ধরণীকে ভারমুক্ত করেছিলেন অধর্মের অপসারণের দ্বারা। অবতাররূপী শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং রাবণ বধ করেছিলেন কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিমিত্তমাত্র অংশগ্রহণ করেছিলেন বিপুল ভারত-সংঘর্ষে। মহামতি ব্যাস ভগবান বাসুদেব-শ্রীকৃষ্ণের এই লীলামাহাত্ম্য তাঁর মহাসৃষ্টি ভারতকাহিনী দ্বারা প্রচারিত করেছিলেন; বিপুল ভারত-ভূখণ্ডের একচ্ছত্র রাজচক্রবর্তী পুরু-ভরত পরিবারের রাজগুরু ঋষি বসিষ্ঠ বংশোদ্ভূত মহামতি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব সেই ভরতবংশের সান্নিধ্য ও ঘনিষ্ঠতাসূত্রে বিপুল দৈবীসত্তায় সমৃদ্ধ, বহু ঐশ্বর্য-মণ্ডিত ভগবান বাসুদেবকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন, অনুধাবন করেছিলেন এবং আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর মধ্যে দেবদেব ভগবান বিষ্ণুর সামগ্রিক মহিমা। কুরু-ভরত পরিবারের রাজপুরোহিত মহর্ষি ব্যাসের গ্রামভিত্তিক গোপসমাজের প্রতি তেমন আকর্ষণ ছিল না, হয়ত এই কারণে বৃন্দাবনের গোপ মাতা-পিতা লালিত ভগবান কৃষ্ণের বাল্যজীবনের প্রতি তিনি তেমন উৎসাহ বোধ করেননি। কিন্তু কৃষ্ণ-বাসুদেবের এই প্রারম্ভিক জীবন সম্বন্ধে তিনি যে অজ্ঞ ছিলেন না, মহাভারতের বিভিন্ন অংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই প্রারম্ভিক জীবনের নানা ঘটনার উল্লেখ থেকে সে কথা উপলব্ধি করা যায়। কৌরব রাজসভায় পাণ্ডবপক্ষ থেকে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে এসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহু জ্ঞানগর্ভ কথা বলেছিলেন, মহাভারতে তার উদ্ধৃতি আছে। এই প্রসঙ্গেই তিনি যে পিতা উগ্রসেনের সিংহাসন অধিকারকারী লোভী কংসকে হত্যা করেছিলেন সেই বিবরণ প্রদান করেন।[৯] কংসের দুই মহিষী অস্তি এবং প্রাপ্তি ছিলেন মগধের দোর্দণ্ডপ্রতাপ অধিপতি জরাসন্ধের কন্যা। শ্রীকৃষ্ণের হাতে কংসের মৃত্যু ঘটলে তাঁর মহিষীদ্বয় দুষ্ট পতিহন্তার শাস্তিবিধান করবার জন্য পিতার শরণাপন্ন হন। জরাসন্ধের আক্রমণের আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বজাতিবর্গ যাদব, বৃষ্ণি, অন্ধক ও শৌরসেনীয়দের নিয়ে দ্বারকায় রাজধানী স্থাপন করেছিলেন এই তথ্যও মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের মুখে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।[১০] এর পর শ্রীকৃষ্ণের উৎসাহে পাণ্ডববীর ভীমসেন জরাসন্ধকে নিহত করেন। এই প্রসঙ্গে মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে গোকুল থেকে আগত যে কৃষ্ণ কংসকে বধ করেছিলেন তিনিই পাণ্ডবদের বন্ধু এবং পরামর্শদাতা রূপে পাণ্ডবদের জরাসন্ধবধে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।[১১] এছাড়া শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র বাল্যজীবনই যে মহাভারত স্রষ্টার জ্ঞাত ছিল যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে আহূত রাজন্যবর্গের

সম্মুখে চেদীরাজ শিশুপালের মুখে আরোপিত কৃষ্ণনিন্দা থেকে তা জানা যায়। এই যজ্ঞসভায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছিল, চেদীরাজ শিশুপালের পক্ষে তা স্বীকার করে নেওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল। প্রভূত বিরক্তি এবং ক্রোধের সঙ্গে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে ঘৃণা প্রদর্শন করবার জন্য যে-সব বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন তাতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন সম্পর্কে বিশেষ বিস্তৃত জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শিশুপাল অভিযোগ করেছেন—শ্রীকৃষ্ণ নারীহন্তা, তিনি পুতনাকে হত্যা করেছিলেন। তিনি নৃশংস পশুঘাতী; অশ্ব, এমনকি পক্ষী-হত্যায়ও তাঁর হাত কলঙ্কিত। তা ছাড়া তাঁকে দানব হিসেবেও অভিযুক্ত করা যেতে পারে, কারণ তিনি এক বৃহৎ শকট পা দিয়ে ভেঙে দিয়েছিলেন এবং বিপুল গোবধনপর্বত সাতদিন ধরে তুলে রেখেছিলেন। সর্বশেষের অভিযোগ এই যে, কৃষ্ণ কংসকে হত্যা করেছেন, যে কংসের তিনি ছিলেন অন্নদাস। বস্তুত এইসমস্ত অভিযোগই অভিজাত সমাজের উচ্চতর রুচির পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে নিন্দার্হ বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু মহাভারতকাহিনীতে শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেব সেই অভিজাত বীরত্বগর্বী সমাজের পক্ষেও আদর্শ পুরুষ; সাধারণে উপলব্ধি করতে না পারলেও তিনি যে স্বয়ং ভগবান, ব্যাসদেবের নিকট এ কথা সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যাবস্থার কীর্তিগুলি অলৌকিক এবং ঐশীশক্তির প্রকাশক বলে সম্ভবত তাঁর কাছে প্রতীয়মান হয় নাই। মহাভারত-কাহিনীতেও শ্রীকৃষ্ণ-ভগবান সাধারণ্যে তেমন কোন অলৌকিক শক্তির প্রকাশ করেছেন বলে উল্লিখিত হয়নি। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে কৃষ্ণনাম স্মরণে তাঁর পরিধেয়ের অন্তহীন বিস্তৃতি, সূর্যপ্রদত্ত থালিতে লেগে থাকা কণামাত্র খাদ্য শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করলে ঋষি দুর্বাসা ও তাঁর শিষ্যবর্গের ক্ষুধার নিবৃত্তি, চক্রান্ত করে দুর্যোধন বাসুদেবকে বন্দী করবার চেষ্টা করলে অলৌকিক কৌশলে তাঁর মুক্তি-লাভ, এমনকি অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপদর্শনরূপ চরম অলৌকিকত্বও অতি স্বল্প-সংখ্যক লোকের দ্বারা দৃষ্ট বা উপলব্ধ হয়েছিল। সাধারণকে হতচকিত করে নিজের মহিমা প্রচারের জন্য তিনি এইসব অলৌকিক কীর্তি সংঘটিত করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ যে প্রকাশ্যে নিজের স্বরূপ উদ্ঘাটনে বিন্দুমাত্রও আগ্রহী ছিলেন না, আদর্শ পুরুষরূপেই তাঁর আবির্ভাব, ব্যাসদেব অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে এই তত্ত্ব ও তথ্য প্রসারিত করেছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই মনে হয় শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ও বাল্যজীবনের নানা ঘটনা তাঁর দানবত্ব বা অসুরত্বের পরিচায়ক বলেই ব্যাসের

নিকট পরিগণিত হয়েছিল। সেইজন্যই শিশু ও কিশোর কৃষ্ণের জীবন সম্বন্ধে তাঁর তেমন উৎসাহ ছিল না। তবে তিনি যে তাঁর বাল্যজীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন, এ তথ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস খুব যুক্তিসহ নয়। মহাভারতে সন্নিবিষ্ট উপরের তথ্যগুলির সবকিছু প্রক্ষিপ্ত বলে গণ্য করাও তেমন যুক্তিগ্রাহ্য নয়। মূল ভারতকথায় এগুলির উল্লেখ ছিল না, এ কথা যেমন দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় না, তেমনি বর্তমান মহাভারত রচিত হওয়ার পর এগুলি মহাভারতে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া হয়েছিল এমন সিদ্ধান্ত করাও সম্ভব নয়। ব্যাসদেব যে সমাজের ঋষিরূপে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, ব্রজধামের গোপসমাজ সেই সাম্রাজ্য পরিচালনায় অধিষ্ঠিত পরমশক্তিধর ঐশ্বর্য ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয় সমাজ থেকে কিছু দূরে অবস্থিত ছিল। রাজপদে অধিষ্ঠিত কংস বা সাত্বত পরিবারে গোকুলের 'গৌরক্ষা বাণিজ্য'জীবী বৈশ্য পরিবারের ব্যক্তিদের পরিচারকরূপে কর্মে নিযুক্ত থাকা কিছু অসম্ভব ছিল না; কিন্তু এই পরিচারক বৃত্তির ফলে তারা দাস পর্যায়ে গণ্য হত না। নন্দগোপ বা তার পত্নীর মথুরার রাজপরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব বলে গণ্য করা যায় না, তেমন ঘনিষ্ঠতা না থাকলে বসুদেব কথনই তাঁর পুত্রকে সেই গোপদম্পতির রক্ষণাধীনে রেখে আসতে পারতেন না। সেই পরিচারক পর্যায়ের গোদুগ্ধ বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকা অর্জনকারী সমাজের সম্পর্কে ব্যাসদেবের নিজের ঘৃণা বা উপেক্ষা না থাকলেও উচ্চ রাজপদের অধিকারী শিশুপাল আদির গভীর উপেক্ষা ছিল। সেইসঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, সুত ও মাগধেরা অতীত কাহিনীর সংকলক ও প্রচারক, তাদেরও প্রধান অবলম্বন ছিল রাজন্য এবং ঋষি সম্প্রদায়কে উপজীব্য করে কাহিনী রচনা করা। পুরাণসমূহে ঋষি এবং রাজন্য সম্প্রদায়ের বংশতালিকা বা কীর্তি ভিন্ন অন্য কোন তথ্য বড় নাই; বৈশ্য এবং শূদ্র সম্প্রদায় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। কিন্তু বৈশ্যদের যথেষ্ট অর্থবল ছিল, সংগঠনপ্রবণতা অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ ছিল, সমাজকে অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী করে রাখায় তাদের যথেষ্ট কৃতিত্ব ও দায়িত্ব ছিল। ভগবান কৃষ্ণ যে দুগ্ধজীবী গোপসমাজে লালিত হয়েছিলেন সেই সমাজের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা ও সেই উচ্চতর দুই সমাজের গোপসমাজের উপর যে উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল শ্রীকৃষ্ণের সে-কথা উপলব্ধি হয়েছিল, পুরাণে বর্ণিত নানা কাহিনী থেকে তা বোঝা যায়।

শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ও কৈশোর জীবনের স্বীকৃতি

মহাভারতের সংকলনে বহুবিধ আখ্যায়িকা, কাহিনী ও উপাখ্যানের সমাবেশ দেখা যায়। এই সংকলনের মূল আখ্যান পুরু-ভরত কাহিনীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেব ভরতবংশীয় না হলেও কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে কীর্তিত। কৌরব এবং পাণ্ডব রাজপুত্রেরা দ্বিতীয় প্রধান স্থানে অধিষ্ঠিত। এই রাজপুত্রদের স্থান দ্বিতীয় পর্যায়ের হলেও এই কাহিনীতে এদের বাল্যাবস্থা থেকে ক্রমপরিণতির বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় চরিত্র পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই কাহিনীতে উপস্থিতি বেশ পরিণত বয়সে, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সমাবেশে বিভিন্ন অঞ্চলের রাজন্যবর্গের সঙ্গে। মহাভারতকাহিনীতে শ্রীকৃষ্ণের প্রাথমিক জীবনের পরিচয়ের অভাব থেকে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। মহাভারতে বর্ণিত সমাজে জন্ম ও বৃত্তিগত বিভেদের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। এই সমাজে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরাই ছিল শীর্ষস্থানীয়। অন্যদের বড় একটা মর্যাদা ছিল না। পাঞ্চাল রাজবংশের দুহিতার স্বয়ম্বরসভায় অনেকেই উপস্থিত ছিল। কিন্তু লক্ষ্যভেদের প্রতি-যোগিতায় রাজন্যবর্গেরই প্রাধান্য ছিল। সুতবংশোদ্ভব বলে পরিচিত মহা-পরাক্রম কর্ণ লক্ষ্যভেদের উদ্যম নিলে পাঞ্চালীর বিরোধিতার ফলে তাঁকে বিরত হতে হয়। কিন্তু অর্জুন ব্রাহ্মণবেশধারী হিসেবে ব্রাহ্মণসন্তানরূপে গণ্য হলেও তাঁর লক্ষ্যভেদের প্রতিযোগিতায় কোন প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়নি। কৃষ্ণ বলরাম এই সমাবেশে উপস্থিত থাকলেও তাঁদের সেই প্রতিযোগিতায় সুযোগ গ্রহণ করবার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাঁদের তখনও উদ্ভিন্ন যৌবনাবস্থা। নিশ্চিতভাবেই তাঁদেরও লক্ষ্যভেদ করবার সামর্থ্য ছিল। তবে কি গোপসমাজে লালিত হওয়া সূত্রে তাঁদের প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সম্ভাবনার ফলেই তাঁরা প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে অগ্রসর হননি। বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়, পুরাণের মূল বলে প্রতীয়মান বংশাবলী সম্বলিত চতুর্থ অংশে যদু-সাত্বত বংশতালিকায় বাসুদেবের উল্লেখ ও সাত্বত বংশের সত্রাজিৎ প্রসঙ্গে সামন্তকমণি সম্পর্কিত ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানেও আনক দুন্দুবির পত্নী দেবকীর সন্তান হিসেবে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব সংক্ষেপে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের তাবৎ শৈশব ও কৈশোরজীবনবৃত্তান্ত একটি স্বতন্ত্র অংশে (পঞ্চম অংশে) পরে সংযোজিত হয়েছিল, এ কথা মনে করা খুব অযৌক্তিক নয়; কারণ এই কাহিনীতে মূল কেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হলেও এই কৃষ্ণ গোপাল-কৃষ্ণ, বাসুদেব-কৃষ্ণ

নন। অন্যান্য পুরাণেও গোকুল এবং বৃন্দাবন আশ্রিত শ্রীকৃষ্ণজীবনলীলা মূল গ্রন্থ থেকে বেশ স্বতন্ত্রভাবেই সন্নিবিষ্ট দেখা যায়, যা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া হয়ত অযৌক্তিক নয় যে শ্রীকৃষ্ণজীবনের এই গোপসমাজ সংস্পৃক্ত অংশ মূল পুরাণে সংকলিত ছিল না ; পরে বৈষ্ণবীয় পুরাণের কয়েকটিতে এই কাহিনী সন্নিবিষ্ট করে দেওয়া হয়। এইসব তথ্য থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব থেকে তাঁর তিরোধান পর্যন্ত ঘটনাবলী অবলম্বনে একটি কাহিনী যখন রচিত হয়েছিল তখন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মহাভারতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক কাহিনীসমূহকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে শ্রীকৃষ্ণের গোকুল ও বৃন্দাবনের জীবনের ঘটনাগুলি মহাভারতকারের অজ্ঞাত ছিল না ; মহাভারতের মধ্যে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনকাহিনী যখন সন্নিবিষ্ট হয় তখন শ্রীকৃষ্ণের গোপজীবনভিত্তিক কাহিনী সবিশেষ প্রচারলাভ করেছিল, এই গোপাল-কৃষ্ণ সম্পর্কে কিছু কিছু স্বীকৃতিও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল।

সমাজ হিসেবে এই গোপ সম্প্রদায় ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ, সহজ এবং নদী পর্বত বৃক্ষলতা পশুপক্ষী পরিবৃত প্রকৃতির অতি নিকট ও নির্ভরশীল। গোচারণ এবং দুগ্ধোৎপাদনই ছিল তাদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। সুপ্রাচীন ঋগ্বেদের কাল থেকেই গোধন সমাজের প্রধান সম্পদ বলে গণ্য হত। ক্রমে সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নগর-সভ্যতার বিস্তৃতি হওয়ার ফলে গোচারণ ও দুগ্ধোৎপাদন গ্রামীণ উপজীবিকায় পরিণত হয়। কিন্তু গোসম্পদ নির্ভরশীল হিসেবে গোপ সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের পরিচয় ঋগ্বেদেই পাওয়া যায়। যারা ধেনুকে খাদ্য হিসেবে যব দিত তাদের ঋগ্বেদে সুগোপা বলে উল্লেখ করা হয়েছে দেখা যায়।[১২] মহাভারতে এই গোপদের নৃত্য-বাদ্যবাদনে কুশলতা সম্পন্ন বলে অভিহিত করা হয়েছে। (অতো গোপা প্রগাতারঃ কুশলা নৃত্য-বাদনে)[১৩]। যমুনার তীরব্যাপী বিস্তীর্ণ তৃণভূমি, তারই প্রান্তে ফলবান বৃক্ষে সমৃদ্ধ বনের সমারোহ। ব্রজের এই যৌথ চারণক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ বিচরণশীল সংখ্যাহীন ধেনু-বৎসের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ গোপসমাজের উদ্বেগহীন নিস্তরঙ্গ জীবনে দুর্মদ এই শিশুর আবির্ভাবে এক মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। বৈষ্ণব পুরাণসমূহে বিশেষ অনুরাগের সঙ্গে শিশু ও কিশোর কৃষ্ণের দ্বারা সংঘটিত ভিন্ন ভিন্ন অবিশ্বাস্য ঘটনার বিবরণ পাঠকের মনে বিস্ময় ও কৌতূহলের সঞ্চার করে। স্বভাবতই এই ঘটনাগুলির সহায়তায় শিশু ও কিশোর কৃষ্ণের অলৌকিকত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস

অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে মহাভারতে কৃষ্ণ-বাসুদেবের এই ধরনের অলৌকিক সামর্থ্যের তেমন প্রকাশ কোথাও নাই। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের যে সামান্য কয়েকটি অলৌকিক কৃত্যের উল্লেখ আছে সেইসমস্ত অত্যন্ত সীমিত-সংখ্যক মানুষেরই প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। এখানে কিন্তু সমগ্র গোপসমাজই যশোদাদুলাল এই বালকের অবিশ্বাস্য কার্যাবলী দৃষ্টে চমৎকৃত এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। চেদীরাজ শিশুপাল যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের সভায় কৃষ্ণকে যে-সব অপরাধসূচক কাজের জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন, পুরাণে সেইসব ঘটনারই বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত আছে।

এইসব ঘটনার প্রথমটি পুতনা বধ। পুতনা মূলত এক রাক্ষসী বা যাতুধান (পুতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিবাসনা)।[১৪] অপরূপ বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত প্রভৃত রূপবতী স্নেহপরায়ণা এক নারীর রূপে বালঘাতিনী এই পুতনা বিষলিপ্ত স্তনের দ্বারা কৃষ্ণকে নিহত করবার প্রয়াস করে শিশুর প্রবল চোষণে নিজস্ব রাক্ষসীর ভয়ানক রূপ ধারণ করে দেহত্যাগ করে। রাক্ষসেরা যে মায়াবী এবং ইচ্ছামত যে-কোন রূপ ধারণে সক্ষম—বেদের কাল থেকে প্রচলিত এই বিশ্বাস তখনও যে সমাজে ছিল এই কাহিনীতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই ঘটনার পর দুরন্ত শিশু যাতে ইচ্ছামত ইতস্তত যেতে না পারে সে-সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য গৃহপ্রাঙ্গণে এক শকটের তলায় শুইয়ে রাখা হত। একদিন স্তনপ্রার্থী রোরুদ্যমান শিশুর পদপ্রহারে সেই বিশাল, বহু দুগ্ধভাণ্ডে ভারগ্রস্ত শকট উল্‌টিয়ে ফেলায় গোপগণের মনে পরম বিস্ময় জাগ্রত হয়। চঞ্চল শিশুকে একদিন কোমরে দড়ি বেঁধে উদূখলের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল। সেই উদূখলকে আকর্ষণ করে হামা দিয়ে শিশু প্রাঙ্গণস্থ, নিকট সান্নিধ্যে উৎপন্ন দুই অর্জুনগাছের মাঝখানে এনে প্রবলভাবে আকর্ষণ করলে দৃঢ়মূল দুই অর্জুনবৃক্ষ ভূমি থেকে উন্মূলিত হয়ে পড়ে।

এইসব অঘটনে নন্দ-যশোদাসহ সমস্ত গোপসমাজে গভীর ভীতির সঞ্চার হয়। তাদের সন্দেহ হয় যে কোন অনিষ্টকারী শক্তি তাদের বিরুদ্ধাচরণ করছে। তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে গোকুল পরিত্যাগ করে বৃন্দাবনে বসতি স্থাপন করে। এখানে কৃষ্ণের বাল্যাবস্থা। বৃন্দাবনের গোচারণভূমির সন্নিকটে ছিল যমুনার বারিতে পুষ্ট এক বিরাট হ্রদ। এই হ্রদ ও তার সমীপবর্তী অঞ্চল ছিল কালিয় নামে পরিচিত এক মহানাগের অধীন। গোপদের ধেনু সেই হ্রদের জল পান

করলে বিনষ্ট হত ; কালিয় নাগের ভয়ে গোপসমাজে আতঙ্কের সঞ্চার হয়েছিল। বালক কৃষ্ণ একক সেই হ্রদে ঝাঁপিয়ে পড়ে নাগরাজ কালিয়কে দমন করলেন ; ভীতিগ্রস্ত কালিয়ের পত্নীরা করজোড়ে স্বামীর প্রাণভিক্ষা করলে, বৃন্দাবন অঞ্চল পরিত্যাগ করে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে কৃষ্ণ তাকে মার্জনা করেন।

এই কালিয় কাহিনী ও তার ফলশ্রুতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই কাহিনীসূত্রেই হয়ত 'একভাব শরীরজ্ঞ একদেহ দ্বিধাকৃত' সংকর্ষণ ও বাসুদেব নাগসমাজের দ্বারা উপাস্যরূপে গৃহীত হয়েছিল, একথাও উল্লেখ করা হয়েছে। নাগপূজক এক শক্তিশালী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের পরিচয় যেমন প্রাচীন হিন্দুসাহিত্যে ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণে পাওয়া যায়, বৌদ্ধদের মধ্যেও সেই নাগদের সম্বন্ধে চেতনা বহুলপ্রচলিত ছিল সে-সম্বন্ধেও নানা তথ্যের উল্লেখ করা যায়। ভারহুত, সাঁচী ইত্যাদি প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত স্তূপ-প্রাচীরে নাগফণা শীর্ষক বহু মানুষের মূর্তিকে ভগবান বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা অবস্থায় দেখান হয়েছে। দক্ষিণভারতের অমরাবতীতে যে-সব বৌদ্ধশিল্পের অস্তিত্ব আছে তাতে নাগ সম্প্রদায়ের দ্বারা ভগবান বুদ্ধের আরাধনার ব্যাপক পরিচিতি আছে। বৌদ্ধধর্মের খ্যাতনামা ব্যাখ্যাকর্তাদের মধ্যে গ্রীক অধিপতি মিনেণ্ডারের গুরু নামে পরিচিত নাগসেন এবং মহাযানপথের অন্যতম প্রবর্তক নাগার্জুন প্রত্যক্ষভাবেই নাগসম্প্রদায় সম্ভূত বলে পরিচিত। এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতককাহিনীতে বিধৃত এলপত্র নাগের কাহিনী খুবই উল্লেখযোগ্য। নাগরাজ এলপত্র এক অভিশাপের ফলে অপরিবর্তনীয় নাগশরীরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিলেন। পরে ভগবান বুদ্ধের অনুগ্রহে মনুষ্যদেহ পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে ভগবান বুদ্ধের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাপরবশ হয়েছিলেন। ভারহুতের স্তূপপ্রাচীরে এলপত্র জাতকের যে দৃশ্যরূপায়ণ পরিলক্ষিত হয় সেই দৃশ্যপটে পঞ্চফণাযুক্ত মহাসর্পরূপে এলপত্রের মাথার উপরে নৃত্যপর একটি অল্পবয়স্ক মানুষের মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। নীচে মানুষের দেহে মাথার উপরে পাঁচটি নাগফণা শোভিত এলপত্র ভগবান বুদ্ধের প্রতীক আসনের সম্মুখে শ্রদ্ধাবনত, এবং তাঁর পশ্চাতে বদ্ধাঞ্জলি একাধিক নাগললনার চিত্র উৎকীর্ণ আছে। এই দৃশ্যপট সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণকাহিনীর কালিয়দমন কাহিনীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাদৃশ্যযুক্ত এবং পরবর্তীযুগে কালিয়দমন কাহিনীর যে অসংখ্য চিত্ররূপ অঙ্কিত হয়েছিল, বিশেষ করে কৃষ্ণলীলা পটে যেভাবে কালিয়দমন কাহিনীর রূপায়ণ পরিলক্ষিত হয় তার সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য

না স্বীকার করে পারা যায় না। পতঞ্জলির অষ্টাধ্যায়ীতে কৃষ্ণলীলা পটের অস্তিত্বের উল্লেখ থেকে শ্রীকৃষ্ণজীবনের চিত্ররূপায়ণ যে বহু প্রাচীনকালেই আরম্ভ হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই কৃষ্ণলীলা পটে কংসনিধনের মত কালিয়দমনের দৃশ্যরূপায়ণের অস্তিত্বের কল্পনাও খুব অযৌক্তিক নয়। এই কালিয় বৃত্তান্তই এলপত্র জাতকের মূল উৎস ছিল, এই কথা কল্পনা করাও হয়ত খুব ভিত্তিহীন নয়।

শ্রীকৃষ্ণের গোবিন্দাভিষেক

কালিয়নাগের দমনের পর শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-বাসকালে যে-সব ঘটনা ঘটেছিল তার মধ্যে কিছু অসুর নিধন ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোপগণের দ্বারা আয়োজিত ইন্দ্রপূজায় বাধাদান এবং গোবর্ধনগিরির পূজন এবং প্রদক্ষিণ করবার পরামর্শ-দান, ক্রোধান্বিত ইন্দ্রের সাতদিনব্যাপী প্রবল বৃষ্টিবর্ষণ এবং বর্ষণজনিত প্লাবন থেকে সমগ্র ব্রজভূমির উপর গোবর্ধনপর্বতের ধারণের দ্বারা ভীতিগ্রস্ত গোপ ও গোপিনী এবং তাদের সমস্ত ধেনু-বৎসের রক্ষা এক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বস্তুত শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনজীবনের তথা পুরাণে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের তাবৎ কার্যাবলীর মধ্যে এই গোবর্ধনধারণরূপ পরমতম অলৌকিক ঘটনাই কৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সব-ক'টি প্রধান বৈষ্ণবীয় পুরাণেই এই গোবর্ধনধারণ কাহিনী এবং এই ঘটনার অবসানে কৃষ্ণের 'গোবিন্দাভিষেকের' কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

একসময় ব্রজমণ্ডলে শরৎকাল উপস্থিত হলে বৃন্দাবনের গোপসম্প্রদায় দেব-রাজ ইন্দ্রের আরাধনার আয়োজনে প্রবৃত্ত হয়। বর্ষণের দেবতা ইন্দ্রের অনুগ্রহে প্রাণিগণের জীবনধারণের জন্য ভূমি শস্যপ্রদা হন, সেইহেতু ইন্দ্রের পরি-তোষণের আয়োজন হয়ে থাকে। ইন্দ্রপূজার সমর্থনে এই বক্তব্য শুনে শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে তাঁরা গোপসম্প্রদায়ভুক্ত; তাঁরা তো কৃষি বা বাণিজ্যজীবী নন। তাঁরা বনচর গো-নির্ভর সমাজের মানুষ। গীতায় আছে চাতুর্বর্ণ বিভাগের কথা; তার মধ্যে "কৃষিগৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্"। কৃষ্ণ বললেন, কর্ষকদের বৃত্তি কৃষিকর্ম, বিপণিজীবীদের বৃত্তি পণ্যবিনিময়, আমাদের বৃত্তি গোচারণ। আমাদের এই ব্রজমণ্ডলে আছে বহু বিস্তৃত তৃণক্ষেত্র; এই তৃণক্ষেত্রের প্রান্তসীমায় বন এবং বনের অন্তে পর্বত। আর এই পর্বতই আমাদের পরম গতি। আমাদের

কোন দ্বার-গবাক্ষযুক্ত স্থায়ী গৃহ নাই, কোন কৃষিজমিও নাই ; আমরা তো চক্রচারী অর্থাৎ সঞ্চরণশীল শকটনির্ভর সুখী সম্প্রদায়।

"কৃষ্যান্তা প্রথিতা সীমা সীমান্তং চ পূর্বনম্
বনান্তা গিরয়স্‌সর্বে তে চাস্মাকং পরাগতিঃ ॥
ন দ্বারবন্ধাবরণা ন গৃহ ক্ষেত্রিণস্তথা
সুখিনস্তখিলে লোকে যথা বৈ চক্রচারিণঃ ॥[১৫]

গোপসমাজের জীবনবৃত্তি সম্পর্কে এই উক্তির সমর্থন অন্যান্য বৈষ্ণবীয় পুরাণেও দেখা যায়। ভাগবতে আছে :

ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামান গৃহাবয়ম।
নিত্যং বনৌকসস্তাত বনশৈলনিবাসিনঃ।[১৬]

যে গোপসমাজে শিশু ও কিশোরজীবনে ভগবান কৃষ্ণ লালিত হয়েছিলেন সেই সমাজ সম্পর্কে পুরাণে যে তথ্য বিবৃত আছে তা যেমন কৌতূহলকর তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ। নানা কারণে গোকুলে থাকা বাঞ্ছনীয় মনে না হওয়ায় নন্দ-যশোদার নেতৃত্বে গোকুলের গোপ পরিবারেরা বৃন্দাবনে আশ্রয়গ্রহণ করেছিল। এই স্বচ্ছন্দ বাসস্থান পরিবর্তনের সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায় যে গোপসমাজের কোন স্থাবর গৃহযুক্ত বাসস্থান ছিল না। বৃষচালিত শকট-ছিল তাদের বিশেষ অবলম্বন, যে শকট তাদের ইচ্ছামত বিচরণে সাহায্য করত। তাই নিজেদের কৃষ্ণ বলছেন চক্রচারিণঃ'। কৃষিক্ষেত্র বা স্থায়ী গৃহদ্বারের বন্ধনহীন, সম্পূর্ণরূপে ধেনুনির্ভর গোপ সম্প্রদায়ের জীবন ছিল সুখ ও আনন্দে সমৃদ্ধ। গোচারণক্ষেত্রের প্রান্তে বন, সেই বনবেষ্টিত পর্বত ধেনুসমূহের প্রাণস্বরূপ আর গোপ সম্প্রদায়ের প্রাণস্বরূপ গোরু। ইন্দ্রের সঙ্গে গোপদের কী সম্পর্ক, এই গোরু এবং পর্বতই গোপদের দেবতা (কিমস্মাকম্ মহেন্দ্রেণ গাবশৈলাশ্চ দেবতাঃ)।[১৭] শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত এইসব যুক্তির যাথার্থ্য স্বীকার করে মহাসমারোহে গোপগণ গোবর্ধনের পূজার অনুষ্ঠান করল, ধেনুবৎস সহ গোবর্ধন পর্বতের পরিক্রমা হল। এই গোবর্ধনের আরাধনা ব্যপদেশে এক পরম রহস্যময় ঘটনা পরিদৃষ্ট হল ; গোবর্ধন শৈলশিখরে শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র মূর্তিমান হয়ে গিরির সঙ্গে এক হয়ে আর্বিভূত হলেন, এবং অনুগামী গোপগণ সঙ্গে নিয়ে স্বমূর্তি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শৈলশিখরে আরোহণ করে কৃষ্ণ-ভূত গিরি-গোবর্ধনকে অর্চনা করলেন। গোবর্ধন কাহিনীর এইটি প্রথম বিশেষ রহস্যপূর্ণ অলৌকিক ঘটনা। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এই ঘটনা অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত হয়েছে

দেখা যায় :

গিরিমূর্দ্ধনি কৃষ্ণোঽপি শৈলোঽহম্মিতি মূর্তিমান্
বুভুজেঽন্তং বহুতরং গোপবর্যাহৃতং দ্বিজ ॥
স্বেনৈব কৃষ্ণোরূপেণ গোপৈঃ সসহ গিরেশশিবঃ
অধিরূহ্যার্চযামাস দ্বিতীয়ামাত্মনস্তনুম্।[১৮]

গোবর্ধনকে কৃষ্ণের সঙ্গে এই সমত্ব প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ঋগ্বেদে বিষ্ণুকে পর্বতসমূহের অধিপতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাণের বর্ণনায় কৃষ্ণ গোবর্ধনকে তাঁদের প্রাণপ্রতিম বলে অভিহিত করছেন, আবার তিনি নিজেকে গোবর্ধনের সঙ্গে এক বলেও প্রকাশ করলেন। পর্বতের উপর আধিপত্য ও পর্বতের সঙ্গে একাত্মতার মধ্যে ঋগ্বেদের সেই চিন্তারই প্রতিধ্বনি লক্ষ করা যায় (বিষ্ণু = গিরিক্ষিৎ/গিরিষথা—ঋগ্বেদ ১।১৪৪:১-৩)। তৈত্তিরীয় সংহিতায়ও বিষ্ণুকে পর্বতের অধিপতি বলে অভিহিত করা হয়েছে (৩।৪:৫-১)।

এই প্রসঙ্গে পালি সাহিত্যে বর্ণিত এলপত্রের কাহিনীর সঙ্গে কালিয় কাহিনীর সাদৃশ্যের মত ভগবান বুদ্ধের যমকরূপ ধারণের যে উল্লেখ আছে তারও নিকট-সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। ভগবান বুদ্ধের প্রদর্শিত এই ঘটনাটিকে মহা-প্রতিহার্য যমক-প্রতিহার্য নামে অভিহিত করা হয়। কোশলাধিপতি প্রসেনজিতের বিশেষ উপরোধে ভগবান বুদ্ধ তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনে স্বীকৃত হলে প্রসেনজিতের অনুজ্ঞায় সেই অলৌকিকত্ব পরিদর্শন করবার জন্য বহু লোকের সমাবেশ হয়। সেখানে আকাশপথে ভগবান বুদ্ধকে আবির্ভূত দেখে সমবেত জনমণ্ডলী চমৎকৃত ও বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়ে। তাদের আরও বিস্ময় জন্মে যখন তারা প্রত্যক্ষ করে যে এক বুদ্ধের স্থানে দুই বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটেছে, এবং এক বুদ্ধের সঙ্গে বাক্যালাপে নিরত অন্য বুদ্ধ আকাশমার্গে আসীন রয়েছেন। পরমবিস্ময়কর এই অলৌকিক দৃশ্য অবলোকনে সমবেত জনমণ্ডলী ভীতিগ্রস্ত হয়ে সত্বর স্থানত্যাগ করেছিল (ধম্মপদটীকায় বিধৃত পাটিহারিয় বত্থু)। বৌদ্ধ ধম্মপদের টীকার রচনার কাল নিশ্চিতভাবে নির্দিষ্ট হয় নাই ; তবে এই টীকা যে খ্রীস্টজন্মের বহু পরে রচিত হয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান বুদ্ধের জীবনের এই ঘটনা একটি আম্রবৃক্ষের মূলে সংঘটিত হয়েছিল বলে উল্লিখিত আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কিত ঘটনার সঙ্গে গোবর্ধনশৈলের যোগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সুপ্রাচীন হরপ্পা সভ্যতার যুগ থেকেই ভারতীয় চিন্তায় ধরণীর বুকে সমুত্থিত

শৈলশিখর সুমেরু পর্বতের প্রতীক হিসেবে বিশেষ অর্থবহ বলে গণ্য হয়ে এসেছে। শ্রীকৃষ্ণকাহিনীর সঙ্গে যুক্ত বৃন্দাবন সন্নিকটবর্তী শৈলশিখরের গোবর্ধন এই নাম ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এই শৈলদেহের একাত্মকতায় ভারতীয় চিন্তায় এই গভীর অর্থবহ দিকটিরই প্রকাশ লক্ষ করা যায়। গোবর্ধনের যথাবিহিত অর্চনা ও প্রদক্ষিণের পর গোপ-গোপীবৃন্দ স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার অবসান হয়নি। গোপসমাজের দারুণ অবহেলায় ক্রোধান্বিত দেবরাজ প্রবল বর্ষণের দ্বারা তাবৎ বৃন্দাবন প্লাবিত করে অপরাধীদের শাস্তিবিধানে উদ্যত হলে কৃষ্ণভগবান তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিলেন। অনায়াস প্রয়াসে গোবর্ধনকে শূন্যে তুলে ইন্দ্রপ্রেরিত মহাপ্লাবনরূপী ধ্বংস থেকে বৃন্দাবনবাসীদের আশ্রয় ও রক্ষাবিধান করলেন। সপ্তদিবসব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণেও অবহেলাকারী বৃন্দাবনবাসীদের কোন ক্ষতিসাধনে অসমর্থ দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের নিকট পরাজয় ও নতিস্বীকার করলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ভারাবতারণার্থ পৃথিবীতে অবতীর্ণ স্বয়ং অখিলাধার পরমেশ্বররূপে অভিনন্দিত করলেন :

ভারাবতারণার্থায় পৃথিব্যাঃ পৃথিবীতলে
অবতীর্ণোঽখিলাধার ত্বমেব পরমেশ্বর। (বিষ্ণুপুরাণ ৫।১২:৭)

শ্রীকৃষ্ণের এই স্তুতি করবার পর দেবরাজ ইন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রকে গোবিন্দ এই আখ্যায় অভিষিক্ত করলেন—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গভীর ইঙ্গিতগর্ভ তাৎপর্যপূর্ণ গোবিন্দ নামের এইভাবে প্রবর্তন ঘটল। ভারতীয় সাংস্কৃতিক চিন্তায় গো-শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য—এই ঐশ্বর্য কেবলমাত্র বৈষয়িক সম্পদই নয়, মানবসত্তার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যেরও দ্যোতক। তাবৎ ঐশ্বর্যের আধার এই গোবিন্দই মধুর রসাশ্রয়ী বৈষ্ণব সাধনার মূল অবলম্বনরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

পুতনা বধ থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন জানোয়ারের রূপধারী দানবনিধনে শ্রীকৃষ্ণের অমিতসাধারণ দেহশক্তির পরিচয় প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু দেবরাজ ইন্দ্রের বিপর্যয় ও পরাজয়বরণ শ্রীকৃষ্ণভগবানের ঐশী সত্তার সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতির পরিচয় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। বস্তুত শিশুকাল থেকে শ্রীকৃষ্ণ যে-সব অলৌকিক কীর্তির স্বাক্ষর সৃষ্টি করছিলেন, এই গোবর্ধনধারণ ও গোবিন্দাভিষেক যেন তারই পরিণতি, শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ ভগবৎসত্তার ইঙ্গিতগর্ভ কাহিনী। বৈষ্ণবীয় পুরাণমাত্রেই ইন্দ্রের পরাজয় ও গোবর্ধনধারণের বিবরণ

আছে। কিন্তু হরিবংশপুরাণে গোবিন্দাভিষেক কাহিনীর বর্ণনা অনুসরণ করলে উপলব্ধি হয় যে, মূল বা আদর্শরূপে রচিত পুরাণবৃত্তের এই বিবরণই অধিকতর মূলানুগামী। এই হরিবংশেই ঘটনাটিকে সুস্পষ্টভাবে গোবিন্দাভিষেক আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। এই সবগুলি কাহিনীরই মূল প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণের গোবিন্দরূপে স্বীকৃতির প্রতিষ্ঠা, যে গোবিন্দ নামেই বৈষ্ণবীয় এই আদর্শমতে তিনি পূর্ণব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত।

তাঁর এই ঈশ্বর বা ব্রহ্মস্বরূপত্বের পূর্ণ পরিচয় তাঁর বৃন্দাবন জীবনের পরবর্তী সবচেয়ে গভীর ইঙ্গিতগর্ভ শেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শ্রীকৃষ্ণ অনুষ্ঠিত নানা অলৌকিক বিস্ময়কর কার্য অনুষ্ঠানের সাক্ষী গোপসমাজ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর স্বরূপ কী তা ব্যক্ত করবার প্রার্থনা জানালে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বললেন—তিনি দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ বা দানব নন, তিনি তাদের বান্ধব ও সখা এই পরিচয়েই যেন তারা সন্তুষ্ট থাকে। গো-জগতের ঈশ্বর গোবিন্দের প্রতি তাদের আকর্ষণ ও আত্মনিবেদন কত গভীর তারই পরিচয় এবং পরীক্ষা হল গোপললনাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়ায়।

নানা দৈত্যের ভীতি থেকে মুক্ত এবং দেবরাজ ইন্দ্রের প্রবল কোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার পর স্বভাবতই গোপসমাজের জীবনচেতনার পরিবেশ তাবৎ ভয় থেকে মুক্ত, স্বচ্ছন্দ ও নির্মল বলে প্রতীয়মান হল। এই পরিবেশে প্রতি গোপললনার চেতনা হয়ে উঠল কৃষ্ণময়। শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলীধ্বনি শুনে তারা এত কৃষ্ণ-ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল যে প্রত্যেকেই নিজেকে কৃষ্ণ বলেই উপলব্ধি করতে লাগল। কেউ বলতে লাগল, "কৃষ্ণোঽহমেব ললিতম্" ; কেউ বলল, আমিই কৃষ্ণ, আমার গান শোন (অন্যা ব্রভীতি কৃষ্ণস্য মম গীতির্নিশম্যতাম)। অন্য আরেক জন বলল, দুষ্ট কালিয়ের দমনকারী আমিই কৃষ্ণ (দুষ্টকালিয় তিষ্ঠাএ—কৃষ্ণোঽহমিতি অপরা)। কৃষ্ণচেতনার অভূতপূর্ব প্রভাবস্পর্শে প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ করল বিপুল মণ্ডলাকারে নৃত্যপরায়ণা প্রতি রমণীর হাত পার্শ্বে নর্তনশীল কৃষ্ণেরই হাতে সমর্পিত। তখন মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ, শারদচন্দ্রের কিরণে চতুর্দিক উদ্ভাসিত, প্রস্ফুটিত পদ্মের সুবাসে দিগন্ত প্রমোদিত। এই মনোহর পরিবেশে সমস্ত গোপললনারা এক শ্রীকৃষ্ণকেই প্রত্যেকে নিজের একান্ত অন্তরঙ্গ বলে উপলব্ধি করে কৃতার্থ হল। এইভাবেই পুরাণ আখ্যানে কৃষ্ণচেতনার শেষ পরিণতি নির্দিষ্ট হল ; ভগবান কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার পূর্ণ আধ্যাত্মিক তাৎপর্য

এইভাবেই নির্মিত ও প্রতিষ্ঠীত হল।

তদ্ভর্তৃষু তথা তাসু সর্বভূতেষু চেশ্বরঃ
আত্মস্বরূপরূপোঽসৌ ব্যাপী বায়ুরিবস্থিত ॥[১৯]

—এই ঈশ্বর (কৃষ্ণ) সর্বব্যাপী গোপীদের মধ্যে, তাদের স্বামীদের মধ্যে তথা সমস্ত প্রাণিসমূহের মধ্যে আত্মস্বরূপ বায়ুর মতই অবস্থিত।

পুরাণসাহিত্যে কৃষ্ণ সম্পর্কে এই উপলব্ধি বৈষ্ণবীয় চিন্তা ও দর্শনের বীজ-স্বরূপ। এখানে গোপবেশধারী কৃষ্ণ যা বলছেন শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় সেই চেতনার প্রস্ফুটন লক্ষ্য করা যায় :

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥[২০]

গোপললনারা যে উপলব্ধিতে ধন্য হয়েছিল গীতায় কিন্তু এক অর্জুন সেই উপ-লব্ধিতে ঐশ্বর্যবান হয়েছিল।

গোপসন্তানেরা পরিজ্ঞাত ছিল যে তাদের সমাজে তেমন আভিজাত্য ছিল না। গোবর্ধনধারণরূপ অলৌকিক ক্রিয়া দেখে সন্ত্রস্ত গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন : আমরা তো অতি নীচ, আমাদের মধ্যে আবির্ভূত আপনার দিব্যকর্ম দেখে আমরা অভিভূত ; এর রহস্য আমাদের বলুন।

বালক্রীড়েয়মতুলা গোপালত্বং জুগুপ্সিতম্
দিব্যং চ ভবতঃ কর্ম কিমেতত্তাত কথ্যতাম্।[২১]

আপনি দেবতা হউন, দানব হউন, যক্ষ-গন্ধর্ব যাই হোন আমাদের বিচারের প্রয়োজন নাই—আপনি আমাদেব বন্ধু এই আমাদের পরম প্রাপ্তি। উত্তরে শ্রী-ভগবান বললেন : তিনি দেবতা, দানব আদি কিছুই নন—তিনি তাদের বান্ধব-রূপেই উৎপন্ন হয়েছেন (বিষ্ণু ৫।২৩:১২)। শ্রীভগবান এই বান্ধবতার সম্পর্কেই গোপসমাজকে অনুগৃহীত করলেন ; গোপসমাজ তাদের অবলম্বন গো-সমুদায়, এবং বনরাজি পরিবৃত গোবর্ধন শৈলে ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করল, সেই-সঙ্গে আরও অনুভব করল যে পরম করুণার আধার সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একান্তভাবেই সর্বদা তাদের সান্নিধ্যে বর্তমান—সকল ভয় সকল শঙ্কাতে তাদের তিনি সর্বদাই রক্ষা করছেন। স্বভাবতই এইসব তথ্য থেকে নিশ্চিতভাবেই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে ভগবানের পরম অনুগ্রহভাজন সেই প্রভূত ভাগ্যবান গোপ সম্প্রদায়েই সেই গোবিন্দরূপী দেবরাজ ইন্দ্রের পরাভবকারী গোবর্ধনরূপী

শ্রীভগবানে অনুরাগ ও পূজার প্রচলন হয়েছিল। অন্যদিকে ব্যাসদেব তাঁর ভারত মহাকাব্যে ভগবান কৃষ্ণের সর্বাত্মকতার উপলব্ধি যে বিশেষভাবে প্রিয়সখা অর্জুনের সমক্ষে প্রকাশিত হয়েছিল সেই তথ্য সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছেন। মহাভারতে যে অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটে তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল সাত্বত বীর শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেবের নিশ্চিত বিরুদ্ধবাদী। সাত্বত সমাজেও বাসুদেব যে ভগবান স্বয়ং, এ বোধ তেমন ছিল না। পাণ্ডব পরিবারের মহিষী দ্রৌপদীর গভীর আস্থা ছিল শ্রীকৃষ্ণের লোকোত্তর ক্ষমতার উপর। কিন্তু তিনিও শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ বলে উপলব্ধি করেছিলেন, ভগবান ব্যাস সে-কথা স্পষ্টত কোথাও বলেননি। মহাভারতে শ্রীমৎ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণকে প্রবল জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন উচ্চ অভিজাত সম্প্রদায়ের এক আদর্শ পুরুষরূপেই প্রতিরূপায়িত করেছেন, তাঁর ব্রহ্মস্বরূপত্ব, যা ব্যাসদেব নিজে পরিজ্ঞাত ছিলেন, সেই তথ্য কোথাও সুস্পষ্টভাবে সাধারণ স্তরে উপলব্ধির প্রমাণ রাখেননি। তবে মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে অশ্বত্থামা দ্বারা নিহত পরীক্ষিতের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পুনর্জীবনলাভ যে ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণের মাহাত্ম্যেই সংঘটিত হয়েছিল এ সংবাদ সাধারণের জ্ঞানগোচর হয়েছিল ব্যাসদেব সে-কথার উল্লেখ করেছেন। অর্জুনের দ্বারা দৃষ্ট বিশ্বরূপ বাসুদেব-কৃষ্ণের ব্রহ্মস্বরূপত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎ সেই ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণ কর্তৃক পুনর্জীবনলাভে সমর্থ হওয়ায় এই পাণ্ডব পরিবারের উত্তরাধিকারসূত্রে পরীক্ষিৎ ও তাঁর বংশধরেরা একক সেই বাসুদেবকেই দেবদেব ভগবান শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ হিসেবে পরিবারের উপাস্য দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এইরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক নয়।

এই বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতেই অনুমান করা চলে যে ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও বিভিন্ন পরিবারে ভগবান কৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন আদর্শে গৃহীত হয়েছিলেন। এর মধ্যে যে পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল সেই বৃষ্ণি পরিবারে তিনি একক বাসুদেব-রূপে দেবত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন না; খ্যাতি ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পূর্বপুরুষরূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সংকর্ষণ, পুত্র প্রদ্যুম্ন ও সাম্ব এবং পৌত্র অনিরুদ্ধসহ এই পঞ্চবৃষ্ণিবীরই একসময় বৃষ্ণিদের দ্বারা উপাস্যরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন।

গোপসমাজে শৈশবে লালিত যশোদাদুলাল কৃষ্ণের গোবর্ধন সম্পর্কিত অলৌকিক ঘটনার পর গোপসম্প্রদায়ের পরম অবলম্বন এবং তাদের অধিপতি-

রূপে গোবিন্দ আখ্যায় তাঁর উপাসনা প্রবর্তিত হয়। গোবর্ধন সম্পর্কিত এই ঘটনার পর মহারাসের মাধ্যমে গোপসম্প্রদায়ের তাবৎ পুরুষ ও ললনারা শ্রীকৃষ্ণকেই বন্ধু, সখা, বিপদে রক্ষাকর্তা এবং জীবনের পরমানন্দস্বরূপ একমাত্র উপাস্য গোবিন্দরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

শিশু কৃষ্ণ কর্তৃক নাগরাজ কালিয়ের দম্ভ ও শক্তি বিচূর্ণিত হলে নাগসমাজে সংকর্ষণ ও বাসুদেব নামে যৌথ অস্তিত্বে প্রকাশমান শাশ্বত ব্রহ্মস্বরূপের আরাধনা প্রবর্তিত হয়েছিল। আর সমগ্র ভারতভূখণ্ডে চক্রবর্তিত্বে অধিষ্ঠিত রাজরাজেশ্বর সম্রাট পরীক্ষিতের পুনর্জীবনদানকারী ভগবান বাসুদেব রাজন্যসমাজের পরম উপাস্য ব্রহ্মস্বরূপ দেবদেবরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

নির্দেশিকা

১. Macdonell, A, A, Vedic Mythology, p. 64 .
২. বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৩:১।
৩. মহাভারত, ১।৫:৮৬৩-৭।
৪. ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ৪।৪:৬৭ ; পদ্মপুরাণ, ৫।১:২-১।
৫. জাতক, ৫৪৬।
৬. উত্তরাধ্যয়ন সূত্র, ২২।
৭. Bhandarkar, R. G., Vaishnavism Saivism etc., p 16.
৮. মহাভারত, ৩।১২:৫৬ ; ৫।৩১:৭।
৯. ঐ, ৫।১২৮:৩৭-৪০।
১০. ঐ, ২।১৪:৭-৫২।
১১. ঐ, শান্তিপর্ব, ১২।৩৩৯:৯০-১০০।
১২. ঋগ্বেদ, ৩।৪৫:৩।
১৩. মহাভারত, ৩।২৪০:৮।
১৪. ভাগবত, ১০।৬:৩৫।
১৫. বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১০:৩২-৩৩।
১৬. ভাগবত, ১০।২৪:২৪।
১৭. বিষ্ণুপুরাণ, ৫।১০:৬৬।
১৮. ঐ, ৫।১০:৪৭-৪৮।
১৯. ঐ. ৫।১৩:৬১।
২০. গীতা ১৮:৬১।
২১. বিষ্ণুপুরাণ. ৫।১০:৬৬।

১১

নারায়ণ-বাসুদেব-বিষ্ণু

ঋগ্বেদের বিস্তৃত উল্লেখ থেকে ভগবান বিষ্ণুর উপর ইন্দ্রের নির্ভরশীলতার কথা বিশেষভাবেই অনুভূত হয়। ঋগ্বেদের বর্ণনায় বিষ্ণুর উপর নির্ভরশীলতার উল্লেখ থাকলেও প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে ইন্দ্রকে সর্বদাই বিজয়ী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদের অব্যবহিত পরে উদ্ভূত ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে কিন্তু ইন্দ্রকে সর্বদা জয়লাভের অধিকারী দেখা যায় না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৬।১৫) বর্ণিত আছে বিষ্ণু তাঁর ত্রিপাদ বিস্তারের দ্বারা সমস্ত ভূমণ্ডল আবৃত করলে এই লোকসমূহে সেই দুই দেবতার (বিষ্ণু এবং ইন্দ্রের) অধিকার কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। শতপথ ব্রাহ্মণের বিবরণ আরও বিস্তৃততর (১।২:৫)। দেবাসুর সংগ্রামে দেবতাদের পরাজিত করে অসুরেরা সমস্ত পৃথিবী নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে শুরু করে। এই সময় যজ্ঞরূপী বিষ্ণুকে পুরোধা করে দেবতারা অসুরদের সমীপে এসে অনুরোধ জানায় যে, তারা যেন বিষ্ণু তাঁর দেহদ্বারা যতখানি ভূমি আবৃত করতে পারেন ততটুকু ভূমিই দেবতাদের দেয়। অসুরেরা এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হলে বিষ্ণু তাঁর দেহ বিস্তৃত করে সমগ্র ভূমণ্ডল আবৃত করেন এবং অসুরদের স্বীকৃতিমত তাদের কাছ থেকে সমগ্র পৃথিবী অধিকার করে নেয়। এই উভয় কাহিনীতেই দেখা যায় অসুরদের অধিকার থেকে ভগবান বিষ্ণুই পৃথিবীর উপর আধিপত্য অর্জন করেছিলেন। তৈত্তিরীয় সংহিতায় এই কাহিনীর যে বর্ণনা আছে তাতে ভগবান বিষ্ণু বামনরূপ ধারণ করে তাবৎ জগৎ অধিকার করেছিলেন এইরূপ উল্লেখ আছে।[১] অর্থাৎ জগৎত্রয়ের উপর বিষ্ণুরই আধিপত্য এইসব উপাখ্যানে স্বীকৃত হয়েছে।

এইসব কাহিনীর ব্যাখ্যান ব্যপদেশে বিষ্ণুপুরাণে যে কাহিনী বর্ণিত আছে তাতে বলা হয়েছে যে ভগবান বিষ্ণু বামনরূপ ধারণ করে অসুরদের হাত থেকে পৃথিবী জয় করে নেওয়ার পর তিনি ইন্দ্রকে সেই পৃথিবীর উপর আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

ত্রিভিঃক্রমৈরিমাল্লোকাঞ্জিত্বা যেন মহাত্মনা
পুরন্দরায় ত্রৈলোক্যং দত্তং নিহতকণ্টকম্।[২]

বিষ্ণু কর্তৃক ইন্দ্র রাজপদে অধিষ্ঠিত হলে দেবতাদের মধ্যে সংঘবদ্ধতা ঘটে এবং তাঁরা বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে যে তিনি এক-সময় মনু ছিলেন।[৩] অর্থাৎ মনুই ইন্দ্র বলে স্বীকৃত ছিলেন। মনুর কন্যা ইলার পুত্র পুরুরবাকেও ইন্দ্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। আবার পুরুরবাকে 'মানব' এই আখ্যায়ও অভিহিত করা হয়েছে।[৪] সেই সূত্রে পুরুরবার বংশধরদের মধ্যে অধিরাজ বলে যাঁকে স্বীকার করা হত তিনিই ইন্দ্র এই আখ্যায় অভিহিত হতেন। যযাতির পাঁচ পুত্রের মধ্যে পুরুই অধিরাজ বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। ভরত-দৌষন্তি পরিবারের এই অধিরাজত্বের দাবি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন ভার্গববংশের কন্যা মমতার গর্ভজাত ঋষি দীর্ঘতমস তাঁর অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞের দ্বারা। পাঞ্চালেরা কিছু-দিনের জন্য সম্বরণকে রাজ্যচ্যুত করে রেখেছিল, পরে বসিষ্ঠ তাঁকে পুনরধিষ্ঠিত করেন এবং সম্বরণ মহাসমারোহে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁর অধিরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর পুনরায় পাণ্ডব-কৌরবে সাম্রাজ্যের দাবি নিয়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করে এই অধিরাজত্বের দাবি প্রতিষ্ঠিত করেন। পাণ্ডববংশে পরীক্ষিতের সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতির পর এই বংশের নীচক্ষু যখন হস্তিনাপুর পরিত্যাগ করে কৌশাম্বীতে বসতি স্থাপন করেন তখন এই অধিরাজত্বের কি হয়েছিল তার সুস্পষ্ট কোন সমাচার পাওয়া যায় না। কৌশাম্বীতে উপনিবিষ্ট নীচক্ষুর বংশধরেরা ভরতবংশীয় বা পুরুবংশীয় নামে পরিচিত ছিলেন না—তাঁদের রাজ্য 'বৎস' রাজ্য নামে অভিহিত হত।

নীচক্ষুর বংশধর, ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক উদয়ন যখন কৌশাম্বীর অধীশ্বর তখনও কুরু নামে স্বতন্ত্র রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল এবং পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে আলেকজাণ্ডারের প্রতিরোধকারী রাজা পুরু (পোরস্) সম্ভবত সেই কুরুরাজ্যের অধিপতি ছিলেন। এই ধারাবাহিকতাসূত্রে মনুর অধস্তন ইন্দ্রত্বের দাবিদার পুরু-ভরতেরা কুলদেবতারূপে দেবদেব ভগবান বিষ্ণুরই উপাসক ছিলেন এমন অনুমান করা অসঙ্গত হবে না।

পুরাণসমূহের বর্ণনায় আছে যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর যাঁরা আধিপত্যবিস্তার ও রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন মনুর বংশধর। এই বিবরণমতে সম্বরণের প্রতিদ্বন্দ্বী পাঞ্চালরা ভরতের বংশধর অজ-মীঢ়ের পুত্র নীলের সন্তান (বিষ্ণু ৪।১৯।৫৬-৬১)। তেমনি অজমীঢ়ের অন্য এক বংশধর কুরুর বংশে জাত বসুর অন্যতম উত্তরাধিকারী ছিলেন মগধরাজ

জরাসন্ধ। স্বভাবতই উপরিচর নামে পরিচিত চেদীরাজ বসু সম্বরণ-পুত্র কুরুর বংশধর হিসেবে কেবলমাত্র খুব খ্যাতিসম্পন্নই ছিলেন না, হয়ত চক্রবর্তিত্বেরও দাবিদার ছিলেন। চেদীরাজ বসুর বংশে প্রখ্যাত শক্তিশালী শিশুপালের উদ্ভব হয় এবং মগধে আধিপত্যলাভ করেন বসুর বংশধর বৃহদ্রথের পুত্র জরাসন্ধ।

এঁদের মধ্যে জরাসন্ধ বহু রাজন্যকে বন্দী করে অধিরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস করেছিলেন এবং সেই প্রয়াসের পেছনে তিনি যে রাজচক্রবর্তী ভরতের অধস্তন প্রভূত খ্যাতিসম্পন্ন সম্রাট কুরুর বংশধর ছিলেন এই চেতনাই ক্রিয়াশীল ছিল। জরাসন্ধ ভীমসেনের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে নিহত হলে জরাসন্ধের পুত্র সহদেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। পুরাণের অভিমত অনুসারে সহদেবের বংশধরেরা সহস্র বৎসর মগধ শাসনে রাখার পর এই বংশের শেষতম রাজা রিপুঞ্জয়কে হত্যা করে তাঁর মন্ত্রী সুনিক নিজপুত্র প্রদ্যোতকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। মন্ত্রী সুনিক কোন্ বর্ণের মানুষ ছিলেন তার স্পষ্ট উল্লেখ পুরাণে পাওয়া যায় না। মৌর্যবংশের শেষ সম্রাট বৃহদ্রথকে অপসারিত করে পুষ্যমিত্র নামে যিনি সিংহাসন অধিকার করেছিলেন তিনি হয়ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। বিভিন্ন রাজ্যের সচিবেরা হয়ত ব্রাহ্মণই হতেন, তবে সিংহাসনে উপবেশন করে রাজ্যশাসনে ব্রতী হলে তাঁদের সম্ভবত ক্ষত্রিয় বলেই গণ্য করা হত। প্রাচীন বাংলার সেন-রাজারা মূলত ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাজ্যলাভের পর তাঁরা ব্রহ্মক্ষত্রিয় নামে পরিচয় গ্রহণ করেছিলেন। মন্ত্রী সুনিকের পুত্র প্রদ্যোতের বংশধর মহানন্দী নামে সম্রাটের শূদ্রা রমণীর গর্ভজাত পুত্র মহাপদ্ম নন্দ বহু ক্ষত্রিয় রাজন্যকে অপসারিত করে 'সর্বক্ষত্রান্তক', মহাবলশালী রাজারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। পুরাণের মতে মহাপদ্ম নন্দ তাবৎ পৃথিবীর উপর একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জন করেছিলেন :

> মহাপদ্ম নামা নন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিল ক্ষত্রান্তকারী ভবিষ্যতি ॥
> ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি ॥
> স চৈকচ্ছত্রামনুল্লঙ্ঘিতশাসনো মহাপদ্মঃ পৃথিবীং ভোক্ষ্যতে ॥[৫]

মহাপদ্মের এই অনুল্লঙ্ঘিত একচ্ছত্র আধিপত্য অর্জনে মগধের সাম্রাজ্য-গৌরবে অধিষ্ঠিত হওয়া এবং কুরুরাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাফল্য অর্জন জরা-সন্ধের প্রারব্ধ প্রয়াসের ফলশ্রুতি বলে গণ্য করা যেতে পারে। শূদ্রাণীর গর্ভজাত বলে অভিহিত মহাপদ্ম নন্দের রাজকুলদেবতা কে ছিলেন সে-সম্পর্কে কোন উল্লেখ প্রাচীন কোন সাহিত্যে, পুরাণে বা প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণে পাওয়া যায় না।

সিংহাসনের অধিকারী রাজাকে অপসারণ করার যে দৃষ্টান্ত বৃহদ্রথের মন্ত্রী শুনিকের দ্বারা ঘটেছিল সেই ধারার অনুসরণ করে শ্রুতকীর্তি, প্রভূত প্রজ্ঞাবান কৌটিল্যও শেষ নন্দরাজাকে অপসারিত করে মৌর্যবংশজাত বীর চন্দ্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। কথিত আছে, চন্দ্রগুপ্তের মাতার নাম ছিল মুরা এবং তিনি নন্দরাজের পত্নী ছিলেন।

মহাপদ্ম নন্দের পূর্বগামী মগধরাজ অজাতশত্রু ভগবান বুদ্ধের সমসাময়িক ও তাঁর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তবে তিনি কখনও বৌদ্ধসংঘে প্রবেশ করে-ছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায় না। আর বুদ্ধের জীবনকালে বৌদ্ধধর্মে উপাসক প্রথা প্রচলিত হয়েছিল এমনও কোন প্রমাণ নাই। এই যুক্তিতেই মনে হয় তাঁর পরিবারের পূর্বপ্রচলিত উপাস্য কুলদেবতাই অজাতশত্রুর কুলদেবতা তথা রাজ-পরিবারের উপাস্যরূপে গৃহীত ছিলেন।

কালের প্রবাহে ভারতের সমাজ ও ধর্মীয় জীবনে বহু পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল। ভগবান বুদ্ধ এবং মহাবীর বর্ধমানের দ্বারা দুই নূতন আদর্শ সাধনধারা প্রবর্তিত হওয়ায় সমাজে এক ঘোরতর আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। সমাজে প্রচলিত অনেক রীতির মতই চতুরাশ্রম পালনের রীতি ছিল অত্যন্ত কঠোর। সংসারধর্মের দায়িত্ব অস্বীকার করে সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যাগ্রহণের অধিকার তেমন স্বীকৃত হত না। লিচ্ছবিসন্তান গৌতম স্ত্রী-পুত্র-সংসার বর্জন করে ধর্মসাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন ; মহাবীর বর্ধমানও সংসারত্যাগ করেন। এই দুই অগ্রণী সংসারত্যাগী মহাপুরুষ সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করে যে মতবাদ প্রচার করেছিলেন তাতে সমাজে প্রবল পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল।

এই সামাজিক বিপ্লবেরই কিছু পরিচয় দেখা গেল প্রবল প্রতাপান্বিত মৌর্য-সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের জৈন সন্ন্যাসী ভদ্রবাহুর প্রভাবে সিংহাসন ত্যাগ করে সন্ন্যাস-গ্রহণে এবং জৈন প্রথামতে অনশনে প্রাণ-বিসর্জনে। জৈনসাহিত্যে চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কে এই বিবরণ রক্ষিত হয়ে থাকলেও পুরাণ বা অন্য কোন সাহিত্যে এর কোন সমর্থন নাই।

এর পরেই উল্লেখ করা যেতে পারে চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র সম্রাট অশোকের কথা। বৌদ্ধসাহিত্যে সম্রাট অশোককে বিশেষভাবেই ভগবান বুদ্ধের অনুরাগী এবং বৌদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়েছে। সম্রাটের অনুশাসনাবলীতেও ভগবান বুদ্ধের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও কিছু সময়ের জন্য সংঘে প্রবেশ করার উল্লেখও পাওয়া

যায়। কিন্তু সংঘে প্রবেশ করে থাকলেও তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন নাই। সেইসঙ্গে একথাও মনে রাখা দরকার যে তাঁর দ্বারা প্রচারিত সমস্ত অনুশাসনে, এমনকি যেখানে তিনি ভগবান বুদ্ধ এবং সংঘের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের উল্লেখ করেছেন, যেমন রুম্মিনদেই স্তম্ভে, এবং ভাব্রুতে প্রাপ্ত লেখ ইত্যাদিতে, তিনি নিজেকে দ্বিধাহীনভাবে 'দেবানং পিয় পিয়দস্‌সি' বলে অভিহিত করেছেন। ভগবান বুদ্ধের দ্বারা প্রবর্তিত অনুশাসন ও উপদেশের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে থাকলেও সম্রাট অশোক নিজেকে দেবতাদের প্রিয় এই স্বীকৃতি বজায় রাখায় এই কথাই মনে হয় যে দেবতানুরাগী সমাজ থেকে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নেননি।

অশোক নিজেকে দেবতাদের প্রিয় বললেও তিনি বা তাঁর পরিবার কোন্ দেবতার উপাসক ছিলেন তা বোঝা যায় না। তবে অনেকে যে তাঁকে জরথুষ্ট্র প্রবর্তিত পারসিক সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত বলে অনুমান করেছেন সে যুক্তি নিতান্তই ভ্রান্ত। কারণ অহুর বা অসুর-মাজদার অনুগামী পারসিকেরা দেবতাঅনুরাগীদের প্রবল বিরোধী ছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাঁদের নিকট অনিষ্টকারী শক্তিরূপেই গণ্য হতেন। ভারতের বেদ-ব্রাহ্মণ-পুরাণপ্রবর্তিত সমাজে দেবতাপরিকল্পনার উদ্ভব ও প্রচলন হয়েছিল এবং এই সমাজেই দেবতারা উপাস্য এবং পূজনীয় বলে গণ্য হতেন। বৌদ্ধসাহিত্যে বৈদিক তথা পৌরাণিক দেবতাদের বহু উল্লেখ পাওয়া যায় এবং অনেক কাহিনীতে ইন্দ্র, ব্রহ্মা ইত্যাদি দেবতাকে ভগবান বুদ্ধের সহায়করূপেও উল্লেখ করা হয়েছে। বৌদ্ধসাহিত্যের এইসব বিবরণে কোথাও কিন্তু বৈদিক দেবতা বিষ্ণুর উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত বিভিন্ন গ্রন্থে এবং বৈষ্ণবীয় পুরাণসমূহে ভগবান বিষ্ণুকে দেবতাদের মধ্যে পরমতম এবং শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (১।১) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪।১:১) ভগবান বিষ্ণুকেই দেবতাদের মধ্যে অগ্রণী এবং প্রধান বলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এই যুক্তিতেই মনে হয় যে সম্রাট অশোক (যিনি নিজেকে নিরবচ্ছিন্নভাবেই দেবতাদের প্রিয় বলে পরিচিত করতে যত্নপরবশ ছিলেন) দেবোপাসক সমাজেই জন্মেছিলেন।

সম্রাট অশোকের বংশধর বৃহদ্রথকে অপসারিত করে যে শুঙ্গরাজ সিংহাসন অধিকার করেছিলেন তাঁর উপাস্য কুলদেবতা কে ছিলেন সে-সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। যোগদর্শনের অগ্রণী পণ্ডিত পতঞ্জলি ছিলেন

শুঙ্গসম্রাট পুষ্যমিত্রের প্রধান সচিব। পতঞ্জলির মহাভাষ্য ও কালিদাস বিরচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকের রচনা থেকে জানা যায় যে পুষ্যমিত্র মহাসমারোহে 'অশ্বমেধ' যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন।

উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় আবিষ্কৃত আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব প্রথম অথবা খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে উৎকীর্ণ একটি শিলালেখতেও পুষ্যমিত্রকে দুইবার অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে (দ্বিরশ্বমেধ-যাজিনঃ সেনাপতেঃ পুষ্য-মিত্রস্য[৬])। এই শুঙ্গ রাজত্বকালেই যে ভারহুতের প্রখ্যাত বৌদ্ধ স্তূপটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ঐ স্তূপের একটি তোরণদ্বারে লিখিত আছে।[৭]

তোরণের পার্শ্বস্থ একটি স্তম্ভের দুইদিকে অশ্বারোহী দুইটি মানুষের মূর্তি খোদিত আছে। এদের একটি পুরুষমূর্তি ও অন্যটি নারীমূর্তি। উভয় মূর্তির হাতেই একধরনের একটি করে ধ্বজদণ্ড দেখা যায়। এই উভয় ধ্বজদণ্ডেরই মাথায় মানুষের মুখশোভিত পক্ষীমূর্তি ডানাবিস্তার করে আছে। এখানকার এই ধ্বজশীর্ষস্থ পক্ষী গরুড় ভিন্ন অন্য কিছু নয়। বৌদ্ধ চৈত্যের বেষ্টনী-প্রাচীরের স্তম্ভে গরুড়ধ্বজ বহনকারী মূর্তির উপস্থিতি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক।

মনে হয় ঐ ধ্বজদণ্ড, যিনি সেই তোরণ প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন, সেই ধনভূতি বা যে শুঙ্গ রাজার কালে (যাঁর নাম ঐ লেখতে উল্লিখিত হয় নাই) ঐ তোরণটি নির্মিত হয়েছিল তাঁরই রাজকীয় প্রতীক। গরুড়ধ্বজ প্রতীক নিশ্চিতভাবেই ভগবান বিষ্ণুর প্রতীক এবং এ থেকে ভগবান বিষ্ণুই যে শুঙ্গদের কুলদেবতারূপে গৃহীত ছিলেন এই অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়।[৮] এ ছাড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত শুঙ্গ-কাণ্ব আমলের কয়েকটি লেখতে নারায়ণ, বাসুদেব-সংকর্ষণ, দেবদেব বাসুদেব ইত্যাদি নামের উল্লেখ এবং এইসমস্ত দেবতার সম্মানে প্রতিষ্ঠিত শিলাস্তম্ভ, পূজাগৃহ ইত্যাদির অস্তিত্বের প্রমাণ থেকে তাঁদের আমলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ভগবান বিষ্ণু ও বাসুদেব-সংকর্ষণের উপাসনার প্রচলন ছিল একথা অনুমান করা চলে। এইসব প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ থেকে বাসুদেব উপাসনায় বিভিন্নতার অস্তিত্বের সঙ্গেও পরিচয় ঘটে।

এইসব লেখসমূহের মধ্যে বিদিশায় হেলিয়োডোর-প্রতিষ্ঠিত গরুড়স্তম্ভই প্রাচীনতম এবং সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় যে রাজার সভায় দিয়নের পুত্র, যবন হেলিয়োডোর তক্ষশিলার রাজা অংতলিকিতের দূত হিসেবে এসেছিলেন, তিনি কাশীপুত্র ভাগভদ্র নামে পরিচিত ছিলেন। এই ভাগভদ্রকে বিষ্ণুপুরাণে

উল্লিখিত শুঙ্গবংশের ষষ্ঠ সম্রাট ভদ্রক বলে অনুমান করা হয়েছে।[৯] এইসমস্ত তথ্য থেকে চক্রবর্ত্তিত্বের দাবিদার শুঙ্গসম্রাটেরা বাসুদেব-বিষ্ণুকেই তাঁদের কুল-দেবতারূপে গণ্য করতেন, এ সিদ্ধান্ত খুব অযৌক্তিক বলে মনে হয় না।

হেলিয়োডোর-প্রতিষ্ঠিত এই গরুড়স্তম্ভের প্রায় অব্যবহিত পরে চিতোরের সন্নিকটবর্তী ঘোষুণ্ডিতে জনৈক রাজা সর্বতাতের একটি লেখতে সংকর্ষণ-বাসুদেবের সম্মানে একটি পূজা-শিলা-প্রাকার নির্মাণের উল্লেখ আছে। হেলিয়োডোরের মত সর্বতাতও ভাগবত এই আখ্যায় অভিহিত হয়েছেন ; তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করেছিলেন।[১০] এখানে ভগবান সংকর্ষণ-বাসুদেবকে অতুলনীয় শ্রদ্ধা ও ভক্তির ইঙ্গিতবহ 'অনিহত' ও 'সর্বেশ্বর' আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। যে প্রাকারের দ্বারা পূজার স্থানটি নির্দিষ্ট হয়েছিল সেই প্রাচীরবেষ্টিত বাটিকা, গৃহ বা মন্দিরটিকে বলা হয়েছে নারায়ণ-বাটক। এই-সকল তথ্য থেকে উপলব্ধি করা যায় যে ভগবান সংকর্ষণ-বাসুদেব কি অভাবনীয় শ্রদ্ধা ও ভক্তির আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। নিজেকে রাজা নামে পরিচয়প্রদানকারী সর্বতাতকে অনেকে কাণ্ববংশের অধিপতি বলে মনে করেন। এই অনুমান সত্য হলে বলা চলে যে চক্রবর্তিত্বের দাবিদার শুঙ্গ রাজবংশের পর যে কাণ্ববংশ মগধে অধিকারলাভ করেছিল তাঁরাও কুলগতভাবে ছিলেন বৈষ্ণব। এই বংশের একজন রাজার নামও ছিল নারায়ণ।

এই লেখটির ভিত্তিতে অবশ্য প্রতীয়মান হয় যে রাজা সর্বতাত একক বাসুদেবকেই দেবদেব বলে আরাধনা করতেন না, তাঁর নিকট সংকর্ষণ এবং বাসুদেব (অর্থাৎ কৃষ্ণ) উভয়েই সমানভাবে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে সংকর্ষণ কালিয়কে দমন করবার জন্য কৃষ্ণকে উৎসাহদান প্রসঙ্গে তাঁকে তাঁর পরমতম সত্তা সম্পর্কে অবহিত হতে বলেছিলেন।[১১] এখানে তিনি অগ্রজরূপে নিজেকে বাসুদেবেরই অংশ বলেও অভিহিত করেন। (অবতীর্ণৌাবি মর্ত্যেষু তবাংশশ্চাহমগ্রজ)[১২] বিষ্ণুপুরাণের এই বর্ণনায় বাসুদেব-কৃষ্ণকেই প্রাধান্য অর্পণ করা হয়েছে দেখা যায়। অগ্রজ সংকর্ষণ নিজেকে বাসুদেবের অংশ বলেই অভিহিত করেছেন। ভাগবতেও এই প্রসঙ্গে রাম (অর্থাৎ সংকর্ষণ) নামে-মাত্রই উল্লিখিত হয়েছেন (প্রত্যবেধৎস ভগবান রামঃ কৃষ্ণানুভাববিত)[১৩]। কিন্তু হরিবংশে সংকর্ষণকে 'একভাব শরীরজ্ঞ একদেহো দ্বিধাকৃত' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৪] এবং কালিয়দমন বর্ণনা উপলক্ষেই হরিবংশে সংকর্ষণের বাসুদেব-

কৃষ্ণের সঙ্গে 'একদেহ দ্বিধাকৃত' এই অভিব্যক্তি সর্বতাতের ঘোষুণ্ডি লেখতে সংকর্ষণ-বাসুদেবকে যৌথভাবে 'অনিহত' ও 'সর্বেশ্বর' নামে অভিহিত করার মূলে ক্রিয়াশীল ছিল বলে গণ্য করা যেতে পারে।

পূর্বে বর্ণিত এই কালিয় কাহিনী সকল বৈষ্ণবীয় পুরাণেই বেশ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। গোকুল এবং বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের শিশু অবস্থায় পুতনাবধ থেকে মথুরা যাত্রার প্রাক্কালে বৃষভাসুর বধ পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সকলকেই তিনি হত্যা করেছেন ধরণীর ভার অপসারণের জন্য। কিন্তু নাগপত্নীগণের করুণ প্রার্থনা ও কালিয়ের দ্বারা স্তুতিলাভের পর কৃষ্ণ কালিয়কে হত্যা না করে যমুনা ত্যাগ করে যেতে আদেশ করলেন। কালিয় তাঁর সমস্ত ভৃত্য, পুত্র, বান্ধব এবং ভার্যাগণ সহ যমুনা পরিত্যাগ করে চলে গেলেন এবং এই ঘটনা সকলে প্রত্যক্ষ করল (পশ্যতাং সর্বভূতানাং সভৃত্যসুতবান্ধবঃ। সমস্ত ভার্যা-সহিতঃ পরিত্যজ্য স্বকং হ্রদম্)[১৫]। অন্য পুরাণসমূহে এই ঘটনা 'কালিয়দমন' নামে অভিহিত হয়ে থাকলেও ভাগবতে এই ঘটনা 'কালিয় মোক্ষ' নামে বর্ণিত হয়েছে। এইসব বর্ণনা থেকে অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে তত্ত্বচিন্তার মাধ্যমেই বাসুদেব-কৃষ্ণ দেব-উপাসক ক্ষত্রিয়দের দ্বারা বিষ্ণুর সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলে গৃহীত ও উপাসিত হয়েছিলেন। সেই পদ্ধতিতেই নাগসমাজেও সংকর্ষণ-বাসুদেব পরমতম উপাস্যরূপে গৃহীত হয়েছিলেন। কালিয়ের এই পরাজয়কে গোবর্ধন কাহিনীতে বর্ণিত কৃষ্ণ কর্তৃক ইন্দ্রের পরাজয়ের সঙ্গে অনায়াসেই তুলনা করা যেতে পারে। বেদ-অনুগামী যজ্ঞধর্মী সমাজে বিষ্ণু ইন্দ্রের সহায়ক বলে গণ্য হয়েছিলেন। মহাভারতেও আছে যে কৃষ্ণ দৈত্যদের পরাজিত করে ইন্দ্রকে দেব-রাজ পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন ; এমনকি শিশু অবস্থাতেই তিনি বিষ্ণু হয়ে তিন পদক্ষেপে মহাকাশ, অন্তরীক্ষমণ্ডল ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করেছিলেন এবং সূর্য-মণ্ডলে স্বয়ং সূর্যের জ্যোতিকে নিজের জ্যোতিতে ম্লান করে দিয়েছিলেন (মহাভারত, ৩।১২।১৯:২৫, ইত্যাদি)। এইসব উক্তিতে কৃষ্ণকে যে কি উচ্চপর্যায়ে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল তা উপলব্ধি করা যায়। এতৎসত্ত্বেও ইন্দ্রকেই দেবরাজ বলে গণ্য করা হত। বাসুদেব-কৃষ্ণ সেই ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ করলে বিষ্ণুর স্বরূপাত্মক কৃষ্ণ-বাসুদেব দেব-উপাসকদের প্রধানতম আরাধ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

ঋগ্বেদের কাল থেকেই নাগসম্প্রদায়কে ইন্দ্রের বিরোধীরূপে দেখা যায়। ঋগ্বেদে অহি নামে পরিচিত দানবরাজ বৃত্রকে হত্যা করে ইন্দ্র নিজের প্রাধান্য

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু যে সমাজে নাগ-উপাসনা প্রচলিত ছিল, যারা নিজেদের নাগসম্ভূত বলে গণ্য করত, তারা নিশ্চিতই ইন্দ্রকে তাদের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে নাই। নাগ-উপাসকেরা সম্ভবত যজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করত না। যজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী এবং ইন্দ্র পরিচালিত দেবসমাজের সঙ্গে নাগদের কোন সদ্ভাব ছিল না, বরং বিরোধই ছিল। এই নাগসম্প্রদায়কে জলাশ্রয়ী বলে বর্ণনা করা হয়েছে দেখা যায়। ঋগ্বেদের অহিরাজ বৃত্র জল আকর্ষণ করে রাখতেন ; বৃত্রের অধিকার থেকে জলকে মুক্ত করবার জন্যই ইন্দ্র বৃত্রকে নিহত করেন। পুরাণে বর্ণিত আছে যে নাগদের সঙ্গে একবার গন্ধর্বদের বিবাদ উপস্থিত হয়েছিল।[১৬] নাগকুলের অধিপতিরা ভগবান বিষ্ণুর নিকট গন্ধর্বদের এই অত্যাচারের প্রতিবিধান প্রার্থনা করেন। ভগবান জলশায়ী সর্বদেবেশ্বর (বিষ্ণু) তাঁদের ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা পুরুকুৎসের সাহায্য প্রার্থনা করতে উপদেশ দেন। পুরুকুৎসের পত্নী নর্মদা ছিলেন নাগাধিপতিদের ভগ্নী। নর্মদার অনুরোধে পুরুকুৎস গন্ধর্বদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন এবং নাগদের ভীতিমুক্ত করেন।

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত এই কাহিনী নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে পুরুকুৎস এই কাহিনীর কেন্দ্রপুরুষ ঋগ্বেদে একাধিকবার তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৭] ম্যাকডোনেল ঋগ্বেদের এই পুরুকুৎস ও তাঁর পুত্র ত্রসদস্যুকে দিবোদাস ও সুদাসের মতই ঐতিহাসিক পুরুষ বলে গণ্য করেছেন।[১৮] পার্জিটার মনে করেন, এই পুরুকুৎস প্রবল শক্তিধর রাজা ছিলেন এবং দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত তিনি দিগ্বিজয় করেছিলেন।[১৯] বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে গন্ধর্বদ্বারা উৎপীড়িত নাগগোষ্ঠীর অধিপতিরা (উরগেশ্বরৈঃ) জলশায়ী, অশেষদেবেশ ভগবান পুণ্ডরীকাক্ষকে স্তুতিদ্বারা প্রীত করেছিলেন। উরগেশ্বরৈঃ এই বহুবচন ব্যবহারে নাগদের মধ্যে গণশাসনের অস্তিত্ব ছিল বলে অনুমান করা যায়। সংস্কৃতি তথা উপাস্য দেবতার ভিন্নতা থাকলেও নাগদের সঙ্গে বেদানুগ যজ্ঞপন্থী সমাজের বৈবাহিক আদানপ্রদান নিষিদ্ধ ছিল না। পুরুকুৎস যজ্ঞপন্থী ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা ছিলেন। তাঁর পত্নী নর্মদা (যাঁর অনুরোধে তিনি গন্ধর্বদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন) নাগ-অধীশ্বরদের ভগিনী অর্থাৎ নাগকন্যা ছিলেন। এই প্রসঙ্গে মহাভারতে বর্ণিত অর্জুনের সঙ্গে নাগকন্যা উলূপীর পরিণয়ের বিবরণ স্মরণ করা যেতে পারে। পুরাণের মতে পুরুকুৎসের মহিষী নর্মদা পরে নদীতে পরিণত হয়েছিলেন। পশ্চিমভারতের বিখ্যাত নর্মদাই সেই

নদী। মহিলার নদীতে পরিণত হওয়ার অর্থ সম্ভবত মহিলার নামে নদীর পরিচয় বা নদীর নামে স্ত্রীলোকের পরিচয় প্রচারিত হওয়া। ঋগ্বেদে বর্ণিত প্রখ্যাত সরস্বতী এমনি একটি নাম, যে নদীকে দেবীরূপে কল্পনা করা হয়েছিল এবং ভরতবংশের আশ্রয়স্থলরূপে যে নদী 'ভারতী' নামেও পরিচয়লাভ করেছিল। ইক্ষ্বাকুবংশীয় মান্ধাতার পৌত্রীর নাম ছিল কাবেরী, যার সঙ্গে কান্যকুব্জের অধিপতি জহ্নুর পরিণয় হয়েছিল।

কালিন্দী অর্থাৎ যমুনা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী।[২০] মহাভারতে পুরুকুৎসের দিগ্বিজয়ের বর্ণনা আছে এবং সে দিগ্বিজয় অভিযানে পুরুকুৎস দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন।[২১] এই মহাভারতেই নর্মদার নদীতে পরিণত হওয়ার কাহিনীও বর্ণিত আছে।[২২] নর্মদা নদীর সমীপবর্তী বিস্তৃত অঞ্চলের নাগসম্পর্ক নাগপুর, নাগবিদর্ভ ইত্যাদি নাম থেকে এখনও প্রচলিত রয়েছে। তক্ষশীলা তথা গান্ধারের অধিবাসীরা হয়ত নাগ-উপাসক ছিলেন এবং তাঁরা নিজেদের নাগবংশোদ্ভূত বলে গণ্য করতেন, জন্মেজয় অনুষ্ঠিত সর্পসত্র-অনুষ্ঠানের কাহিনী থেকে অনেকে এরূপ অনুমান করেছেন। তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতার যে-সব নিদর্শন মহেঞ্জোদারো ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে নাগ-উপাসনার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ তক্ষশীলার সন্নিকটবর্তী সরাইকালা অঞ্চলে খননকার্য পরিচালনা ক'রে সেখানে তাম্র-প্রস্তর যুগে প্রচলিত নাগ-উপাসনার বহু প্রমাণ আবিষ্কার করেছেন।[২৩]

পুরাণে পুরুকুৎস সম্পর্কিত যে উপাখ্যান আছে, দেবতত্ত্ব বিবর্তনের দিক থেকে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে বর্ণিত হয়েছে যে গন্ধর্বদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে নাগসম্প্রদায়ের অধিপতিরা জলশায়ী ভগবান 'অশেষদেবেশের' নিকট গন্ধর্ব-সম্প্রদায়ের অত্যাচার থেকে উদ্ধারের উপায় নির্দেশের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করেছিলেন। নাগকুলের উপাস্য এই পরমদেবতার কোন নাম এখানে উল্লিখিত হয় নাই কিন্তু তাকে জলশায়ী, পুণ্ডরীকনয়ন, অশেষদেবেশ আখ্যায় অভিহিত করায় এই রূপ যে ভগবান বিষ্ণুর শেষনাগের উপর শায়িত নারায়ণ রূপ তা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। নারায়ণ নামে দেবতার কোন উল্লেখ কিন্তু প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। তৈত্তিরীয় আরণ্যক নামক গ্রন্থে বিষ্ণু ও নারায়ণকে এক এবং বাসুদেবকে বিষ্ণু ও নারায়ণের সঙ্গে অভিন্নরূপে উল্লেখ করা

হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে নারায়ণ-বাসুদেব-বিষ্ণুর এক ও অভিন্নরূপে উল্লেখে কৃষ্ণসাধনার এক নূতন দিগন্তের উন্মোচনের সূচনা হয়েছিল। বস্তুত বাসুদেব-কৃষ্ণের সঙ্গে বৈদিক দেবতা বিষ্ণুর একত্ব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু গীতাতে নারায়ণের কোন উল্লেখ নাই। দেবতারূপে নারায়ণের উল্লেখ ও তাঁর মাহাত্ম্যের প্রতিষ্ঠা মহাভারতেই প্রথম বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। সেই-সঙ্গে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বাসুদেব ও বিষ্ণুকে নারায়ণের সঙ্গে এক ও অভিন্ন-রূপে প্রতিষ্ঠা করায় যে সম্ভাবনার সূত্রপাত হয়েছিল, পরবর্তী যুগে শ্রীকৃষ্ণসাধনা সেই ইঙ্গিত অনুসরণ করেই ব্যাপক পরিণতিলাভ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণসাধনার এই বিবর্তনের ইতিহাস ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ইতিহাসের সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য সম্পর্কে গ্রথিত হয়ে আছে।

মহাভারতে উল্লেখ আছে যে জলকে 'নারস' বলা হত, কারণ জল ছিল নরের পুত্র। সেই আদিমতম কালে, যখন তাবৎ সৃষ্টিই ছিল জলমগ্ন, তখন সেই নারস বারিরাশির উপরেই আদিপিতা ব্রহ্মার অবস্থান ছিল, যার ফলে তিনি নারায়ণ নামে অভিহিত হয়েছেন। অর্থাৎ প্রাচীন রক্ষণশীল যজ্ঞপন্থীদের নিকট ভগবান বিষ্ণুর অন্যান্য প্রতীক, যেমন মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদিকে ব্রহ্মার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল, তেমনি এই জলশায়ী নারায়ণকেও ব্রহ্মার প্রতীকরূপেই গণ্য করা হত। বিবর্তনপথে যখন বিষ্ণু যজ্ঞপন্থীদের দেবতাদের মধ্যে অগ্রণী বলে গৃহীত হয়েছিলেন তখন কালক্রমে বরাহ যজ্ঞের সঙ্গে এক ও অভিন্নরূপে বিষ্ণুর প্রতীক বলে গণ্য হয়েছিলেন। বরাহকে যেমন ঋগ্বেদেই বিষ্ণুর সঙ্গে এক ও অভিন্ন প্রতীয়মান হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, মৎস্য ও কূর্মেরও তেমনি পুরাণ-গ্রন্থে প্রথম ভগবান বিষ্ণুর অবতাররূপে স্বীকৃতিলাভ করবার সাক্ষ্য আছে।[২৪] নারায়ণের ক্ষেত্রেও ঘটনা প্রায় অনুরূপ। ঋগ্বেদে সৃষ্টির আদি যুগ সম্পর্কে এক অভিনব কল্পনার বিবরণ আছে। সেখানে বলা হয়েছে যে সেই আদিমতম অবস্থায় তাবৎ সৃষ্টিই ছিল শুধুমাত্র বারিরাশিতে আবৃত; সমস্ত সৃষ্টি, বীজরূপে সেই বারিসমুদ্রে অবস্থিত ছিলেন, অবস্থিত ছিলেন জন্মহীন সত্তার নাভিদেশে। (পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবেভিরসুরৈর্ যদস্তি। কম্ স্বিদগর্ভম প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে। অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ)[২৫]। এই চরাচরবিস্তৃত বারিরাশির এবং সেই বারিরাশিস্থিত-

জন্মহীন (অজ) সত্তার নাভির কল্পনাই যে পরবর্তীকালে জলশায়ী নারায়ণের পরিকল্পনায় রূপ নিয়েছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মহাভারতে এই কল্পনাভিত্তিতেই সেই 'আপ' বা জলরাশিকে নারা এই আখ্যায় অভিহিত করে নারায়ণ পরিকল্পনার যোগসূত্রের ইঙ্গিত প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। (আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং মম তৎপূর্বমতো নারায়ণোহহম্।[২৬]) তৈত্তিরীয় আরণ্যকই (প্রথম অনুবাক্, দশম প্রপাঠক) সম্ভবত প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থ যেখানে গায়ত্রী মন্ত্র প্রসঙ্গে নারায়ণ-বাসুদেব-বিষ্ণুকে এক ও অভিন্ন বলে অভিহিত করা হয়েছে। এরপর উল্লেখ করা যেতে পারে মৈত্রায়ণীয় সংহিতার কথা, যেখানে অনুরূপভাবে এই গ্রন্থের অন্তভুক্ত শতরুদ্রীয় অংশে কেশব এবং নারায়ণ অভিহিত হয়েছেন এক ও অভিন্নরূপে। (তৎ কেশবায় বিদ্মহে নারায়ণায় ধীমহি / তৎ নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ)। ঋগ্বেদে বর্ণিত অনন্তজল-রাশিস্থিত 'অজ', পরবর্তী যুগে আদি অন্তহীন (আদি-শেষ) তথা অনন্ত আখ্যায় রূপায়িত হয়েছিলেন। প্রতিমা রূপায়ণে জলশায়ী নারায়ণকে দেখান হয় অনন্ত জলরাশিতে স্থিত কুণ্ডলীকৃত নাগের উপর শায়িত চতুর্ভুজ এবং শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধারীরূপে। বহুফণাশোভিত বিস্তৃত নাগমস্তক ছত্রাকারে নারায়ণের উপরে বিধৃত ; নারায়ণের নাভি থেকে উদ্ভূত নালশীর্ষে প্রস্ফুটিত বহুদল পদ্মের উপর ভগবান চতুর্মুখ ব্রহ্মা উপবিষ্ট। নাগদেহকৃত শয্যার শেষপ্রান্তে উপবেশনরত লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের পদসেবায় নিরত। দেবরূপের প্রতিমাকল্পনার এই পূর্ণ রূপ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র এবং বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতার পূর্বে পাওয়া যায় না। এই দুই গ্রন্থই খ্রীস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকের পূর্ববর্তী নয়। অবতার পরিকল্পনায় সংকর্ষণের অবতাররূপে স্বীকৃতিও অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের। প্রাচীনতর সংহিতা ও ব্রাহ্মণে নারায়ণ এবং বাসুদেব বা কেশবই এক ও অভিন্ন। তেমনি মহাভারতে অবতারের যে তালিকা পাওয়া যায় তাতে অবতার হিসেবে ভার্গব রাম (পরশুরাম) ও দাশরথি রাম এবং বাসুদেব-কৃষ্ণ অবতাররূপে বর্ণিত হয়েছেন। কিন্তু মহাভারতের ঐ নারায়ণীয় অংশের ১৪০তম শ্লোকে অবতারদের যে তালিকা আছে তাতে বাসুদেব-কৃষ্ণের নামের পরিবর্তে 'সাত্বত' এই শব্দের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণ-বাসুদেব নিজেও সাত্বত। এই সূত্রে এখানে সাত্বত সংজ্ঞায় কৃষ্ণ-বাসুদেবও হতে পারেন, আবার বলরামও হতে পারেন। অধ্যাপক বন্দ্যো-পাধ্যায় তাঁর মূর্তিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে এই নিয়ে দ্বিধার পরিচয় দিয়েছেন।

(Vasudeva or Baladeva, both of them are of the Sattvata race.[২৮]) সাত্বত সংজ্ঞার শাখা পরিবার 'বৃষ্ণি' বংশে যারা দেবতা পর্যায়ে গৃহীত হয়েছিলেন সেই পঞ্চবীরের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন সংকর্ষণ। বায়ুপুরাণে বিধৃত অবতারের তালিকায়ও বাসুদেব-কৃষ্ণের নামই অবতার রূপে উল্লিখিত আছে।[২৯] বিভিন্ন সূত্রে অবতার কল্পনার বিবরণসমৃদ্ধ যে-সব তালিকা পাওয়া যায় তাতে সেই সংখ্যা অনেকক্ষেত্রে দশে পরিণত হয়েছিল। এই সীমিত দশ সংখ্যার প্রথম উল্লেখ মহাভারতে পাওয়া যায়, যেখানে প্রদত্ত দ্বিতীয় তালিকায় নবম অবতারের নাম 'সাত্বত'। পরবর্তী যুগে এই তালিকার প্রথম উল্লিখিত হংসকে বাদ দিয়ে নবম স্থানে বুদ্ধকে বসিয়ে যে তালিকা প্রচলিত, কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দে প্রদত্ত তালিকায় সেই দশাবতারের মহিমাই গীত হয়েছে। এখানে বিশেষ লক্ষণীয় এই যে পরবর্তী তালিকাসমূহে ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণ আর অবতাররূপে অভিহিত হন নাই। মহাভারতের দ্বিতীয় তালিকার 'সাত্বত' এই সূত্রে সংকর্ষণের অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম নিদর্শনরূপে গণ্য করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে যে দুটি গ্রন্থকে পাঞ্চরাত্র সাধনার মূল গ্রন্থ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে সেই 'সাত্বত সংহিতা' ও 'অহির্বুধ্ন্য সংহিতা'য় প্রদত্ত অবতারের তালিকায় 'সংকর্ষণ-বলরামের' নামের অনুল্লেখ বিশেষভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ। এই তালিকায় তৃতীয় নাম 'অনন্ত'। জার্মান পণ্ডিত স্রাডারের মতে এই অনন্ত শেষ নামে পরিচিত সর্প নন, এঁকে শেষ বা অনন্তের অবতার বলরাম অর্থাৎ সংকর্ষণ বলে গণ্য করাই সমীচীন।

এইসব তথ্য থেকে অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে পরম দেবতা-রূপে 'নাগ' বা সর্পের স্বীকৃতি যজ্ঞ-অনুষ্ঠানকারী সমাজে বেদ বা বেদের বহু পরবর্তীকাল পর্যন্তও ছিল না। নাগ বা সর্পকে বংশপিতা রূপে (totem) গ্রহণ করা থেকেই নাগ-উপাসনার প্রবর্তন হয়েছিল, যেমন হয়েছিল অন্যান্য নানা পশুর বংশপিতারূপে স্বীকৃতি ও উপাসনা। ঋগ্বেদে এইধরনের উপাস্য পশুপ্রতীক বিভিন্ন দেবতার সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলে গণ্য হয়ে গিয়েছিল। দেবরাজ ইন্দ্রকে বৃষ, সূর্যকে গরুত্মন্ ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করার সূত্রেই সে-কথা উপলব্ধি করা যায়। নাগ বা সর্প যে কোন কোন সমাজ কর্তৃক বংশপ্রতীকরূপে বেদের যুগেই প্রচলিত ছিল অহির্বুধ্ন্য সম্পর্কিত মন্ত্র থেকে সে তথ্য উপলব্ধি করা যায়।[৩০]

এই অহির্বুধ্ন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় 'অজ-একপাদের',

সমুদ্রের এবং আপাম নাপাটের[৩১] অথবা সাগর, নদী, মহাকাশ (রজস্), বায়ু এবং গর্জনশীল বন্যার সঙ্গে।[৩২] এই মন্ত্রে সকল দেবতাই যে অহির্বুধ্ন্যের সঙ্গে সংযুক্ত সে-কথারও উল্লেখ আছে। বিস্তৃত জলরাশি, সাগর, নদী, আপাম নাপাট ইত্যাদির সঙ্গে 'অহির্বুধ্ন্য'-দেবতার এই ঘনিষ্ঠতা যেমন প্রণিধানযোগ্য, অজ-একপাদ নামক দেবতার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাও তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ। ঋগ্বেদে 'সর্পরাজ্ঞী' নামে এক দেবীরও উল্লেখ আছে। বেদে উল্লিখিত যজ্ঞের অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই অহির্বুধ্ন্যের কোন যোগ থাকার উল্লেখ পাওয়া যায় না। আবার 'অহি' এই আখ্যায় পরিচিত দানবরাজ বৃত্র তো দেবরাজ ইন্দ্রের পরমতম শত্রু! স্বভাবতই উপলব্ধি করা যেতে পারে যে বংশপিতা সূত্রে যাঁরা সর্পের বা নাগের উপাসক ছিলেন তাঁদের মধ্যে বৃত্রপরিচালিত জনগোষ্ঠী, বৈদিক যজ্ঞ-অনুষ্ঠানকারী ইন্দ্রপরিচালিত জনগোষ্ঠীর প্রবল বিরোধী এবং শত্রুতাসম্পন্ন ছিলেন। এ ছাড়া অহির্বুধ্ন্য উপাসকেরাও তেমন জনপ্রিয় ছিলেন না। এই সম্প্রদায়ের উপাস্য অহির্বুধ্ন্য অনন্ত জলরাশির অধিপতিরূপেই পরিকল্পিত ছিলেন, এ অনুমানও উপরে উদ্ধৃত ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি থেকে সুস্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যায়। এই বিস্তৃত জলরাশি সংশ্লিষ্ট অহির্বুধ্ন্য ও অনন্তরূপী নাগ যে এক ও অভিন্ন, এ অনুমানও অযৌক্তিক নয়। ঋগ্বেদে সেই সৃষ্টির আদিতে অনন্ত জলরাশিতে নিবদ্ধ 'অজ' ও সর্বদেবতার আশ্রয়রূপ যে পরিকল্পনা আছে, নারায়ণ নামে সেই অনন্ত সত্তাই পরমদেবতারূপে উদ্ভূত হয়েছিলেন। আর 'সাত্বত' বলরাম সংকর্ষণই ছিলেন সেই শেষ বা অনন্তের অবতার। দুই প্রবল, পরস্পর সংগ্রামশীল জনগোষ্ঠী এই নারায়ণের স্বীকৃতির মাধ্যমেই পরস্পরের সঙ্গে একত্বসূত্রে এক সমাজে পরিণত হয়েছিল।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সেই নারায়ণ-বাসুদেব-বিষ্ণুই এই সমন্বয় ধারণার মূল পথিকৃৎ। এই প্রসঙ্গে বৈশালীতে (বসাঢ়) আবিষ্কৃত একটি মাটির ছাপমুদ্রার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে একটি লিপিতে লেখা আছে শ্রীবিষ্ণুপাদ-স্বামী-নারায়ণ; সেইসঙ্গে এই মুদ্রার ঠিক মাঝখানে একটি চিহ্ন উৎকীর্ণ আছে, যে চিহ্নটিকে ডক্টর ব্লক একটি ত্রিশূলচিহ্ন বলে অভিহিত করেছিলেন।[৩৩]

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন যে, সন্নিহিত লিপি থেকে ছাপ-মুদ্রাটিকে নিশ্চিতভাবে বৈষ্ণব সাধনা আশ্রিত বলে মনে হয় এবং এই বৈষ্ণব উপকরণে ত্রিশূলের অবস্থান কল্পনা করা যায় না; বরং চিহ্নটিকে একটি

নাগচিহ্ন বলেই তিনি অনুমান করেছেন, যদিও এই চিহ্নটিকে নাগচিহ্নরূপে গণ্য করার কোন যুক্তি তিনি দেন নাই।[৩৪] নারায়ণ যে একান্তভাবেই নাগ-সম্প্রদায়ের দেবতা ছিলেন এ সম্ভাবনার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই যুক্তিতেই এই চিহ্নটিকে নাগচিহ্নরূপে গণ্য করার যথার্থতা আছে বলে মনে হয়। অহির্বুধ্ন্য শব্দে বুধ্ন্য বলতে যে বিরাট জলরাশির কথা বোঝানো হয়েছে তাকে ঋগ্বেদে বিশাল আকাশ বলেও বর্ণনা করা হয়েছে (ঋগ্বেদ ১০।৪৫।১)। এই জলরাশিতে অবস্থিত সর্প সম্ভবত সূর্যের বিদ্যুৎরূপের প্রতীক। ঋগ্বেদে সূর্যের তিনটি রূপের কথা বলা হয়েছে: শূন্যমণ্ডলে তিনি সূর্য (হিরণ্যগর্ভ), আকাশের বিস্তৃত জলরাশিতে তিনি বিদ্যুৎ এবং ভূমিতে তিনি অগ্নি। আকাশের এই বিস্তৃত জলরাশি সম্পর্কিত ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের ৫৪তম সূক্তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণে' একটি উক্তি করেছেন যা এই প্রসঙ্গে খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলছেন 'ন এদম নভোমণ্ডলম্ অম্বুরাশির / ন এতশ্চচ তারা নবফেণ-ভঙ্গা / নায়ম্ শশি কুণ্ডলিতে ফণিন্দ্রো / না সৌ কলঙ্কঃ শয়িতো মুরারি'।

সংকর্ষণ ও বাসুদেবের নাম সম্বলিত যে-সব প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ পাওয়া যায় তার মধ্যে নানাঘাটে আবিষ্কৃত নাগনিকার লিপির কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এ ছাড়া শাতবাহন বংশেরই বাসিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ীর নাসিক চৈত্যগুহায় আবিষ্কৃত একটি লেখতে পুলমায়ীকে রাম-কেশব-অর্জুন-ভীমসেন তুল্য পরাক্রম-শালী বলে অভিহিত করা হয়েছে। (বাসিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ীর ১৯ বর্ষাঙ্কে উৎকীর্ণ নাসিক গুহালিপি)।[৩৫] এই সঙ্গেই মথুরার মোরাগ্রামের বৃষ্ণিবংশের পঞ্চ-বীরের প্রতিমা প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আনুমানিক প্রথম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ এই লিপিতে শৈলদেবগৃহে পাঁচটি প্রতিমা স্থাপিত করবার কথা বর্ণিত আছে। সাত্বত বংশের বৃষ্ণি পরিবারের এই পঞ্চবীর যে বায়ুপুরাণে বর্ণিত সংকর্ষণ-বাসুদেব-প্রদ্যুম্ন-সাম্ব ও অনিরুদ্ধ এ তথ্য সংশয়াতীতভাবে অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন।[৩৬]

এই বৃষ্ণিবীরদের প্রতিমা প্রতিষ্ঠার সংবাদের উপর নির্ভর করে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় ঐতিহাসিক আমলে তাবৎ ভারতবর্ষব্যাপী ভাগবত বা বৈষ্ণব সাধনার যে বিস্তৃতি ঘটেছিল সে-সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন। সাধারণভাবে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা-উপাসক সম্প্রদায়ের পরিচয়ের সূত্রে

religion-শব্দের ব্যবহার বিশেষ করে ইংরাজীতে প্রচলিত আছে। ভারতীয় চিন্তায় এইসব সম্প্রদায়গত ভাবনাকে ধর্ম বলে অভিহিত করা পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাবের ফল। এইসমস্ত ভিন্ন ভিন্ন সাধনমার্গকে বৌদ্ধরা অত্যন্ত যুক্তিসম্মতভাবে 'যান' এই নামে অভিহিত করেছিলেন। এই আলোচনায় এগুলিকে 'সাধন-পথ' এই আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে।

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় অভিমত প্রকাশ করেছেন যে ভাগবত বা বৈষ্ণব সাধনা বৃষ্ণিবংশের পঞ্চবীর সাধনার মাধ্যমেই রূপগ্রহণ করেছিল। এই বিবর্তনের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে প্রথমে এই পঞ্চ বৃষ্ণি-বীরের উপাসনাই প্রচলিত ছিল। এর একমাত্র সমর্থন মোরা গ্রামের কূপপ্রাচীরের লেখ, যা ক্ষত্রপ সোদাসের আমলে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের প্রথমভাগে উৎকীর্ণ হয়েছিল।[৩৭] এই একটি নিদর্শন ভিন্ন পঞ্চ-বৃষ্ণি-বীর উপাসনার আর কোন প্রত্নতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অধ্যাপক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের মতে, যে এই পঞ্চবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে পঞ্চবীরের তালিকা থেকে সাম্বের নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট চারজনকে অব-লম্বন করে পাঞ্চরাত্র বা ব্যূহবাদ নামেব সাধনপথের প্রবর্তন হয়। ('.. but shortly afterwards, Sāmba was eleminated from this list of the deified heroes by the theologians of the cult and the remaining four (Vāsudeva as the fountain head, the three others being his successive emanatory forms) were regarded as typifying the different aspects of the one great God Parā Vāsudeva'.)[৩৮]

পাঞ্চরাত্র একটি অতি বিস্তৃত এবং জটিল দার্শনিক সাধনপ্রকল্প, যার দ্বারা বাসুদেবকে কেন্দ্র করে একটি চিন্তা ও দর্শন বিস্তৃতিলাভ করেছিল। এই পাঞ্চ-রাত্রের সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে যার মধ্যে বৈখানসাগম, পাঞ্চরাত্র সংহিতা, সাত্বত সংহিতা, অহির্বুধ্ন্য সংহিতা ইত্যাদি প্রধান। এই পাঞ্চরাত্র মতে বাসু-দেবের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের পরিকল্পনা করা হয়েছে, যার মধ্যে পরা বাসুদেবই প্রধানতম। এই অলোকসামান্য পরা-বাসুদেব অচিন্ত্য এবং রূপাতীত। সেই পরা-বাসুদেবের প্রথম ব্যক্ত রূপকে বলা হয়েছে ব্যূহ। এই ব্যূহে আছেন বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে বিভব পরিকল্পনা, যে পরিকল্পনায় বাসুদেব বহুরূপে, বহু অবতারে প্রকাশিত। তৃতীয় পর্যায়ের বাসুদেব

অন্তর্যামী ; ইনি সর্বভূতের অন্তরে অবস্থান করে সকলের সকল কর্ম, চিন্তা ও জ্ঞানকে নিয়ন্ত্রণ করেন। চতুর্থ বা শেষ পর্যায়ে অর্চার স্থান, যে পরিকল্পনামতে বাসুদেব অর্চা বা বিগ্রহরূপে প্রত্যক্ষভাবে ভক্তের পূজা গ্রহণ করেন। সব মিলিয়ে এই পঞ্চতত্ত্বের চিন্তা রূপায়িত হয়ে পাঞ্চরাত্র নামে অভিহিত হয়।

এই পরিকল্পনার চাতুর্ব্যূহে ভগবান পর-বাসুদেব, বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপে ব্যক্ত। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে এই তালিকাকে কোথাও বৃষ্ণি-বীরের তালিকা বলে অভিহিত করা হয় নাই ; আরও লক্ষণীয় যে এই তালিকায় ভগবান পর-বাসুদেব কেবল চাতুর্ব্যূহের আধাররূপে প্রধান বলে গণ্য হন নাই, ব্যূহের তালিকায়ও বাসুদেবকে সংকর্ষণের আগে স্থান দেওয়া হয়েছে। এই তথ্য থেকে একথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, প্রায় খ্রীষ্টীয় যুগ পর্যন্ত বৃষ্ণি সমাজে প্রচলিত পঞ্চ-বৃষ্ণি-বীর পূজা থেকে আকস্মিকভাবে এই ব্যূহবাদ তথা পাঞ্চরাত্র পরিকল্পনার উদ্ভব হয়নি। কারণ, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে হেলিয়োডোর বাসুদেবকে পরম উপাস্য দেবদেবরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানেই ভাগবত বা ভক্তিসাধনা পূর্ণ পরিণতিলাভ করেছিল উপলব্ধি করা যায়। সেইসঙ্গে বিচার করা যেতে পারে যে, যে ক্ষত্রপ সোদাসের আমলে পঞ্চ-বৃষ্ণি-বীরের প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই সোদাসের রাজ্যকালেই (আনু-মানিক ১০-২৫ খ্রীস্টাব্দে) মথুরাতে একটি মন্দিরে ভগবান বাসুদেবের একক ভাবে উপাসিত হওয়ারও প্রমাণ পাওয়া যায় ('··বসুনা ভগবতো বাসুদেবস্য মহাস্থানকে দেবকুলং তোরণং বেদিকা প্রতিষ্ঠাপিতং')।[৩৯] দেখা যাচ্ছে যে ভক্তিচেতনা বৃষ্ণিদেরই একক সম্পদ ছিল না। প্রাচীনতম যে-সব প্রত্নলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে দেখা যায় মণিভদ্র প্রমুখ যক্ষ (নমো ভগবতো সথবাহস মানিভদস)[৪০], শাক্যমুনি ও অন্যান্য বুদ্ধ (ভগবতো শকমুনিনো বোধো)[৪১] এবং জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমানকেও ভগবৎ আখ্যায় অভিহিত করায় ভক্তিচিন্তা যে ভারতে বহুপ্রাচীনকাল থেকেই প্রবাহিত ছিল তা উপলব্ধি করা যায়। এককভাবে পরম দেবতারূপে বাসুদেবের প্রতি ভক্তি বৃষ্ণিদের দ্বারাই প্রচারিত হয়েছিল এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত বলে গৃহীত হতে পারে না। আর বাসুদেব-কৃষ্ণের প্রতিমাও যে ঐ পাঞ্চরাত্র সাধনার অর্চা পরিকল্পনা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল এ সিদ্ধান্তও অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের রচনা থেকেই অসিদ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ তিনি অনুমান করেছেন যে, বিদিশায়

হেলিওডোর প্রতিষ্ঠিত গরুড়স্তম্ভের সান্নিধ্যে এবং ঘোসুণ্ডিতে রাজা সর্বতাত প্রতিষ্ঠিত প্রাকারের অভ্যন্তরে বাসুদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঘোষুণ্ডির প্রাকারের অভ্যন্তরে কোন প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত থাকবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ঐ লেখতে নাই। বরং পূজা-শিলা-প্রাকার এই লেখ থেকে অনেকে সেখানে উদ্দিষ্ট দেবতার শিলাপ্রতীকের অবস্থিতি ছিল এই অনুমানই করেছেন। (J. C. Ghosh suggested that these were two Sālagrāma stones (pūjās'ilā) corresponding to the varieties of Samkarshaṇa and Vāsudeva as laid down in the Agnipurāṇa)[৪২]। মোরা কূপের লেখতে পঞ্চ-বৃষ্ণি-বীরের প্রতিমার অস্তিত্বের কথা যেখানে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে প্রায় সেই সময়েরই মথুরায় আবিষ্কৃত ভগবান বাসুদেবের দেবকুলে তোরণ-বেদিকা প্রতিষ্ঠার উল্লেখের কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হতে পারে। এই লেখতে তোরণ এবং বেদিকা প্রতিষ্ঠার কথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়ে থাকলেও কোন প্রতিমার অস্তিত্বের বা বেদিকার উপরে প্রতিমাপ্রতিষ্ঠার কোন উল্লেখ নাই।

মোরা গ্রামে পঞ্চ-বৃষ্ণি-বীরের যে প্রতিমা ছিল, সেইসব প্রতিমার গঠন কেমন ছিল বা সেইসব প্রতিমা দেখতে কেমন ছিল তার কোন বিবরণ নাই। কিছু পরবর্তীকালের একটি লেখ থেকে জানা যায় যে, মথুরায় তোষানাম্নী এক মহিলার একটি প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মথুরায় শক-কুষাণ আমলে বিভিন্ন রাজপুরুষ বা রাজপ্রতিনিধির প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল, অনেকেই এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের পূর্বগামী নরপতি ওয়েমা (বীম) কাদপিসেস ও কুজুলা কাদপিসেসের প্রতিকৃতি বলে পরিচিত যে মূর্তিগুলি মথুরায় আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলিকে অনুরূপভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা বলেই গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ শক্তি ও বীর্যবত্তার প্রতীক, নাম-পরিচয় খোদিত, বহুপরিচিত সম্রাট কণিষ্কের মূর্তিটিকে এইধরনের প্রতিমা বলেই অভিহিত করা যেতে পারে। সম্রাট কণিষ্ক বহিরাগত কুষাণ (ঘুষণ) বংশোদ্ভব বলে পরিচিত। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণে কণিষ্কের ভগবান বুদ্ধের প্রতি অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির আহ্বান করেছিলেন এই তথ্য প্রচলিত আছে। এই মহাসঙ্গীতিতেই মহাযান বৌদ্ধ মতের প্রবর্তন হয়েছিল। বৌদ্ধ সাধনা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে

থাকলেও অশোক যেমন বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে সমর-স্পৃহা বিসর্জন দিয়ে ধর্মবিজয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন, কণিষ্ক সেভাবে সমর-স্পৃহা বিসর্জন দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। মথুরায় তাঁর যে বৃহৎ-বপু যোদ্ধবেশে সজ্জিত তরবারি-হস্ত প্রতিমা আবিষ্কৃত হয়েছে সেই প্রতিমা প্রতিকৃতি-ভাস্কর্যের এক তুলনাহীন নিদর্শন। মথুরা ও সন্নিহিত অঞ্চল থেকে সম্রাট কণিষ্কের নামাঙ্কিত যে-সমস্ত লেখ আবিষ্কৃত হয়েছে তার প্রায় সব-ক'টিতেই সম্রাট কণিষ্ককে দেবপুত্র এই আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। এইসব লেখতে মহারাজস্য দেবপুত্রস্য কণিষ্কস্য—বা মহরজস্য রজতিরজস্য দেবপুত্রস্য কণিষ্কস্য—কিম্বা মহারাজস্য দেবপুত্রস্য উল্লেখ আছে। কণিষ্কের পরবর্তী কুষাণ সম্রাট বসিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেবের বহু লেখতে এঁদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এই দেবপুত্র আখ্যা ব্যবহৃত হয়েছে।[৪৩]

কুষাণ সম্রাটদের ব্যবহৃত দেবপুত্র আখ্যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কুষাণ সম্রাটেরা যে কি পরিমাণে ভারতীয় ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁদের এই দেবপুত্র আখ্যা ব্যবহারে তার প্রমাণ নিহিত আছে। সম্রাট অশোক নিজেকে অভিহিত করেছেন 'দেবানাং প্রিয়' এই আখ্যায়। ভারত সমাজ সম্ভূত অশোকের 'দেবানাং প্রিয়' আখ্যা ব্যবহারে বিস্ময়ের কারণ নাই। কিন্তু শকবংশোদ্ভূত বহিরাগত কুষাণ সম্রাটেরা দেবপুত্র এই আখ্যা কেন ব্যবহার করেছেন সে-সম্বন্ধে খুব যুক্তিপূর্ণ তথ্য কোথাও প্রদত্ত হয়নি। আফগানিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও ইরাণের পূর্ব অঞ্চলের একাংশ একসময় 'শকস্থান' নামে পরিচিত ছিল। এই শকস্থানের একদিকে পারস্য সাম্রাজ্য (একামেনিড), অন্যদিকে ভারতবর্ষ। একামেনিড সম্রাট ডেরিয়াস (দারায়বুস) তাঁর সাম্রাজ্যে যে-সব জনপদ অন্তর্ভুক্ত বলে দাবি করেছেন, শক জনপদ ছিল তার অন্যতম। (বেহিস্তান লেখতে—গদার সক ; পারসিপোলিস লেখতে—গদার সকামক ; নকস-ই-রুস্তম লিপিতে—গদার-হিন্দুস্ সকা-হৌমবর্গা ; জেরাক্সিসের পার্সিপোলিস লিপিতে—গদার-হিন্দুষ্ কত-পাতুক-দহা-সকা হৌমবর্গা সকা তিগ্রখৌডা ইত্যাদি)[৪৪] পরবর্তী যুগে ভারতে একশ্রেণীর সূর্যোপাসক ব্রাহ্মণ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হয়। দারিয়াস ও জেরাক্সিস 'গদার' অর্থাৎ গান্ধারকে তাঁদের সাম্রাজ্যভুক্ত বলে দাবি করলেও মহাভারতে গান্ধার ভারতেরই অন্তর্ভুক্তরূপে বর্ণিত হয়েছে। গান্ধারের অন্যতম রাজ্যরূপে পরিচিত তক্ষশিলার রাজা অম্ফিসকে আলেকজাণ্ডারের ঐতিহাসিকেরা ভারতীয় বলেই

অভিহিত করেছেন। সম্রাট অশোকের সময় গান্ধার মৌর্যসাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। নবম শতাব্দীতে বাংলার পাল সম্রাট দেবপালের রাজত্বকালে, নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত বীরদেব নামক বৌদ্ধভিক্ষুর একটি লিপিতে জানা যায় যে আফগানিস্থানের নগরহার নামক একটি প্রসিদ্ধ নগরের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। এই নগরহার (বর্তমান জালালাবাদের সন্নিকটে) তৎকালেও ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির এক বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল এবং এই নগরটিকে উত্তরাপথের অন্তর্গত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪৫] আরবদের দ্বারা পারস্য দেশ অধিকৃত হওয়ার পরেই হয়ত শকদ্বীপ অঞ্চলের অধিবাসীরা ধর্ম ও জীবন রক্ষার্থ ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, যেমন করেছিল আহুর মাজদা-উপাসক পারস্যদেশের বহু অধিবাসী। কিন্তু শকদ্বীপ সম্ভবত আহুর মাজদা-উপাসক অধ্যুষিত ছিল না—দারিয়াস ও জেরাক্সিসের লেখতে যাদের 'দায়েব' অর্থাৎ দেব-উপাসক বলে অভিহিত করা হয়েছে তারাই ছিল শকদ্বীপের অধিবাসী। এই ভিত্তিতেই মনে হয় যে কণিষ্ক ও তাঁর বংশের সম্রাটেরা ভারতে প্রবেশ করবার পূর্ব থেকে 'দায়েব'—উপাসকই ছিলেন এবং এই সূত্রেই তাঁরা নিজেদের দেবপুত্র এই আখ্যা ব্যবহার করেছেন। শক-কুষাণদের যে মোঙ্গল জাতি উদ্ভূত বলে গণ্য করা হয় তার সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ নাই; বরং তাঁরা হয়ত মূলত দেব-উপাসক ভারতীয় সমাজেরই অঙ্গীভূত ছিলেন। সম্রাট কণিষ্কের মুদ্রায় জরথুস্ত্র-উপাসক সমাজে ব্যবহৃত প্রতীক, গ্রীক দেবতার মূর্তি এবং ভগবান বুদ্ধের মূর্তি পাওয়া যায়। জরথুস্ত্রের প্রবর্তিত আহুর মাজদা-উপাসক সমাজে মূর্তিপূজা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ভারতীয় সমাজে মৃতের প্রতিমা নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার যে প্রচলন ছিল, নানা সূত্র থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শক-কুষাণদের মূর্তিগুলি অনুরূপ মরণোত্তর প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা বলেই অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত। এই যুক্তিতেই লুডার্স (Luders) বলেছেন, তোষার যে প্রতিমার উল্লেখ মথুরার একটি লেখতে আছে, সেটি তোষার মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৪৬] তোষার এই প্রতিমূর্তিটিকে প্রতিমা নামে অভিহিত করায়, উপলব্ধি করা যায় যে প্রতিমা বলতে কেবলমাত্র দেবপ্রতিমা বা তদনুরূপ ভক্তিভাজন এবং পূজার্হ ব্যক্তির প্রতীককেই বোঝাত না, কারণ তোষাকে নিশ্চিতই তেমন দেবতারূপে গণ্য করা যায় না। বৃষ্ণিবংশের যে পঞ্চবীরের প্রতিমার উল্লেখ মোরা কূপের লেখতে আছে সেই

প্রতিমাকেও অনুরূপ পঞ্চবীরের প্রতিকৃতি বলেই অনুমান করা চলে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে এই পঞ্চবীরের যেখানে উল্লেখ আছে সেই পুরাণে এদের 'মনুষ্য-প্রকৃতি দেবতা' বলে অভিহিত করা হয়েছে (বায়ুপুরাণ ৯৭।১-৪)। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চবীরের 'মনুষ্য-প্রকৃতি দেবত্ব' থেকে কি করে পরবর্তীকালে পাঞ্চরাত্র চাতুর্ব্যূহের বাসুদেব-সংকর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনুরুদ্ধ—এই চার দেবতার উদ্ভব হয়েছিল সে-সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[৪৭] কিন্তু কেন সাম্বের নাম মূল তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং কেন সেই চাতুর্ব্যূহ তালিকার প্রথমে উল্লিখিত জ্যেষ্ঠ সংকর্ষণকে দ্বিতীয় স্থানে এনে বাসুদেবকে অনতিক্রম্য প্রাধান্যে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল তার কোন ক্রম বা কারণ তিনি প্রদর্শন করেননি।

এই প্রসঙ্গে ভাগবতের কালিয়মোক্ষ অধ্যায়ের একটি শ্লোককে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। এখানে বর্ণিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণের চরণাঘাতে কালিয় হৃতশক্তি ও মরণোন্মুখ হয়ে পড়লে কালিয়ের পত্নীরা একান্ত কাতরতার সঙ্গে কেবল শ্রীকৃষ্ণের নিকটই স্বামীর মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেনি, তাদের প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ, রাম (অর্থাৎ বলরাম বা সংকর্ষণ), বাসুদেবপুত্র প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ এই চারজন সাত্বত অধিপতির উদ্দেশ্যে (নমঃ কৃষ্ণায় রামায় বাসুদেবসুতায় চ / প্রদ্যুম্নানুরুদ্ধায় সাত্বতং পতয়ে নমঃ—ভাগবত)।[৪৮] স্মরণ করা যেতে পারে যে হরিবংশপুরাণে সংকর্ষণ কৃষ্ণকে নিজের প্রকৃত সত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে দুষ্ট নাগকে দমনে উৎসাহিত করেছিলেন এই বর্ণনা যেখানে আছে সেখানে বলরামকে ভিন্নদেহে একই পরম সত্তার অভিব্যক্তি বলে অভিহিত করা হয়েছিল। হরিবংশ বা বিষ্ণুপুরাণে কালিয়ের প্রাণরক্ষার প্রার্থনায় কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন নামের উল্লেখ দেখা যায় না। পরন্তু কৃষ্ণ যখন কালিয়কে বিমর্দিত করেছিলেন তখন তিনি বৃন্দাবনের গোপসমাজের প্রভূত আদরের সদ্য শৈশব উত্তীর্ণ কিশোর। সাত্বত কুলের সঙ্গে তাঁর কোন সংস্রব তখন ছিল না, পুত্র প্রদ্যুম্ন এবং পৌত্র অনিরুদ্ধের জন্ম তখনও সুদূরাগত। ভাগবতপুরাণে কালিয় কাহিনীতে এই অংশ যিনি সংযোজন করেছিলেন তাঁর কালবিন্যাসের পারম্পর্য বিচার করার কোন আগ্রহ ছিল না। তবে এই অংশ যখন গ্রথিত হয় তখন পাঞ্চরাত্র সাধনা যথেষ্ট পরিণতিলাভ করেছে এবং চাতুর্ব্যূহের বিন্যাসে ইতিমধ্যেই কনিষ্ঠ বাসুদেব জ্যেষ্ঠ সংকর্ষণের পূর্বে স্থান-

লাভ করেছেন। ইতিপূর্বে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে এই পাঞ্চরাত্র সম্পর্কিত পুস্তকের মধ্যে সাত্বত সংহিতা এবং অহির্বুধ্ন্য সংহিতা নামে দুটি গ্রন্থ বিশেষ প্রাধান্য পেয়ে থাকে। অহির্বুধ্ন্য সংহিতার সঙ্গে সাত্বত সংহিতার, বিশেষ করে উভয় গ্রন্থে প্রদত্ত অবতারের নামের তালিকা হুবহু এক। ইতিপূর্বে কালিয় কাহিনীর উপরে ভিত্তি করেই যে অনন্তজলরাশির উপর নাগশয্যায় শায়িত নারায়ণ-বাসুদেব-বিষ্ণুর আরাধনার প্রবর্তন হয়েছিল এই কথা বলা হয়েছে। সাত্বত পাঞ্চরাত্র সাধনার প্রবর্তনও যে এই নাগসমাজের স্বীকৃতির দ্বারাই উদ্ভূত এবং প্রচারিত হয়েছিল—এমন সম্ভাবনা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে অনুমান করা যেতে পারে। এই সাত্বত বা অহির্বুধ্ন্য বিধৃত সাধনার সঙ্গে বৃষ্ণি-বীর প্রতিমার কোন যোগ ছিল না। অহির্বুধ্ন্য সংহিতা সূত্রে এই পাঞ্চরাত্র-চাতুর্ব্যূহ সাধনার সঙ্গে ঋগ্বেদের উল্লিখিত অহির্বুধ্ন্য দেবতার সম্পর্ক, সেই দেবতার নারায়ণরূপে পরিকল্পনা ও বাসুদেবকে সেই নারায়ণ-বিষ্ণুরই মূর্ত অভিব্যক্তিরূপে গ্রহণ করার ক্রমবিবর্তন এইসব সূত্র থেকে স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যায়।

এই ভিত্তিতেই বলা চলে যে বহু প্রাচীনকালেই দেবতা হিসেবে বাসুদেব উপাসনার উদ্ভব ও বিবর্তন ঘটে থাকলেও সাত্বত সংহিতা সম্মত বাসুদেব আর বিদিশায় প্রতিষ্ঠিত হেলিয়োডোরের স্তম্ভে বর্ণিত দেবদেব বাসুদেব এক ও অভিন্ন ছিলেন না, কারণ তখনও পাঞ্চরাত্র পরিকল্পনার প্রসার হয় নাই। পাঞ্চরাত্র মতে বাসুদেবের উপাসনা কবে প্রবর্তিত হয়েছিল এখন সেকথা নিশ্চিতভাবে বলা দুষ্কর। পাঞ্চরাত্রের পরিপোষক শাস্ত্রীয় গ্রন্থের মধ্যে বৈখানসাগম নামে পরিচিত গ্রন্থই প্রাচীনতম বলে গণ্য হয়ে থাকে। এই গ্রন্থ সম্ভবত পঞ্চম বা ষষ্ঠ-শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয় নাই। পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে যে, অর্চা বা মূর্তি ভিন্ন দেবতার পূজা বিধেয় নয়। আর দেবতার মূর্তির লক্ষণ ও প্রকারভেদ বিস্তৃতভাবে এই বৈখানসাগম গ্রন্থে এবং হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু সাত্বতদের মধ্যে যে এক বিশেষ ধরনের সাধনার প্রবর্তন বহুপূর্বেই হয়েছিল, মহাভারতে উল্লিখিত একটি শ্লোক থেকে সেকথা প্রতীয়মান হয়। এই শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে যে দ্বাপরযুগের অবসানে এবং কলির প্রারম্ভে সংকর্ষণের দ্বারা সাত্বত বিধি গীত হয়েছিল (দ্বাপরস্য যুগস্যান্তে আদৌ কলিযুগস্য চ/ সাত্বতং বিধিমাস্থায় গীতঃ সংকর্ষণেন বৈ)।[৪৯] কিন্তু শতপথ

ব্রাহ্মণের মতে নারায়ণই প্রথম পাঞ্চরাত্র যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন, সে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি তাবৎ লোকের উপর প্রাধান্য অর্জন করেছিলেন এবং সর্বত্র ব্যাপ্তিলাভ করেছিলেন।[৫০] শতপথ ব্রাহ্মণের এই বর্ণনার সঙ্গে ঐ শতপথেই বিষ্ণুকে যেভাবে সমস্ত দেবতাদের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল তার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বিশেষ লক্ষণীয়। নারায়ণ বিশেষ করে বিস্তৃত জলরাশির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এই সূত্রেই পাঞ্চরাত্র বিধি প্রবর্তনের মাধ্যমে নারায়ণ পরবর্তী পাঞ্চরাত্র চিন্তায় পর-বাসুদেবের সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলে গণ্য হয়েছিলেন। এই নারায়ণ পরিকল্পনার সঙ্গে 'শেষ' নামে অভিহিত নাগের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শতপথের পাঞ্চরাত্র পরিকল্পনামতে নারায়ণই প্রধান বলে বর্ণিত হয়ে থাকলেও পরবর্তী পাঞ্চরাত্র গ্রন্থগুলিতে পর-বাসুদেবকেই প্রধান বলে গণ্য করা হয়েছিল। এই বিবর্তনের বীজ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে পাওয়া যায়, যেখানে নারায়ণ-বাসুদেব-বিষ্ণুকে এক ও অভিন্ন বলা হয়েছে।[৫১] মহাভারতে সংকর্ষণকেই সাত্বত বিধির প্রবর্তক বলে অভিহিত করা হয়েছে, যে বর্ণনার সঙ্গে কালিয় কাহিনীতে সংকর্ষণের দ্বারা কিশোর কৃষ্ণকে তাঁর প্রকৃত সত্তা অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়ার বিশেষ যোগ লক্ষ্য করা যায়। সংকর্ষণ ও বাসুদেব ভিন্ন দেহে একই সত্তা বলে বর্ণিত হলেও সংকর্ষণের দ্বারা বাসুদেবের শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য এইভাবেই স্বীকৃত হয়েছিল এবং সাত্বত সংহিতার মতে চাতুর্ব্যূহের মধ্যে বাসুদেবকেই পুরোগামী স্থান দেওয়া হয়েছিল।

সাত্বতবিধিসম্মত এই নারায়ণ-বাসুদেব-বিষ্ণু ভিত্তিক, ভাগবতনিরপেক্ষ, স্বতন্ত্রভাবে পরিকল্পিত এবং উদ্ভূত আর একটি ধারা ছিল, যে ধারায় বাসুদেব কৃষ্ণ বৈদিক বিষ্ণুসত্তার সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ঋগ্বেদের বিষ্ণু যজ্ঞের সঙ্গে এক হয়ে থাকলেও এই বিষ্ণু সেখানে মূলত সূর্যের অভ্যন্তরস্থ পরমতম শক্তিরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। ঋগ্বেদের বিষ্ণুর পরমপদ বা তিন পদক্ষেপ নভোমণ্ডলে সূর্যের বিচরণের প্রতীক বলে গণ্য হয়েছে।[৫২] এই প্রসঙ্গে শতপথ ব্রাহ্মণের সেই তাৎপর্যপূর্ণ কাহিনীটির পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন বিষ্ণুর মস্তক নভোমণ্ডলে আদিত্যরূপে সংস্থাপিত হয়েছিল।[৫৩] সেইসঙ্গে ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের সঙ্গে ঋষি ঘোর আঙ্গিরসের কথোপকথনের যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে তারও উল্লেখ করা যেতে পারে। এই বর্ণনায় দেখা যায়, ঘোর আঙ্গিরস কৃষ্ণকে পুরুষ-যজ্ঞবিদ্যা

সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জীবনের মূলীভূত পরিবর্তন ও ধ্বংসবিহীন পরম সত্তা সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, উপনিষদসমূহে বিধৃত ব্রহ্মতত্ত্বই যেন তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে উপলব্ধি হয়।[৫৪]

ছান্দোগ্য উপনিষদের এই বর্ণনায় অত্যন্ত সুনিশ্চিতভাবেই ভগবান সূর্যের সত্তাকেই সেই পরিবর্তন ও ধ্বংসবিহীন পরম সত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। কৃষ্ণ এই পুরুষ-যজ্ঞবিদ্যার অনুশীলনের মাধ্যমে সেই পরম উপাস্যের সঙ্গে এক ও অভিন্ন 'পুরুষোত্তম'রূপে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন। ভগবদ্গীতায় দেখা যায় কৃষ্ণকে পুরুষোত্তম তথা আদিত্যদের মধ্যে 'বিষ্ণু' বলে দাবি করা হয়েছে। গীতা রচিত হওয়ার পূর্বেই কৃষ্ণ ও বিষ্ণু যে এক ও অভিন্ন বলে গণ্য হয়েছিলেন এইসব তথ্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে গরুড়কে সূর্যের প্রতীক গরুত্মৎ বলে অভিহিত করা হয়েছে। সূর্যকে সুন্দর পক্ষযুক্ত পক্ষী সুপর্ণও বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে গরুড় একান্তভাবে বিষ্ণুরই প্রতীক বলে গণ্য হয়। ঋগ্বেদে সূর্যের অন্য আরও কিছু প্রতীক পরে বিষ্ণুর প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছিল। সূর্যের রথের চক্র বা যজ্ঞে ব্যবহৃত চক্র-প্রতীক ভগবান বিষ্ণুর হাতের চক্রে পরিণত হয়েছিল। মহাভারতে বর্ণিত বিষ্ণুর সঙ্গে এক ও অভিন্নরূপে পরিগণিত ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণও গরুড় প্রতীকচিহ্নিত এবং চক্র আয়ুধে সজ্জিতরূপে প্রতীয়মান হয়েছিলেন।

ব্রাহ্মণ সাহিত্য ও পুরাণ কাহিনীতে ঋষি কশ্যপের দুই বনিতা কদ্রু ও বিনতার উল্লেখ পাওয়া যায়। কদ্রুর গর্ভে অসংখ্য নাগ বা সর্পের জন্ম হয়েছিল ; বিনতার দুই সন্তান অরুণ ও গরুড়। এই দুই পত্নীর সন্তানদের মধ্যে বিরোধ ও তার শেষ পরিণতিও কাহিনী হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। এই কাহিনীর পেছনে যে তাৎপর্য ছিল তার কিছু আলোচনা হয়েছে। একই প্রকারের অণ্ডসম্ভূত হলেও এই দুই শ্রেণীর জীব দুই বিভিন্ন আকৃতি ও চরিত্রের অধিকারী। সাপ বা সরীসৃপরা একান্তভাবেই জল ও ভূমিনির্ভর। কিন্তু অন্য জাতি পক্ষযুক্ত ও নভোমণ্ডলে বিচরণে সক্ষম। সূর্য এবং নক্ষত্রমণ্ডলী আকাশে বিচরণশীল। পৃথিবীজাত প্রাণি-মণ্ডলের মধ্যে একমাত্র পক্ষীই স্বচ্ছন্দ আকাশচারী। আর সরীসৃপের সঙ্গে পক্ষীর স্বভাবজাত শত্রুতাও বিশেষ লক্ষণীয়। সুপ্রাচীনকালে যখন মানুষের বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন জীবজন্তু, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ ও পর্বতকে বংশপিতারূপে কল্পনা করার প্রথার উদ্ভব হয় তখন থেকে যাঁরা নাগ ও পক্ষী এই দুই প্রজাতিকে

বংশপিতারূপে গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রকৃতিজাত বিরোধও সঞ্চারিত হয়েছিল বলে মনে হয়। প্রাচীন ভারতীয় পুরাণ-কাহিনীর নাগ-সুপর্ণের বিবরণে সেই দ্বন্দ্বেরই প্রতিফলন বিধৃত আছে। স্বভাবতই অনুমান করা যায় যে যাঁরা গরুড়কে বিষ্ণুর প্রতীক বলে গণ্য করতেন তাঁদের এবং যাঁরা নাগকে বিষ্ণুর প্রতীক বলে গণ্য করতেন তাঁদের মধ্যে বিভিন্নতা ছিল। ইতিপূর্বে বেদের বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম বা বামনের আদিত্যরূপে পরিগণিত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এই আদিত্য ও যজ্ঞের সঙ্গে এক যে বিষ্ণু তাঁকে মনু, পুরুরবা, যযাতি এবং ভরতের দ্বারা পরম আশ্রয়রূপে গৃহীত হওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এই বিষ্ণু-সাধনা সূত্রেই পুরু-ভরত বংশীয়ের দ্বারা গরুড় প্রতীকের ধ্বজ-চিহ্নরূপে ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল। এই তথ্য থেকে গরুড় যে বিষ্ণু-উপাসক রাজশক্তির প্রতীক-রূপে পরিগণিত হয়েছিল তা বোঝা যায়। প্রতীক হিসেবে নারায়ণের সঙ্গে নাগের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সাত্বত সংকর্ষণ, যিনি নিজে শেষ নামধেয় নাগের অবতার বলে গণ্য হতেন তাঁরই প্রয়াসে হয়ত বাসুদেব-কৃষ্ণ বিষ্ণু এবং নারায়ণের সঙ্গে অভিন্ন বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর গরুড় প্রতীকের যাঁরা অনুগামী ছিলেন তাঁরা সহজে বিষ্ণুর এই নাগ প্রতীককে স্বীকার করে নিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। গরুড় প্রতীক যে নাগ অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী, কালিয় কাহিনী প্রসঙ্গে পুরাণকারেরা সে ভাব প্রকাশ করেছেন। হরিবংশপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের কালিয়কে মুক্তিদান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

মৎপদানি চ তে সর্প দৃষ্টা মূর্ধণি সাগরে
গরুড়ঃ পন্নগরিপুস্তয়ি ন প্রহরিষ্যতি।[৫৫]

বিষ্ণুপুরাণেও এইভাবেই বর্ণিত হয়েছে যে কালিয়কে মুক্তিদানকালে শ্রীকৃষ্ণ তাকে আশ্বাস দিলেন যে, এর পর থেকে গরুড় আর তাকে (কালিয়কে) প্রহার করবে না :

মৎপদানি চ তে সর্প দৃষ্টা মূর্ধণি সাগরে
গরুড়ঃ পন্নগরিপুস্তয়ি ন প্রহরিষ্যতি।[৫৬]

এই দুই পুরাণের শ্লোকের সাদৃশ্য কেবলমাত্র নাগ-গরুড় সম্পর্কের ইঙ্গিত দিচ্ছে না—নাগের উপর গরুড়ের প্রাধান্যের ইঙ্গিতও বহন করছে। কিন্তু ভাগবত পুরাণে সুস্পষ্টভাবে নাগপত্নীদের দ্বারা গরুড়ধ্বজ জগন্নাথের (বিষ্ণুর) স্তুতির উল্লেখ আছে :

পূজয়িত্বা জগন্নাথং প্রসাদ্য গরুড়ধ্বজম্।
ততঃ প্রীতোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিক্রম্যাভিবন্দিতাম্।[৫৭]

কালিয়দমন প্রসঙ্গে গরুড়ের এই প্রাধান্য তথা বাসুদেব বিষ্ণুকে জগন্নাথ ও গরুড়ধ্বজ প্রতীকের সঙ্গে এক বলে অভিহিত করার মধ্যে বিষ্ণু-বাসুদেব সাধনার বিবর্তনের গভীর ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে একথা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

বাসুদেব-কৃষ্ণ সাধনার বিবর্তনে গরুড়ধ্বজ প্রতীক তথা দেববিগ্রহ

এক সময় পূজায় ব্যবহৃত অর্চা বা বিগ্রহকে প্রতিমা নামে অভিহিত হতে দেখা গেলেও প্রতিমা শব্দে গোড়া থেকেই এই পূজায় ব্যবহৃত বিগ্রহ বোঝাত কিনা সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। প্রতিমা শব্দের যথার্থ অর্থ প্রতিকৃতি, যা থেকে প্রতি-ম শব্দের অর্থসাদৃশ্য।[৫৮] ভাসের রচিত প্রতিমা নামক নাটকে প্রতিমা শব্দের এই 'সাদৃশ্য' অর্থই গৃহীত হয়েছে। মোরা কূপের লেখতে বৃষ্ণিবীরদের যে প্রতিমার উল্লেখ আছে তার সঙ্গে অর্চা শব্দের সংযোজনে সেই প্রতিমা যে অর্চনা বা পূজার্থে ব্যবহৃত হয়েছিল তা বোঝা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালের যে লেখতে তোষার প্রতিমার উল্লেখ আছে সেখানে প্রতিমা অর্থে প্রতিকৃতি নির্দিষ্ট হয়েছিল, অর্চা হিসেবে তার পূজার কোন ইঙ্গিত নাই। কুষাণ যুগের রাজন্যবর্গের যে-সব প্রতিকৃতি পাওয়া যায় সেগুলিকেও প্রতিমা বলা যেতে পারে। অনেকে মনে করেন, রোমক সমাজে যেভাবে সিজার নামে অভিহিত সম্রাটেরা দেবতা বলে গণ্য হতেন এবং তাঁদের মূর্তিকে দেবমূর্তির মর্যাদা দেওয়া হত, সেই রোমক প্রভাবের ফলেই ভারতে এই কুষাণ সম্রাটদের মূর্তিকেও দেবমূর্তির মর্যাদা দেওয়া হত। অনেকে এমন মতও প্রকাশ করেছেন যে ভগবান বুদ্ধের মূর্তিও সেই রোমক প্রভাবের ফলেই উদ্ভূত হয়েছিল। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের পূর্বে ভগবান বুদ্ধের মূর্তির অস্তিত্বের কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত না হওয়ায় এই সন্দেহ অনেকের মনে দৃঢভাবে গ্রথিত আছে। বিভিন্ন দেবতার আকৃতি যে খ্রীস্টজন্মের বহু পূর্ব থেকেই শিল্পে রূপায়িত হয়েছিল তার প্রমাণের অভাব নাই। তবে পাণিনির সুপরিচিত 'জীবিকার্থে চাপণ্যে' সূত্রের দ্বারা দেবতার প্রতিমার কথাই যে বলা হয়েছিল তেমন সুনিশ্চিত কোন প্রমাণ আছে বলে মনে হয় না। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এই সূত্রের দ্বারা নির্দিষ্ট প্রতিকৃতিকে দেবমূর্তি বলেই গণ্য করেছেন। (On

the authority of the commentaries like the Mahābbāshya and the Kasikā we can assume that these objects which were meant for livelihood but at the same time were not for sale were really images of gods which were highly venerated by some people of his time).[৫৯] পাণিনির যুগে যে প্রতিকৃতি নির্মাণের প্রচলন ছিল একথা পাণিনির এই সূত্র থেকে উপলব্ধি করা গেলেও, এই প্রতিমূর্তির সবই যে দেবতার মূর্তি হত এমন সিদ্ধান্ত করা খুব যুক্তিযুক্ত নয়। একই সঙ্গে 'জীবিকার্থে' আবার সেই প্রতিকৃতি 'অপণ্যে' অর্থাৎ বিক্রয়ের জন্য নয় এমন হতে পারে না। বরং বলা যেতে পারে পাণিনি এখানে দুই প্রকারের প্রতিকৃতির কথাই বলেছেন, যার এক শ্রেণীর প্রতিকৃতি শিল্পীরা জীবিকা অর্জনের জন্য অর্থাৎ বিক্রয়ের দ্বারা অর্থ উপার্জনের জন্য নির্মাণ করতেন। এই ধরনের যে প্রতিকৃতি অঙ্কিত বা মূর্তিতে রূপায়িত হয়, তাকে ইংরাজীতে বলা হয় portrait। অন্য এক শ্রেণীর প্রতিকৃতি ছিল যা বিক্রয় করা চলত না; এই শ্রেণীর প্রতিকৃতিই হয়ত ছিল দেবমূর্তি। তবে এই ধরনের মূর্তির পূজার প্রচলন ছিল এমন সিদ্ধান্ত পাণিনির সূত্র থেকে করা চলে না। বরং উপাস্য দেবতার রূপের কল্পনা থাকলেও সাধারণ চোখে তাঁদের দেখা যায় না—এই ভিত্তিতে তাঁদের প্রতিকৃতি নির্মাণ করারও সম্ভাবনা স্বীকার করা যায় না। কঠ উপনিষদ স্পষ্টভাবেই বলছেন—উপাস্য যেই দেবতাকে চোখে দেখা যায় না; কেউ কখনও তাঁকে নিজের চোখে দেখেনি। (ন সন্দশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম—কঠ উপনিষদ, ৪।২০)। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য—সেই মহাসত্তার কোন প্রতিমার অস্তিত্ব নাই। (ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহাদ্যশঃ—শ্বেতাশ্বতর, ৪।১৯)। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে প্রাচীনতম যে-সমস্ত শিল্পনিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে সেসব প্রত্নিদর্শনের কিছু বিচার করা যেতে পারে। প্রথমত লক্ষণীয় যে এইসব প্রাচীনতম প্রত্নিদর্শন—হয় বৌদ্ধ সমাজের অথবা জৈন সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বৌদ্ধ বা জৈন ছাড়া অন্য বিভিন্ন সাধনা অনুসরণকারী আরও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে বসবাস করছে। হরপ্পা সভ্যতার যে-সব প্রত্ন-উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে সেইসব নানাধরনের শিল্পের নিদর্শনগুলিতে বিভিন্ন প্রকারের মূর্তির অস্তিত্ব থাকলেও সেগুলিকে কোন পরিচিত দেবতার মূর্তি

বলে চেনা যায় না। প্রাক্-খ্রীষ্টীয় যুগের ভারহুত, সাঁচী, বুদ্ধগয়া এবং মথুরার বৌদ্ধ শিল্পে নানা আখ্যায়িকা, লোককাহিনী, ভগবান বুদ্ধের জীবন ও জাতক কাহিনীর বিস্তৃত রূপায়ণের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। উড়িষ্যার খণ্ডগিরি-উদয়গিরিতে তেমনি জৈনদের নানা কাহিনীর খোদিত চিত্রায়ণ আছে। এইসব চিত্রায়ণে ভগবান বুদ্ধ বা মহাবীর বর্ধমানের কোন প্রতিমা পাওয়া যায় না। নিশ্চিত কোন গুরুত্বপূর্ণ কারণেই শিল্পীরা বুদ্ধ বা মহাবীরের প্রতিমা রূপায়ণে বিরত ছিলেন। এইসব খোদিত মূর্তির মধ্যে যক্ষ, যক্ষিণী, নাগ, নাগিনী, দেবতা ও অপ্সরার বহু মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। অনেকে মনে করেন এইসব যক্ষ-যক্ষিণী নাগ ও দেবতারা ছিলেন অনার্য লোকসমাজের উপাস্য; জনমানসে এরা ভগবান বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবনত বলে প্রতীয়মান হওয়ায় স্তূপপ্রাচীরে বা তোরণে এদের মূর্তি বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীলরূপে দেখানো হয়েছিল। এইসব প্রত্নকেন্দ্রের শিল্পে কেবলমাত্র যক্ষ-যক্ষিণী, নাগ ও দেবতাদের মূর্তিই নাই, ভগবান বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনার চিত্রায়ণে কোথাও কোথাও বৈদিক দেবতা ইন্দ্র এবং ব্রহ্মার মূর্তিও উৎকীর্ণ হয়েছে। ভারহুতের একাধিক চিত্রের ক্ষেত্রে ইন্দ্র এবং ব্রহ্মার মূর্তি পাওয়া যায়। এইসব চিত্রের মধ্যে ভগবান বুদ্ধের স্বর্গ থেকে অবতরণের দৃশ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারহুতে এই দৃশ্যটির রূপায়ণে একটি দাঁড়ানো সিঁড়ির ছবি আছে। এই সিঁড়িটি ভগবান বুদ্ধের স্বর্গ থেকে অবতরণের প্রতীক। সিঁড়িটি সমান্তরালভাবে তিনভাগে বিভক্ত। দুপাশের দুটি অংশের ধাপে কোন চিহ্ন নাই; শুধু মাঝের অংশের সবচেয়ে উপরের এবং সব নীচের ধাপে দুটি পদচিহ্ন ভগবান বুদ্ধের নেমে আসার প্রতীকরূপে দেখানো হয়েছে। কথিত আছে যে ভগবান বুদ্ধের স্বর্গ থেকে অবতরণকালে বেদোক্ত দুই দেবতা, ইন্দ্র এবং ব্রহ্মা তাঁকে পৃথিবীতে পৌছে দিয়ে গিয়েছিলেন। এই দৃশ্য-চিত্রটির নিম্নে বাঁ দিকে একটি বৃক্ষতলস্থ শূন্য আসন দেখানো হয়েছে; ভগবান বুদ্ধ পৃথিবীতে উপনীত হয়ে আসনগ্রহণ করেছেন, এই হল চিত্রটির প্রতিপাদ্য। এখানে ছাড়া আরও বহুক্ষেত্রে বৌদ্ধ শিল্পে ভগবান বুদ্ধের উপস্থিতি প্রতিরূপায়িত করবার জন্য পদচিহ্নের ব্যবহার করা হয়েছিল। ভারহুতের এই খোদিত পটে দেখানো দুটি সাধারণ বেশভূষায় মণ্ডিত মানুষের মূর্তিকে দেবরাজ ইন্দ্র এবং ব্রহ্মার মূর্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মক্ষেত্রের শিল্পীরা যক্ষ, যক্ষিণী, নাগ ইত্যাদির মূর্তি ভগবান বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবনতরূপে চিত্রায়িত করে থাকলেও অনুরূপভাবে

কোন বৈদিক দেবতাকে দেখানো হয়নি। তবে বৌদ্ধ কাহিনীতে ইন্দ্র ও ব্রহ্মার উল্লেখ থাকায় তাঁদের মূর্তিও কোথাও কোথাও উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। গান্ধার অঞ্চলের প্রাচীন শিল্পে তো মাথায় একটি ঝুড়ির আকারের শিরোভূষণ ও হাতে বজ্রসহ দেবরাজ ইন্দ্রের মূর্তিকে ভগবানের রক্ষী হিসেবে সর্বদা বুদ্ধজীবন কাহিনীগুলিতে বুদ্ধের মূর্তির সান্নিধ্যে উপস্থিত রূপে দেখানো হয়েছে। এইসব শিল্প-চিত্রায়ণ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে বৌদ্ধ সমাজের মানুষ যেমন বেদ-পুরাণে বর্ণিত দেবতা সম্পর্কিত কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তেমনি বৌদ্ধ শিল্পীরাও সেইসব দেবদেবীর মূর্তি চিত্রায়ণে পারঙ্গম ছিলেন। এই ভিত্তিতেই বলা যায় যে তাঁরা ইন্দ্র এবং ব্রহ্মার মত সেকালে পরিচিত ভগবান বিষ্ণু এবং শিবের কথাও জানতেন। কিন্তু বৌদ্ধ কাহিনীতে যেমন এই দুই দেবতার কোন উল্লেখ নাই, বৌদ্ধ শিল্পেও এঁদের কোন মূর্তি পাওয়া যায় না। তবে ভগবান বিষ্ণু সম্পর্কে তাদের যে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল তার অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারহুতের স্তূপ-বেষ্টনীর একটি স্তম্ভে উৎকীর্ণ অশ্বারূঢ় একটি নারী ও অন্য একটি পুরুষমূর্তির হাতে প্রদর্শিত গরুড়ধ্বজের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই গরুড়ধ্বজ নিশ্চিতভাবেই বিষ্ণুর প্রতীকরূপে পরিচিত ছিল এবং একথা ভারহুতের শিল্পীদের অজানা ছিল না। তাছাড়া পদচিহ্নের ব্যবহারে ভগবান বুদ্ধের উপস্থিতি বা বুদ্ধের প্রতীকরূপে পদচিহ্নের ব্যবহারে, বেদের পরিকল্পনায় ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর পদক্ষেপের যে কাহিনীর প্রচলন আছে তার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। আর এই যুগে গরুড় যেমন বিষ্ণুর প্রতীকরূপে প্রচলিত ছিল তেমনি হস্তী ইন্দ্রের এবং বৃষ রুদ্র বা শিবের প্রতীকরূপে বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। বৌদ্ধ শিল্পে ব্যাপকভাবে এইসব প্রতীক সম্পর্কে চেতনার পরিচয় থাকলেও বিষ্ণু বা শিবের কোন মূর্তি বৌদ্ধ শিল্পে পাওয়া যায় না। কিন্তু যে যক্ষরাজ কুবের ব্রাহ্মণ্য স্বীকৃতিতেও দেবতা বলে গণ্য বা যে লক্ষ্মী সম্ভবত একসময় কুবেরের পত্নী বলে গণ্য হতেন, তাঁদের মূর্তিও বৌদ্ধ শিল্পে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ শিল্পে বিষ্ণু ও শিবের অনুপস্থিতির দুটি কারণ থাকতে পারে। সে যুগে বিষ্ণু ও শিবের উপাসক সম্প্রদায় অতি প্রবল ছিল এবং তাদের মধ্যে থেকে তেমন কেউ ভগবান বুদ্ধের উপাসনায় এমন সংখ্যায় যোগ দেয়নি যাতে করে তাদের পূর্বতন উপাস্য দেবতাকে ভগবান বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলে দেখানো যেতে পারে। অন্যদিকে, এটাও সম্ভব যে, বিষ্ণু বা শিবের মূর্তির উপাস্য প্রতিমা হিসেবে প্রচলন ছিল না, যার ফলে

এই দুই দেবতার মূর্তি বৌদ্ধ শিল্পে আত্মপ্রকাশ করেনি। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, বিদিশার গরুড়স্তম্ভের সন্নিকটে, ঘোষুণ্ডির নারায়ণ-বাটিকায় এবং মথুরার শিলালেখের ভগবান বাসুদেবের তোরণবেদিকার সান্নিধ্যে অবস্থিত মন্দিরে বাসুদেবের মূর্তির অস্তিত্ব ছিল।[৬০] কিন্তু এইসমস্ত প্রত্ননিদর্শনে এমন কোন সুনিশ্চিত ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, যা থেকে এইসব প্রত্নক্ষেত্রে পূজার জন্য বিষ্ণু-বাসুদেবের প্রতিমার অস্তিত্ব ছিল বলে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। মোরা কূপের পঞ্চ-বৃষ্ণি-বীরের প্রতিমার মধ্যে বাসুদেবের প্রতিমা ছিল, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং সেই প্রতিমার অর্চা হিসেবে পূজারও ব্যবস্থা সম্ভবত ছিল ; কিন্তু সেখানে বাসুদেব-বিষ্ণুর বিগ্রহ প্রতিমা বলতে চতুর্ভুজ যে মূর্তির কথা আমরা জানি তেমন চতুর্ভুজ মূর্তি ছিল একথা মনে হয় না। মূর্তিবিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ তখনও তেমন হয়নি এবং একটির বেশী মাথা এবং দুটির বেশী হাত সম্বলিত দেবমূর্তির প্রচলন তখনও তেমন হয়েছে এমন প্রমাণ নাই। বরং মনে হয় যে গরুড়ধ্বজই ভগবান বাসুদেব-বিষ্ণুর প্রতীকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং ঘোষুণ্ডির প্রাকার বেষ্টিত নারায়ণ-বাটিকা এবং বেসনগরে আবিষ্কৃত হেলিয়োডোরের লেখতে উল্লিখিত তৎপ্রতিষ্ঠিত গরুড়স্তম্ভের সন্নিকটবর্তী প্রাসাদোত্তম, বা মথুরার সোদাসের আমলে ভগবান বাসুদেবের প্রীত্যর্থে প্রতিষ্ঠাপিত তোরণ ও বেদিকায় মূর্তির পরিবর্তে প্রতীক শিলারই পূজার প্রচলন ছিল।

অধ্যাপক ভাণ্ডারকারের মতে যে প্রতীক এখানে উপাসিত হত, তা ছিল বিষ্ণুর পদচিহ্ন।[৬১] তিনি ঐ ঘোষুণ্ডিতে (হাথিবাদা নামে পরিচিত নগরীর একটি অঞ্চলে) খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর একটি লেখ আবিষ্কার করেছিলেন, যে লেখতে শ্রী-বিষ্ণু-পদাভ্যাস এই কথা কয়টি উৎকীর্ণ আছে। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য ভাণ্ডারকারের এই মত গ্রহণে সম্মত ছিলেন না।

সমসাময়িক বৌদ্ধ শিল্পে দেখা যায় যে ভগবান বুদ্ধের মূর্তির পরিবর্তে বিভিন্ন প্রতীকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এইসব প্রতীকের মধ্যে 'পদচিহ্ন' প্রতীকের পূজা যে ব্যাপকভাবেই প্রচলিত ছিল বৌদ্ধশিল্পের বহু চিত্রায়ণ থেকে সে তথ্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। সমসাময়িক মুদ্রার গায়ে যে-সব প্রতীকের চিত্র দেখা যায় তার মধ্যে নানা আয়ুধ এবং শিলাপ্রস্তরের ও পশুর মূর্তির রূপায়ণই অত্যন্ত ব্যাপক। এইসব প্রমাণ থেকে অনুমান করা খুব অযৌক্তিক মনে হয় না যে, পরমতম উপাস্যরূপে পরিগণিত অচিন্ত্য ও লোকোত্তর দৈবী সত্তা, যেমন বিষ্ণু এবং

রুদ্রশিব, মূর্তির পরিবর্তে প্রতীকের ব্যবহারই প্রচলিত ছিল। হরপ্পা যুগের সভ্যতাতেও পশুমূর্তি এবং অন্যান্য নানা প্রতীকের যে ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত ছিল হরপ্পা, মোহেঞ্জোদারো ইত্যাদি অঞ্চলের খনন ব্যপদেশে আবিষ্কৃত ছাপ-মুদ্রাগুলি থেকে তা বোঝা যায়। তবে হরপ্পা সভ্যতায় মূর্তির উপাসনাও যে প্রচলিত ছিল কয়েকটি ছাপ-মুদ্রায় তার প্রমাণ আছে। কয়েকটি ছাপ-মুদ্রায় দুই-দিকে দুজন কৃতাঞ্জলি পুরুষের সামনে যোগাসনে উপবিষ্ট একটি পুরুষমূর্তি দেখানো আছে (চিত্র ২)। পার্শ্ববর্তী মূর্তিদুটিরই পেছনে একটি করে উদ্যত ফণাযুক্ত সাপ চিত্রিত আছে। পরবর্তী যুগে মানুষের মাথার উপরে নাগফণাযুক্ত মূর্তিকে নাগমূর্তি বলে গণ্য করা হয়েছে। এই যুক্তিতেই হরপ্পা যুগের ছাপ-মুদ্রার পশ্চাতে নাগচিত্র সম্বলিত মূর্তিকেও নাগমূর্তি বলেই অভিহিত করা যেতে পারে। এই দুই উপাসকের মূর্তির পেছনে নাগের ছবি থাকলেও উপাস্য যোগাসনে উপবিষ্ট মূর্তির মাথায় কোন নাগছত্র নাই। এই চিত্র থেকে স্বভাবতই সিদ্ধান্ত করা যায় যে উপাসনারত দুই পুরুষমূর্তি ছিল নাগজাতির প্রতীক এবং তাদের উপাস্য দেবতাকে তারা মানুষের আকৃতিতেই কল্পনা করত। এছাড়া অন্য কয়েকটি ছাপ-মুদ্রায় এমন কয়েকটি মূর্তি পাওয়া যায় সে-সব মূর্তিকেও উপাস্য দেবতার মূর্তি বলে অনুমান করা সম্ভব। এইধরনের একটি ছাপ-মুদ্রায় একটি দৃশ্যচিত্র উৎকীর্ণ আছে। এই চিত্রের দক্ষিণ প্রান্তে একটি বৃক্ষের দুটি ডাল দুদিকে দেখানো হয়েছে যার অভ্যন্তর ভাগে দেখানো হয়েছে একটি দাঁড়ানো নারীমূর্তি। এই মূর্তির সামনে হাঁটু মুড়ে-বসা একটি সম্ভাব্য নারীমূর্তিকে দেখানো হয়েছে উপাসনারত ভঙ্গীতে। এই মূর্তির পেছনে দেখানো আছে একটি দাঁড়ানো পশুমূর্তি। চিত্র-ফলকের নিম্নভাগে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাতটি দাঁড়ানো মূর্তি আছে, সে মূর্তিগুলিও সম্ভবত নারীমূর্তি। ভারতে সুপ্রাচীনকাল থেকেই বনস্পতি বা বৃহৎ বৃক্ষ, অশ্বত্থ, বট, শিমুল, ইত্যাদিকে দেবসত্তাসম্পন্ন, বিশেষ করে যক্ষ নামে পরিচিত অতি-প্রাকৃত সত্তার আবাসস্থলরূপে শ্রদ্ধা ও উপাসনা করা হয়েছে। হরপ্পা সভ্যতায় এইসব উপাস্য মূর্তিকে যাঁরা শ্রদ্ধা ও উপাসনা করছেন বলে দেখানো হয়েছে তাঁদের নাগ এবং যক্ষ সম্প্রদায়ের মানুষ বলে গণ্য করা হলে সে-সিদ্ধান্তকে যুক্তিসম্মত বলে অভিহিত করা অন্যায় হবে না। ইন্দ্র-উপাসক সম্প্রদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁদের উপাস্য দেবতার প্রীতি কামনা করতেন; তাঁদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। এই যজ্ঞ-সংস্কৃতির জনগোষ্ঠীর নিকট ভগবান বিষ্ণু

স্বয়ং 'যজ্ঞ' রূপে পরিগণিত ছিলেন ; এই যুক্তিতেই মনে হয় বিষ্ণুর কোন প্রতিমা ছিল না। এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের একটি উক্তি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে বর্ণিত হতে পারে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৩০তম সূক্তের ঋষি প্রশ্ন করছেন যজ্ঞের প্রতিমার রূপ কি এবং সেই প্রতিমার মাপই বা কি? ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটিতেই প্রতিমা শব্দের প্রথম উল্লেখ আছে বলে অভিহিত করা যেতে পারে। স্বভাবতই ঋষির এই উক্তি থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে পারিপার্শ্বিক পরিচিত জনসমাজে প্রতিমাপূজার যে প্রচলন ছিল একথা সেই ঋষির অজ্ঞাত ছিল না। যে উদ্দিষ্ট আকৃতির সাদৃশ্য নিয়ে প্রতিমা হত সেই প্রতিমা উদ্দিষ্ট আকৃতি থেকে ছোট বা বড় মাপের হতে পারত। প্রতিমা শব্দের মূলে এই পরিমাপের ইঙ্গিতটি অত্যন্ত স্পষ্ট। যে ঋষি নিজে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, পরের পঙ্‌ক্তিতে তিনি নিজেই তার উত্তর এই বলে দিচ্ছেন যে 'যজ্ঞের' প্রতিমা হচ্ছেন 'যজ্ঞ' স্বয়ং। অর্থাৎ যজ্ঞের কোন প্রতিমা হয় না। (ঋ. ১০।১৩০:৩)। ঋগ্বেদের এই দশম মণ্ডল যখন সংকলিত হয়েছিল তখন পুরু-ভরত সিংহাসন সম্ভবত শান্তনুর অধিকারে। এই সময়ের বহুকাল পূর্বেই 'যজ্ঞ' এবং ভগবান বিষ্ণু এক ও অভিন্ন বলে গণ্য হয়েছেন। ঋগ্বেদের ঋষির এই উক্তি থেকে সুনিশ্চিতভাবেই অনুমান করা যায় যে, ভগবান বিষ্ণুর সেপর্যন্ত কোন প্রতিমা নির্মিত হয়নি। ঋগ্বেদে গরুড় (গরুত্মন্) সূর্যের প্রতীক ; চক্রও ঋগ্বেদে সূর্যের প্রতীক বলে গণ্য হত। শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে যে যজ্ঞের বেদীতে সূর্যের প্রতীক হিসেবে একটি চক্রের আকারে প্রস্তুত সোনার থালা রাখার প্রচলন ছিল। (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৭।৪:১৫)। পরবর্তীকালে কোন এক সময়ে বিষ্ণু সূর্যের সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী বিষ্ণুর মস্তক আকাশে সূর্যরূপে সংস্থাপিত হয়েছিল। (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৪।১:১)। এই অভিন্নতাসূত্রেই সূর্যের প্রতীক গরুড় এবং চক্র ভগবান বিষ্ণুর বাহন এবং আয়ুধে পরিণত হয়েছিল।

খ্রীস্টপূর্ব কালে ধাতুর পাত থেকে কেটে কিম্বা ছাঁচে ঢালাই করে বিনিময়ের প্রয়োজনে যে-সব মুদ্রা প্রস্তুত হয়েছিল সেগুলির গায়ে নানা ধরনের পশুমূর্তি, গাছ, পর্বত, চক্র, গদা, শঙ্খ ইত্যাদির চিহ্ন আছে। এইসব চিহ্নের অনেকগুলিকে বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতীকরূপে গণ্য করা হয়েছে। এইসব মুদ্রার কোন-কোনটিতে রুদ্র-শিবের প্রতীক বৃষ ও ত্রিশূল, এবং বিষ্ণুর প্রতীক গরুড় এবং চক্রচিহ্নের অস্তিত্বও লক্ষ্য করা যায়। দুই-একটি মূর্তিকে শিবের মূর্তি বলে অনুমান করা হলেও

কোন মুদ্রাতেই এপর্যন্ত বিষ্ণুর কোন মূর্তি পাওয়া যায় নাই। বিভিন্ন তীর্থে অবস্থিত উপাস্য দেবতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে, মহাভারতে একস্থানে বলা হয়েছে যে, পুণ্ডরীক তীর্থে ভগবান বিষ্ণুর শালগ্রামের অবস্থান আছে। (শালগ্রাম ইতি খ্যাতো বিষ্ণুরদ্ভুতকর্মকঃ—মহাভারত, ৩।৮৪।১২৪)। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এই শালগ্রামকে বিষ্ণুর প্রতিমা বলে অনুমান করেছিলেন।[৬২] যে প্রতীককে শালগ্রাম নামে অভিহিত করা হয়েছে তাকে কখনই মনুষ্যাকৃতি প্রতিমা বলে গ্রহণ করা চলে না। কারণ শিলারূপে পূজিত নারায়ণই শালগ্রাম নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। বাংলাদেশের বহু মন্দিরে শালগ্রামশিলাই এখনও মূল বিগ্রহরূপে পূজিত হয়ে থাকেন, যদিও এইসমস্ত শালগ্রামকে মাধব, মধুসূদন, মদনমোহন ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর কোন এক সময়ে প্রচারিত, পাঞ্চালমিত্র নামে পরিচিত রাজন্যদের মধ্যে অন্যতম রাজা বিষ্ণুমিত্রের নাম সম্বলিত একটি মুদ্রায় চতুর্ভুজ এক দেবতার মূর্তি চিত্রিত রয়েছে বলে অনেকে অনুমান করেছেন। আলেকজাণ্ডার ক্যানিংহাম মূর্তিটিকে একটি চতুর্ভুজ মূর্তি বলে বর্ণনা করে-ছিলেন।[৬৩] কিন্তু মুদ্রাতত্ত্ববিদ অ্যালেন মূর্তিটিকে দ্বিভুজ বলে সিদ্ধান্ত করেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য মূর্তিটিকে চতুর্ভুজ বলে স্থির করে মুদ্রাটির প্রচারক রাজা বিষ্ণুমিত্রের নামসূত্রে মূর্তিটিকে বিষ্ণুমূর্তি বলে অভিহিত করেছেন।

পাঞ্চালমিত্র নামে পরিচিত সূর্যমিত্র ও ভানুমিত্র নামে রাজন্যদ্বয়ের মুদ্রায় সূর্যের প্রতীকরূপে একটি জ্যোতিপূর্ণ গোল চক্র ব্যবহার করা হয়েছে। মিত্র-রাজারা যখন সূর্যের এই চক্র—প্রতীকের ব্যবহার করেছিলেন তখন বিষ্ণুকে যে চতুর্ভুজ মানুষের আকারে প্রতিরূপায়িত করেছিলেন এমন অনুমান যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। তেমনি মূর্তিটি যে সত্যই চতুর্ভুজ তাও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। এইসব কারণে মনে হয় যে এই মূর্তি সম্ভবত বিষ্ণুমূর্তি নয়। খ্রীস্টপূর্ব যুগে ভগবান বিষ্ণুর মূর্তি আদৌ আত্মপ্রকাশ করেছিল কিনা এবিষয়ে সন্দেহের নিরসন এই মুদ্রার সাহায্য সম্ভব নয়।

মুদ্রা ও ভাস্কর্যে লক্ষ্মীমূর্তির আবির্ভাব

দ্বিতীয় যে মুদ্রাটিতে গ্রীক হরফে OOSNO এই লিপি পড়া হয়েছে, কুষাণ-

সম্রাট হুবিষ্কের সেই মুদ্রায় প্রদর্শিত চতুর্ভুজ মূর্তিটিকে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্ভুজ ভবেশের অর্থাৎ শিবের মূর্তি বলে অনুমান করেছেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ লিপিটিকে OOSNO পড়তেও স্বীকৃত নন। ভারতে প্রাচীন-কাল থেকে প্রচারিত কিছু কিছু মুদ্রায় ভারতীয় দেবদেবীর মূর্তির চিত্ররূপের ব্যবহার ঘটেছিল তার অনেক প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে একটি নারীমূর্তির মাথায় দুটি হাতী শুঁড়ের দ্বারা বারিবর্ষণ করছে এই ধরনের ছবি, প্রায় খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের কৌশাম্বীতে প্রচলিত কিছু মুদ্রায় পাওয়া গেছে। হাতীর দ্বারা অভিষেকরত এইধরনের নারীমূর্তি সেই যুগ থেকে বহু পরবর্তী-কাল পর্যন্ত বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তোরণ, প্রাকার এবং গৃহপ্রাচীরে রূপায়িত হয়েছে, যাকে গজলক্ষ্মী বা অভিষেক লক্ষ্মী নামে অভিহিত করা হয়েছে।

লক্ষ্মী ভারতের এক অতি জনপ্রিয় দেবী এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির যুগ থেকেই এই লক্ষ্মীর উল্লেখ পাওয়া যায়। একসময় লক্ষ্মীকে ধনের দেবতা কুবেরের পত্নী বলে অভিহিত করা হত। পরে তিনি মহাভারতে ধর্ম এবং পুরাণে ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম পত্নীরূপে গণ্য হয়েছিলেন। প্রজ্ঞার দেবী সরস্বতীকেও বিষ্ণুর অন্যতম পত্নীরূপে অভিহিত করা হয়েছে। বাজসনেয়ী সংহিতায় (৩১।২২) লক্ষ্মীকে (এবং শ্রীকে) আদিত্যের পত্নীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবান বিষ্ণু আদিত্যদের মধ্যে প্রধানরূপে পরিগণিত হলে লক্ষ্মী বিষ্ণুর পত্নীতে পরিণত হন। শ্রী-সূক্তে সর্বপ্রথম 'শ্রী' বা লক্ষ্মীকে পদ্মস্থিতা এবং পদ্মের উপর দণ্ডায়মানা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। রামায়ণেও লক্ষ্মী পদ্ম থেকে সঞ্জাত, পদ্মালয়া এবং পদ্মহস্তা বলে উল্লিখিত হয়েছেন। মহাভারতে শ্রী শ্রীকৃষ্ণের পত্নী রুক্মিণীর সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলে উল্লিখিত হয়েছেন। পরে দেখা যায় সর্পদেবী মনসার পদ্মা বা পদ্মাবতী নাম প্রচলিত হয়েছিল।

এই সর্পদেবী মনসাকে নিয়ে পদ্মপুরাণ নামে একটি পুরাণও রচিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম পদ্মপুরাণে (নামসাদৃশ্য লক্ষণীয়) উল্লিখিত একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কাহিনীতে বর্ণিত আছে যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কে প্রধান, দেবতাদের মধ্যে এ-নিয়ে এক-সময় প্রচণ্ড বিতণ্ডা শুরু হয়েছিল। এই সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁরা মহর্ষি ভৃগুকে প্রথমে শিবের এবং তারপর ব্রহ্মার নিকট পাঠিয়েছিলেন। কৈলাস পর্বতের

অধিবাসী শিব মহর্ষি ভৃগুর সঙ্গে বাক্যালাপ না করায় ভৃগু তাঁকে অভিসম্পাত দিয়েছিলেন যে, শিব ব্রাহ্মণেতর জাতিদের দ্বারা লিঙ্গরূপে পূজিত হবেন। ব্রহ্মাও ভৃগুকে কোন সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। এরপর ভৃগু মন্দার পর্বতে ভগবান বিষ্ণুর সমীপে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি অনন্তনাগের উপর শয়ান বিষ্ণুকে লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা পদসেবায় নিরত অবস্থায় দেখতে পান। এখানে বিষ্ণুও প্রথমে ভৃগুর প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। এর ফলে ক্রুদ্ধ ভৃগু বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করেছিলেন। কিন্তু ভগবান বিষ্ণু পরমশ্রদ্ধার সঙ্গে ভৃগুর পদচিহ্ন তাঁর বক্ষে ধারণ করেন। এই আখ্যায়িকায় দেখা যায় যে, মহর্ষি ভৃগুকে দেবতারাই প্রধান তিন দেবতার নিকট পাঠিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, মহর্ষি ভৃগু সাধারণত অসুর সম্প্রদায়ের গুরু বলেই অভিহিত হয়ে থাকেন। অসুরগুরুর পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করা থেকে মনে হয় যে, এই কাহিনীতে বিষ্ণুকে অবলম্বন করে দেব-উপাসক ও অসুর-উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত হয়ত প্রকাশ করা হয়েছিল। অনন্ত-শায়ী বিষ্ণু ও নারায়ণকে এক ও অভিন্ন বলে গণ্য করা হলেও একসময় নারায়ণ স্বতন্ত্র দেবতারূপেই গণ্য হতেন। এই স্বতন্ত্র দেবতা নারায়ণ যে নাগ-সংযোগ-ভূয়িষ্ঠ এ সম্ভাবনা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে নারায়ণ বিষ্ণু ও বাসুদেবের সঙ্গে অভিন্নরূপে পরিগণিত হন। এই ঘটনা থেকে বিষ্ণু-উপাসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে নাগ সম্প্রদায়ের যাঁরা নারায়ণের উপাসক ছিলেন তাঁদের পরস্পরের মধ্যে একটা সাযুজ্য ও মিলন ঘটেছিল এমন অনুমান বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না। সেই নাগশয্যায় শয়ান ভগবান নারায়ণের পদসেবাকারিণী, সম্পদ ও ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মীও মূলত নাগেদের দ্বারাই উপাসিত হতেন, একথাও অনুমান করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণের নর্মদা-ঘটিত উপাখ্যানের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এই উপাখ্যানে নাগদের প্রভূত ধনরত্নের অধিকারী বলে অভিহিত করা হয়েছে। নাগেদের রত্নরাজি মৌনেয় নামে গন্ধর্বরা অপহরণ করে নিলে, নাগেরা নাগকন্যা নর্মদার স্বামী রাজা পুরুকুৎসার সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। (নাগকুলান্যপহৃত প্রধান রত্নাধিপত্যান্যক্রিয়স্ত—বিষ্ণুপুরাণ, ৪।৩:৪)। পদ্মের উপর দণ্ডায়মান এবং পদ্মহস্তা যে নারীমূর্তিকে দুদিক থেকে উত্তোলিত শুণ্ডের নিষিক্ত বারিতে দুটি হাতীর দ্বারা অভিষিক্ত হতে দেখা যায়, তাঁকে

কুমারস্বামী গজলক্ষ্মী বা অভিষেক লক্ষ্মী বলে অভিহিত করেছেন। হাতীকে যেমন গজ বলা হয় তেমনি হাতী নাগ নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। হাতীর নাগ নামে অভিহিত হওয়ার থেকে নাগ এবং হাতীর এক ও অভিন্নরূপে পরিগণিত হওয়ার ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়। নাগ যেমন এক শ্রেণীর মানুষের বংশপিতা বলে গণ্য হত, তেমনি হাতীও হয়ত কোন সম্প্রদায়ের বংশপিতারূপে গণ্য হত। হরপ্পা সভ্যতায় অন্যান্য পশুর মধ্যে হাতীর সঙ্গে খুব নিকট পরিচয় ছিল এবং সেখানকার ছাপ-মুদ্রায় হাতীর সংখ্যাবাহুল্য থেকে হাতী যে সে-যুগে বিশেষ আকর্ষণের পাত্র বলে গৃহীত হয়েছিল তা বোঝা যায়। পৌরাণিক যুগে বিঘ্ননিবারক ও সিদ্ধিদাতারূপে হস্তিমুণ্ড গণেশ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এই জনপ্রিয়তা'য় সম্ভাব্য বংশপিতারূপে শ্রদ্ধার পরিচয় নিহিত আছে।

পুরাণে হাতী ও নাগকে নিয়ে একটি জনপ্রিয় উপাখ্যান পাওয়া যায়। 'গজেন্দ্র-মোক্ষ' নামে পরিচিত এই উপাখ্যানটি অবলম্বন করে পরবর্তী যুগে বহু ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছিল। একদিন এক হস্তিরাজ তার প্রতিদ্বন্দ্বী এক প্রকাণ্ড সর্পের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিশেষভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সর্পরাজের হাত থেকে মুক্তির কোন আশা না দেখে তিনি ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করেন এবং আকুলভাবে তাঁর সহায়তা প্রার্থনা করেন। গজেন্দ্রের প্রার্থনায় বিচলিত হয়ে ভগবান বিষ্ণু নাগরাজের হাত থেকে গজেন্দ্রকে মুক্ত করে দেন।

ভাগবতপুরাণের বর্ণনায় গজেন্দ্র হরিকে যে-সব নামে অভিহিত করে স্তুতি করেছিলেন, সেই নামের তালিকায় 'ব্রহ্মণে অনন্তশক্তয়ে' এই সম্বোধনই প্রথমে উল্লিখিত হয়েছে (৮।৩:৯)। তা ছাড়া বিষ্ণুর 'পরমং পদম্'-এরও উল্লেখ এখানে আছে। (৮।৩:২৯)। হরির নামরূপের বিভেদের কথাও গজেন্দ্র তাঁর স্তুতিতে কয়েকবারই উল্লেখ করেছেন। (ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম বা ন নামরূপে গুণদোষ এব বা/তথাপি লোকাপ্যয়সম্ভবায় যঃ স্বমায়য়া তান্যনুকালমৃচ্ছতি॥ এবং যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা বেদা লোকাশ্চরাচরাঃ/নামরূপ বিভেদেন ফল্গব্যা চ কলয়া কৃতাঃ॥)[৬৪] ভগবান হরিকে এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব এই তিন দেবতার সমন্বিত রূপ বলা হয়েছে; ভেদ শুধু নামরূপের। (এবং গজেন্দ্রমুপবর্ণিতনির্বিশেষং ব্রহ্মাদয়ো বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানাঃ/নৈতে যদোপসসৃপুর্নিখিলাত্মকত্বাৎ তত্রাখিলামরময়ো হরিরাবিরাসীৎ—ভাগবত, ৮।৩:৩০)[৬৫] একদিকে গজরাজ যেমন

গ্রাহ বা নাগের হাত থেকে মুক্তি পেলেন, অন্যদিকে ভগবান হরির অনুগ্রহে সেই গ্রাহও পরম আশ্চর্য রূপধারী হুহু নামক গন্ধর্বে রূপান্তরিত হলেন। এই গন্ধর্ব হুহু দেবল মুনির শাপে এই গ্রাহরূপে পরিণত হয়েছিলেন।

ভাগবতে বর্ণিত এই কাহিনীটি নানা কারণেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে। হাতীকে পুরাণে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতীক এবং বাহন বলে অভিহিত করা হয়েছে। ঋগ্বেদে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যাতুধান বা রাক্ষস এবং অহি বা সর্পের সঙ্গে প্রবল বিরোধিতার উল্লেখ আছে। রামায়ণের বর্ণনায় রাক্ষস এবং যক্ষদের একই জাতিসম্ভূত, এবং যক্ষরাজ কুবেরকে রাক্ষসাধিপতি রাবণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই রাক্ষসাধিপতি কর্তৃক দেবরাজ ইন্দ্রকে বন্দী করে রাখার বর্ণনাও রামায়ণে পাওয়া যায়। আর দানব বা অসুরদের সঙ্গে দেব-রাজ ইন্দ্রের দ্বন্দ্বের উল্লেখ বেদে যেমন আছে, বিভিন্ন সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থেও ইন্দ্র-পরিচালিত দেবতাদের অসুরের সঙ্গে সংগ্রামের উল্লেখ আছে। এইসব বিপাক থেকে ইন্দ্র ও অন্য দেবতারা ভগবান বিষ্ণুর বুদ্ধিমত্তা এবং অনুগ্রহেই পরিত্রাণলাভ করেছিলেন। ভাগবতে বর্ণিত গ্রাহ-গ্রস্ত গজেন্দ্রের বিড়ম্বনা এবং নারায়ণ-বিষ্ণুর কৃপায় গজেন্দ্রের মুক্তিলাভকে এই দেবাসুর বিরোধেরই প্রতীক বলে মনে করা যেতে পারে।

এই বর্ণনায় আশ্চর্য অর্থাৎ সুন্দর অবয়বধারী গন্ধর্বের সর্পে পরিণত হওয়ার যে কাহিনী পাওয়া যায় তা থেকে যক্ষরা যে সর্পে পরিণত হতে পারত এবং সর্প যক্ষে রূপান্তরিত হতে পারত' এই বিশ্বাসের অস্তিত্বের প্রমাণ লক্ষ করা যায়। ঋগ্বেদে একজায়গায় বসিষ্ঠকে বলা হয়েছিল যে তিনি সত্যই বসিষ্ঠ নন, বসিষ্ঠের রূপধারণকারী রাক্ষস। রামায়ণে রাবণ, মারীচ, সূর্পণখা প্রমুখ রাক্ষস-রাক্ষসীদের ইচ্ছামত রূপধারণ করবার কথা উল্লিখিত আছে। এই গজেন্দ্র-মোক্ষ কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে যে যক্ষ হুহু গ্রাহরূপে পরিণত হয়েছিল। পরমকারুণিক ভগবান বিষ্ণুর কৃপায় পরে সে তার স্বরূপে পরিবর্তিত হয়। বৌদ্ধ এলপত্র জাতকে অভিশাপগ্রস্ত এলপত্রের ভগবান বুদ্ধের কৃপায় সর্পদেহ থেকে মুক্তিলাভের কাহিনীর সঙ্গে পুরাণবর্ণিত এই কাহিনীর সাদৃশ্য অত্যন্ত নিকট।

এই কাহিনীতে বিষ্ণুর নানা অবতারের স্তুতি আছে কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে বুদ্ধের উল্লেখ নাই। কিন্তু বিষ্ণুর প্রতি যে স্তুতি গজরাজ করেছেন সেই

স্মৃতিতে বিষ্ণুকে 'শাস্তায়' বলে আখ্যাত করা হয়েছে। এই শাস্তায় অভিজ্ঞান ভগবান বুদ্ধের প্রতিই আরোপিত হয়েছিল, এই তথ্য নানা গ্রন্থ থেকে জানা যায়। ভাগবতের এই কাহিনীতে ভগবান নারায়ণ-বিষ্ণুকে সর্বদেবময় এবং পৃথিবীর বিবদমান প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলির মধ্যে মিত্রতা প্রতিষ্ঠার নির্দেশক বলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই কাহিনীটিতে নারায়ণ-বিষ্ণুকে অবলম্বন করে এক মহৎ সাংস্কৃতিক সমন্বয় প্রচেষ্টা, এবং নির্বিরোধ চাতুর্বর্গ ফলসাধনের প্রবণতা আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই চিন্তা ও উপলব্ধি যে সমগ্র ভারতব্যাপী এক মহৎ পরিণতি অর্জন করেছিল গ্রাহ-কাহিনীকে তারই একটি প্রতীকগর্ভ বিবরণ বলে গণ্য করা যেতে পারে।

ভগবান বাসুদেবকে অবলম্বন করে যে সংস্কৃতির উদ্ভব হয় তার আকর্ষণ যে কত ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল শুঙ্গ রাজসভায় নিযুক্ত প্রভূত মর্যাদা-সম্পন্ন গ্রীক রাজদূত হেলিয়োডোরের ভগবাম বাসুদেবের প্রতি অনুরাগ ও ভক্তি প্রকাশে তার পরিচয় প্রতিষ্ঠিত আছে। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে গ্রীকরা যেমন প্রভূত শক্তিশালী বলে গণ্য হত, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকে শক-কুষাণেরাও ভারতে তেমনি শক্তিধর হয়ে উঠেছিল। শক রাজন্যবর্গের দ্বারা প্রচারিত মুদ্রায় যে-সব রাজার নাম পাওয়া যায়, মোগ (মোয়স) নামে জনৈক রাজপুরুষই হয়ত তাদের মধ্যে প্রাচীনতম। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষভাগে গ্রীকদের হাত থেকে এই শকজাতীয়রা উত্তর-পশ্চিম ভারতে এক বিশাল রাজ্য অধিকার করে নিয়েছিল। এই শক রাজন্যবর্গের উপর গোড়াতে গ্রীক প্রভাব ছিল খুব প্রবল। মোগ-র উত্তরাধিকারী এজেস (অজ) ও এজেলিসেস, রঞ্জুবুল এবং সোদাস ইত্যাদি রাজন্যবর্গ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এঁদের মধ্যে রঞ্জুবুল এবং সোদাস মথুরা পর্যন্ত তাদের রাজত্ব বিস্তৃত করেছিলেন। এঁরা বহুলপরিমাণে ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এরপরে সেই রাজত্ব কুষাণদের হাতে যায় এবং কুষাণসম্রাট কুজুল কদ্‌-ফিস এবং বীম কদ্‌ফিসের রাজত্বাবসানের পর বিখ্যাত সম্রাট প্রথম কণিষ্ক সিংহাসন লাভ করেন। এইসমস্ত বৈদেশিক রাজন্যবর্গের মধ্যে কণিষ্ককেই প্রথম 'দেবপুত্র' এই আখ্যা ব্যবহার করতে দেখা যায়। যদিও দেব-উপাসকদের দ্বারা ইন্দ্রকেই দেবরাজ বলে অভিহিত করা হত, তাহলেও সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি

যখন রচিত হয় সেই যুগে ভগবান বিষ্ণুকেই দেবতাদের মধ্যে প্রধান বলে ধার্য করা হয়েছিল। ভারতে দীর্ঘকাল বসবাসকারী কুষাণেরা যখন নিজেদের দেবপুত্র বলে দাবি করতেন তখন ভারতীয় দেব-সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বোধহয় তাঁরা অজ্ঞ ছিলেন না। দেবানুরাগীদের সংস্কৃতির এই বৈশিষ্ট ই হয়ত কুষাণসম্রাট হুবিষ্কের উত্তরাধিকারীর 'বাসুদেব' নামে পরিচিত হওয়ার মধ্যে নিশ্চিতরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যিনি নিজের সন্তানের 'বাসুদেব' নাম রেখেছিলেন, তিনি কণিষ্ক, বাসিষ্ক, হুবিষ্ক ইত্যাদি শকসমাজে প্রচলিত নামের পরিবর্তে ভগবান বাসুদেবের প্রতি ভক্তিবশতই সন্তানের জন্য এই নাম বেছে নিয়েছিলেন, সন্দেহ নাই। বহিরাগত এঁরা ছিলেন পারসিক ও গ্রীক প্রভাবের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। সেই সমাজসম্ভূত রাজবংশে 'দেবপুত্র' উপাধি ব্যবহার এবং তাঁদের একজনের অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ 'বাসুদেব' নামগ্রহণে ভগবান বাসুদেব আশ্রিত সংস্কৃতির ব্যাপক স্বীকৃতি ও প্রভাবই নিহিত আছে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এপর্যন্ত আলোচনায় বেদ-অনুগামী, যজ্ঞধর্মী দেব-সংস্কৃতির কথাই প্রাধান্য পেয়েছে, যে সমাজে ভগবান বিষ্ণু একসময়ে যজ্ঞের সঙ্গে এক ও অভিন্ন এবং দেবতাদের মধ্যে প্রধানতম স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কৌতুহলের বিষয় এই যে, ঋগ্বেদে ভগবান বিষ্ণুর তেমন প্রাধান্যসূচক মন্ত্র নাই; বিষ্ণুর স্তুতিতে রচিত মন্ত্রের সংখ্যাও নিতান্তই অল্প। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর এই আপেক্ষিক অপ্রধানতা ও পরবর্তী সেই যজ্ঞধর্মী সমাজে ভগবান বিষ্ণুর বিপুল প্রাধান্যলাভ বেদ সম্পর্কে উৎসাহী বৈদেশিক পণ্ডিতদের মনেও প্রভূত বিস্ময় উৎপাদন করেছে। অনেকে এমনও মন্তব্য করেছেন যে, বিষ্ণু মূলত অবৈদিক। তাঁদের মতে এই বিষ্ণু আর্য নামে পরিচিত সমাজের বাইরে থেকে গৃহীত হয়েছিলেন।

ঋগ্বেদে জগৎকারণ ও অধ্যাত্মচিন্তার কিছু কিছু পরিচয় থাকলেও ঋগ্বেদের সমাজ অত্যন্ত বাস্তবধর্মী এবং জীবনের ভোগ ও আনন্দের উপকরণের প্রতি আকর্ষণ পরিপুষ্ট ছিল বলেই প্রতীয়মান হয়। ঐশ্বর্য এবং সম্পদ্ অভিলাষী ভোগ-প্রবণ এই সমাজ অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে তাদের জীবনযাত্রা পরিচালিত করতে পারত না। তাদের অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু ছিল যাদের মধ্যে 'অহি' বা সর্প নামে পরিচিত দানব বৃত্র, নানা নামের দাস ও দস্যু, যাতুধান বা রাক্ষস এবং যক্ষ ইত্যাদি ছিল প্রধান। এদের প্রায় সকলকেই বিভিন্ন গ্রন্থে অসুর নামে অভিহিত

করা হয়েছে। ঋগ্বেদে অনেক দেবতাকেও অসুর আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। এমনকি দেবরাজ ইন্দ্রকেও দু'একবার অসুর বলা হয়েছে। এইসব তথ্য থেকেই একথা অনুমান করা হয়েছে যে বেদ-অনুরাগী সমাজের প্রতিদ্বন্দ্বী অসুর নামে পরিচিত শত্রুরা সকলেই ভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর লোক ছিল না।

ঋগ্বেদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও ঋগ্বেদের অনুকল্পরূপে রচিত ভিন্ন ভিন্ন সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থে এবং পরবর্তী বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের তথ্যপ্রমাণে এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় যে দেব-উপাসকদের মত পিতৃ-উপাসক তথা গন্ধর্ব, সর্প, যক্ষ ইত্যাদি নামে যারা বর্ণিত, তারা একটি সুপ্রাচীন জনগোষ্ঠীরই উত্তরপুরুষ। উপাসনার পদ্ধতিতে, বিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক উপকরণ ও ভোগ্য সম্পদের বিভিন্নতার ফলে পরস্পরবিচ্ছিন্ন হয়ে এরা দ্বন্দ্বপরায়ণ ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র সমাজে পরিণত হয়েছিল। ঋগ্বেদ তথা বেদপরবর্তী বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে দেবতা-উপাসক ইন্দ্রানুরাগী সমাজ থেকে আর্থিক সম্পদ ও ঐশ্বর্যের সম্ভারে প্রতিদ্বন্দ্বী যক্ষ-রাক্ষস, গন্ধর্ব এবং দানব নামে পরিচিত সম্প্রদায়সমূহ অনেক অগ্রসর ও সমৃদ্ধ ছিল। ঋগ্বেদে বর্ণিত দেবরাজ ইন্দ্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দানবরাজ বৃত্র ছিলেন বহু 'পুরের' অধিপতি। ঋগ্বেদে শহর বোঝাতে ব্যাপকভাবে পুর শব্দেরই ব্যবহার আছে। কিন্তু পরবর্তী যুগে বৈসিষ্ট্যপূর্ণ জনবসতিসমূহ 'নগর' এই আখ্যায়ই অভিহিত হতে থাকে। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের আধিপত্যে কোন পুর ছিল কিনা তার কোন উল্লেখ নাই। ইন্দ্রের দেবতারূপে পরিগণিত হওয়ার পরে তিনি তাঁর প্রীতিভাজন যে-সমস্ত শক্তিধর ঋষি বা রাজন্যকে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সহায়তা করেছিলেন, কুৎস এবং দিবোদাস ইত্যাদি সেইসব ইন্দ্রানুরাগীদের অধীনস্থ কোন পুরের অস্তিত্বের সংবাদও ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না।

ঋগ্বেদের বর্ণনা থেকে বেদানুগামী জনসমাজ যে অনেক পরিমাণে গ্রামনির্ভর ছিল এই কথাই মনে হয়। যজ্ঞের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষির জন্য বর্ষণ ও অর্থসম্পদলাভের জন্য যে আকুল নিবেদন ও প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে তা থেকে এই সমাজের আর্থিক ভিত্তি যে খুব দৃঢ়বদ্ধ ছিল, এমন মনে হয় না। কিন্তু ঋগ্বেদের বর্ণনা থেকেই ইন্দ্রানুরাগী সমাজ অপেক্ষা যক্ষ-দানব-গন্ধর্ব ও নাগ সম্প্রদায় যে সম্পদ ও ঐশ্বর্যে অনেক বেশী পরিমাণে অগ্রসর ছিল একথা সুস্পষ্টরূপে

উপলব্ধি করা যায়। যক্ষ-দানব-গন্ধর্ব ও নাগসমাজের মধ্যে পরস্পর বিশেষ কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল এমন উল্লেখ বিরল। পুরাণে অবশ্য একবার গন্ধর্ব ও নাগেদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে ইক্ষ্বাকু বংশের পুরুকুৎস গন্ধর্বদের সাহায্য করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। বহু গন্ধর্বরমণী (অপ্সরা নামে পরিচিত উর্বশী, মেনকার কন্যা শকুন্তলা ইত্যাদি), অসুরকন্যা (বিকুণ্ঠা, শর্মিষ্ঠা ইত্যাদি) ও নাগকন্যার (নর্মদা, উলুপী, জরৎকারু ইত্যাদির) সঙ্গে দেব-উপাসক ঋষি বা রাজন্যের পরিণয় হয়। ঐসব সমাজভুক্ত জনগোষ্ঠী যে দেব-উপাসকদের থেকে তেমন স্বতন্ত্র বলে গণ্য হতেন না, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ভারতভূখণ্ড যখন গভীর ও অগভীর জলরাশি এবং ঘন অরণ্যে আবৃত ছিল তখন সিন্ধু নদীর তীরে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেই সভ্যতা যে দানব-যক্ষ-নাগ সম্প্রদায়ের আদি জনগোষ্ঠী দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয় ও প্রসারলাভ করে, এ সত্য ক্রমে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এই মূল অসুর-উপাসক যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ সম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'নদীতমে সরস্বতীর' উপকূলে যাঁরা আশ্রয়গ্রহণ করেছিলেন, ঋগ্বেদকে একান্তভাবে তাঁদেরই সামাজিক দলিল বলে গণ্য করা যেতে পারে। জননায়ক ইন্দ্রের পরিচালনায় যাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছিলেন, ইন্দ্রের ভগিনী সরণ্যুর পুত্র মনুর উপর সেই সমাজের অধিনায়কত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। মনুর কন্যা ইলার পুত্র পুরুরবা এই সমাজের প্রধানরূপে স্বীকৃত হন। পুরাণ-সাহিত্যে বর্ণিত আছে যে পুরুরবার রাজধানীরূপে 'প্রতিষ্ঠান' নামে একটি পুর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বহু পরবর্তী যুগে দেব-উপাসক পুরু-ভরতবংশীয় পাণ্ডবেরা যখন খাণ্ডববন দগ্ধ করে দেবরাজ ইন্দ্রের নামানুসারে 'ইন্দ্রপ্রস্থ' নামে পুর প্রতিষ্ঠা করেন (ঐ বংশের মহারাজ হস্তীর প্রতিষ্ঠিত রাজধানী যেমন হস্তিনাপুর), তখন দানবশিল্পী 'ময়' পাণ্ডবদের সেই প্রাসাদ নির্মাণ করে দিয়েছিলেন বলে মহাভারতে উল্লিখিত আছে। হস্তিনাপুরের অধীশ্বর দুর্যোধন পাণ্ডবদের সেই প্রাসাদের ঐশ্বর্য ও বিলাস উপকরণ লক্ষ্য করে শুধু বিস্মিতই হন নাই, অনেক জায়গায় তাঁকে ঠকতেও হয়েছিল, কৃত্রিম বহু জিনিসকে বাস্তব বলে গ্রহণ করে। দানবসভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলেও পাণ্ডবদের দ্বারা তাঁদের প্রাসাদনির্মাণে দানবশিল্পীর সহায়তাগ্রহণে দানবদের পূর্তবিদ্যায় পারঙ্গমতার স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়। মূল সরস্বতীতীরে যে প্রতিষ্ঠানপুরী অবস্থিত ছিল সেই পুরীর প্রতিষ্ঠায় দানব কারিগরের সহায়তাগ্রহণের সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই।

পরিত্যক্ত সিন্ধুতীরভূমিস্থিত পুরসমূহের মত সরস্বতীর তীরবর্তী, বর্তমানে কালিবঙ্গান ইত্যাদি অঞ্চলে প্রত্নযুগের বহু শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এইসব ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে প্রায় প্রতি গৃহে যজ্ঞকুণ্ডের অবস্থান দেখা যায়। সিন্ধু অববাহিকার শহরগুলির সঙ্গে এই সরস্বতী তীরবর্তী শহরের গঠনের অন্য বিশেষ তারতম্য না থাকায় এইসব শহরনির্মাণে যে একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শিল্পী এবং কারিগরের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল, এ বিশ্বাস দৃঢ় না হয়ে পারে না।

পরবর্তী যুগে সরস্বতীর স্রোতধারা যখন বিনষ্ট হতে থাকে, পুরু-ভরতরা তখন হস্তিনাপুরে নূতন নগর প্রতিষ্ঠায় বাধ্য হয়েছিলেন। অনুমান করা অন্যায় নয় যে, সিন্ধু অববাহিকার শহরগুলি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেও সেখানকার অধিবাসীরা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়নি বা ভারত ভূখণ্ড পরিত্যাগ করে যায়নি। যমুনাতীরবর্তী মথুরাকে অনেক কাহিনীতে মধুদৈত্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নগর, গঙ্গাতীরবর্তী অঙ্গকে দৈত্যরাজ বলির অবতাররূপে বর্ণিত সম্রাট বলির নগর, পূর্বাঞ্চলে গয়াসুরের নগর গয়া, অসুররাজ বাণের রাজধানী বাণগড় (দেবীকোট বা কোটীবর্ষ—অনেকে বাণের রাজধানী শোণিতপুরে অবস্থিত ছিল বলে মনে করেন) এবং আরও পূর্বে অসুররাজ নরকের বংশধরদের কামরূপে অবস্থানের বিবরণ থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে অসুরদের অনেকে প্রাচ্যে কামরূপ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁদেরই অন্য একদল পারস্যদেশে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। অসুরসমাজের বেশকিছু মানুষকে যে ভারতভূখণ্ডেই আশ্রয়গ্রহণ করতে হয়েছিল এবিষয়ে অনায়াসেই অনুমান করা যায়। তেমনি নাগজাতির বহু জনগোষ্ঠীও ভারতের বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ এবং রাজ্যস্থাপন করেছিল। সেই সঙ্গে বেদে যাতুধান নামে পরিচিত জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত যক্ষ এবং রাক্ষসেরাও ছিল।

পুরাণে মথুরার সাত্বতবংশজাত কংসকে অসুররূপে বর্ণনা করা হয় নাই। তবে তার কর্তৃত্বাধীনে অসুরজাতির বহু মানুষ মথুরায় বা তার সান্নিধ্যে বসবাস করত, পুরাণকাহিনীতে এইধরনের উল্লেখ থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। অঙ্গের রাজা বলির, মগধের অধিপতি জরাসন্ধের অসুর নামে অভিহিত হওয়ার মধ্যে যযাতির উত্তরাধিকারী বিভিন্ন বংশের মধ্যে যে অসুর সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তা অনুমান করাও অযৌক্তিক নয়। ছোটনাগপুর অঞ্চলে

খুব অনগ্রসর একটি উপজাতীয় জনগোষ্ঠী এখনও নিজেদের অসুর আখ্যায় অভিহিত করে থাকে। অনেকে এদের বেদে বর্ণিত অসুরদের উত্তরপুরুষ বলে মনে করেন। কিন্তু বেদে অসুরদের যে উচ্চ পর্যায়ের সংস্কৃতির অধিকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, এই উপজাতীয় অসুরদের ঠিক তাদের উত্তরাধিকারী বলে গণ্য করা যায় না। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষ করে ছোটনাগপুর অঞ্চলে নাগজাতি-উদ্ভূত বলে দাবি করে এমন অনেক উপজাতীয় জনগোষ্ঠী আছে। আবার হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত বেশকিছু মানুষও নিজেদের নামে নাগ উপাধি ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া নানা উপজাতীয় সমাজে এবং হিন্দুসমাজেও নাগ তথা মনসাপূজার বিস্তৃত প্রচলনকে সেই সুপ্রাচীন নাগ সংস্কৃতির চিহ্ন বলেই অভিহিত করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক যুগে 'নাগ' নামে পরিচিত মগধের শিশুনাগবংশ, সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা পরাজিত বিভিন্ন নাগ পরিচয়ে বর্ণিত রাজন্য-বর্গ, ভারশিব এবং বাকাটক বংশ, গৌড়ের জয়নাগ ইত্যাদির মাধ্যমে সেই সুপ্রাচীন নাগ সম্প্রদায়েরই প্রবহমানতা লক্ষ্য করা যায়।

ঋগ্বেদের যুগে যজ্ঞবাদী দেবপূজকেরা যখন সরস্বতীর তীরে উপনিবিষ্ট ছিলেন তখন 'অহি' নামে অভিহিত ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বীরা সেই সরস্বতীর তীরবর্তী বৈদিক জীবনকেন্দ্রের সান্নিধ্যেই বাস করত। ঋগ্বেদে এই 'অহি' নামে পরিচিত বৃত্রদের (বৃত্র শব্দ বহুবচনেও ব্যবহৃত হয়েছে) দানব নামেও অভিহিত করা হয়েছে দেখা যায়। শিল্পকর্মে পারঙ্গম বিশ্বরূপকেও দানব নামে পরিচিত করা হয়েছে। পুরাণকাহিনীতে দানবদের বিশেষ সংস্কৃতিসম্পন্ন, এবং শিল্পকর্ম ও পূর্তবিদ্যা, গৃহ ও অট্টালিকা নির্মাণ ইত্যাদি কলাকৌশলে বিশেষ পারদর্শীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

ঋগ্বেদের অহি বা সর্প নামে অভিহিত বৃত্রকে দানবদের অধিপতি হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। দানবদের অসংখ্য পুরের উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। বেদে এই শহরগুলিকে 'পুর' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকলেও এগুলি বাস্তবে কি নামে অভিহিত ছিল সেকথা সঠিক জানা যায় না। বেদে পুর শব্দের বহু উল্লেখ থাকলেও পুরের প্রতিশব্দ হিসেবে নগর শব্দের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণে অশোকের শিলালেখে 'নগর ব্যবহারিক' নামে রাজ-কর্মচারীর পরিচয়ে নগর শব্দের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'পৌরব্যবহারিক' নামে উল্লিখিত কর্মচারী এবং অশোকের 'নগরব্যবহারিক' নামে কর্মচারীরা যে এক বা অভিন্ন ছিলেন একথাই অনুমান করা হয়েছে। এই সূত্রে

পুর এবং নগর যে একই অর্থজ্ঞাপক অর্থাৎ উভয় শব্দেই যে শহরকে বোঝাত, এই উল্লেখ থেকে সেকথা বেশ বোঝা যায়। বেদে এবং বেদপরবর্তী সাহিত্যে দীর্ঘকাল নগর শব্দের বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। মালবদের দ্বারা প্রচারিত বহু মুদ্রা বর্তমান রাজস্থানের 'কার্কোট' নগর থেকে প্রচারিত হয়েছিল। পুরাণে 'কার্কোট' নামে নাগজাতীয় একজন রাজার উল্লেখ আছে। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে 'নগর' নামে বসতির কথা। বর্তমান আফগানিস্তানের জালালাবাদ প্রাচীনকালে গান্ধারের 'নগরহার' নামে এক প্রখ্যাত নগর হিসেবে পরিচিত ছিল। টলেমি এই নগরকে Dionysopolis নামে উল্লেখ করেছেন। গ্রীক ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় আছে যে আলেকজাণ্ডার এই নগরে উপস্থিত হলে স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁকে বলেছিল যে, সেই নগরী গ্রীকবীর Dionysus-এর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতীয় দেবতা শিবকে গ্রীকরা Dionysus নামে অভিহিত করত। এই ভিত্তিতে ঘোষুণ্ডির বিখ্যাত সংকর্ষণ-বাসুদেবের পূজা-শিলাপ্রাকার লিপির কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। স্থানটি নাগরী নামে পরিচিত। বিহারের রাজগীরে যেমন দেখা যায়, এখানেও তেমনি একটি সুপ্রশস্ত, বিরাট আকারের পাষাণপ্রাচীর প্রতিষ্ঠিত ছিল। নগরি বা নাগরী নামে পরিচিত স্থানটির সন্নিকটে 'নাগদহ' বা নাগহ্রদ নামে একটি বিস্তৃত জলাশয়ও ছিল।

উত্তর-পশ্চিমের গান্ধারের অন্তর্বর্তী কপিশা থেকে প্রচারিত মুদ্রায় 'কভিশিয়ে নগর দেবতা' এই লিপি দেখা যায়। কপিশা থেকে প্রচারিত বহু মুদ্রায় হাতীর মূর্তি চিত্রিত আছে ; হুয়েন সাং কপিশার দেবতাকে বলেছেন 'পিলু' বা হাতী। এই হাতী এবং নাগের পরস্পরের পরিবর্তন-প্রবণতা সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিদিত ছিল এবং হাতীকেও নাগ বলা হত। নগর শব্দের সঙ্গে 'নাগ' শব্দের যোগের আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যে-সব তথ্য থেকে নিশ্চিতভাবে অনুমান করা যায় যে নাগদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও যেখানে নাগজাতি বসবাস করত সেইসব শহরকেই 'নগর' নামে অভিহিত করা হত। এই সূত্রেই নাগ রাজধানী তক্ষশিলা নগর, পুর নয়। জাতকে বিভিন্ন রাজ্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে রাজ্যের গঠনে গ্রাম ও নগরের কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের গ্রামের সংখ্যারও উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন বারাণসী রাজ্যে ৬০,০০০টি গ্রাম ছিল ; মিথিলায় ছিল ১৬,০০০টি গ্রাম। কিন্তু এইসব রাজ্যের রাজধানীকে

জাতকে সাধারণত নগর আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে দেখা যায়। (বহিনগরে, বদ্ধকি গামে—জাতক, সংখ্যা ৪৭৫) গ্রামের অধিবাসীদের বলা হত গামবাসী আর নগরের আধিবাসীদের নগরবাসী।

'নগর' শব্দের উদ্ভব সম্পর্কে স্কন্দপুরাণে বর্ণিত একটি কাহিনীর কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। গুজরাটে অবস্থিত ভাদনগর নামে একটি শহর প্রাচীনকালে শুধু নগর নামে পরিচিত ছিল। এই স্থানটি একসময়ে বিশেষ সর্পসমাকুল এবং মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত ছিল। জনৈক ব্রাহ্মণ বিশেষ প্রয়াসের দ্বারা স্থানটি থেকে সর্পদের বিতাড়ন করেন এবং সন্নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে কিছু ব্রাহ্মণকে এখানে এনে প্রতিষ্ঠিত করেন। সর্পের গরল থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে স্থানটি ন-গর অর্থাৎ গরলহীন আখ্যা লাভ করে এবং এখানে বাসস্থান প্রতিষ্ঠাকারী ব্রাহ্মণেরা 'নাগর ব্রাহ্মণ' আখ্যায় পরিচিতিলাভ করেন। নগেন্দ্রনাথ বসু এশিয়াটিক সোসাইটির একটি সভায় নাগর ব্রাহ্মণদের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে স্কন্দপুরাণের এই কাহিনীটি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন যে, এই 'নাগর' নামে পরিচিত ব্রাহ্মণেরাই উত্তর ভারতে প্রচলিত নাগরী লিপির প্রবর্তন করেছিলেন।

নগর শব্দের উদ্ভব সম্পর্কে বর্ণিত এই কাহিনীটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা প্রয়োজন। 'নগর' শব্দের মূলে যে নাগ শব্দের বিশেষ যোগ ছিল এই কাহিনী থেকে সে তথ্য নিশ্চিতভাবেই প্রতিষ্ঠা করা যায়। নাগ পরিচয়ে প্রখ্যাত এক বিরাট জনগোষ্ঠী যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতিস্থাপন করেছিল মহাভারত, পুরাণ এবং বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে এ তথ্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। প্রাচীন ভারতের বহু রাজবংশ 'নাগবংশ'-সম্ভূত বলে প্রতিষ্ঠিত আছে। বিষ্ণুপুরাণে দক্ষিণ ভারতের মাহিষ্মতীতে কর্কোট নামে নাগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে উল্লেখ আছে। পশ্চিম ভারতে উপনিবেশ স্থাপনকারী মালব নামে একটি জনগোষ্ঠী রাজস্থানে 'কর্কোটনগর' নামে একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই মালবেরা সম্ভবত নিজেদের নাগবংশসম্ভূত বলে মনে করত। কর্কোট নামে অভিহিত একটি রাজবংশ কাশ্মীরে দীর্ঘকাল আধিপত্য ভোগ করেছিল, কল্হনের 'রাজতরঙ্গিণী'তে তার উল্লেখ আছে। পৌরাণিক সাহিত্যে কার্কোটকে নাগজাতির এক বিশেষ শক্তিধর অধিপতিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। গুজরাটের ভাদনগর ছাড়া ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে শুধু নগর বা নগর-শব্দযুক্ত নাম-সম্বলিত বহু জনবসতির

অস্তিত্ব আছে। স্কন্দপুরাণে 'নগর' শব্দের উদ্ভবের যে বর্ণনা পাওয়া যায় সেটি নাগদের উপর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকল্পেই উদ্ভূত হয়েছিল, সহজেই এমন সন্দেহ হতে পারে।

অতীতে বিস্তৃত যুগব্যাপী নাগ নামে অভিহিত এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাধান্য অর্জন করেছিল তার ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব নাই। এই জনগোষ্ঠী যে বেদানুগামী ছিল না এই তথ্য প্রতিষ্ঠা করাও দুষ্কর নয়। পাতাল নামে বর্ণিত ভৌগোলিক অঞ্চলই নাগ জাতির মূল বাসস্থান ছিল, মহাভারতের আস্তিক পর্বে, উলূপী কাহিনীতে এবং পুরাণের বহু অংশে সে-তথ্যের উল্লেখ আছে। ভারতে অভিযানকারী গ্রীকসম্রাট আলেকজাণ্ডারের সহগামী ঐতিহাসিকেরা সিন্ধু অঞ্চলে পাটালিনি নামে পরিচিত একটি অঞ্চলের উল্লেখ করেছেন। অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে, ঐ পাটালিনি অঞ্চলই অতীতের ভারতীয় সাহিত্যের 'পাতাল' এবং এই অঞ্চল থেকেই 'নাগ' নামে অভিহিত জনগোষ্ঠী ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল। সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে বিশেষ সমুন্নত এই নাগ জনগোষ্ঠীই ছিল 'নাগর' সভ্যতার প্রবর্তক এবং নগর বা 'নাগর' শব্দের সঙ্গে যুক্ত সংস্কৃতির বিভিন্ন নিদর্শন, নাগর লিপি, নাগর স্থাপত্য ইত্যাদি সেই নাগ জনগোষ্ঠী দ্বারাই উদ্ভূত হয়েছিল।

অহি বা নাগ নামে পরিচিত দানবদের শহর সংখ্যায় ছিল বহু এবং ঋগ্বেদের যজ্ঞপন্থী মন্ত্রকারেরা এই শহরগুলিকে সর্বদাই পুর বলেই অভিহিত করেছেন, ভুলেও নগর বলে অভিহিত করেননি। কিন্তু পরবর্তীকালে নগর শব্দের ব্যবহারের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল। এই 'নগর' শব্দ থেকেই সভ্যতা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন অধিবাসীদের 'নাগরিক' পরিচয় ব্যাপক জনপ্রিয়তালাভ করেছিল। বৃহদায়তন অট্টালিকা নির্মাণে সেই দানবেরা ছিল অত্যন্ত পারঙ্গম। পরবর্তী যুগে নাগ-সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী তাদের সংস্কৃতি নিয়ে সামগ্রিকভাবে ভারতের অগ্রসর সংস্কৃতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গেলে, তাদের কারুকৌশলের অঙ্গ হিসেবে এক বিশিষ্ট গঠনের মন্দির 'নাগর' রীতির মন্দির নামে পরিচয়লাভ করে। সংস্কৃতির আরও অনেক ক্ষেত্রে এই 'নাগ' সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর অবদানের পরিচয় আছে। তার মধ্যে পূজার জন্য প্রতিমা বা অর্চার উদ্ভব ও প্রচলন খুব সম্ভবত এই নাগ সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল।

প্রতিকৃতিরূপে প্রতিমার ব্যবহার বৈদিক যুগেই প্রচলিত ছিল বলে অনেকে

বৈদিক সাহিত্য থেকে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। ঋগ্বেদের সেই মন্ত্র, যেখানে 'কে আমার ইন্দ্র কিনে নেবে' এই উক্তি আছে, এই প্রসঙ্গে সে-কথার উল্লেখ করা হয়েছে। ঋগ্বেদের সমাজে প্রতিকৃতির ব্যবহার, এমনকি উপাস্য দেবতাদের প্রতিমার অস্তিত্ব থাকার সম্ভাব্যতা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু পুরাণশাস্ত্রে প্রতিমাকে অর্চা হিসাবে পূজা করবার যে-পদ্ধতি নির্দিষ্ট হয়েছে, সেই ধরনের পূজাপদ্ধতির প্রয়োজনে সৃষ্ট প্রতিমার প্রচলন পূর্বে ছিল একথা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। পূজাস্থানে শিলাপ্রতীক (যেমন নারায়ণ-শিলা বা শালগ্রাম, শিবলিঙ্গ ইত্যাদি) বা স্তম্ভোপরি উদ্দিষ্ট দেবতার পশু বা পক্ষী প্রতীক (গরুড়-ধ্বজ, বৃষ-ধ্বজ ইত্যাদি) পূজানুষ্ঠানের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত এই ধারণা অযৌক্তিক নয়।

এই প্রসঙ্গে নারদ পঞ্চরাত্র গ্রন্থে প্রতিমা সম্পর্কিত বক্তব্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে সুনিশ্চিতভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে শ্রীহরি (অর্থাৎ বিষ্ণুর) পূজায় সর্বদা প্রতিমার ব্যবহারই প্রয়োজন ; প্রতিমা যদি না পাওয়া যায় তবেই অন্য কোন উপকরণে পূজা করা যেতে পারে। (নারদ পঞ্চরাত্র, ভরদ্বাজ সংহিতা পরিশিষ্ট, ৩।৫৭) এইসব পরিবর্ত উপকরণের মধ্যে শালগ্রাম শিলাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ এই শালগ্রামই শ্রীহরির অকল্পনীয় রূপের প্রকৃষ্ট প্রতীক। পাঞ্চরাত্রীয় বৈখানসাগম গ্রন্থে পূজার জন্য ভগবান বাসুদেব-বিষ্ণুর নানা ধরনের প্রতিমার বর্ণনা আছে। তাছাড়া অন্য যে-সব গ্রন্থে প্রতিমার রূপরীতি সম্পর্কিত আলোচনা আছে সে-সবের মধ্যে আনুমানিক চতুর্থ-পঞ্চম শতকে রচিত বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা প্রতিমাবিজ্ঞান বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে গণ্য হয়ে থাকে।

পুরাণসমূহে প্রতিমাপূজার যে ধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটে সেই ধারা অবলম্বনেই প্রতিমা-নির্মাণশিল্প সমাজে স্বীকৃতি ও প্রসারলাভ করেছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই প্রতিমা-পূজার তত্ত্ব ও তার ধারা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং পুরাণবিহিত পূজায় দেব-দেবী মূর্তির ব্যবহারের মূলে যে দার্শনিক চিন্তা এবং উপলব্ধি ক্রিয়াশীল ছিল, বৈদিক বা বেদবিহিত নানা শাস্ত্রীয় গ্রন্থে বর্ণিত উপাসনাপদ্ধতি থেকে তা একান্তই ভিন্ন। প্রতিমার পূজার প্রারম্ভে মূর্তিতে প্রাণসঞ্চার করতে হয়। পরে সেই প্রতিমার রূপকে আপন অন্তরে প্রত্যক্ষ করতে হয়। প্রতিমা-পূজার এইসব প্রকরণ অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রতিমাতে প্রাণসঞ্চার করে উদ্দিষ্ট

দেবতাকে যেভাবে নিজের অন্তরে ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করে তাঁকে সমস্ত-কিছু উৎসর্গ করে পূজা করতে হবে বলে নির্দেশ দেওয়া আছে তার বৈশিষ্ট্য যেমন অন্য কোন উপাসনাপদ্ধতিতে লক্ষ্য করা যায় না, তেমনি এই তত্ত্ব-সম্মত উপলব্ধি কিভাবে এবং কোথা থেকে পুরাণের ধারায় গৃহীত হয়েছিল সে-সম্পর্কেও তেমন অনুসন্ধান বা গবেষণা হয়নি। ভারতীয় সাধনধারায় এই তত্ত্ব কবে থেকে প্রচলিত রয়েছে এবং পুরাণের দ্বারা স্বীকৃতির ফলে কিভাবে বিগ্রহ বা অর্চারূপে প্রতিমা পূজার প্রচলন হয়েছিল সে-সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাঞ্চরাত্রীয় চিন্তাকল্পনায় নিহিত আছে।

পঞ্চরাত্রের মতে নারায়ণ-বাসুদেব-বিষ্ণুই মূল উপাস্য। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই পাঞ্চরাত্র তত্ত্বের মূল সম্ভবত মহাভারতের 'নারায়ণীয়' নামে পরিচিত অংশেই প্রথম বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছিল। এই নারায়ণীয় অংশে নারায়ণকে ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে এক ও অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং পূর্বে যে-সব অবতারকে সাধারণত ব্রহ্মার অবতার বলে উল্লেখ করা হয়েছিল সেইসব অবতারদেরও ভগবান বিষ্ণু-নারায়ণের অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। পরবর্তী পাঞ্চরাত্র গ্রন্থগুলিতে, যেমন বৈখানসাগম, পঞ্চরাত্র সংহিতা, সাত্বত সংহিতা এবং বিশেষ করে অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় এই অবতারতত্ত্বেরই প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। পাঞ্চরাত্রবিহিত পূজায় অর্চারূপে প্রতিমার প্রয়োজনীয়তার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ধরনের প্রতিমা ও সেই প্রতিমা সংস্থাপনার্থে পূজাগৃহ বা মন্দির-নির্মাণ সম্পর্কেও অনেক পুরাণ ও পাঞ্চরাত্র গ্রন্থে বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

প্রতিমা এবং মন্দিরাদি নির্মাণে পারঙ্গমরূপে এইসমস্ত সূত্রগ্রন্থে যাদের উল্লেখ আছে, তাদের মধ্যে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা, ময় ইত্যাদিই প্রধান রূপে গণ্য। মহাভারতের নারায়ণীয় অংশে বিশ্বকর্মা, ময় ইত্যাদিকে ভাগবত মতের প্রবর্তক এবং চিত্র-শিখণ্ডী নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই তথ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অনেক পুরাণে বাস্তুশিল্পকে সকল শিল্পের মধ্যে প্রধান বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে দেখা যায়। এইসব গ্রন্থে বাস্তুশাস্ত্রের যে-সব প্রবক্তার নাম বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে বাস্তুবিদ্যায় পারঙ্গম হিসেবে 'ময়'-এর নামকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গণপতি শাস্ত্রী শিল্পবিষয়ক নানা তথ্য সংগ্রহ করে 'ময়মত' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন, যেখানে তিনি এই

ময়কে একজন মুনি আখ্যায় অভিহিত করেছেন। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে 'ময়'কে অতিপারঙ্গম দানব স্থপতি বলেই পরিচিত করা হয়েছে। পাণ্ডবদের নূতন রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে আশ্চর্য গড়নের যে প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল, তার বাস্তুবিদ্ ছিলেন ময়-দানব। অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে, বাস্তুবিদ্যায় দানব নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল এবং তাদের মধ্যে অগ্রণী বাস্তুবিদেরা 'ময়' নামে অভিহিত হতেন।

ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে, দানব বিশ্বরূপ বিশেষ পারঙ্গম শিল্পবিদ্ ছিলেন। দানবগুরু মহর্ষি ভৃগুর নামও শিল্পের প্রবক্তা হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে এবং ভৃগুর পুত্র শুক্রাচার্যের নামে পরিচিত শুক্রনীতিসারে (৪র্থ অধ্যায়, ৪র্থ অংশ) প্রতিমা ও মন্দির সম্পর্কিত বিধি-বিধানের বিস্তৃত বিবরণ আছে। পাঞ্চ-রাত্র সাধনা বিষয়ে বিভিন্ন আগম নামে পরিচিত গ্রন্থগুলিও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব পাঞ্চরাত্রে যেমন, শৈব সাধনার ক্ষেত্রেও তেমনি বহু আগম-গ্রন্থের প্রচলন আছে। এইসব আগমগ্রন্থবিধৃত শাস্ত্র পরবর্তী যুগে 'তন্ত্র' নামে পরিচিত সাধনপ্রণালীর মূল উৎস বলে গণ্য হয়েছে। হরপ্পা সভ্যতায় প্রাপ্ত নানা উপকরণ থেকে বাস্তুবিদ্যা তথা পূজার জন্য প্রতিমা ব্যবহারের উৎপত্তির মূল উৎস যে হরপ্পা সভ্যতায়ই অবস্থিত ছিল, এই উপলব্ধি হওয়া অযৌক্তিক নয়। পরবর্তী যুগে উদ্ভূত পাঞ্চরাত্রীয় সাধনার উৎস এবং মহাভারতের নারায়ণীয় চিন্তার উৎসও সেই প্রাক্-ঐতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতাতেই নিহিত ছিল। পরে সরস্বতী উপকূল থেকে দেব-উপাসক জনগোষ্ঠী যখন ভারত ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে হস্তিনাপুর, কাম্পিল্য, ইন্দ্রপ্রস্থ, কৌশাম্বী, অযোধ্যা, বৈশালী ইত্যাদি অঞ্চলে আশ্রয়-গ্রহণ করেছিল তখনই সিন্ধুনদের আশ্রয়ে উদ্ভূত এবং পুষ্ট সভ্যতার জন-গোষ্ঠীকেও, সেখানকার নগরগুলি বাসের অনুপযুক্ত হওয়ার ফলে, ভারতের অভ্যন্তরে আশ্রয় নিতে হয়। সেই সমাজের জনগোষ্ঠীর দানব নামেও পরিচিতি ছিল এই অনুমান অহি-বৃত্রের কথা বলতে গিয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যজ্ঞধ্বংসকারী শিব মূলত এই যজ্ঞবিরোধী সমাজেরই উপাস্য ছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে। ত্রিশূল, চন্দ্র ও অহি শোভিত মহেশ্বর নামে পরিচিত শিব এই অহি-ধারণ-সূত্রে মূলত নাগ সমাজের দেবতা ছিলেন এমন অনুমান অযৌক্তিক নয়। মহাভারতে এবং বিভিন্ন পুরাণে মহেশ্বর শিব যেমন বেদের রুদ্রদেবতার সঙ্গে অভিন্নরূপে গৃহীত হয়েছিলেন, ভগবান নারায়ণও তেমনি

ঋগ্বেদের বিষ্ণুর সঙ্গে এক ও অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এই দুজনই মূলত যজ্ঞীয় সমাজের দেবতা ছিলেন না; সর্প বা অহি বা নাগ নামে পরিচিত সমাজেই তাঁদের উপাসনা প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। পরে ভারত ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে যখন সরস্বতীতীর থেকে সমাগত যজ্ঞপন্থীদের মত সিন্ধুতীরের সভ্যতায় অন্তর্বর্তী সর্প (অহি বা নাগ)-উপাসক জনগোষ্ঠীকেও এসে আশ্রয় নিতে হয়েছিল তখন এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে বোঝাপড়া ও আদান-প্রদানের মাধ্যমে যে মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, সেই সংস্কৃতিতেই ভগবান মহেশ্বর বা শিব এবং নারায়ণ উপাস্যরূপে গৃহীত হয়েছিলেন। পুরু-ভরতদের হস্তিনাপুরে আগমনের পর থেকেই এই মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিবর্তন ঘটতে থাকে। কুরু পরিবারে গান্ধার রাজ্যের যে রাজকন্যা ধৃতরাষ্ট্রের মহিষীরূপে গৃহীত হয়েছিলেন, প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ না থাকলেও, গান্ধারের রাজধানী তক্ষশিলায় অনুষ্ঠিত জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ কাহিনীর ভিত্তিতে সেই গান্ধার দেশকে নাগরাজ্য এবং গান্ধারীকে নাগবংশের কন্যা বলে অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। মাতা গান্ধারীর শতপুত্রের নিহন্তা পাণ্ডব ভ্রাতৃগণের উত্তরাধিকারী পরীক্ষিতের নাগের হাতে মৃত্যুকে কৌরবদের বিপর্যয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং জনমেজয়ের দ্বারা তক্ষশিলার নাগকুল ধ্বংসকে আবার তারই প্রতিশোধ বলে গণ্য করা যেতে পারে। জনমেজয় গান্ধারের নাগরাজ্য বিধ্বস্ত করে থাকলেও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে উপনিবিষ্ট নাগ জনগোষ্ঠী কালক্রমে ভারতসমাজের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল সন্দেহ নাই। এই পারস্পরিক সান্নিধ্য ও যোগাযোগের ভিত্তিতেই এক সময়ে নারায়ণ, বেদের অগ্রণী দেবতা ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আরও পরে সাত্বত বংশের সংকর্ষণ এবং বাসুদেবের দ্বারা এই নাগসংস্পর্শ প্রতিষ্ঠিত হলে, ভগবান বাসুদেব বৈদিক বিষ্ণু তথা নারায়ণের সঙ্গে উপাস্যরূপে গৃহীত হয়েছিলেন। এই যোগাযোগ সম্ভূত অন্যান্য যে-সব সাংস্কৃতিক বিবর্তনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, নাগ বা নাগর (নগ এবং নগর)-ভিত্তিক সেইসবের সঙ্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজনের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। জনপদ কেন্দ্ররূপে নগর শব্দ যেমন এই নাগ সংস্কৃতিরই অবদান, নাগর স্থাপত্য-রীতি তথা প্রতিমায় উদ্দিষ্ট উপাস্যের পূজাও যেমন এই নাগ সমাজ থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে, তেমনি যে লিপি নাগরী লিপি নামে পরিচয়লাভ করেছে, যজ্ঞপন্থীরা যাকে এক সময় ব্রাহ্মী লিপি বলে

অভিহিত করেছিলেন, সেই লিপিও যে নাগ জনগোষ্ঠীর দ্বারাই প্রবর্তিত হয়েছিল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও অযৌক্তিক বলে মনে হয় না।

নির্দেশিকা

১. তৈত্তিরীয় সংহিতা, ২।১।৩ ১।
২. বিষ্ণুপুরাণ, ৩।১:৪৩।
৩. ঋগ্বেদ, ৪।২৬:১।
৪. ঐ, ১।৩১:৪।
৫. বিষ্ণুপুরাণ. ৪।২৪:২০-২২।
৬. Epigraphia Indica, XX, p. 57.
৭. Barua aud Sinha, Bharhut Inscriptions, pp. 1f
৮. Barua, B. M., Bharhut, III, plate XXI. fig. 17 & 17a.
৯. Sircar. D. C., Select Inscriptions, I, p. 88. n. 4.
১০. Epigraphia Indica, XVI, p. 27.
১১. বিষ্ণুপুরাণ, ৫।৭:৩৩-৪২।
১২. ঐ, ৫।৭:৩৮
১৩. ভাগবত পুরাণ, ১০।৯৬:২২।
১৪. হরিবংশ, ১৩।১৯।
১৫. বিষ্ণুপুরাণ, ৫।৭.৮০।
১৬. ঐ, ৪।৩:১-২৫।
১৭. ঋগ্বেদ, ৮।১৯:৩৬।
১৮. Macdonell, A. A., Vedic Mythology, p. 147.
১৯. বায়ুপুরাণ, ৯৮।৫১-৬০ ; হরিবংশ, ২৭।১৪২১-২৩।
২০. হরিবংশ, ১১৮।৬৭০১।
২১. মহাভারত, ৩।৯৮:৮৬০৬-৮।
২২. ঐ, ১৫।২০:৫৪৯-৫০।
২৩. Khan, M. F., Excavations at Taxila (Pakistan Archaeology, 1973).
২৪. Macdonell, A. A., Vedic Mythology, p. 41.
২৫. ঋগ্বেদ, ১০।৮২।
২৬. মহাভারত, ১২।৩৪১।
২৭. ঐ, ১২।৩৪৯:৩৭ ; ৩৮৯:৭৭-৯০।
২৮. Banerjea, J. N., Development of Hindu Iconography, p. 390.
২৯. বায়ুপুরাণ. ৯৮।৭১।
৩০. ঋগ্বেদ. ৫।৪১:২৬ ; ৭।৪:১৬-১৭।
৩১. ঐ, ৭।৩৫:১৩।
৩২. ঐ, ১০।৬৬:১১।

৩৩. Archaeological Survey of India, Annual Report (ASI, AR.), 1903-04, p. 110-11, pl. XI, 3.
৩৪. Banerjea, J. N., Development etc., p. 100.
৩৫. Epigraphia Ind, VIII, pi, 60f, no. 2.
৩৬. Banerjea, J. N., Development etc., p. 94.
৩৭. Epigraphia Ind., XXIV, p. 194.
৩৮. Banerjea, J. N., Development etc., p. 386.
৩৯. Epig. Ind., XXIV, p. 208.
৪০. ঐ, XVIII, p. 158
৪১. Barua, B. M., Bharhut, III, pl. LXII
৪২. Banerjea, J. N., op cit. p. 91
৪৩. Epig. Ind., VIII, p. 180 ; IX, p. 240 ; XIV, p, 190 etc.
৪৪. Sen, Sukumar, Old Persian Inscriptions, pp. 92 98 ; 148 f.
৪৫. Indian Antiquary, VIII, p. 306 f.
৪৬. Epigraphia Ind., XXIV, pp. 200-2.
৪৭. Journal of the Indian Society of Oriental Art. (J.I.S.O.A.), X, pp. 65-68.
৪৮. ভাগবত পুরাণ, ১০।১৬:৪২।
৪৯. মহাভারত ৬।৬২:৪০।
৫০. শতপথ ব্রাহ্মণ, ১২।৩।৪:১ ; ৬:১।
৫১. ঐতরেয় আরণ্যক, ১০।২.১।
৫২. ঋগ্বেদ, ১।১৫৪:২।
৫৩. শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৪।১:১।
৫৪. ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৩।১৭:১-৭।
৫৫. হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব, ১৩।৪২।
৫৬. বিষ্ণুপুরাণ, ৫।৭.৫৬।
৫৭. ভাগবত পুরাণ, ১০।১৬.৬৬।
৫৮. পাণিনি, অষ্টাধ্যায়ী, ৫।৩.৯৬।
৫৯. Banerjea J. N., op. cit, p. 40.
৬০. ঐ., পৃ. ৯১-৯২।
৬১. Epig. Ind., XXII, p 204.
৬২. Cunningham. A., Coins of Ancient India, p. 84, pl. VII, fig. 21.
৬৩. Allan, T., op. cit, p. WCXIX, 202, pl. XXIX, 6-9.
৬৪. Procedings of the Asiatic Society, April, 1896.
৬৫. Banerjea, J. N., op. cit, p. 42.

১২

সমাজ-বিবর্তনে ইন্দ্র-বিশ্বরূপ : দ্বন্দ্ব ও মহাবিচ্ছেদ

ঋগ্বেদ-সংকলনে যে জনগোষ্ঠীর প্রাধান্য ছিল, তাদের প্রধানত দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। এদের মধ্যে যারা যজ্ঞের অনুষ্ঠাতারূপে মন্ত্রের দ্রষ্টা, তাদের বলা হয়েছে ঋষি। আর যজ্ঞ যাদের আনুকূল্যে অনুষ্ঠিত হত, তাদের অধিকাংশকেই বর্ণনা করা হয়েছে রাজন্য নামে। এই ঋষি এবং রাজন্য শ্রেণী ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর উল্লেখ বা স্বীকৃতি বৈদিক সাহিত্যে বড় একটা পাওয়া যায় না। এই জনগোষ্ঠী ভিন্ন, বেদে অবশ্য এদের অনেক প্রতিবাদী এবং শত্রুরও উল্লেখ আছে। যেমন অহি বা দানব বা যাতুধান, রক্ষ, গন্ধর্ব, অপ্সরস্, পিতৃ ইত্যাদি। এইসমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জনগোষ্ঠীর পরস্পরের মধ্যে সান্নিধ্য ও যোগাযোগের কিন্তু অভাব ছিল না। এদের ঋগ্বেদে প্রায়শই দাস বা দস্যু নামেও অভিহিত করা হয়েছে। বেদের যজ্ঞধর্মী জনগোষ্ঠীর মত দানব, বৃত্র এবং অন্যান্যরা সংস্কৃতির দিক থেকে ন্যূন ছিলেন না, বরং যজ্ঞপন্থীদের অপেক্ষা ঐশ্বর্য-সম্পদে অধিকতর সমৃদ্ধ ছিলেন। যজ্ঞের অনুষ্ঠানে উচ্চারিত মন্ত্রে, উদ্দিষ্ট দেবতাদের নিকট ধন, ঐশ্বর্য, গোসম্পদ ইত্যাদির জন্য আকুল প্রার্থনায় যজ্ঞীয় সম্প্রদায়ের আর্থিক সচ্ছলতার যথেষ্ট অপ্রতুলতারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বৃত্র, সম্বর ইত্যাদি যজ্ঞপন্থীদের শত্রুদের অসংখ্য পুরের উল্লেখ ঋগ্বেদে বারবার আছে। কিন্তু যজ্ঞপন্থীদের নিজস্ব কোন পুর ছিল কিনা স্পষ্ট করে তার কোন উল্লেখ কোথাও নাই। এই যজ্ঞীয় সমাজের প্রথম নেতারূপে বর্ণিত মখ, মঘ বা ইন্দ্র তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বৃত্রের বহু পুর বিধ্বস্ত করেছিলেন, কিন্তু তাঁর নিজের কোন পুর ছিল কিনা তা বোঝা যায় না। ঋগ্বেদে ইন্দ্র, মনু, ইল-ইলা, ইক্ষ্বাকু, পুরুরবা, আয়ু, নহুষ ও যযাতির উল্লেখ আছে, কিন্তু এঁদের পরস্পর সম্পর্কের কোন পরিচয় নাই। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে এঁদের পরস্পরের সম্পর্কের কিছু কিছু ইঙ্গিত আছে। পুরাণ, মহাভারত ও রামায়ণে যে বংশপরিচয় পাওয়া যায় সেই তথ্য থেকেও এদের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ জানা যায়। অধিকাংশ পাশ্চাত্য ভারতবিদেরা পুরাণ ও মহাভারতে বিধৃত তথ্যকে কিছুমাত্র গুরুত্ব দিতে চাননি। কারণ যদি মনু থেকে ঋগ্বেদে উল্লিখিত প্রতীপ ও দেবাপি এবং পুরাণে বর্ণিত মনুর বংশধর

পরীক্ষিত থেকে মগধের নন্দরাজ পর্যন্ত বংশতালিকার স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তবে ম্যাক্সমুলার নির্দিষ্ট এবং অন্যান্য পারজম পাশ্চাত্য ভারতবিদ্ ও তাঁদের দেশীয় অনুগামীদের দ্বারা স্বীকৃত তথাকথিত আর্যজাতির ভারত আগমন কাহিনী নিতান্তই অলীক ও ভিত্তিহীন হয়ে পড়ে।

ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে যে, উপযুক্ত যজ্ঞস্থলের অন্বেষণে বহু অঞ্চল পরিভ্রমণ করে নদী সরস্বতীর আহ্বানে যযাতি সেই নদীর উপকূলে যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে ব্রতী হয়েছিলেন। এই তথ্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, যযাতির পূর্বগামীদের কোন স্থায়ী আশ্রয় ছিল না। যযাতিই প্রথম নিজেকে একটা স্থিতিশীল অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, দৈত্যরাজ বলীকে বামনরূপধারী বিষ্ণু পাতালে স্থাপিত করেছিলেন এবং ইন্দ্রকে তার স্বরাজ্যে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে অসুররাজ্যের অধীশ্বর বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠার সঙ্গে যযাতির পরিণয় হয়েছিল। ঋগ্বেদে যযাতির সরস্বতীতীরে বসতি প্রতিষ্ঠা এবং পুরাণে যযাতির সঙ্গে অসুররাজকন্যা শর্মিষ্ঠার পরিণয়ের কাহিনীকে সত্যভিত্তিক বলে গ্রহণ করলে, বৈদিক জন-গোষ্ঠীর আবাসস্থল এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে কিছু পরিমাণে ধারণা করে নেওয়া যায়। পুরাণ, মহাভারত এবং রামায়ণে বর্ণিত আছে যে ইক্ষ্বাকু বংশের দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের সঙ্গে রাক্ষসশক্তির প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটেছিল এবং এই সংঘর্ষে রাক্ষসপ্রধান রাবণ রামচন্দ্রের দ্বারা পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন। অতীতের এই কাহিনীর কোন উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না; কিন্তু ঋগ্বেদে যজ্ঞবিরোধী বা যজ্ঞধ্বংসকারী কিমিদিন এবং যাতুধান নামে বর্ণিত রাক্ষসদের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের যজ্ঞপন্থীরা দানব, বৃত্র বা অন্যান্য শত্রুদের ঐশ্বর্যসম্পদ সম্পর্কে প্রভূত ঈর্ষা পোষণ করতেন, একথা ঋগ্বেদের বর্ণনা থেকে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়। রামায়ণ কাহিনীতে বর্ণিত লঙ্কাপুরী ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরে রামচন্দ্রের রাজধানী অযোধ্যাপুরী অপেক্ষা বহুগুণে সমৃদ্ধ ছিল এবং রামায়ণ-রচয়িতার তাতে প্রভূত ঈর্ষার আভাস পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে দাশরাজ্ঞ কাহিনীর নায়ক সুদাসের যাতুধানদের দ্বারা বিশেষভাবে উৎপীড়িত হওয়ার উল্লেখ আছে। ঐশ্বর্যসম্পদের বিচারে ঋগ্বেদের যজ্ঞপন্থী জনগোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু হিসেবে গণ্য দানব, রাক্ষস, নাগ ইত্যাদিরা যে অনেক বেশি সমৃদ্ধিশালী ছিল, বৈদিক সাহিত্য ও পুরাণাদি থেকে একথা সুস্পষ্টই

প্রতীয়মান হয়। যে দুই শ্রেণীর লোকের বিবরণ ঋগ্বেদের প্রধান উপজীব্য, সেই ঋষি ও রাজন্য সমাজের দ্বারা তেমন সম্পদ উৎপাদন সম্ভবপর ছিল না। ঋষি এবং রাজন্য সম্প্রদায়ের নিজস্ব হয়ত কিছু চাষবাস ছিল, যে কৃষিকর্মের সুবিধার্থে প্রভূত বর্ষণের জন্য তাঁরা ইন্দ্র এবং পর্জন্যদেবের স্তুতি করতেন। তাছাড়া তাঁদের গোসম্পদও ছিল বিশেষ গর্বের কারণ। পরবর্তী যুগে এই কৃষিকর্ম এবং গোপালন বৃত্তি ঋষি সম্প্রদায় সম্ভূত ব্রাহ্মণ এবং রাজন্য সম্প্রদায় সম্ভূত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আর তেমন গৌরবজনক বলে মনে করা হত না। নানাবিধ ভোগ্যপণ্যের ব্যবহারের ইঙ্গিত ঋগ্বেদে আছে। যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, বহুমূল্য প্রস্তরের তৈরি অলঙ্কার, পরিধেয় বস্ত্র, চলাচলের জন্য রথ, গৃহকর্মের জন্য তৈজসপত্র ইত্যাদি। এইসমস্ত উপকরণ যারা সরবরাহ করত—স্বর্ণকার, মণিকার, রথকার ইত্যাদি নামে পরিচিত সেইসব ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারীদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বৈদিক সাহিত্যে অনেক উল্লেখও পাওয়া যায়। কিন্তু সমাজে এদের কতখানি স্বীকৃতি ছিল, এদের ধর্মীয় ধ্যানধারণাই বা কেমন ছিল, সে-সম্বন্ধে ঋগ্বেদের বর্ণনায় তেমন কোন তথ্য পাওয়া দুষ্কর। মহাভারতে পাণ্ডব-বীর ভীমসেনের রাক্ষসরাজ-কন্যা হিড়িম্বার সঙ্গে পরিণয়ের উল্লেখ ছাড়া রাক্ষস সম্প্রদায়ের আর তেমন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু সেখানে রাক্ষস সমাজের স্বগোত্র যক্ষ-জনগোষ্ঠীর যথেষ্ট উল্লেখ আছে। যক্ষ সম্প্রদায়ের অধিপতি বৈশ্রবণ বা কুবেরকে ধনপতি এবং বিত্তেশ নামে অভিহিত করে তাঁকে দেবতার মর্যাদা ও উত্তরদিকের দিকপালরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। সর্প-কুলের অধিপতি বাসুকি এবং নাগ সম্প্রদায়ের অনন্তকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। যক্ষ সম্প্রদায় যে প্রভূত অর্থসম্পদের অধিকারী তারই ইঙ্গিতস্বরূপ যক্ষরাজ কুবেরের মূর্তির হাতে দেখানো হত মুদ্রাপূর্ণ থলি। নাগদেরও অর্থ-প্রাচুর্যের অভাব ছিল না। তাদের আবাসস্থল পাতাল নামে পরিচিত অঞ্চল বহু পুরীতে পূর্ণ (পাতালপুরী শব্দের প্রচলন লক্ষণীয়) বলে মনে করা হত। পাতাল কেবল বহু পুরীতেই পূর্ণ নয়, বহু ধনরত্নেও সমৃদ্ধ ছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, পুরাণে দানবরাজ হিরণ্যকশিপুর বিপুল প্রাসাদ ও ঐশ্বর্য সম্পদের বর্ণনার কথা এবং সেইসঙ্গে হিরণ্যকশিপুর বংশধর দানবরাজ বলিকে বামনরূপী বিষ্ণুর দ্বারা পাতালে সংস্থাপনের কথা। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, দিতির পুত্র হিরণ্যকশিপু সমস্ত ত্রিজগৎ অধিকার করে ইন্দ্র হয়ে বসেছিলেন। (ইন্দ্রত্ব-

মকরোদ্বৈত্যঃ স চাসীৎ সবিতা স্বয়ং/বায়ুরগ্নিরপাং নাথঃ সোমশ্চাভূন্মহাসুরঃ)।[১] দেবতা ভিন্ন অন্য সবাই, যেমন গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং পন্নগেরা অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর উপাসনায় তৎপর হয়েছিল। এই অসুররাজের প্রাসাদ ছিল স্ফটিক ও অভ্রে মণ্ডিত এবং তাঁর প্রাসাদে গন্ধর্ব-কিন্নরেরা সঙ্গীত-বাদ্য ও অপ্সরারা নৃত্য পরিবেশন করত। গর্বোদ্ধত হিরণ্যকশিপুকে ভগবান বিষ্ণু নৃসিংহরূপ ধারণ করে সংহার করেন। দৈত্যরাজদের এই ঐশ্বর্যসম্পদ দেবতাদের প্রভূত ঈর্ষার কারণ ছিল। দেবরাজ ইন্দ্র এবং ইন্দ্র-পরবর্তী মনু ও মনুর বংশধরেরা কিছু রাজ্য ও সম্পদের অধিকারী হয়ে থাকলেও দৈত্য, দানব, যক্ষ-রক্ষ, নাগ-গন্ধর্বদের ঐশ্বর্য-প্রাচুর্য মনে হয় এই দেব-উপাসকদের অপেক্ষা সর্বদাই অধিক বলে গণ্য হত। ঐশ্বর্যসম্পদের সৃষ্টি কেবলমাত্র কৃষি এবং গোপালনের দ্বারা সম্ভব হয় না; নানাবিধ ভোগ্যপণ্য উৎপাদন, শিল্প ও কারুদ্রব্য সৃষ্টি এবং বাণিজ্য, ক্রয়বিক্রয়, আদান-প্রদানেই এই সম্পদ সৃষ্টি হতে পারে। এই দিক থেকে ঋগ্বেদ বর্ণিত সমাজ তেমন কৃতী বা পারঙ্গম ছিল এমন পরিচয় নাই। বরং সম্পদশালী বাণিজ্য-ব্যবসায়ী পণিদের প্রভূত সম্পদই ছিল তাদের সঙ্গে প্রবল বিরোধের কারণ।

শিল্প ও কারুদ্রব্য উৎপাদনে যারা দক্ষ ছিল তাদের উদ্ভব সম্পর্কে পুরাণের বর্ণনা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। এই বর্ণনা মতে, বৃহস্পতির ভগ্নী বরস্ত্রীর সঙ্গে অষ্টম বসুর পরিণয় হয়েছিল। বরস্ত্রীর বিশ্বকর্মা নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। বিশ্বকর্মা সকল শিল্পবিদ্যার কর্তা এবং বহু মানুষের জীবিকা-অর্জনের কৌশলের প্রবক্তারূপে খ্যাতি অর্জন করেন। বিশ্বকর্মা সম্পর্কে বিষ্ণুপুরাণ বলছেন: কর্তাশিল্পসহস্রাণাং ত্রিদশানাং চ বর্দ্ধকী। ভূষণানাং চ সর্বেষাং কর্তা শিল্পবতাং বরঃ—১।১৫:১২০। বিশ্বকর্মার ছিল চার পুত্র; তাঁদের নাম যথাক্রমে অজ একপাদ, অহির্বুধ্ন্য, ত্বষ্টা এবং রুদ্র। এদের মধ্যে ত্বষ্টার পুত্র ছিলেন মহাতপস্বী 'বিশ্বরূপ'। (তস্য পুত্রাস্তু চত্বারস্তেষাং নামানি মে শৃণু অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যস্তষ্টা রুদ্রশ্চ বীর্যবান—১।১৫:১২২।)

ভাগবতেও অজ একপাদ, অহির্বুধ্ন্য, বহুরূপী এবং রুদ্রকে একসঙ্গে একাদশ রুদ্রের অন্যতম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যো বহুরূপী মহানিতি/রুদ্রস্য পার্ষদাশ্চান্যে ঘোরা ভূত বিনায়কাঃ—ভাগবত)।[২] এই তালিকায় ত্বষ্টার পরিবর্তে বহুরূপী নামের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ঋগ্বেদেও ত্বষ্টাকে বহুবার 'বিশ্বরূপ' নামে অভিহিত করা হয়েছে।[৩] ভাগবতে এই বিশ্বরূপ

অর্থেই যে 'বহুরূপী' শব্দের ব্যবহার হয়েছিল এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মহাভারতে অহির্বুধ্ন্যকে যেমন একাদশ রুদ্রের অন্যতম বলা হয়েছে,[৪] তেমনি অহির্বুধ্ন্যকে 'শিব' নামেও অভিহিত করা হয়েছে।[৫] বর্তমানের এই আলোচনায় দেখাবার চেষ্টা হয়েছে যে, প্রাচীন নাগ সম্প্রদায়ের ভিতর থেকেই 'নারায়ণ' নামে অনন্তশায়ী দেবতার পরিকল্পনা উদ্ভূত হয়ে সেই নারায়ণ ভগবান বাসুদেব ও বিষ্ণুর সঙ্গে এক ও অভিন্নরূপে গণ্য হয়েছিলেন। মহাভারতে অহির্বুধ্ন্যকে শিবের সঙ্গে এক ও অভিন্নরূপে বর্ণনা করায়, উপলব্ধি করা যায় রুদ্র নামে বৈদিক দেবতার সঙ্গে শিবকে এক ও অভিন্ন ধার্য করা হয়েছিল। গীতায় 'রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি' এই উক্তিতে রুদ্র এবং শঙ্কর বা শিবকে এক ও অভিন্ন বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য নাগপূজক সম্প্রদায়ের সকলেই তাঁদের উপাস্য নাগদেবতাকে ঋগ্বেদের বিষ্ণুর সঙ্গে এক বলে গণ্য করেননি। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট এক অংশ বেদের রুদ্রকেই পৌরাণিক শিব বা শঙ্করের মধ্যে আরোপ করেছিলেন এবং তাঁদের উপাস্য 'নাগ'কে এই শিবের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শিবের মস্তকোপরি নাগের অবস্থানের কল্পনা এই নাগ সংযোগেরই ফল। বস্তুত সিন্ধুবিধৌত অঞ্চলে বিস্তৃত যে সভ্যতার অভ্যুত্থান হয়েছিল সেই সভ্যতার অন্তর্বর্তী জনগোষ্ঠীর এক সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাসম্পন্ন বৃহৎ অংশ যে 'নাগ'-উপাসক ছিল, সেখান থেকে পাওয়া বহু উপকরণ থেকে সে সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক মনে হয় না। যজ্ঞ-অনুষ্ঠানকারী বেদানুগামী সমাজের প্রবর্তক ইন্দ্রের সঙ্গে যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী বৃত্রের সংঘর্ষ হয়েছিল, হরপ্পা সভ্যতার অধিবাসী বলে অনুমিত জনগোষ্ঠীর নেতা সেই বৃত্র বা বিশ্বরূপ 'নাগ-উপাসক' ছিলেন বলেই সিদ্ধান্ত করা যায়। পরবর্তী যুগে যে সাংস্কৃতিক বিবর্তন ঘটেছিল শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে রুদ্র-শিবকে 'বিশ্বরূপ' আখ্যায় প্রতিষ্ঠিত করে উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একটু আগে উদ্ধৃত পুরাণের বর্ণনাটি সংস্কৃতির বিবর্তন প্রসঙ্গে এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উপকরণ বলে গণ্য হওয়ার দাবি রাখে। ঋগ্বেদেও এই দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার উল্লেখ আছে। বিশ্বকর্মার পুত্র নামে বর্ণিত অজ একপাদ, অহির্বুধ্ন্য, ত্বষ্টা এবং রুদ্র প্রত্যেকেরই উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে এবং সেখানে এঁদের প্রত্যেকেই দেবতা বলে অভিহিত হয়েছেন। ঋগ্বেদে অজ একপাদের নাম অহির্বুধ্ন্যের সঙ্গে বেশ কয়েকবারই উল্লিখিত হয়েছে। সেখানে এঁরা উভয়েই বিস্তৃত সমুদ্র, পু

স্রোতস্বতী নদী, নভোমণ্ডল, বিধ্বংসী বন্যা এবং সমস্ত দেবতাদের সহচর।[৬] তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে অজ একপাদের পূর্বদিকে উদয়ের উল্লেখ আছে।[৭] নিরুক্তের ব্যাখ্যাকর্তা দুর্গ বলেছেন অজ একপাদ ও সূর্য এক।[৮] অহির্বুধ্ন্য অর্থে গভীর জলের অহি বা সর্প ঋগ্বেদে বৃত্র নামেও অভিহিত হয়েছেন।[৯] অন্য একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে গভীর জলের তলায় (বুধ্নে) উৎপন্ন অহিকে আমি স্তুতি করছি।[১০] ঋগ্বেদে অজ একপাদ ও অহির্বুধ্ন্য অপেক্ষা ত্বষ্টার অনেক বেশিবার উল্লেখ পাওয়া যায়। ত্বষ্টাকে বর্ণনা করা হয়েছে দক্ষ কারুশিল্পীরূপে।[১১] তিনিই ইন্দ্রের বজ্র নির্মাণ করেছিলেন।[১২] তিনিই সকল রূপশিল্পের এবং মানুষের আকৃতির স্রষ্টা এইসব কথাও বলা হয়েছে।[১৩] ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যু ছিলেন বিবস্বতের পত্নী, যে বিবস্বত মনুর পিতা। তিনি আবার প্রথম যাদের মৃত্যু হয়েছিল সেই যম ও যমীরও পিতারূপে বর্ণিত হয়েছেন।[১৪] ঋগ্বেদেও বিশ্বরূপকে ত্বষ্টার পুত্ররূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৫] এই বিশ্বরূপকেও যে ইন্দ্র হত্যা করেছিলেন, এ তথ্যও ঋগ্বেদে আছে। বিশ্বকর্মার অন্য পুত্রের নাম রুদ্র। ঋগ্বেদে রুদ্রকে বলা হয়েছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এক জন্তুর মত; এই জন্তুকে উল্লেখ করা হয়েছে 'বৃষ' আখ্যায়, আবার তাঁকে অসুর নামে অভিহিত করে (৫।৪২:১১) বলা হয়েছে যে তিনি পরম শক্তিমান (১।৬৩:১; ২।৩২:৩)।

বিষ্ণুপুরাণে প্রদত্ত যে বংশাবলী উপরে আলোচনা করা হল, অন্যান্য কিছু পুরাণে ও মহাভারতে বর্ণিত বিশ্বকর্মার পরিচয় তা থেকে সামান্য কিছু স্বতন্ত্র। বায়ু (৬৫।৭২-৯৭), মৎস্য (১৯৫।১১-৪৬) ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে (৩।১।৭৩-১০০) বর্ণিত আছে যে মহর্ষি ভৃগুর দুই পুত্র ছিল; নাম চ্যবন এবং উশনস-শুক্র। শুক্র কবি নামেও পরিচিত ছিলেন। শুক্রের পত্নী ছিলেন পিতৃকন্যা 'গো'। শুক্রপত্নী 'গো'র চার পুত্র জন্মে; তাদের নাম ছিল ত্বষ্টৃ, বরুত্রিণ, যণ্ড ও মর্ক। ত্বষ্টৃর দুই পুত্র—ত্রিশিরস্‌-বিশ্বরূপ ও বিশ্বকর্মা। বিষ্ণুপুরাণের প্রদত্ত তালিকায় বিশ্বকর্মন্‌ বৃহস্পতির ভগ্নী বরস্ত্রীর সন্তান, ত্বষ্টা বিশ্বকর্মার অন্যতম পুত্র। অন্যমতে বিশ্বকর্মন্‌ ত্বষ্টর পুত্র। দুই তালিকাতেই বিশ্বরূপকে ত্বষ্টৃর পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে মহাভারত, বায়ু, মৎস্য ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের তালিকার উপর নির্ভর করে ত্বষ্টৃ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ঋগ্বেদে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও, ত্বষ্টৃকে ইন্দ্রের পিতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, বেদের পণ্ডিত ম্যাকডোনেল এই

মত প্রকাশ করেছিলেন।[১৬] ঋগ্বেদে বিশ্বরূপকেও ত্বষ্টৃর পুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বর্ণিত আছে যে, ইন্দ্র বিশ্বরূপকে হত্যা করেছিলেন, যার ফলে ত্বষ্টৃ ইন্দ্রের সোমযজ্ঞে সাহায্য করতে অস্বীকার করেন।[১৭] শতপথ ব্রাহ্মণেও ইন্দ্র কর্তৃক বিশ্বরূপের নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[১৮] ঋগ্বেদের দুটি মন্ত্রে ত্বষ্টা, সবিতা এবং বিশ্বরূপকে একসঙ্গে দেবতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৯] কৌশিকী সূত্রে ত্বষ্টৃকে সবিতা এবং প্রজাপতি ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে ত্বষ্টৃকে বিশ্বকর্মা এবং প্রজাপতির সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনায় ত্বষ্টা, অজ একপাদ এবং অহির্বুধ্ন্য, এঁরাও একাদশ রুদ্রের অন্তর্ভুক্ত। ঋগ্বেদে ও অন্যান্য কিছু গ্রন্থে ত্বষ্টাকে সূর্যের সঙ্গেও অভিন্ন বলা হয়েছে। অহির্বুধ্ন্য শব্দের বুধ্ন্য অর্থে যেমন গভীর জল বোঝায়, তেমনি গভীর মহাশূন্যকেও বুধ্ন্য শব্দে বোঝানো যায়। এই সূত্রেই অহির্বুধ্ন্য মহাকাশের অহি অর্থাৎ সূর্য। রুদ্রদেবতারাও সূর্যরূপেই গণ্য হয়েছেন। ঋগ্বেদে রুদ্রকে আকাশের মহা অসুর বলা হয়েছে, যা থেকে রুদ্র যে আকাশস্থ সূর্য এই কথাই মনে হয়।

ত্বষ্টৃর পুত্র ইন্দ্র এবং ত্রিশিরস্-বিশ্বরূপ ঘটিত প্রসঙ্গ পুনরায় একটু বিস্তৃতভাবে করা হল, এখানে একটি যে মূল বক্তব্য উপস্থিত করা হচ্ছে তারই সমর্থনে। ইন্দ্র যে ত্রিশিরস্-বিশ্বরূপকে হত্যা করেছিলেন এই তথ্য সম্বন্ধে ঋগ্বেদ, ব্রাহ্মণ এবং পুরাণের বর্ণনায় কোন দ্বিমত পাওয়া যায় না। ইতিপূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে, বিশ্বরূপকে হত্যা করার ফলে ইন্দ্র তাঁর সমাজে বিশেষভাবে নিন্দিত হয়েছিলেন। বিশ্বরূপ যে কেবল ত্বষ্টার পুত্র হিসেবে ইন্দ্রের ভ্রাতাই ছিলেন তা নয়, তিনি জ্ঞান, প্রজ্ঞা ইত্যাদির জন্য বিশেষ খ্যাতিমান ছিলেন। ভাগবতপুরাণে ইন্দ্র-বিশ্বরূপ সম্পর্কিত একটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ আছে। ইন্দ্র এবং বিশ্বরূপের বিরোধের পরিণতি এই বিবরণ থেকে কিছু অনুমান করা যায়। ভাগবত বলেছেন, ত্বষ্টার ভার্যা ছিলেন 'রচনা' নাম্নী দৈত্যকুলের কন্যা। এই ত্বষ্টৃ বিশ্বরূপ নামেও পরিচিত ছিলেন। একসময় ইন্দ্র মদগর্বে গর্বিত হয়ে গুরু আঙ্গিরস-বৃহস্পতিকে অপমান করেছিলেন, যার ফলে তাঁর সমস্ত রাজ্য-ঐশ্বর্য বিলুপ্ত হয়ে ইন্দ্র পরম বিপাকে পতিত হন। সেই সময়ে ইন্দ্র ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলে, ব্রহ্মা ইন্দ্রকে ত্বাষ্ট্র-বিশ্বরূপকে পুরোহিত পদে বরণ করতে বলেন। মহাতপস্বী বিশ্বরূপ ছিলেন নারায়ণের উপাসক, এবং নারায়ণের প্রদত্ত শক্তিতে শক্তিমান। এই শক্তি বা বিদ্যাকে

ভাগবতে বলা হয়েছে 'নারায়ণ-বর্ম'। তপস্বী বিশ্বরূপ তাঁর 'নারায়ণ-বর্ম'-রূপ শক্তি দ্বারা ইন্দ্রকে পুনরায় তাঁর আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইন্দ্র কিন্তু তাঁর হৃতগৌরবলাভ করার পরই বিশ্বরূপকে হত্যা করেন। বোধহয় প্রবল শক্তিধর বিশ্বরূপকে প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করার ফলেই ইন্দ্র তাঁকে হত্যা করেছিলেন। ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে যে, ইন্দ্র তাঁর পিতাকেও হত্যা করে তাঁর মাতার বৈধব্য-সাধন করেছিলেন।[২০] বেদের আলোচনা প্রসঙ্গে খ্যাতনামা জার্মান পণ্ডিত পিশেল ও বারগয়েন ইন্দ্রের দ্বারা ত্বষ্টার নিধনের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই তথ্য উল্লেখ করে ম্যাকডোনেল বলেছেন যে, বলপূর্বক সোম অধিকার করবার জন্য ইন্দ্র যাঁকে হত্যা করেছিলেন, ঋগ্বেদে তাঁকে ত্বষ্টা নামেই অভিহিত করা হয়েছে।[২১] এই বিরোধের সূত্রে দেবতারাও ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ইন্দ্র যে আয়ুধের দ্বারা পরে বৃত্রকে বধ করেছিলেন সেই আয়ুধের নির্মাতাও ছিলেন ত্বষ্টা। ভাগবতে উল্লেখ আছে যে 'ত্রি-শির বিশ্বরূপ' তাঁর মাতার (দৈত্যানুজা 'রচনা') প্রতি শ্রদ্ধাবশত ইন্দ্রের পৌরোহিত্য-জনিত উপ-ঢৌকনের কিয়দংশ জ্ঞাতি (মায়ের ভ্রাতৃ সম্পর্কে আত্মীয়) দৈত্যদের দিয়ে-ছিলেন। এরই ফলে কুপিত হয়ে ইন্দ্র বিশ্বরূপকে হত্যা করেন (স এবহি দদৌ ভাগং পরোক্ষমসুরান্ প্রতি / যজমানোঽবহদ্ ভাগং মাতৃস্নেহবশানুগঃ)[২২]। পুত্রকে নিহত দেখে বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা ইন্দ্রের বিনাশের জন্য স্বমূর্তি-সদৃশ ত্রিজগৎ-আবরণকারী এক বীরের সৃষ্টি করলেন, যার পরিচয় হল বৃত্র নামে। বৃত্রের এই ভয়ানক রূপ দর্শনে দেবতারা ভগবান শ্রীহরির নিকট আকুল প্রার্থনা জানালেন, বৃত্রের হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করবার জন্য। বিশ্বকর্মা-নির্মিত মহা আয়ুধের সাহায্যে ইন্দ্র শেষপর্যন্ত বৃত্রকে নিধন করলেন।[২৩] ইন্দ্র-বৃত্র বিরোধের এমন বিস্তৃত বর্ণনা অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে ইন্দ্র, ত্বষ্টা এবং ত্রিশির-বিশ্বরূপ ও বৃত্রের সম্পর্কে বহু তথ্য ও বিস্তৃত উল্লেখ আছে। পরবর্তী নানা গ্রন্থেও এই ইন্দ্র-কাহিনীর আপেক্ষিক উল্লেখ খুবই ব্যাপক।[২৪] এই কাহিনীর নানা ব্যাখ্যা, বেদ সম্পর্কে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁদের সকলেই দিতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে এই কাহিনীর তাৎপর্য বর্তমান আলোচনায় যেভাবে উপস্থিত করা হয়েছে, সেভাবে অন্য কেউ এই বিষয়টিকে বিচার করে দেখিয়েছেন বলে জানা নাই।

এখানে নানা প্রাচীন গ্রন্থ থেকে যে-সব প্রমাণের উল্লেখ করা হল, তা থেকে

একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, যে সিদ্ধান্ত বর্তমান আলোচনার মূল ভূমিকা হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঋগ্বেদে প্রদত্ত বর্ণনা থেকে নিশ্চিতভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে, ত্বষ্টৃকে ইন্দ্রের পিতারূপে উপস্থিত করায় বেদের প্রবক্তাদের দ্বিধা ছিল অত্যন্ত গভীর। বিষয়টি কিন্তু সম্পূর্ণ গোপন থাকেনি। বিশ্বরূপ নামে ত্বষ্টৃর যে পুত্রের উল্লেখ স্পষ্টভাবেই ঋগ্বেদে করা হয়েছে, সেই বিশ্বরূপ এবং বৃত্র উভয়ে যে ত্বষ্টৃরই সন্তান ছিলেন, এ তথ্যও গোপন রাখা সম্ভব হয় নাই। বিশ্বরূপ কেন এবং কিভাবে ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন, বিশ্বরূপকে হত্যা করবার পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ইন্দ্রকে কিরূপ প্রয়াস করতে হয়েছিল, পরবর্তী সাহিত্য থেকে সে প্রসঙ্গও জানা গেছে। এইসব তথ্য থেকে ঋগ্বেদের ইন্দ্র-বিশ্বরূপ (বৃত্র) দ্বন্দ্বভিত্তিক ঘটনাকে নিশ্চিতভাবেই ভ্রাতৃ-বিরোধ বলে গণ্য করা যেতে পারে। ঋগ্বেদের ইন্দ্র-বৃত্র (বিশ্বরূপ) কাহিনীকে ইন্দ্রের দ্বারা বর্ষণরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ব্যাখ্যার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে ঘটনাটিকে ইতিহাসভিত্তিক বলে গণ্য করা গেলে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির তথা হরপ্পা ও বৈদিক সংস্কৃতির বিভিন্নতাভিত্তিক প্রচলিত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে একটি যুক্তিগ্রাহ্য প্রতিবাদ এবং সেই সমস্যার সমাধানের পথে যথেষ্ট আলোক পাওয়া যেতে পারে। ইন্দ্র এবং বৃত্রের দ্বন্দ্ব ঋগ্বেদের তথ্যভিত্তিতে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বরূপে উপস্থিত করা যায়, কারণ এঁরা উভয়েই ছিলেন ত্বষ্টার সন্তান। এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের ফলে মূল সমাজের দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়াকেই এখানে বলা হয়েছে 'মহাবিচ্ছেদ'।

ত্রিশির-বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর ত্বষ্টার মূর্তিতে -বৃত্রের উদ্ভবের যে বর্ণনা ভাগবতে আছে, তাতে ত্রিশির-বিশ্বরূপই যে বৃত্ররূপে উদ্ভূত বা রূপান্তরগ্রহণ করে-ছিলেন এই কথা বোঝা যায়। ঋগ্বেদের মত অথর্ববেদেও এই কাহিনীর উল্লেখ আছে। দেবীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধেও ইন্দ্র-বিশ্বরূপ ঘটিত কাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। এইসব বহু গ্রন্থে ইন্দ্র-বৃত্র-বিশ্বরূপ সম্পর্কিত ঘটনার বারংবার উল্লেখ থেকে ঘটনাটিকে যে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হত সে-কথা প্রমাণিত হয়। মহাভারতে সুস্পষ্টভাবেই বিশ্বরূপকে বৃত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পিতা এবং ভ্রাতার দ্বন্দ্বের ফলেই এক বৃহৎ জন-গোষ্ঠী যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল, এইসব তথ্য থেকে সেই সিদ্ধান্তই এই আলোচনায় একটি বিশেষ প্রতিপাদ্যরূপে উপস্থিত করা হয়েছে। সেই সনাতন সমাজে ইন্দ্র সকলের অবিসংবাদী সমর্থনলাভ করেন নাই। 'বিশ্বকর্মা'ই ছিলেন

সেই সমাজের শীর্ষে। তাঁর সন্তান ছিলেন অজ একপাদ, অহির্বুধ্ন্য, ত্বষ্টা এবং রুদ্র। মনে হয়, সেই আদি অসুরসমাজে এঁরাই ছিলেন গোষ্ঠীপতি। এঁদের প্রত্যেকেই সম্পদ ও শস্যের উৎপাদনের সহায়ক ও নিয়ন্তা—মহাকাশ বা নভোমণ্ডল এবং গভীর সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত বলে গণ্য হয়েছিলেন। সমুদ্র, হ্রদ এবং নদীর জলরাশিই তাপপ্রভাবে উত্থিত হয়ে আকাশে মেঘরূপে সংস্থাপিত হয় এবং পৃথিবীতে বর্ষিত হয়ে শস্যসম্ভাররূপ জীবনপোষক সম্পদ উৎপন্ন করে। এই বিস্তৃত জলের বিবর্তনক্রিয়ার নিয়ন্তা প্রত্যক্ষত নভোমণ্ডলস্থ জ্যোতিষ্মান মহাশক্তিরূপ ভগবান সূর্য। রুদ্র আখ্যায় অভিহিত সূর্যই ছিলেন সেই জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশের প্রধানতম উপাস্য।

এই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যিনি স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি তাঁর অনুগামীদের কাছে ইন্দ্র বা অধিকর্তারূপে গৃহীত ও অধিষ্ঠিত হলেন। তাঁর অনুগামীরা পরিচিত হন 'দেব' আখ্যায়। যে অসুরসমাজ থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছিলেন, তাঁরা অসুর পরিচয়েই আখ্যাত হয়ে রইলেন। ত্বষ্টৃকন্যা সরণ্যুর বিবাহ হয়েছিল বিবস্বতের সঙ্গে, যাঁর পুত্র মনু ইন্দ্রের উত্তরাধিকার অর্জন করেছিলেন। ঋগ্বেদ মূলত এই ইন্দ্র-মনু অনুগামী সমাজেরই তথ্যসমৃদ্ধ সংকলন। ঋগ্বেদ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, ইন্দ্র ও মনুর অনুগামী সমাজ মনুর উত্তর-পুরুষ রাজন্যশ্রেণী ও যে ঋষিরা ইন্দ্র এবং মনুকে সাহায্য দান করেছিলেন, মূলত তাদের নিয়েই সংগঠিত হয়েছিল। যজ্ঞের অনুষ্ঠানের দ্বারা উদ্দিষ্ট দেবতার উপাসনার মাধ্যমে এঁদের সাধনকৃত্য সম্পন্ন হত। রাজন্য ও ঋষি ছাড়া, যজ্ঞ-ক্রিয়ায় অন্য কারো অধিকার স্বীকৃত ছিল না। ফলে, বেদের সমাজে রাজন্য ও ঋষি ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় ও জীবিকা অনুসরণকারী মানুষের জীবন, সমাজ, ধর্মকর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে তেমন কোন বিবরণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিশ্বকর্মা বা বিশ্বস্রষ্টা যিনি ব্রহ্মণস্পতি ও পরে ব্রহ্মা নামে অভিহিত হয়েছেন, তাঁর পুত্র ত্বষ্টা, ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপ সকলেই ছিলেন শিল্পী এবং রূপস্রষ্টা। ইন্দ্রের পরিচালিত সমাজে তেমন রূপস্রষ্টার কোন নাম পাওয়া যায় না; হয়ত শিল্পকর্মের তেমন কোন স্বীকৃতিও এই সমাজে ছিল না। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই ইন্দ্রের আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকে স্বীকৃত বিশ্বকর্মাকে ইন্দ্রানুগ সমাজেও শিল্প এবং কারিগরী বিদ্যার অধিষ্ঠাতা বলে স্বীকার করতে হয়েছিল।

বিশাল সিন্ধু নদী এবং সিন্ধুর নানা শাখার উপকূল ও অববাহিকায়

যে-সব প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে সেইসব উপকরণ এবং বেদ ও বেদানুবর্তী বিস্তৃত সাহিত্যসম্ভারে যে-সব তথ্য পাওয়া যায় তার উপর নির্ভর করে যে অনুমান এখানে উপস্থিত করা হয়েছে, তা থেকে সাংস্কৃতিক আরও কিছু সম্ভাবনার কথাও বিচার করা যেতে পারে। যে-সব জনবসতি এবং নগরের ধ্বংসাবশেষ সিন্ধু উপকূলে পাওয়া গেছে সেইসব নগরনির্মাণে স্থাপত্য ও পূর্ত-বিদ্যার যথেষ্ট অগ্রগতির পরিচয় আছে। তেমনি অনেক ভোগ্য উপকরণ—গহনা, অলঙ্কার, বাসনপত্র, মাটির, পাথরের ও ধাতুর মূর্তি, স্টিয়েটাইট-এর তৈরি শীলমুদ্রা ইত্যাদি বহু শিল্প-উপকরণসমূহে সেই সিন্ধু-আশ্রিত সমাজের উন্নত কৃতিত্বী এবং অগ্রসর শিল্পবোধের পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। স্থপতি, পূর্তবিজ্ঞানী, শিল্পী এবং কারুস্রষ্টার একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী যে এখানে বসবাস করত এবং এই সভ্যতাকে তারাই যে পুষ্ট করে তুলেছিল একথা সহজেই অনুমান করা চলে। বিষ্ণুপুরাণে যথার্থই বলা হয়েছে—মনুষ্যাশ্চোপজীবন্তি যস্য শিল্পং মহাত্মনঃ—যে শিল্পবিদ্যার আশ্রয়ে বহু মানুষের জীবনযাত্রা সম্পন্ন হয় সে-শিল্প অতি মহৎ। ঐসব নগরবৃত্তে আরও যে-সব বিশিষ্ট অধিবাসীর কর্মের পরিচয় পাওয়া যায় তাদের মধ্যে নগরবাসীদের ভোগ্যপণ্য, খাদ্য-শস্য এবং অন্যান্য সামগ্রী আমদানী করা এবং তার সরবরাহ করার ব্যবস্থায় যারা ব্যাপৃত ছিল এবং নগরগুলির সাধারণ বিধিব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ঠিক রাখা, জল-সরবরাহ ইত্যাদি এবং রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা ও পরিচালনার দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত ছিল, এই প্রধান দুই শ্রেণীর নাগরিকের অস্তিত্বের কথাও উপলব্ধি করা যায়। এদের প্রথমোক্ত শ্রেণীকে সাহিত্যের ভাষায় বণিক বা শ্রেষ্ঠী এবং সার্থবাহ বলে অভিহিত করা চলে। অন্য শ্রেণী, নগর ও রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণী। ইন্দ্র যদি সরস্বতীর তীরে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে থাকেন তাহলে সেই অঞ্চলেও শিল্পী, কারিগর, শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ এবং শাসনকার্য-পরিচালক শ্রেণীর সমাবেশ হয়েছিল। সিন্ধু অঞ্চলে মূর্তিপূজা, যোগ-ধ্যান, বৃক্ষ-উপাসনা ইত্যাদির প্রচলন ছিল এবং এইসব এখানকার সাধারণ মানুষের আচার ও সংস্কৃতির অঙ্গ বলে গণ্য হত। কিন্তু ইন্দ্র এবং মনু প্রবর্তিত সমাজে যজ্ঞই ছিল প্রধান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই যজ্ঞপন্থীদের মধ্যে মূর্তিপূজা, বৃক্ষপূজা, যোগ-ধ্যান ইত্যাদির কোন প্রচলন ছিল না। জরথুস্ত্র ইরানে যে সমাজ ও ধর্মীয় সংস্কার প্রবর্তন করেছিলেন সেই সংস্কারে 'আহুর মাজদা' প্রধানতম উপাস্য এবং বিবনহ্বন্ত-এর (ঋগ্বেদের বিবস্বত) পুত্র যিম (ঋগ্বেদের যম—মনুর ভ্রাতা) আদি

পিতা বলে গৃহীত হয়েছিলেন। এই সংস্কারের অন্যতম প্রধান নির্দেশ ছিল মূর্তির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা। ভারতীয় সংস্কারধারায় এই শ্রেণীর মানুষকেই বোধ-হয় পিতৃ-উপাসক বলে অভিহিত করা হত এবং দেব-উপাসক সমাজের সান্নিধ্যেই এই পিতৃ-উপাসকরাও একসময় বসবাস করত। ইরানে উপনিবেশ স্থাপিত হওয়ার পর এই যম-উপাসক সমাজেই সংস্কারক জরথুস্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল। মনুর বংশধর, যজ্ঞপন্থী ও দেব-উপাসকদের মধ্যে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন নির্দেশ না থাকলেও যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান ও কর্মকাণ্ডে বৃক্ষপূজা, মূর্তি-পূজা বা যোগ-ধ্যানের তেমন কোন স্থান ছিল না। মনুর বংশধরদের সমাজে রাজন্য এবং ঋষির বৃত্তিধারীরাই কেবল যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকারী বলে গণ্য হতেন। কিন্তু এই সমাজের পোষণের ও পরিচালনার জন্য স্থপতি, পূর্তবিজ্ঞানী, শিল্পী, কারুকর্মী, বণিক, ব্যবসায়ী এবং নগর ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নিযুক্ত কর্মচারীর প্রয়োজনীয়তাও নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু এইসব শ্রেণীর মানুষের দ্বারা যজ্ঞা-নুষ্ঠানের কোন সংবাদ বেদে বা বেদপরবর্তী সাহিত্যে পাওয়া যায় না ; বরং এদের যজ্ঞের অধিকার ছিল না বলেই মনে হয়। মহাভারত এবং রামায়ণেও রাজন্য এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণীর মানুষের বিবরণ খুবই অল্প। তবে নাগ, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব, বানর, ইত্যাদি নামে অভিহিত জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্পর্কে এইসব গ্রন্থে যথেষ্ট উল্লেখ আছে। এইসব ব্যক্তিরা যে যজ্ঞবাদী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, সে কথাও এইসব গ্রন্থের বর্ণনা থেকে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়।

পরবর্তী যুগের বিভিন্ন আকর গ্রন্থ (পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, গ্রীক লেখকদের ভারত-সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বৌদ্ধ পালি সাহিত্য) এবং কুষাণ যুগ পর্যন্ত ইতিপূর্বে আলোচিত প্রত্নতাত্ত্বিক লেখ এবং সেই-সঙ্গে বহু পোড়ামাটির মূর্তি এবং নানা প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ থেকে সমাজ-বিবর্তনের স্পষ্ট একটি রূপরেখা গড়ে নেওয়া যেতে পারে, যে রূপরেখায় বিষ্ণু-কৃষ্ণ সাধনার বিবর্তনটিকে সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করা সম্ভব হতে পারে। বৈদিক ও বেদপরবর্তী সাহিত্যে যজ্ঞধর্মী সমাজের জীবনে সম্পদ-কামনা ও সম্পদ-উপভোগের প্রবণতার পরিচয় আছে। কিন্তু ঋষি সম্প্রদায়ের মধ্যে তেমন ভোগপ্রবণ কেউ ছিলেন না। তাঁদের প্রবল আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসাও কালের বিবর্তনে নানা দার্শনিক চিন্তায় রূপ নিচ্ছিল। রাজন্য শ্রেণীতে এই দার্শনিক চিন্তার প্রবণতা গোড়ায় তেমন

ছিল না। তাঁদের মধ্যে একটা নীতিগত আদর্শে জীবন অনুশীলনেরই প্রয়াস প্রচলিত ছিল, যার পরিচয় রামায়ণে রামের প্রতি ঋষিদের উপদেশ এবং মহাভারতে পিতামহ ভীষ্মের প্রদত্ত উপদেশাবলীতে বিধৃত রয়েছে। রামায়ণ এবং মহাভারত যেন এমনি এক আদর্শ জীবন অনুশীলনের কথাই তুলে ধরতে চেয়েছে। অন্যদিকে সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদগুলিকে আধ্যাত্মিক চিন্তার বিকাশের দলিল বলে গণ্য করা যেতে পারে। এইসব আকর গ্রন্থগুলিকেও সেই রাজন্য এবং ঋষিদেরই চিন্তা ও অন্বেষণের দিগ্‌দর্শন বলে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত। তবে এইসব গ্রন্থেই ক্রমশ এমন সব চিন্তা ও তথ্যের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে, যা বেদসম্মত রক্ষণশীল চিন্তায় কখনই প্রকাশ পায়নি। ব্রহ্মচিন্তা, যোগক্রিয়া, বেদবহির্ভূত নানা দেবদেবীর স্বীকৃতি ও বিবর্তন এবং রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের মাধ্যমে যজ্ঞবিধি-বহির্ভূত এক সম্পূর্ণ নূতন ধর্মচিন্তা ও সাংস্কৃতিক বিধিব্যবস্থা গড়ে উঠছিল। এই অভিনব সাংস্কৃতিক বিবর্তনকে সম্পূর্ণ নূতন সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়েছে—এক শ্রেণীর পণ্ডিত এই সংস্কৃতিকে বলেছেন 'পৌরাণিক সংস্কৃতি'। অন্য এক শ্রেণী এই সংস্কৃতিকে অভিহিত করেছেন 'ব্রাহ্মণ্য ধর্ম' বলে। এই নূতন সংস্কৃতিধারায় বেদবহির্ভূত যা কিছু পরিলক্ষিত হয়েছে সেগুলিকে পণ্ডিতেরা সাধারণত ভারতে আর্য অনুপ্রবেশের পূর্বেকার অনার্য এবং আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে গৃহীত বলে ধরে নিয়েছেন।

নানা যুক্তিতে পুরাণনির্দিষ্ট সংস্কৃতিকে সরল করে আকরসাহিত্যে প্রচলিত একটি নামে অভিহিত করা হয়েছে দেখা যায়—নামটি হল 'পঞ্চোপাসনা'। এই মত অনুসারে গণেশ আদি পঞ্চদেবতাই মুখ্য ; তবে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও প্রবণতার ভিত্তিতে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ উপাস্য দেবতা বাছাই করে নেবার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এই পঞ্চদেবতা হলেন গণেশ, বিষ্ণু, মহাদেব, সূর্য এবং দেবী। এই পঞ্চদেবতার মধ্যে কেবলমাত্র সূর্য এবং বিষ্ণুই ঋগ্বেদের সমাজে পরিচিত ছিলেন ; কিন্তু সূর্যের জনপ্রিয়তা ঋগ্বেদেই বিশেষভাবে হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল। পরে পঞ্চদেবতার মধ্যে স্থান পেলেও সূর্য তাঁর হৃত জনপ্রিয়তা ফিরে পাননি। তবে ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে এক ও অভিন্ন বলে পরিণত হয়ে সূর্যদেব পুরাণবিহিত চিন্তায় ভাস্বর হয়ে আছেন। আর, যজ্ঞের ভাগে বঞ্চিত, সর্পভূষণ, ব্যাঘ্রচর্ম ইত্যাদি ভূষিত শিব যে অনার্য সমাজ থেকে গৃহীত হয়েছেন এবং ঋগ্বেদের রুদ্রের সঙ্গে তাঁকে পরে এক করে নেওয়া হয়েছিল এই

ধারণাই প্রচলিত আছে। হস্তীমুণ্ড নিয়ে গণেশের দেবসমাজে প্রবেশকেও তেমনি অনার্য প্রভাবসম্ভূত বলেই গণ্য করা হয়েছে; যেমন ধার্য হয়েছে মাতৃকারূপিণী নারীশক্তির প্রতীক দেবীর ক্ষেত্রেও। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বের সঙ্গে অন্বেষণ, বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হয়েছে ভগবান বিষ্ণু সম্পর্কে। ঋগ্বেদে যাঁর উল্লেখ বেশ সীমিত সেই বিষ্ণু কি করে ঋগ্বেদাশ্রিত পরবর্তী চিন্তায় যজ্ঞধর্মীদের প্রধান অবলম্বন যজ্ঞের সঙ্গে এক হয়ে গেলেন এবং পরবর্তী অধ্যাত্মচিন্তার মন্থনে বাসুদেব-কৃষ্ণ নামে এক মানবদেহধারীর সঙ্গে এক ও অভিন্নরূপে পরিগণিত হয়ে তাবৎ ভারতখণ্ডে অনতিক্রম্য এবং অভাবনীয় জনপ্রিয়তায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, এ সমস্যা ভারতসংস্কৃতির জিজ্ঞাসুমাত্রকেই বিশেষভাবে বিস্মিত ও কৌতূহলী করে তুলেছে।

সুদূর অতীতের বেদবিহিত নানা দেবতার উপাসনার স্তর অতিক্রম করে এই পঞ্চদেবতার উপাসনা প্রবর্তিত হওয়ার কাল পর্যন্ত সমাজও নানাভাবে বিবর্তিত ও সংগঠিত হয়েছিল। এই বিবর্তনের পরিচয় যে-সব আকরগ্রন্থে প্রধানত পাওয়া যায় তার মধ্যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে সমাজের অঙ্গ হিসেবে শিল্পী, কারিগর, শ্রেষ্ঠী, ব্যবসায়ী, রাজকর্মচারী ও গৃহস্থের ব্যাপক উল্লেখে ব্রাহ্মণ ও রাজন্য শ্রেণীর বাইরের নানা উপজীবিকা অবলম্বনকারী মানুষের সামাজিক স্বীকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কৌটিল্য দ্বিধাহীনভাবে মত প্রকাশ করছেন যে ধনসম্পদ অর্থাৎ বিত্তই জীবনের প্রধান নির্ভর। কারণ, ধর্মসাধনা, দানপুণ্য এবং জীবনের উপভোগের প্রধানতম উপকরণ 'অর্থ'।[২৫] কৌটিল্য সমাজবিষয়ের চিন্তায় তিনজন পূর্বগামীকে স্বীকৃতি দিয়েছেন; তাঁরা হলেন মনু, বৃহস্পতি এবং উশনস অর্থাৎ শুক্রাচার্য। স্মৃতি নামে পরিচিত শাস্ত্রগ্রন্থগুলির প্রবর্তক ছিলেন মনু; বেদ এবং যজ্ঞবাদীরা মনুকেই পিতা ও সমাজপ্রবর্তক বলে স্বীকার করতেন। এই সমাজের গুরু বা পথনির্দেশক ছিলেন ঋষি আঙ্গিরসের পুত্র বৃহস্পতি। মনু এবং বৃহস্পতিতে বেদেরই প্রাধান্য। কৌটিল্য উশনস বা শুক্রাচার্যকেও পালনযোগ্য স্মৃতির প্রবক্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। শুক্রাচার্য বৈদিক গ্রন্থাদিমতে যজ্ঞপন্থী সমাজের শত্রু বলে পরিগণিত সমাজের (দৈত্য, দানব এবং অসুর সমাজের) গুরু। কৌটিল্যের পূর্বগামী কোন শাস্ত্রগ্রন্থকার শুক্রাচার্যকে তেমন স্বীকৃতি দেন নাই। একথা অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে কৌটিল্যের আবির্ভাবের বহু পূর্বে,

সমাজ যখন বৃহস্পতি এবং শুক্রাচার্যকে গুরুরূপে স্বীকার করে দুই বিবদমান অংশে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল তখন থেকে তাদের পরস্পরের যোগ এবং সান্নিধ্য থাকলেও, তারা উপলব্ধি ও আচরণবিধিতে বেশকিছু পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলত। কৌটিল্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কর্তব্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার বর্ণ, গৃহস্থ, শিক্ষার্থী অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ-অবলম্বনকারী এবং সংসারত্যাগী পরিব্রাজকদের (সন্ন্যাসী) কথা উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে প্রচলিত মনুর গ্রন্থে কিন্তু উপরোক্ত চার বর্ণ ছাড়া আরও বহু উপ বা সংকরবর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়—যে-সব সংকর-বর্ণের উল্লেখে নিম্নপর্যায়ের মানুষের অধিকারের সংকোচন এবং তাদের প্রতি অপ্রত্যক্ষ ঘৃণারও পরিচয় আছে। এইসব তথ্যের ভিত্তিতে বলা চলে যে বর্ত-মানে মনুর নামে প্রচলিত গ্রন্থ কৌটিল্যের আমলে বোধহয় প্রচলিত ছিল না ; কৌটিল্য মনুর যে গ্রন্থ দেখেছেন সেই গ্রন্থে পরে বহু সংযোজন হয়েছে। মনু এবং বৃহস্পতি উভয়েই বেদের প্রামাণিকতা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন ; কৌটিল্য লক্ষ্য করেছেন যে শুক্রাচার্য জীবনবিন্যাসে সমাজ ব্যবস্থার উপরই গুরুত্ব দিয়ে-ছেন, বেদের উল্লেখই করেননি।[২৬] ঋগ্বেদে এবং পরবর্তী বেদানুগামী সাহিত্যে ঋষি এবং রাজন্য ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণীর মানুষের তেমন কোন উল্লেখ বড় ছিল না, তাদের সামাজিক স্বীকৃতিও ছিল না। পুরুষসূক্তের 'পুরুষের' দেহের চার অংশ থেকে চার শ্রেণীর উদ্ভবের কাহিনী ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে আছে। তবে এই কাল্পনিক কাহিনী পরবর্তীকালে পরিকল্পিত সংযোজন একথা অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। ঋগ্বেদে 'বিশ' বা 'জন' শব্দের উল্লেখ থাকলেও বৈশ্য শব্দের প্রচলন নাই। 'বিশ' নামে পরিচিত জনগোষ্ঠীর যজ্ঞের অধিকার ছিল এমন তথ্য ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। এরা কী ধরনের আচার-অনুষ্ঠান পালন করত তারও কোন ইঙ্গিত বৈদিক সাহিত্যে নাই। কৌটিল্যই প্রথম বিস্তৃত-ভাবে এই বৈশ্য সম্প্রদায়ের কর্তব্য এবং অধিকারের উল্লেখ করেছেন ; যেখানে তাদের যজ্ঞের অধিকার আছে বলে বলা হয়েছে। এদের জীবিকা বলে উল্লেখ করা হয়েছে কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য। সেইসঙ্গে শূদ্র সম্বন্ধে বলা হয়েছে তারাও কৃষি, গরু, বাণিজ্যের অধিকারী। সেইসঙ্গে শিল্পী এবং 'কথাকারদের'ও শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (কারুকুশিলব কর্ম)।[২৭] কৌটিল্য যে উশনসের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে শুক্রনীতিসারের

যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে ; মনু ও বৃহস্পতি স্মৃতির সঙ্গে অনেক বিষয়ে শুক্রনীতির সাদৃশ্য থাকলেও শুক্রাচার্যের প্রবর্তিত নীতি বেশকিছু পরিমাণে অগ্রসর, বুদ্ধিদীপ্ত এবং উদার বলে প্রতীয়মান হয়। মনু এবং বৃহস্পতিতে বৈশ্য শ্রেণীর যজ্ঞের স্বীকৃতি থাকলেও তাদের তেমন স্বীকৃতি যে সমাজে ছিল না গীতার সেই বিখ্যাত শ্লোক—'মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ / স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্' থেকে উপলব্ধি করা যায়। সেইসঙ্গেই ব্রাহ্মণ ও রাজন্য সম্প্রদায়কে এখানে বলা হয়েছে পুণ্যজন্মা। (কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা / অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্—গীতা ৯।৩৩)। মর্ত্যলোকের উদ্ধার ও মুক্তির নিয়ন্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে গীতাকারেরা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে যে মনোভাবের পরিচয় এই দুই শ্লোকে সন্নিবদ্ধ করেছেন তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি অর্থবহ। গীতার প্রবর্তনকালে সেই সমাজে বেদোক্ত ঋষি বা ব্রাহ্মণ এবং রাজন্যই সমাজের যথার্থ স্বীকৃত শ্রেণী, পুণ্যজন্মা বলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই যুগে বৈশ্য, শূদ্র, এমনকি উচ্চতর দুই বর্ণের স্ত্রীলোকসহ সমস্ত স্ত্রীসম্প্রদায়কে পাপযোনিসম্ভূত বা নিম্নস্তরের বলে গণ্য করা হত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই দৃঢ়তার সঙ্গে প্রথম বলেছিলেন, তিনিই বর্ণচতুষ্টয়ের স্রষ্টা। গুণ ও কর্মের বিশিষ্টতায় তারা স্বতন্ত্র হলেও সকলেই তাঁরই সৃষ্টি এবং এই ভিত্তিতে মানুষমাত্রেই সমান। (চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ / তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্—গীতা ৪।১৩)। গীতার এই বাণী চাতুর্বর্ণ্যের অর্থাৎ বিভিন্ন কর্মে নিরত বিভিন্ন ধরনের উপাসনায় লিপ্ত মানুষের সাম্য ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার এক উল্লেখযোগ্য নির্দেশপত্র। এইখানেই ভগবান কৃষ্ণ বলছেন—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ / মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ—গীতা ৪।১১। যাঁরা যজ্ঞের মাধ্যমে দেবতার অর্চনা করেন না তাঁদের অর্চনাও সমানভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ অর্থাৎ অ-যজ্ঞবাদীদের উপাসনাকেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞবাদীদের উপাসনার সঙ্গে সমান বলে ঘোষণা করলেন। পাপযোনিজাত বলে যাদের অবজ্ঞা করা হত, ভগবান বাসুদেব ব্রাহ্মণ ও রাজন্যের সঙ্গে তাদেরও মুক্তির সমান অধিকারে অধিষ্ঠিত করলেন। সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠায় ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণের এই প্রয়াসকে সে-যুগের পরিপ্রেক্ষিতে যুগান্তকারী ও বৈপ্লবিক বলেই আখ্যাত করা যেতে পারে।

এখানে বৈশ্য ও শূদ্র নামে পরিচিত দুই সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া

প্রয়োজন। কারণ, এই দুই বর্ণের অন্তর্ভুক্ত বণিক ও শিল্পী সম্প্রদায়ের নানাভাবে নারায়ণ-বাসুদেব-বিষ্ণুর বিবর্তনে বিশেষ অবদান ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। বেদে 'বিশ' শব্দের বিস্তৃত ব্যবহার দেখা যায়; পরবর্তী যুগের বৈশ্য নামে পরিচিত এবং শূদ্র ঋষি ও রাজন্য থেকে স্বতন্ত্র সাধারণ শ্রেণীর মানুষের পরিচয়ে কোন উপজীবিকা বা ক্রিয়াকর্মের সুস্পষ্ট কোন উল্লেখ নাই। তবে বহু প্রকারের উপজীবিকা যেমন কৃষি, গোপালন, রথনির্মাণ, সূত্রধারের কাজ, স্বর্ণ, মণি ইত্যাদির গহনা প্রস্তুতি, বস্ত্রবয়ন ইত্যাদি বহুবিধ কর্মের উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে, যা থেকে উপলব্ধি করা যেতে পারে যে বিশ নামে জনগোষ্ঠী বলতে এই-সব কর্মে নিরত মানুষদেরই বোঝাত। শূদ্র শব্দের উল্লেখ তেমনভাবে ঋগ্বেদে নাই। অনেক পরবর্তী যুগে এক বিশিষ্ট শ্রেণীর মানুষকে শূদ্র আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছিল। সাধারণভাবে নানা শিল্প ও কারুকলার যারা অনুশীলন করত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তাদেরই শূদ্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মনুর গ্রন্থেও শিল্পী, বন্ধকী (সূত্রধার) ইত্যাদি শূদ্র আখ্যায় অভিহিত। বৈশ্য সম্প্রদায়ের জন-গোষ্ঠীর যজ্ঞ অনুষ্ঠানের স্বীকৃতি কৌটিল্যে দেখা গেলেও ভগবদ্গীতায় বৈশ্যদেরও শূদ্রদের মতোই পাপযোনিজাত বলে অভিহিত করা হয়েছে। গীতা নিশ্চিতভাবেই কৌটিল্য অপেক্ষা প্রাচীনকালের রচনা, যখন বৈশ্যেরও যজ্ঞকর্মে স্বীকৃতি ছিল না; ঋগ্বেদে বৈশ্যের যজ্ঞ অনুষ্ঠানের কোন সংবাদ নাই। শূদ্রের অবশ্য যজ্ঞ অনুষ্ঠানে স্বীকৃতি রক্ষণশীল সমাজ কখনও দেয়নি। শূদ্রের উৎপত্তি ও অধিকার সম্পর্কে পণ্ডিত রামশরণ শর্মার বিস্তৃত গবেষণা আছে। গ্রীক লেখক দিওদোরাস-এর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শর্মা দেখিয়েছেন যে, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালে Sodrai নামে একটি জাতি আলেকজাণ্ডারকে প্রবলভাবে বাধাদান করেছিল। শোদ্রাই নামে জাতি দিওদোরাস-এর মতে বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধু অঞ্চলে বাস করত এবং সেইখানেই তারা গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারকে প্রতিরোধ করেছিল। অথর্ববেদের মতে শূদ্ররা ছিল মহাবৃষ, মুজবন্ত এবং বহ্লীকদের প্রতিবেশী (অথর্ব—৫।২২।৭)। বেদমন্ত্রের রচয়িতাদের সঙ্গে শূদ্র, বহ্লীক এবং মুজবন্তদের সৌহার্দ্য ছিল না। বরং অথর্ববেদের ঐ মন্ত্রে জ্বরকে বহ্লীক এবং মুজবন্তদের পীড়নে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। বিশেষ করে জ্বরকে অনুরোধ করা হচ্ছে শূদ্ররমণীদের বেশকিছু পরিমাণে নির্যাতিত করতে।[২৮] খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের গ্রীক ভূগোল রচয়িতা টলেমি শোদ্রাইদের আফগানিস্তানের

অন্তর্ভুক্ত আরাকোশিয়া অঞ্চল থেকে সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত অঞ্চলে থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। আলেকজাণ্ডারের প্রতিরোধকারী শোদ্রাইরা সিন্ধুদেশে বাস করত।[২৯] বহ্লীক ও মুজবন্তদের সঙ্গে তারা আফগানিস্তানেও উপনিবিষ্ট ছিল। অথর্ববেদের যুগে কিংবা ছান্দোগ্য উপনিষদে যেখানে ঋষি রেকব ও রাজা জনশ্রুতির কাহিনীতে জনশ্রুতিকে শূদ্র বলে অভিহিত করা হয়েছে তা থেকে মনে হয় শূদ্র নামে পরিচিত এই বিশিষ্ট জনগোষ্ঠী, মূলত সিন্ধু অঞ্চল থেকে পশ্চিমে বাল্‌খ ও বৃষজন (আরাকোশিয়া) অঞ্চলে এবং পূর্বে ভারতের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঋগ্বেদের যুগে এরা ঋগ্বেদের ঋষি ও রাজন্যবর্গের অধ্যুষিত অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে নাই। পরেও দীর্ঘকাল এরা সম্ভবত তাদের সেই পূর্বতন অবস্থান, সিন্ধু অঞ্চল থেকে মূল ভারতভূখণ্ডে প্রবেশ করে নাই। হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কারের পরে সিন্ধু অববাহিকায় যে উচ্চস্তরের সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে সেখানে বণিক ও শিল্পজীবী বহু জনগোষ্ঠীর সমাবেশ ছিল সে-কথা প্রমাণিত হয়েছে। কৌটিল্য এবং মনু নিশ্চিতভাবেই শিল্পজীবীদের শূদ্র বলে অভিহিত করেছেন। বৈদিক সমাজের বহির্ভূত এই শূদ্র নামে পরিচিত জনগোষ্ঠী মূলত সিন্ধু অববাহিকতেই বসবাস করত; আলেকজাণ্ডারের প্রবল সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে যে-সব জাতিগোষ্ঠী দৃঢ় প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল শূদ্রজাতির কথা তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে। রামশরণ শর্মা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অম্বষ্ঠদের উল্লেখ পেয়েছেন, যে-অম্বষ্ঠদের উল্লেখ শূদ্রদের সঙ্গেও পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উল্লেখের যুক্তিতেই অধ্যাপক শর্মা শূদ্রদের খ্রীস্টপূর্ব দশম শতকে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। অ-যজ্ঞবাদী এই ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী এককালে অত্যন্ত প্রতাপান্বিত ও শক্তিশালী ছিল, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পরে নিজস্ব মূল বাসস্থান সিন্ধু উপত্যকা পরিহার করে নানা কারণে যখন দৃঢ়বদ্ধ যজ্ঞবাদীদের অধ্যুষিত অঞ্চলে এসে উপনিবেশ স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিল তখনই ভাগ্যবিড়ম্বিত শূদ্র জনগোষ্ঠীকে রক্ষণশীল যজ্ঞবাদী সমাজের নিকট নতিস্বীকার করতে হয়েছিল। এই নূতন পরিবেশে তারা কোন স্বীকৃতি বা অধিকারলাভ করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু নানা উপজীবিকায় তাদের কৃতিত্ব এবং পারঙ্গমতা স্বীকৃত হয়েছিল—বিশেষ করে শিল্পী এবং কারুবিদ্‌ হিসেবে। এই দুই বিশেষ ধরনের কাজে তাদের কৃতিত্ব থাকায় এই নূতন পরিবেশেও তাদের জীবিকা অর্জনে বা প্রতিষ্ঠালাভে তেমন কোন প্রতিবন্ধকতা হয় নাই।

যে দুই শ্রেণীকে ভগবান বাসুদেব সমানাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস করেছিলেন সেই বৈশ্য ও শূদ্র সম্প্রদায় সমাজে কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিলেন না—যে অর্থসম্পদকে কৌটিল্য মনুষ্যজীবনের সফলতার সর্বপ্রধান উপায় বলে গণ্য করেছেন, সেই অর্থসম্পদ সৃষ্টি ও বণ্টনের প্রধান দায়িত্বও এই দুই শ্রেণীর মানুষের দ্বারাই সাধিত হত। শ্রেণী হিসাবেও এই দুই শ্রেণী বিশেষ সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী ছিল। এদের সংগঠনগুলি 'সংঘভৃতাঃ' নামে পরিচিত ছিল, কৌটিল্যের রচনায় তার উল্লেখ আছে।[৩০] কারুশিল্পী এবং পণ্যাজীবীদেরও এখানে বিস্তৃত উল্লেখ আছে, যা থেকে সমাজে তাদের প্রভাবের প্রমাণ মেলে। স্বর্ণকাব, মণিকার, তন্তুবায়, রজক ইত্যাদি কারুশিল্পীদেরও উল্লেখ কৌটিল্যের রচনায় বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। কারুশিল্পীদের সংঘকে বলা হত শ্রেণী।[৩১] বংশানুক্রমে যারা সেই কারু অনুশীলন করত তাদেরই বিভিন্ন শ্রেণীতে স্থান হত। তবে অন্য বংশোদ্ভব ব্যক্তিরাও কখনও কখনও ভিন্ন শ্রেণীতে গৃহীত হতে পারত। বিভিন্ন জাতকের কাহিনীতে এইধরনের জীবিকা পরিবর্তনের উল্লেখ আছে। একটি জাতকের গল্পে উল্লেখ আছে যে, এক ব্রাহ্মণকে বদ্ধকী বা কাঠের মিস্ত্রির শ্রেণীতে প্রবেশ করতে হয়েছিল[৩২]। জাতকের আখ্যানগুলিতে বহু জীবিকা অনুসরণকারী সাধারণ মানুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ শিল্পকেন্দ্রের স্তূপ এবং স্তূপপ্রাচীরে উৎকীর্ণ লিপিগুলিতেও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা জীবিকা অবলম্বনকারী মানুষের উল্লেখ আছে। এইসব লিপির মধ্যে মধ্যপ্রদেশের সাঁচীর তোরণে উৎকীর্ণ বিদিশার গজদন্তশিল্পী শ্রেণীর লিপিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সাঁচীর মহাস্তূপের দক্ষিণের তোরণটি বিদিশার গজদন্ত-শিল্পীদের সংঘের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই শিলাখোদিত চিত্রায়নে দৃশ্যসংস্থানের চিত্রবিন্যাসে, চিত্রে রূপায়িত নরনারীর দেহগঠনে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লালিত্যে, ভঙ্গী ও গতিপ্রবণতায় যে অনতিক্রমণীয় সৌকুমার্য ও বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় তার সঙ্গে সবিশেষ লালিত্যপূর্ণ গজদন্ত শিল্পের অত্যন্ত নিকট সাদৃশ্য লক্ষ্য না করে পারা যায় না। খোদাই-করা চিত্রবিন্যাসের ক্ষেত্রে কাঠ, গজদন্ত, প্রস্তর, ধাতু, পোড়ামাটি—প্রত্যেকটি উপকরণের ক্ষেত্রেই উপকরণের পার্থক্য শিল্পের বিন্যাসকৌশলের তারতম্য ঘটায়। এই তারতম্য থাকলেও ভিন্ন ভিন্ন শিল্পের রূপকর্মে শিল্পীর এবং সমাজ-মানসের যে প্রতিবিম্ব রূপায়িত হয়, সমাজ সম্পর্কে কিছু জানতে হলে, সেই শিল্পপ্রকরণকে

সমাজের দর্পণ বলে গণ্য করা চলে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে এই শিল্পীসমাজের ব্যাপক অস্তিত্ব ও তাদের শ্রেণী-সংঘের সম্বন্ধে কৌটিল্যের রচনায় এবং জাতকগুলিতে বিস্তৃত সংবাদ থাকলেও এই শিল্পীগোষ্ঠীকে কৌটিল্য শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলেই অভিহিত করে গিয়েছেন। গীতায় গোরক্ষা, কৃষি এবং বাণিজ্যকে বৈশ্যদের বৃত্তি এবং একমাত্র পরিচর্যাকে শূদ্রের বৃত্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বৃত্তিতে অধিকারদানে কৌটিল্যের যুগ অনেক অগ্রসর ও উদার। কৌটিল্যের মতে বৈশ্যরা কৃষি, গো-রক্ষা, বাণিজ্য ছাড়া যজ্ঞকর্মেরও অধিকারী আর কৌটিল্য শূদ্রদের দ্বিজাতির পরিচর্যা ছাড়া কৃষি, গো-রক্ষা এবং বাণিজ্যেরও অধিকারী বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৩] সেইসঙ্গে কৌটিল্য কারুশিল্পী এবং কুশীলবদেরও (অর্থাৎ কথাজীবী) শূদ্রবর্ণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারু-শিল্পীদের পুরাণে বিশ্বকর্মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৪] বিশ্বকর্মাই শিল্পকলার প্রবর্তক আর এই শিল্পকলার আশ্রয়ে যারা জীবিকা অর্জন করত তারা ছিল বিশ্বকর্মা প্রবর্তিত কারুকৌশলেরই অনুগামী। পুরাণে যেমন বিশ্ব-কর্মাকে অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন্য, ত্বষ্টা ও রুদ্রের পিতা বলা হয়েছে, ঋগ্বেদেও তেমনি ত্বষ্টাকে বলা হয়েছে বিশ্বরূপ। তাঁকে আবার ত্রিশির-বিশ্বরূপ আখ্যায় অসুরের পিতা 'বল' নামেও অভিহিত করা হয়েছে। ঋগ্বেদে বর্ণিত ত্বষ্টৃ-বিশ্বরূপ এবং ত্রি-শির বিশ্বরূপ ছিলেন পারঙ্গম রূপকর্তা ও শিল্পী। ত্বষ্টৃ ও ত্রি-শির বিশ্বরূপের মাধ্যমে যে শিল্পবিদ্যার প্রবর্তন হয়েছিল, সেই শিল্পবিদ্যার অনুসরণ-কারীদের সঙ্গে ইন্দ্রের অনুগামী সমাজের কোন সৌহার্দ্য ছিল না, বরং বিবাদ এবং বিরোধই ছিল প্রবল।

শিল্পকর্ম মানুষের এক অত্যন্ত উচ্চস্তরের সাধনা ও প্রজ্ঞালব্ধ কৌশল। পরবর্তী শাস্ত্রে শিল্পকে মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকলেও শিল্পী শ্রেণী সমাজে কেন তেমন স্বীকৃতি পায়নি, শূদ্রপর্যায় থেকে উচ্চতর ধাপে উন্নীত হতে পারেনি, তার কারণ হয়ত সেই অতীত যুগে শিল্পী শ্রেণীর সঙ্গে ইন্দ্র ও ইন্দ্রানুগামীদের দ্বন্দ্ব-বিরোধের মধ্যে নিহিত ছিল। স্থপতি, পূর্তবিদ্, রূপশিল্পী ও কারিগর সম্প্রদায় ছাড়া অন্য যে সম্প্রদায়কে যজ্ঞপন্থী দেবপূজকেরা স্বসমাজে গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন সম্পদসৃষ্টিকারী বণিক, মূল্যবান ধাতুকে বিনিময়-মুদ্রায় রূপান্তরকারী সার্থবাহ ও শ্রেষ্ঠী শ্রেণী। যজ্ঞবাদীদের শিল্পী শ্রেণীর উপর তেমন নির্ভরশীলতা না থাকলেও এই বণিক ও শ্রেষ্ঠী শ্রেণীকে অবজ্ঞা করা

ব্রাহ্মণ, বিশেষ করে রাজন্যবর্গের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। গ্রামনির্ভর সমাজ যখন বিস্তৃতিলাভ করতে থাকে তখনই বৃদ্ধি পেতে থাকে অর্থসম্পদের প্রয়োজনীয়তা। অর্থসম্পদসৃষ্টিতে এই বণিক এবং শ্রেষ্ঠী শ্রেণীই ছিল অগ্রণী। হরপ্পার নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতার বিস্তার ও বিবর্ধনে এই বাণিজ্যসম্ভূত আর্থিক সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের পরিচয় আছে। প্রতিবেশী সুমের, ব্যাবিলনিয়া এবং সম্ভবত মিশরের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন হরপ্পার অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে দৃঢ় ও বিস্তৃত করেছিল। কেবলমাত্র গ্রামজাত কৃষি ও গোসম্পদের দ্বারা হরপ্পার মতো সভ্যতাকে, হরপ্পার নগরসমূহের স্থাপত্য, পূর্তকৌশল এবং সূক্ষ্ম কারুকলার পোষণ সম্ভবপর ছিল না। ঋগ্বেদের বর্ণনায় শত্রুপক্ষ অহি বা বৃত্রের এবং যাতুধানদের অসংখ্য পুর ও অর্থসামর্থ্যের পরিচয় থাকলেও ঋষি ও রাজন্য গঠিত ঋগ্বেদের সভ্যতায় অনুরূপ পুর বা আর্থিক সমৃদ্ধির উল্লেখ বা পরিচয় নাই। রামায়ণে বর্ণিত রাক্ষসদের সঙ্গে রামচন্দ্রের সংঘর্ষের বহু পরে রচিত হয়ে থাকলেও বর্তমানে প্রচলিত সংস্কৃত রামায়ণে রামচন্দ্রের রাজধানী অযোধ্যার যে বর্ণনা পাওয়া যায় রাবণের লঙ্কার তুলনায় তা একান্তই অনগ্রসর এবং নিষ্প্রভ। মহাভারতের হস্তিনাপুরের বর্ণনায় তেমন জৌলুস নাই কিন্তু পাণ্ডবদের আমন্ত্রণে দানব পূর্তবিদ্ ও স্থপতি 'ময' ইন্দ্রপ্রস্থে যে নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার বর্ণনা ব্যাপক স্থাপত্যচেতনার পরিচয় দেয়। এই নূতন নগরী প্রতিষ্ঠার পেছনে যথেষ্ট ধনসম্পদের প্রয়োজন হয়েছিল এবং সেই ধন যক্ষরাজ কুবেরের নিকট থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। স্বভাবতই উপলব্ধি করা যায় যে যক্ষরাই ছিল ধন-সম্পদের অধিকারী। এই যক্ষ সম্প্রদায় রাক্ষস নামে পরিচিত অগ্রসর সভ্যতা ও অর্থসামর্থ্যের অধিকারীদেরই স্বগোত্র। জ্যেষ্ঠ হলেও যক্ষপতি বৈশ্রবণকে কনিষ্ঠ রাবণের নিকট নতিস্বীকার করে লঙ্কাপুরী ত্যাগ করে সরে আসতে হয়েছিল। রাক্ষস বা যাতুধানদের সঙ্গে যজ্ঞপন্থীদের প্রবল বিরোধ থাকলেও যক্ষরাজ বৈশ্রবণ মনে হয় যজ্ঞপন্থীদের সঙ্গে একটা সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন, যার ফলশ্রুতি লক্ষ্য করা যায় দেবসমাজে বৈশ্রবণের বিত্তেশ নামে স্বীকৃতিতে। (রুদ্রাণাং শংকরশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্—গীতা ১০।২৩)। এই বিত্তশালী যক্ষরা কিন্তু যজ্ঞবাদী দেবপূজক সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটা সহাবস্থানে এসে থাকলেও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেয় নাই। ভারতের বিভিন্ন প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ থেকে অসংখ্য পোড়ামাটির মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, যে-সব

মূর্তিকে যক্ষ-যক্ষিণীর মূর্তি নামে অভিহিত করা হয়েছে। এইসব মূর্তির যক্ষ-পরিচয়ের পেছনে আছে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের ভারহুত স্তূপ বেষ্টনীর স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ, প্রমাণ আকৃতির, প্রভূত অলঙ্কারে সজ্জিত নরনারীর মূর্তির যক্ষ-যক্ষিণী পরিচয়জ্ঞাপক লিপি। খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতক ও খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের বলে গণ্য অনুরূপ বেশ কয়েকটি একক দাঁড়ানো পাথরের মূর্তি পাটনা, দিদারগঞ্জ, মথুরা, গোয়ালিয়র ইত্যাদি স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটিতে মূর্তির পরিচয়সূচক 'মণিভদ্র যক্ষ' ইত্যাদি লিপি দেখতে পাওয়া যায়। ভারহুতের স্তূপপ্রাচীরে যক্ষ-যক্ষিণী মূর্তি ভিন্ন কিছু নাগফণা-শোভিত নরনারীর মূর্তির নাগ পরিচয়ব্যঞ্জক লিপি ও সাধারণ কিছু নরনারী মূর্তির দেবতা পরিচয়সূচক লিপিও লক্ষ্য করা যায়। স্তূপের প্রাচীরে এই তিন শ্রেণীর নরনারীকে ভগবান বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীলরূপে দেখানো হয়েছে। অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে সমাজে যে-সব শ্রেণীর মানুষের নিকট এইসব যক্ষ-যক্ষিণী, নাগ ও দেবতা উপাস্যরূপে গণ্য হতেন সেইসব সম্প্রদায়ের লোকেরাই ভগবান বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগবশত তারা যাঁদের উপাসনা করত সেইসব দেবতাদের ভগবান বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীলরূপে স্তূপপ্রাচীরে সন্নিবিষ্ট করেছিল। ভগবান বুদ্ধ যখন তাঁর করুণা ও মুক্তির বাণী প্রচারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তখন এই তিন শ্রেণীর নরনারীই সমাজে প্রাধান্যসম্পন্ন বলে গণ্য হত।

রামায়ণ এবং মহাভারতের বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে বেদানুগামী জনগোষ্ঠী অপেক্ষা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী অবৈদিক নাগ-দানব ও যক্ষ-রাক্ষসেরা ঐশ্বর্যসম্পদ এবং শক্তিসামর্থ্যে কম প্রাধান্যসম্পন্ন ছিল না। এই দুই গ্রন্থে সমাজজীবনের যে পরিচয় সন্নিবদ্ধ আছে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এবং বৌদ্ধ জাতক-কাহিনীগুলিতে যেন সেই সমাজাচত্রেরই প্রতিফলন ঘটেছে। সুপ্রাচীন বৈদিক পরিবেশ থেকে এই সমাজে উত্তরণের পশ্চাতে ছিল এক বহুবিস্তৃত কালব্যাপী, ভারতের অভ্যন্তরস্থ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে, ভিন্ন ভিন্ন সাধনপথ এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন বহু বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রসারলাভ। স্বাভাবিক নানা কারণেই এইসব বিচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বপরায়ণ জনগোষ্ঠীসমূহকে সহাবস্থানে স্বীকৃত হতে হয়েছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে সমন্বয় এবং সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টিতে ভগবান কৃষ্ণ-বাসুদেবের যে একটা অতুলনীয় ভূমিকা ছিল সে-তথ্য তেমনভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই।

নির্দেশিকা

১. বিষ্ণুপুরাণ, ১।১৩:৩।
২. ভাগবত পুরাণ, ৬।৩:১৮।
৩. ঋগ্বেদ, ১।১৮৮:৯, ৮।৯১.৮; ১০।১৮:১-৪।
৪. মহাভারত, ১।৬৬:২।
৫. ঐ, ১৩।১৭:১০৩।
৬. ঋগ্বেদ, ১০।৬৬:১১।
৭. তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১।২:৮।
৮. যাস্ক, নিরুক্ত, ১২।২৯।
৯. ঋগ্বেদ, ৪।১১:১।
১০. ঐ, ৭।৩৪.১৬।
১১. ঐ, ১।৮৫.৯; ৩।৫৪:১২, ১০।৫৩:৯।
১২. ঐ, ৫।৩১.৪।
১৩. ঐ, ১।১৮৮:৯; ৮।৯০:৮; অথর্ববেদ, ২।২৬:১; শতপথ ব্রাহ্মণ, ১১।৪।৩:৩।
১৪. ঋগ্বেদ, ১০।১৭:১-২।
১৫. ঐ, ২।১৮:১৯।
১৬. Macdonell, A. A., Vedic Mythology, p. 57; 116.
১৭. তৈত্তিরীয় সংহিতা, ২।৪।১২-১।
১৮. শতপথ ব্রাহ্মণ, ১।৬।৩:৬।
১৯. ঋগ্বেদ, ৩।৫৫:১৯; ১০।১০.৫।
২০. ঐ, ৪।১৮.১২।
২১. Macdonell, A. A., Vedic Mythology, p. 57.
২২. ভাগবত পুরাণ, ৭।৯:৩।
২৩. ঐ, ষষ্ঠ স্কন্ধে সপ্তম থেকে একাদশ অধ্যায়।
২৪. Benveniste, E., et Renou, L., Vritra et Vritragna (Paris, 1936)
২৫. Samasastri, R., Kautilya's Arthasastra, (Bangalore, 1915), pp. 113f.
২৬. ঐ, পৃ. ৬।
২৭. অর্থশাস্ত্র, ৩।১৩-১৪।
২৮. Whitney, W. D., Atharvaveda, p. 250.
২৯. Ptolemy, Geography, 6|20|3.
৩০. Samasastri, R., op. cit., p. 235.
৩১. ibid, p. 253.
৩২. জাতক, ৪৭৫।
৩৩. Samasastri, R., op. cit., p. 7.
৩৪. বিষ্ণুপুরাণ, ১।১৫।১২১।

১৩

সরস্বতী থেকে গঙ্গা

সুপ্রাচীনকাল থেকে ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভকাল পর্যন্ত ভারতের সমাজদেহ যেভাবে গড়ে উঠেছিল তারই কিছু রূপচিত্র পূর্বগামী আলোচনায় তুলে ধরা হয়েছে। বহুযুগ ধরে সংঘটিত সমাজদেহের বিবর্তনে যে-সব ঘটনা এবং উপলব্ধি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, এরপর সে সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

ভাবতীয় তত্ত্বচিন্তা এবং সমাজমানসের একটি সুসংহত রূপের সন্ধান মহাভারত গ্রন্থেই প্রথম সন্নিবদ্ধ হয়েছে বলা যেতে পারে। দক্ষিণে কূলহীন সমুদ্র, উত্তরে উত্তুঙ্গ হিমালয়, মহিমময় এই দুই সীমারেখা দ্বারা প্রকৃতিই এই বৃহৎ উপমহাদেশের অখণ্ডতা সুনির্দিষ্ট করেছেন (উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্ / বর্ষং যৎ ভারত নাম ভারতী যস্য সন্ততি—বিষ্ণুপুরাণ)। অসংখ্য নদ-নদী, মরু-পর্বত, অরণ্য-কান্তারে সমাবৃত এই দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যেও বৈচিত্র্য এবং বিচ্ছিন্নতার কিছু অভাব নাই। যুগ যুগ ধরে এই জনমণ্ডলীর মধ্যে বহু বিচিত্র চিন্তা, চেতনা, কর্ম এবং সাধনধারার উদ্ভব ঘটেছে। অসংখ্য সেইসব চিন্তা-চেতনাকে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে উপলব্ধি দিয়ে মহাভারতে প্রজ্ঞা এবং সহিষ্ণুতায় সমৃদ্ধ একটি অখণ্ড ভারতীয় মহাজাতি সংগঠনের নির্দেশ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। আর সেই মহাভারত-চেতনার ক্রিয়াশীল কর্ণধাররূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ভগবান কৃষ্ণ-বাসুদেবের অনন্য দৈবী সত্তাকে।

এই উপমহাদেশের 'ভারত' নাম কবে থেকে প্রচলিত হয়েছে, এখন সেকথা নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়। ঋগ্বেদে 'ভরত' শব্দের উল্লেখ আছে একটি জাতিগোষ্ঠীর নাম হিসেবে; সেইসঙ্গে দেব-নদী সরস্বতীর 'ভারতী' নামে উল্লেখের কথাও বলা যেতে পারে। বৈদিক জনগোষ্ঠীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী, মাতা সরস্বতীর যে সূত্রে 'ভারতী' নামের প্রচলন হয়েছিল, সেই সূত্র থেকেই এই উপমহাদেশের ভারত নামে পরিচয় ঘটে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে, পুরু-বংশের অন্যতম অধিপতি, দুষ্মন্তের পুত্র রাজচক্রবর্তী ভরত গঙ্গার উপকূলে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। ভরতের এই যজ্ঞের কাহিনী মহাভারতেও

আছে। এই যজ্ঞে ভরতের পুরোহিত ছিলেন ঋষি দীর্ঘতমা, যাঁর উল্লেখ ঋগ্বেদেও পাওয়া যায় (ঋগ্বেদ ১।১৪০-১৫৬)। প্রাচীন বৈদিক রাজন্যদের মধ্যে ভরতই প্রথম গঙ্গাপ্রবাহের দিকে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত করেছিলেন। ভরতের দ্বারা গঙ্গার উপকূলের দিকে আধিপত্য সম্প্রসারিত করার প্রয়াসকে ইতিহাস বিবর্তনের দিক থেকে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে গণ্য করা যেতে পারে।[১] ভারতের সংস্কৃতিতে পুণ্যতোয়া গঙ্গার একটি বিশেষ স্থান থাকলেও গঙ্গার উল্লেখ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে একবার ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গেই স্মরণ করা যেতে পারে যে বৈদিক মন্ত্রসমূহের সংকলনের কৃতিত্ব যাঁকে অর্পণ করা হয় সেই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, যমুনা নদীর একটি দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যে যমুনা গঙ্গার অন্যতম শাখানদী। এইসব তথ্যের উপর ভিত্তি করে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে বৈদিক সংস্কৃতির বাহকেরা যখন সরস্বতী উপকূল ত্যাগ করে গঙ্গা নদীর উপত্যকা অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে-ছিলেন, ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি তার পরেই সংহিতার আকারে সংকলিত হয়। ঋগ্বেদের অন্তিম অংশরূপে পরিচিত দশম মণ্ডলের মন্ত্রগুলি সংকলিত হওয়ার পূর্বে বৈদিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে গঙ্গা নদীর তেমন কোন পরিচয় ছিল না।

ইক্ষ্বাকু বংশের অধিপতি মহামতি ভগীরথ কপিলমুনির ক্রোধে ভস্মীভূত তাঁর পূর্বপুরুষদের পারলৌকিক মুক্তিবিধানকল্পে বহু তপস্যার দ্বারা ভগবতী গঙ্গাকে মর্ত্যলোকে প্রবাহিত করেছিলেন, এই কাহিনী সারা ভারতবর্ষে সুবিদিত। দেবী এবং মাতারূপে পরিচিত সরস্বতীই ছিলেন বৈদিক সংস্কৃতির ধাত্রী। সেই সরস্বতীর প্রবাহ যখন বিলুপ্তির পথে তখনই গঙ্গার অভ্যুদয় ঘটেছিল, যার ফলে সরস্বতীর আশ্রয় পরিত্যাগ করে বেদানুগামী জনগোষ্ঠী গঙ্গা উপকূলে আশ্রয় নিতে সক্ষম হয়েছিল। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে হস্তিনাপুরে ভরতের রাজধানী ছিল।[২] পুরাণ কাহিনীতে ভরতের বংশধর হস্তী গঙ্গাতীরে হস্তিনাপুর নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই তথ্যের উল্লেখ আছে। এইসব তথ্য থেকে মনে হয় চক্রবর্তী ভরত গঙ্গার উপকূলে যেখানে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন শেষপর্যন্ত কৌরবদের সেইখানেই নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। মহাভারতে গঙ্গা আনয়ন কাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে (৩।১০৭-১০৯)। ভারতে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাসে ভগীরথের এই গঙ্গা আনয়ন কাহিনীকে কাল্পনিক আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে, ঐতিহাসিক কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় নাই।

পার্জিটার বলেছেন—After him the Ganges was called Bhagirathi, because he is fabled to have brought it down (from heaven)[৩]। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি যে বেদানুগামীদের ভারতের অভ্যন্তরীণ ভূখণ্ডে আসার পূর্বে সংকলিত হয় নাই এই তথ্য সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। ওয়েবার এ সম্বন্ধে বলেছেন : although the songs of the Rik, or the majority of them were composed on the banks of the Indus (?) their final composition and arrangement could only have taken place in India proper[৪]। গঙ্গার ধারাকে প্রবাহিত করে আনবার কাহিনীর যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকা অসম্ভব নয়, উইলিয়াম উইলকক্স নামে ঔপনিবেশিক শাসনকালের একজন ইংরাজ পূর্তবিজ্ঞানী এই তথ্য পণ্ডিতমহলে উপস্থিত করেছিলেন।[৪ক] গঙ্গা আনয়ন কাহিনীর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি বিচার করতে গেলে সুদূর অতীতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করা প্রয়োজন। সুদূর অতীতে এক সময়ে উত্তরে হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল অনন্ত জলরাশিতে নিমগ্ন ছিল, ভূবিজ্ঞানীদের মধ্যে এইধরনের একটি মত প্রচলিত আছে। বেদ সম্পর্কে গবেষণাকারীদের মধ্যে অধ্যাপক অবিনাশচন্দ্র দাস অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে ঋগ্বেদে পূর্ব সমুদ্র নামে যে সমুদ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, হিমালয়-বিন্ধ্য অন্তর্বর্তী বিস্তৃত জলরাশিই ছিল সেই পূর্ব সমুদ্র (—there is also the clearest mention of the existence of an eastern sea (Purva Samudra) in the Rigveda ;—this sea could not have been the Bay of Bengal)।[৫] অধ্যাপক দাস তাঁর এই মতের সমর্থনে প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ ডি. এন. ওয়াদিয়ার যুক্তিপূর্ণ অভিমতের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। অধ্যাপক দাসের দ্বারা ঋগ্বেদে বর্ণিত পূর্ব সমুদ্র সম্পর্কিত অভিমত বৈদিক ইতিহাসের গবেষকদের নিকট বিবেচনার যোগ্য বলে গণ্য হয় নাই। কারণ, এই অভিমত যুক্তিভিত্তিক বলে গৃহীত হলে বেদের উদ্ভবকাল এবং সেইসঙ্গে বৈদিক সভ্যতা সম্বন্ধে সযত্ন পরিকল্পিত অনেক সিদ্ধান্তেরই সমাধির সম্ভাবনা ঘটে। ওয়াদিয়ার রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অধ্যাপক দাস অভিমত প্রকাশ করেছেন যে হিমালয় ও বিন্ধ্যের অন্তর্বর্তী এই সমুদ্র (Pleistocene sea) 'was gradually filled up by the waste of the high lands and the alluvium brought down by the Himalayan rivers and the two

large rivers of Central India, viz. the Sone and the Chambal'.[৬] বেদের মন্ত্ররচয়িতারা একাধিক মন্ত্রে পূর্ব সমুদ্র থেকে সূর্যের উদয় হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। বহু সহস্র বৎসর পূর্বে যখন হিমালয় ও বিন্ধ্যের অন্তর্বর্তী অঞ্চল জলমগ্ন ছিল, বৈদিক জনগোষ্ঠী যদি সেই সমুদ্র দেখে থাকেন তবে খ্রীস্ট-জন্মের সামান্য এক বা দেড় হাজার বৎসর পূর্বে তথাকথিত আর্যজাতির ভারতে অনুপ্রবেশভিত্তিক সুপরিকল্পিত অভিমতের কোন ভিত্তি থাকে না। ওয়াদিয়া অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এই অঞ্চল হিমালয় এবং বিন্ধ্য থেকে আনীত উদ্ভিজ্জ এবং মৃত্তিকার দ্বারা ক্রমে ভরাট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রতিবৎসর বর্ষা-কালে বৃষ্টির সঞ্চিত জলের নিষ্কাশনের কোন পথ না থাকায় এই অঞ্চল একসময় বিস্তৃত জলাভূমি আর ঘন অরণ্যে সমাবৃত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় এখানে মনুষ্য-বসতি হতে পারে নাই, যার ফলে বৈদিক চেতনায় এই অঞ্চলে বসতির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। একটি প্রশস্ত পরিখা খনন করে ঐ আবদ্ধ জলরাশিকে পূর্বে কপিল মুনির আশ্রম-সান্নিধ্যে সাগরে প্রবাহিত হওয়ার পথ করে দিয়ে পুণ্যশ্লোক ভগীরথ শাপগ্রস্ত পূর্বপুরুষদেরই শুধু উদ্ধারসাধন করেন নাই, জলাকীর্ণ এবং অরণ্য-সমাকুল সেই বিস্তৃত অঞ্চলকে জনবসতির উপযোগী করে এক নূতন সভ্যতার অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নের যুক্তিযুক্ততা প্রতিষ্ঠার জন্য বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণ অত্যন্ত প্রয়োজন।

মনুষ্য-বসবাসের পক্ষে নির্ভরযোগ্য এবং চলাচলের পক্ষে সুগম হয়ে উঠবার পরেই এই অঞ্চলে উপনিবেশ-স্থাপনকারীদের প্রবেশ ঘটতে থাকে এবং বেদানুগামী জনগোষ্ঠী বহুসংখ্যায় এখানে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে। ক্রমে এই গাঙ্গেয় অঞ্চলই যজ্ঞপন্থীদের পুণ্যভূমি এবং একমাত্র পবিত্র বাসস্থান-রূপে পরিগণিত হয়ে উঠেছিল। মনুসংহিতায় একস্থানে সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের অভ্যন্তরবর্তী অঞ্চলকেই বৈদিক জনমণ্ডলীর পুণ্যবাসভূমিরূপে বর্ণনা করা হয়েছিল (২।১৭)। আবার তার কিছু পরেই এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বতের দ্বারা সীমিত যে অঞ্চলে কৃষ্ণসার মৃগ নির্ভয়ে বিচরণ করে বেড়ায় সেই ভূখণ্ডই যজ্ঞকর্মের জন্য সুপ্রশস্ত এবং আর্য-জনমণ্ডলীর পবিত্র আবাসভূমি আর্যাবর্ত (২।২১-২৩)। আর্যাবর্ত ভূমি সম্পর্কে মনুর এই গভীর আবেগপ্রবণতা থেকে এই ভূখণ্ডই যে একসময় মনুর অনুমোদিত

যজ্ঞীয় সমাজের উপযুক্ত আবাসভূমি বলে ধার্য হয়েছিল এই তথ্য উপলব্ধি করা যায়। সিন্ধু-সরস্বতী অঞ্চল থেকে বহুসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে কেন এই গাঙ্গেয় উপত্যকায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছিল তার কারণ সম্পর্কে বেদ নিয়ে গবেষণাকারী বিভিন্ন পণ্ডিতের মধ্যে ঔৎসুক্য কম প্রকাশ পায় নাই।

ওয়েবার এ সম্পর্কে বলেছেন—What it was that led to the emigration of the people in such masses from the Indus across the Sarasvati towards the Ganges, what was the principal cause ? Was it pressure brought about by arrival of new settlers ? Was it excess of population ? Or was it only the longing for the beautiful tracts of Hindusthan ? Or perhaps all these causes combined.[৭] জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত চাপ নিশ্চিতই ছিল। কিন্তু একদিকে সরস্বতী-প্রবাহের বিলোপ এবং অন্যদিকে পুণ্যতোয়া স্রোতস্বতী গঙ্গার সৃষ্টিতে বিস্তৃত আর্যাবর্ত অঞ্চল বসবাসের পক্ষে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠার ফলেই সরস্বতী-নির্ভর জনমণ্ডলী গঙ্গার আশ্রয়ে সরে এসে নূতন বাসস্থান নির্মাণ এবং নূতন সংস্কৃতির পত্তন করেছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সিন্ধু অববাহিকা নির্ভর জনমণ্ডলীর পক্ষে এত বিপুল সংখ্যায় বাসস্থান পরিত্যাগ করবার কারণ হয়ত তখনও দেখা দেয় নাই। কিন্তু সিন্ধুনির্ভর জনগোষ্ঠী থেকেও পর্যায়ক্রমে কিছু কিছু লোক যে গঙ্গা উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করতে এসেছিল তারও প্রমাণ ঋগ্বেদোত্তর সাহিত্যে ব্যাপকভাবেই সন্নিবিষ্ট আছে।

ঋগ্বেদে মূল সিন্ধু অববাহিকা সম্পর্কে উল্লেখের স্বল্পতা এবং সরস্বতীকে প্রাধান্য দেওয়ায় যে সমস্যা ঘটেছে, ইতিপূর্বে তার উল্লেখ করা হয়েছে। সুপ্রাচীন এবং প্রভূত ঐশ্বর্যসমৃদ্ধ যে সভ্যতা সিন্ধু অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল, ইন্দ্র-মরুৎ নেতৃত্বাধীন সরস্বতীনির্ভর বৈদিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সেই সিন্ধু অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রবল দ্বন্দ্ব-বিরোধের ইতিবৃত্তই ঋগ্বেদ সংহিতায় দানব, অসুর, অহি (নাগ), পণি ইত্যাদিদের সঙ্গে শত্রুতা এবং যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনীতে বিধৃত আছে। সরস্বতীনির্ভর বৈদিক জনগোষ্ঠী এবং সিন্ধুনির্ভর অহি, দানব এবং অসুর নামীয় জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য এবং শত্রুতার কথা পুরু-ভরত বংশোদ্ভূত দিবোদাসের সঙ্গে অসুর আখ্যায় পরিচিত শম্বরের দ্বন্দ্বের উল্লেখ উপলক্ষে মর্টিমার হুইলার কর্তৃক অপ্রত্যক্ষভাবে স্বীকৃত হয়েছে।[৮] বৈদিক যুগে এই দুই

জনগোষ্ঠী দুই স্বতন্ত্র অঞ্চলে পরস্পরবিচ্ছিন্ন অবস্থায়ই বসবাস করত। গঙ্গা উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপন করার পরে এই দুই বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী আর তাদের আঞ্চলিক স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে পারে নাই ; গাঙ্গেয় অঞ্চলে বসবাসের উপযুক্ত আবাসভূমিতে তাদের পরস্পরের নিকটসান্নিধ্যেই বসতি প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণ কাহিনীতে রাক্ষস, দৈত্য, অসুর, গন্ধর্ব, নাগ ইত্যাদিরা যে বৈদিক জনগোষ্ঠীর নিকটসান্নিধ্যেই বাস করত তার বহু প্রমাণ আছে। গঙ্গাতীরে এবং দক্ষিণ ভারতের জনমণ্ডলীতেও এইধরনের অবৈদিক জনগোষ্ঠীর অবস্থানের প্রমাণ বৌদ্ধ সাহিত্যে ব্যাপকভাবেই পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগের সাহিত্য এবং বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণেও তার অনেক উল্লেখ আছে।[৯]

গাঙ্গেয় উপত্যকায় উপনিবেশ স্থাপনের পর বৈদিক জনমণ্ডলীতে যে সমাজগত চাঞ্চল্য এবং পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল, ঋগ্বেদোত্তর সাহিত্যে তার বিস্তৃত পরিচয় সন্নিবিষ্ট আছে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলেই নূতন পরিবেশ সম্ভূত দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের পরিচয় সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। ঋগ্বেদের এই অংশে প্রায় সমকালীন দেবাপি-শান্তনু সম্পর্কিত ইতিবৃত্তের যে সমাবেশ আছে (ঋগ্বেদ ১০।৯৮-১০০) সে-সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

তারই সঙ্গে সঙ্গে আবার সুপ্রাচীন অতীতে সংঘটিত নানা ঘটনা, যেমন ইন্দ্রের দ্বারা ত্বষ্টৃ-পুত্র বিশ্বরূপের নিধনকাহিনী (ঋগ্বেদ, ১০।১-৮), যম এবং যমীর উপাখ্যান, (ঋগ্বেদ ১০।১০), ত্বষ্টৃ-কন্যা সরণ্যুর সঙ্গে বিবস্বতের পরিণয় (১০।১০), পণি-সরমা কাহিনী (১০।১০৮), উর্বশী-পুরুরবা কাহিনী (১০।৮১-৯২) ইত্যাদি বহু বিবরণ সংকলিত আছে, যে-সব বিবরণ সম্পর্কিত স্মৃতি ঋগ্বেদের অন্যত্র বিরল। সেইসঙ্গে এই দশম মণ্ডলেই, বৈদিক সংস্কৃতিতে তেমন সমাদৃত নয়, এমন অনেক তথ্য অথর্বন, ভৃগু, অঙ্গিরস ইত্যাদি ঋগ্বেদে স্বল্পোল্লিখিত ঋষিদের উল্লেখ (ঋ ১০।১৫), পিতৃ, দেবতা এবং অসুরদের ভিন্ন ভিন্ন অগ্নি অর্থাৎ যজ্ঞীয় পদ্ধতির বিভিন্নতা, অন্ত্যেষ্টি সম্পর্কিত মন্ত্র ইত্যাদির সমাবেশকে অনায়াসেই ঋগ্বেদ থেকে স্বতন্ত্র কোন বিশিষ্ট সংস্কৃতির প্রভাবের ফল বলে গণ্য করা যেতে পারে।

ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহকে চেতনার বিবর্তনের দিক থেকে খুব পরিণত বলে গণ্য

করা হয় নাই। ঋগ্বেদ নির্দিষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান পদ্ধতিও ছিল অপেক্ষাকৃত সরল। কিন্তু গাঙ্গেয় উপত্যকায় বসতি প্রতিষ্ঠার পর যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ক্রমে প্রভূত আড়ম্বর এবং জটিলতা দেখা দিতে থাকে। সামবেদ সংহিতায় ঋগ্বেদ থেকে সংগৃহীত বেশকিছু মন্ত্রকে যজ্ঞ অনুষ্ঠানকালে সুরে তালে গানের জন্য গীতের আকারে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যজুর্বেদে যজ্ঞের প্রকারভেদ এবং অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি সম্পর্কে বহুল বিস্তৃতি ঘটেছিল লক্ষ্য করা যায়। সরস্বতী এবং দৃষদ্বতীর অন্তর্বর্তী সংকীর্ণ ভূমিখণ্ড থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকার অতি উর্বর, সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনের ফলে সেই বসতি প্রতিষ্ঠাকারীদের যে যথেষ্ট আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল, যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপক বাহুল্যের সমাবেশের বর্ণনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মূল যজ্ঞভূমি সরস্বতী উপকূল থেকে সরে আসার ফলে যজ্ঞক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক বিশুদ্ধতা রক্ষার যেমন প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, তেমনি যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রভূত বাহুল্য এবং আড়ম্বরেরও সমাবেশ ঘটেছিল। যজুস্ সংহিতায় এবং বিভিন্ন ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে অনেক নূতন নূতন যজ্ঞের অনুষ্ঠানে বহু পুরোহিত এবং তাদের সহায়কের নিযুক্তি সম্পর্কে উল্লেখ আছে। বিভিন্ন পরিচয় ও নামে অভিহিত এইসব যজ্ঞের মধ্যে সমাজ-বিবর্তনের উল্লেখযোগ্য কিছু পরিচয় সন্নিবিষ্ট আছে বলে মনে হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, ঋগ্বেদে অপরিজ্ঞাত, রাজশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাসূচক রাজসূয়, বাজপেয় ইত্যাদি বহু আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞের বর্ণনা আছে। সরস্বতী অববাহিকায় সুদাসের দাশরাজ্ঞ সংগ্রাম ভিন্ন ঐল বংশোদ্ভূত জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের তেমন কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরে ঐল পরিবারগুলি কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, কাশী ইত্যাদি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং এদের পরস্পরের মধ্যে প্রাধান্য নিয়ে প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব-বিরোধ ঘটত, পুরাণগুলিতেও তার উল্লেখ আছে। পুরু-ভরতদের চক্রবর্তিত্বের অধিকার মোটামুটি স্বীকৃত থাকলেও পরস্পর ঈর্ষা-দ্বেষ কম ছিল না। রাজকীয় প্রাধান্যসূচক যজ্ঞ ছাড়াও বাজসনেয়ী সংহিতায় পুরুষ-মেধ, পিতৃমেধ, সর্ব-মেধ, সৌত্রামণি ইত্যাদি নানাপ্রকার যজ্ঞের উল্লেখ আছে। এইসব যজ্ঞের মধ্যে পুরুষ-মেধ যজ্ঞটির অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বিস্তৃত উল্লেখে সেই যুগের সমাজের মানসিকতার বেশকিছু ইঙ্গিত নিহিত আছে বলে মনে হয়। উদ্দিষ্ট উপাস্যের সন্তুষ্টিবিধানের জন্যই মেধ সংজ্ঞায় অভিহিত এই-সব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হত। পিতৃমেধ নামটি এই দিক থেকে বিশেষ অর্থপূর্ণ।

পিতৃপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য অনুষ্ঠিত যজ্ঞের নামই পিতৃমেধ। এই ভিত্তিতেই পুরুষ নামে অভিহিত উদ্দিষ্টের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন ও তাঁর সন্তুষ্টি বিধানার্থে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ 'পুরুষমেধ' নামে অভিহিত হত বলা যায়। পরম সত্তারূপে পরিকল্পিত 'পুরুষ' সম্পর্কে বিবরণ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯০তম সূক্তে অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। গভীর অধ্যাত্মচেতনার দ্যোতকরূপে পরিকল্পিত এই 'পুরুষ' পরিকল্পনাকে বেদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসুরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

উপনিষদের বর্ণনায় সাধারণভাবে সৃষ্টির অন্তর্নিহিত কারণস্বরূপ পরম সত্তাকে 'ব্রহ্ম' এই নামেই অভিহিত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ব্রহ্ম নামে অভিহিত সত্তাকে 'পুরুষ'ও বলা হয়েছে। (সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপসিতার্থ খলু ক্রতুময় পুরুষো যথা ক্রতু অস্মিল্লোকে পুরুষ ভবতি—প্রশ্ন উপনিষদ ৬।৭)। ঋগ্বেদে কিন্তু দশম মণ্ডলে সংকলিত পুরুষ সূক্ত ছাড়া অন্যত্র 'পুরুষের' উল্লেখ বিরল। তবে পুরুষ চেতনার প্রাচীনতম উল্লেখ ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলে ৩৮তম সূক্তেই সম্ভবত প্রথম সন্নিবিষ্ট পাওয়া যায়। এই সূক্তটিতে যে দৈবী-চেতনার পরিচয় প্রতিষ্ঠিত আছে, নানা দিক থেকেই সেটিকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা প্রয়োজন। সূক্তটিতে মূলত 'বিশ্বরূপ' আখ্যায় অভিহিত সত্তার মহিমা কীর্তিত হয়েছে, যে বিশ্বরূপকে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে জগতের সকল কিছুর স্রষ্টা এবং আধাররূপে। সেইসঙ্গে এখানে বিশ্বরূপকে 'পুরুষ' এবং 'সবিতা' এই দুই আখ্যায়ও পরিচিত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ঋগ্বেদের মূল অংশে পুরুষের আর তেমন কোন উল্লেখ না থাকলেও যজুর্বেদ থেকে আবার পুরুষ চেতনার ব্যাপক স্বীকৃতি ঘটতে থাকে এবং উপনিষদ চিন্তায় এসে এই পুরুষ চেতনা বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করে। পুরুষ নামে অভিহিত সত্তার বিরাটত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত উল্লেখ ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলেই প্রথম সন্নিবিষ্ট দেখা গেলেও 'পুরুষ' সম্পর্কিত চেতনা যে খুবই প্রাচীন এ-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। ম্যাকডোনেল এ সম্বন্ধে বলেছেন—**Though several detail in the myth point to the most recent period of the Rv., the main idea is very primitive as it accounts for the formation of the body of a giant.** অথর্ববেদে পুরুষকে সমস্ত কিছুর সঙ্গে এক বলে প্রতিষ্ঠিত করে পুরুষ-তত্ত্বের গভীরতাকে আরও প্রসারিত এবং

মাহাত্ম্যপূর্ণ করা হয়েছে (অথর্ববেদ ১০।২৭)। শতপথ ব্রাহ্মণে পুরুষকে বলা হয়েছে প্রজাপতি (১১।১।৬:১)।

যজুর্বেদে পুরুষমেধ যজ্ঞের যে বিশেষ আড়ম্বরপূর্ণ বিবরণ আছে তা থেকে যজুর্বেদ সংকলনকালে পুরুষ-তত্ত্ব যে বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করেছিল, এ কথা বোঝা যায়। পুরুষমেধের বিবরণে যজ্ঞবাদী সমাজের একটি বিশেষ গ্রানিকর মানসিকতার পরিচয় সন্নিবদ্ধ আছে বলা যেতে পারে। এই মানসিকতা যজ্ঞে মেধ্যরূপে মানুষ উৎসর্গ করবার প্রথা সম্বন্ধে উল্লেখ। বাজসনেয়ী সংহিতার ত্রিংশৎ অধ্যায়ে 'পুরুষের' সন্তুষ্টিবিধানের জন্য বর্ণিত এই যজ্ঞে মেধ্যরূপে যাদের আহুতি দেওয়ার নির্দেশ আছে তার মধ্যে প্রায় আটান্ন প্রকারের বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষের উল্লেখ দেখা যায়। এই তালিকায় সর্বপ্রথম উল্লেখ আছে সূত এবং মাগধ নামে পরিচিত দুই শ্রেণীর লোকের। বিষ্ণুপুরাণের একটি কাহিনীতে উল্লেখ আছে, বহুপ্রাচীনকালে বৈবস্বত মনুর আবির্ভাবেরও পূর্বে, বেনের পুত্র পৃথুর দ্বারা অনুষ্ঠিত এক যজ্ঞে সূত এবং মাগধদের উদ্ভব হয়েছিল। সূত এবং মাগধদের ছাড়া যজ্ঞীয় মেধ্যের এই তালিকায় গোপালক, মেষপালক, কৃষিজীবী (কীনাগ), কামার (কর্মার), কুমোর (কুলাল), চিকিৎসক (ভিষজ) ইত্যাদি পুরুষ এবং বস্ত্ররঞ্জনকারিণী (রজয়িত্রী), কাজল-প্রস্তুত-কারিণী (অঞ্জনকরী) ইত্যাদি সমাজের নানা স্তরের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অনুসরণ-কারী কিছু নারীরও উল্লেখ দেখা যায়। এই তালিকায় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের যে কোন উল্লেখ নাই তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। কারণ এই ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়রা ছিলেন বেদানুগ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অধিকারী। বৈদিক সমাজ এই ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের নিয়েই গঠিত ছিল। বাজসনেয়ী সংহিতার এই বিবরণ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে গাঙ্গেয় উপত্যকায় বৈদিক জনগোষ্ঠীর সম্প্রসারণের পরে পণ্য উৎপাদন তথা সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় চাহিদার সংকুলানের জন্য বহু বৃত্তি ও উপজীবিকার উদ্ভব ঘটেছিল, কিন্তু এইসব উপজীবিকা অনুসরণকারী সম্প্রদায়গুলিকে বেদানুগামী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলেই গণ্য করা হত। এই বিভিন্নতার কারণ অন্বেষণে খুব দূরে যেতে হয় না। বাজসনেয়ী সংহিতার শতরুদ্রীয় নামে পরিচিত রুদ্রদেবতার মাহাত্ম্য সম্বলিত ষোড়শ অধ্যায়-টিতেই এই স্বাতন্ত্র্যের কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

রুদ্র সম্ভবত ঋগ্বেদীয় সমাজের উদ্ভবের পূর্ব থেকেই অত্যন্ত প্রভাবশালী

দেবতারূপে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু ঋগ্বেদীয় সমাজে বোধহয় রুদ্রের তেমন জনপ্রিয়তা ছিল না। সমগ্র ঋগ্বেদে এককভাবে রুদ্রদেবতার উদ্দেশ্যে মাত্র তিনটি সূক্ত সন্নিবিষ্ট আছে (১।১১৪ ; ২।৩৩ ; ৫।৪২)। "মহা অসুর" আখ্যায় অভিহিত (২।১:৬) রুদ্র সম্বন্ধে ঋগ্বেদে প্রভূত ভীতির পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। যজুর্বেদের শতরুদ্রীয় অংশে কিন্তু রুদ্রের ভীতিজনক রূপের সঙ্গে তাঁর অতি মাহাত্ম্যপূর্ণ শান্ত-শিব রূপেরও স্তুতি আছে। শতরুদ্রীয় অধ্যায়ে রুদ্রের ভক্ত-রূপে যাদের বর্ণনা আছে তাদের মধ্যে পুরুষমেধ যজ্ঞের মেধ্যরূপে বর্ণিত কামার (কর্মার), কুমোর (কুলাল), ছুতোর (তক্ষা) ইত্যাদি বৃত্তিজীবীর সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের দস্যু-তস্করেরও উল্লেখ দেখা যায়। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় ভিন্ন, সমাজের বিশেষ প্রয়োজনীয় কিন্তু অবজ্ঞেয় এবং দস্যু-তস্কর, ব্যাধ-নিষাদ ইত্যাদি জন-গোষ্ঠীকে রুদ্র-শিবের উপাসক হিসেবে বিচ্ছিন্ন এবং স্বতন্ত্র বলেই গণ্য করা হত, শতরুদ্রীয়ের বর্ণনায় সেই তথ্যই প্রতিষ্ঠিত আছে। বৈদিক সমাজ থেকে এইসব নানা জীবিকা অনুসরণকারী জনগোষ্ঠী যে শুধু আলাদাই ছিল তা নয়, এদের সম্বন্ধে বৈদিক সমাজে যথেষ্ট হীনতাবোধ এবং ঘৃণাও প্রচলিত ছিল, উল্লিখিত বর্ণনা থেকে সে তথ্যও অনায়াসে উপলব্ধি করা যায়।

বৈদিক জনগোষ্ঠীর গাঙ্গেয় উপকূলে প্রবেশের পর যজুর্বেদ সংহিতার যেমন সংকলন ঘটেছিল, 'অথর্বাঙ্গিরস' নামে চতুর্থ সংহিতার সংকলনও ঐ গাঙ্গেয় উপ-ত্যকায় প্রবেশের পরই ঘটে। যজুর্বেদ, ব্রাহ্মণ এবং সূত্রগ্রন্থগুলিতে যজ্ঞ সম্পর্কে যেমন প্রাধান্য লক্ষিত হয়, অথর্ব সংহিতায় যজ্ঞের মাহাত্ম্য সম্পর্কে তেমন কোন উল্লেখ নাই বললেই চলে। অথর্ব সংহিতাতে ঋগ্বেদের বেশকিছু মন্ত্র সংকলিত থাকলেও রক্ষণশীল বেদানুগামীদের নিকট অথর্ববেদের মর্যাদা খুবই কম। এই সংহিতায় নানা আদিম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, মন্ত্র-তন্ত্রের উল্লেখ থাকায় এর বেশ কিছু অংশই যে অতি প্রাচীন সমাজ সম্ভূত এই সিদ্ধান্তই প্রচলিত আছে। এই সংহিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য রুদ্র-শিব সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধার সমাবেশ। এই গ্রন্থের ষোড়শ খণ্ডে রুদ্র-দেবতার 'ব্রাত্য' আখ্যায় পরিচয় প্রতিষ্ঠিত আছে। রুদ্রদেবতার উল্লেখ ঋগ্বেদে থাকা সত্ত্বেও রুদ্র কেন ব্রাত্য নামে অভিহিত হলেন সেই সমস্যার যুক্তিপূর্ণ কোন সমাধান হয় নাই। ঋগ্বেদে 'ব্রাত্য' শব্দের কোন উল্লেখ নাই। ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহের মধ্যে বেশ প্রাচীন বলে ধার্য তাণ্ড্য ব্রাহ্মণেই প্রথম ব্রাত্য নামে পরিচিত এক শ্রেণীর লোকের উল্লেখ দেখা যায়। বেদানুগামী

জনগোষ্ঠী যে ভাষায় কথা বলত তাণ্ড্য ব্রাহ্মণের মতে ব্রাত্যদের মধ্যেও সেই ভাষারই ব্যবহার প্রচলিত ছিল। তাছাড়া তাদের আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, যানবাহন, অস্ত্রশস্ত্রের যে বিবরণ এখানে আছে তাতে সংস্কৃতি এবং আভিজাত্যে তারা যে বেদানুগামীদের অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিল না এই তথ্যই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তাদের সাধনপথ ছিল স্বতন্ত্র এবং 'ব্রাত্য ষ্টোম' নামে অনুষ্ঠানের দ্বারা তাদের বেদানুগামীদের সংস্কৃতিতে গ্রহণ করা হত। (They drive in open chariots of war, carry bows and lances, wear turbans, robes bordered with red and having fluttering ends, shoes—they speak the same language as those who have received Brahmanical consecration.—Weber[১০]). তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে, যে গ্রন্থ পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ নামেও পরিচিত, সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী অঞ্চলে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ সম্পর্কে যে নিখুঁত বিবরণ সন্নিবদ্ধ আছে তা থেকে অনুমান করা অসংগত নয় যে এই ব্রাহ্মণ বৈদিক জনগোষ্ঠী সরস্বতী অঞ্চল থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার অল্পকালের মধ্যেই রচিত হয়েছিল। আর ব্রাত্যদের সম্পর্কে প্রদত্ত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হওয়া অযৌক্তিক নয় যে সেই ব্রাত্য জনগোষ্ঠীও ঐ অঞ্চলে নবাগত এবং তারা তখনও সেখানে তেমন স্থিতিলাভ করে নাই। (They persue neither agriculture nor commerce ; their laws are in a constant state of confusion.—Weber). ব্রাত্যদের এখানে বলা হয়েছে যজ্ঞাবকীর্ণ অর্থাৎ যজ্ঞ-সংস্কৃতিরহিত।

বাজসনেয়ী সংহিতায় নানা শ্রেণীর বৃত্তি এবং উপজীবিকার উল্লেখ থেকে সে-যুগের সমাজবিন্যাস এবং সমাজের বৈষয়িক মান সম্বন্ধে বেশকিছু ধারণা করে নেওয়া যায়। এইসব বৃত্তির মধ্যে কৃষক, মেষপালক, কামার, কুমোর ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্যের যোগানদারদের যেমন উল্লেখ আছে তেমনি স্বর্ণকার, রথকার, বণিক, বীণাবাদক, সূত, মাগধ, অভিনেতা (শৈলূষ), বস্ত্ররঞ্জন-কারিণী, কাজল-প্রস্তুতকারিণী ইত্যাদি আভিজাত্য এবং বিলাস-উপকরণের যোগানদারদের উল্লেখ থেকে একটি অত্যন্ত উচ্চমানের বৈষয়িক সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য এবং সেবার জন্য বেদানুগামীদের ঐসব লোকেদের উপরই নির্ভর করতে হত। কিন্তু এইসব বৃত্তিজীবী সাধারণ লোক বৈদিক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন বলেই গণ্য হত, যজ্ঞবাদী সমাজে তাদের কোন

স্থান ছিল না। বাজসনেয়ী সংহিতায় রুদ্রাধ্যায়ের বর্ণনা থেকে এইসব বৃত্তিজীবী সমস্ত জনগোষ্ঠীই যে রুদ্র-শিবের উপাসক বলে পরিচিত ছিল এই তথ্য উপলব্ধি করা যায়। অথর্ববেদে স্বয়ং রুদ্র-শিবকে 'ব্রাত্য' আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। বাজসনেয়ী সংহিতায় প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করা না হলেও রুদ্র-শিব উপাসক সেই বিস্তৃত জনগোষ্ঠীই যে 'ব্রাত্য' বলে গণ্য হত এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অথর্ববেদে প্রসঙ্গক্রমে সপ্তসিন্ধু অঞ্চলের গান্ধার, মূজবন্ত, মহাবৃষ ইত্যাদি যে-সব জনগোষ্ঠীর উল্লেখ আছে তাদের সম্পর্কেও বৈদিক সমাজে বিরূপতা অত্যন্ত দৃঢ়বদ্ধ ছিল, তার অনেক প্রমাণ আছে। এমনকি মহাভারতেও এই বিরূপতার প্রকাশ আছে। এইসব অঞ্চলের অধিবাসীদের এখানে বিকুৎসিত আখ্যায় অভিহিত করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোন আর্যের পক্ষে ঐ পঞ্চনদীর তীরস্থ আরট্ট নামে পরিচিত অঞ্চলের বল্‌হিকাদি জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত দেশে দ্বিরাত্রিও বাস করা উচিত নয় (পঞ্চনদ্যো বহন্তেতে যত্র নিঃস্রিত্য পর্বতাৎ/আরট্ট নামা বল্‌হিকা ন তেষ্বার্যো দ্ব্যাহা বসেৎ—মহাভারত ৮।৩০:৪৭ ; অথবা, অরেট্ট নাম তে দেশ বল্‌হিকা নামা তে জনাঃ/বসতি সিন্ধুসৌবিরা ইতি প্রায়ো বিকুৎসিতাঃ —ঐ ৮।৩০:৩৫)। সিন্ধু অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সম্বন্ধে এই বিরূপতা দূরত্বজনিত বিচ্ছেদ থেকে জন্মেছিল বলেই অনেকে অনুমান করেছেন।[১১] কিন্তু এই বিরাগ সুদূর অতীতে সিন্ধু অঞ্চলবাসীদের সঙ্গে যে প্রভূত বৈরতা ছিল তারই ফল; দূরত্বের ফলে নূতন করে জন্মে নাই। পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসী মগধদেশবাসীদের সম্বন্ধেও প্রভূত বিরাগের পরিচয় বিভিন্ন ব্রাহ্মণ গ্রন্থে দেখা যায়। মগধ সংলগ্ন উত্তরে বিদেহ এবং পূর্বে বঙ্গ অঞ্চলেও এই সময়ে অবৈদিক প্রভাবই প্রবল ছিল। তাছাড়া প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় উপকরণের সরবরাহকারীর নিকট প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীর সঙ্গেও যজ্ঞের প্রতি অনুরক্ত বৈদিক সমাজের সাংস্কৃতিক কোন সমন্বয়বোধ ছিল না।

দক্ষযজ্ঞ কাহিনীর গুরুত্ব

এই পরিবেশেই কোন এক সময়ে বেদানুগামীদের নিকট বিশেষ অবজ্ঞার পাত্র 'ব্রাত্য' আখ্যায় পরিচিত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কিছু গুরুতর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল, দক্ষযজ্ঞের কাহিনীতে সম্ভবত তারই একটি প্রতীকী বিবরণ সন্নিবদ্ধ আছে। বেদানুগামী কোন ব্রাহ্মণ বা আরণ্যক গ্রন্থে দক্ষযজ্ঞের কাহিনীর কোন

উল্লেখ না থাকলেও দক্ষযজ্ঞ কাহিনী কারও অবিদিত নয়। প্রাচীন গ্রন্থাদির মধ্যে মহাভারতেই দক্ষযজ্ঞ কাহিনীর কিছু বিস্তৃত উল্লেখ আছে। পরবর্তী যুগের গোপথ ব্রাহ্মণে এবং কিছু কিছু পুরাণে দক্ষযজ্ঞ কাহিনীর সুবিস্তৃত বর্ণনা সন্নিবিষ্ট আছে। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, যজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হব্যের বা উপকরণের উপর দেবতা হলেও রুদ্রের কোন ভাগ ছিল না। একবার প্রজাপতি দক্ষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন এবং সেই যজ্ঞে রুদ্র ভিন্ন অপর সকল দেবতাকেই আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করা হয়। দক্ষকন্যা সতী ছিলেন রুদ্রের পত্নী। পিতার যজ্ঞে পতির নিমন্ত্রণ না হওয়ায় সতী বিনা নিমন্ত্রণেই যজ্ঞস্থলে উপনীত হন এবং সেখানে স্বামিনিন্দা শ্রবণ করে যজ্ঞের অনলে আত্মাহুতি দান করেন। রুদ্রের নিকট এই সংবাদ এসে পৌঁছলে বিপুল অনুচর বাহিনী নিয়ে এসে রুদ্র দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করেন এবং দক্ষের মুণ্ড দেহচ্যুত করেন। সমবেত দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণুর দ্বারা রুদ্রের ক্রোধের উপশম সাধিত হয়। দক্ষের স্কন্ধে একটি ছাগমুণ্ড সংস্থাপিত কবে দক্ষকে পুনর্জীবিত করা হয়। এরপর স্থির হয় যে যজ্ঞের আহুতি প্রদানে একমাত্র ছাগ বা অজই মেধ্য পশু বলে নির্দিষ্ট থাকবে। (মহাভারত, দ্রোণপর্ব, ২০২।৫২-৬০ ; অনুশাসন পর্ব, ১৬০।১১-২৪)

সংস্কৃতির ইতিহাসে এই কাহিনীটিকে শৈব সম্প্রদায়ের দ্বারা রুদ্র-শিবের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য কল্পিত জনপ্রিয় কাহিনী ছাড়া অন্য কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। বেদানুগামী গ্রন্থাদিতে এই কাহিনীর কোন উল্লেখ না থাকলেও দক্ষপ্রজাপতির উল্লেখ আছে। ইতিহাস-সচেতন মহামতি ব্যাস কাহিনীটিকে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করায় কাহিনীটি পরিপূর্ণ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। এই কাহিনীর প্রজাপতি দক্ষকে যজ্ঞবাদী বৈদিক সংস্কৃতির প্রতীক বলে ধার্য করলে রুদ্র-শিবকে ঐ সংস্কৃতির প্রতিবাদী জনগোষ্ঠীর প্রতীক বলে নির্দিষ্ট করা যায়। ঋগ্বেদে রুদ্রের উল্লেখের ভিত্তিতে রুদ্র-দেবতার যে ঋগ্বেদীয় সমাজেও পরিচিতি ছিল তা বোঝা যায়। কিন্তু রুদ্র যেখানে শিবের সঙ্গে যুক্ত সেই রুদ্র-শিবের অনুগামীদের সঙ্গে বেদানুগামীদের কোন সম্প্রীতি ছিল না। বেদানুগামী জনগোষ্ঠীর গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলে প্রসারলাভ করবার পর যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানের আড়ম্বর এবং বিস্তৃতি ক্রমে বৃদ্ধিলাভ করছিল। আর সেই সময়েই, বৈদিক সংস্কৃতির অনুগামী নয়, ব্রাত্য আখ্যায় অভিহিত বহুসংখ্যক

লোক গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলে বেদানুগামীদের নিকটসান্নিধ্যে বসতি স্থাপন করেছিল এবং মগধ ইত্যাদি অঞ্চলে তারা বিশেষ প্রাধান্যও অর্জন করেছিল।৮ অথর্ববেদের ব্রাত্যখণ্ডের ভিত্তিতে এই ব্রাত্য গোষ্ঠী যে প্রধানত রুদ্র-শিবের উপাসক ছিল, এ তথ্য অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। বাজসনেয়ী সংহিতার শত-রুদ্রীয় এবং অথর্ববেদের ব্রাত্যখণ্ডের সংযোজনকে ওয়েবার রুদ্র-শিবের উপাসক সেই ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর শেষপর্যন্ত বেদানুগামীদের নিকট অবনতি স্বীকারের পরি-চায়ক বলে ধার্য করতে চেয়েছিলেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন—I am inclined to suppose that this Rudra book dates from the time of these secret feuds on the part of the conquered aborgines as well as the Vrātyas or un-Brahmanised Aryans, after their open resistance had been more or less crushed.[১২] ওয়েবারের এই সিদ্ধান্তকে প্রকৃত যা ঘটেছিল তার বিপরীত বলেই গণ্য করা উচিত। ওয়েবার বা ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসবেত্তারা দক্ষযজ্ঞ কাহিনীতে কোন গুরুত্বই আরোপ করতে চান নাই। কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণের কিছু কাহিনীতে এই কাহিনী-সূত্রে উদ্ভূত সামাজিক পরিবর্তনের বেশকিছু সমর্থন নিহিত আছে বলে মনে হয়। যজুর্বেদে বা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পর্কে অত্যন্ত বিস্তৃত এবং আড়ম্বর-পূর্ণ যে ধরনের বিবরণ সন্নিবিষ্ট আছে শতপথ ব্রাহ্মণে যজ্ঞ-সম্পর্কিত বিবরণ ততটা বিস্তৃত নয়। শতপথ ব্রাহ্মণের একটি অংশে যজ্ঞের মেধ্যরূপে উৎসর্গ করার পক্ষে বিহিত পাঁচ ধরনের জীবের উল্লেখ আছে, যা হল যথাক্রমে নর, অশ্ব, বৃষ, মেষ এবং অজ বা ছাগ।[১৩] শতপথ ব্রাহ্মণের এই তথ্যের ভিত্তিতে বাজসনেয়ী সংহিতায় বর্ণিত 'পুরুষমেধ' যজ্ঞের মেধ্যরূপে বর্ণিত সূত, মাগধ ইত্যাদি বহু-সংখ্যক মানুষের উল্লেখের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ঋগ্বেদে উল্লিখিত কোন যজ্ঞের ক্ষেত্রে মেধ্যরূপে 'নরের' উল্লেখ পাওয়া যায় না। যজ্ঞবাদী জনগোষ্ঠী গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রসারলাভ করবার পরই যজ্ঞের আড়ম্বর যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, যজ্ঞের অনুষঙ্গরূপে মেধ্যরূপী মানুষ উৎসর্গ করার প্রথারও প্রচলন হয়েছিল। আর যজ্ঞের মেধ্যরূপে বিহিত ছিল ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের লোক, যাদের দুর্বল বলে গণ্য করা হত। এই পরিপ্রেক্ষিতেই শতপথ ব্রাহ্মণের অন্য এক অংশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে যেখানে নির্দেশ পাওয়া যায় যে যজ্ঞে একমাত্র ছাগই উৎসর্গযোগ্য, অন্য কোন জীব নয়।[১৪]

একই সংকলনে এই দুইপ্রকার নির্দেশ যথেষ্ট কৌতূহলের কারণ হলেও, কেন পশুবলিকে সীমিত করে কেবল মাত্র 'অজ' বা ছাগই মেধ্যরূপে নির্দিষ্ট হল তার কোন কারণ এখানে উল্লিখিত হয় নাই। এই পরিবর্তনের কারণ ইতিপূর্বে বর্ণিত দক্ষযজ্ঞের কাহিনীর মধ্যেই নিহিত ছিল বলে সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয়। যে সমাজ থেকে যজ্ঞের মেধ্যরূপে মানুষ সংগ্রহ করা হত সেই সমাজ যে ক্রমে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠছিল বিভিন্ন সাহিত্যিক উপকরণ থেকেও সেই তথ্য উপলব্ধি করা যায়। বাজসনেয়ী সংহিতার শতরুদ্রীয় অংশের সেই দুর্বল শ্রেণীর উপাস্য সম্পর্কে পূর্ব অভিমতের পরিবর্তন এবং অথর্ববেদে সেই রুদ্র-শিবকে বিশেষ আনুগত্য প্রদর্শনের স্বীকৃতিতে এই পরিবর্তনের সাক্ষ্য সন্নিবিষ্ট আছে। দক্ষযজ্ঞের কাহিনীতে রুদ্র-শিবের উপাস্য হিসেবে স্বীকৃতিই যে এই পরিবর্তনের মূলে ক্রিয়াশীল ছিল এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠাকে যথেষ্ট যুক্তিসম্মত বলে মনে হয়। ঐ দক্ষযজ্ঞের কাহিনীতেই 'অজ' কিভাবে যজ্ঞে একমাত্র মেধ্য জীব বলে নির্দিষ্ট হয়েছিল তার কারণ নির্দিষ্ট আছে। মেধ্যরূপে নির্দিষ্ট এই 'অজ'কে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতার নিজের প্রতীক বলে একটি দার্শনিক ব্যাখ্যারও উদ্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে রুদ্র-শিব জীব বা পশুমাত্রেরই অধিপতি এবং রক্ষাকর্তারূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এইসব তথ্য রুদ্র-শিব-উপাসক সমাজে প্রচলিত পশুমাত্রের জীবন সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধার প্রভাব বলে গণ্য করা চলে। সমাজের এই গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তনের ভেতরে যে চিত্রটি দৃষ্টিগোচর হয় তার একদিকে ছিল প্রবল রক্ষণশীলতা, প্রতিদ্বন্দ্বী অব্রত বা যজ্ঞক্রিয়ার প্রতি আনুগত্যহীন জনগোষ্ঠীর প্রতি বিদ্বেষ এবং বিরূপতা ও যজ্ঞের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্যকে অপরিবর্তিত রাখার প্রয়াস, সেইসঙ্গে অন্যদিকে উদারতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী জনগোষ্ঠির সঙ্গে সৌহার্দ্য এবং সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করে এক সম্মিলিত সমাজ গড়ে তোলার আগ্রহ। এইসব তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই অনুমান করা যেতে পারে যে, সমাজে পশুহিংসার বিরুদ্ধে ক্রমে এক বিশেষ প্রবল জনমত গড়ে উঠছিল যার ফলশ্রুতি লক্ষ্য করা যায় মহাভারতে চেদীরাজ বসুর অনুষ্ঠিত পশুবলিহীন এক যজ্ঞের কাহিনীতে।[১৫]

প্রজাপতি দক্ষের দ্বারা আয়োজিত যজ্ঞ রুদ্রের দ্বারা ধ্বংস হওয়ার কাহিনীর উল্লেখ যেমন মহাভারতের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, চেদীরাজ বসুর দ্বারা পশুমেধহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠানের উল্লেখকেও মহাভারতের তেমনি

একটি গভীর ইঙ্গিতগর্ভ বিবরণ বলে গণ্য হতে পারে। পার্জিটার অন্তত সাতটি পুরাণে বসুর উল্লেখ লক্ষ্য করেছেন, যা থেকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসেবে বসুর অস্তিত্বের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যজ্ঞে পশু আহুতি দিতে অস্বীকার করা এবং এই অস্বীকৃতির ফলে যজ্ঞের পুরোহিতরূপে বর্ণিত বৃহস্পতির ক্রোধান্বিত হয়ে যজ্ঞভূমি পরিত্যাগ এবং নারদ কর্তৃক এই অভিনব ধরনের যজ্ঞের স্বরূপ সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, মহাভারতে তার বিবরণ অতি বিস্তৃত। কিন্তু বসুর এই যজ্ঞ সম্পর্কে উল্লেখ অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। পুরাণে বসুর পরিচয় বর্ণিত হয়েছে 'চেদ্যোপরিচর' এই আখ্যায়। উপরিচর শব্দের উপর নির্ভর করে বসুকে শূন্যমার্গে সঞ্চরণে সক্ষম বলে অনেকে মনে করে থাকলেও, পার্জিটার যথার্থই চেদীদের পরাজয়কারী অর্থেই চেদ্যোপরিচর শব্দের ব্যবহার হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন।[১৬] বসু শুধু চেদীরাজ্য নয়, মগধরাজ্যও জয় করেছিলেন এবং সেখানে তাঁর পুত্র বৃহদ্রথকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পাণ্ডববীর ভীমসেনের দ্বারা নিহত জরাসন্ধ ছিলেন বৃহদ্রথের পুত্র। পুরাণের এই বংশতালিকা অনুসারে বসু মহাভারত যুগের খুব পূর্ববর্তী ছিলেন না বলেই ধার্য করা যায়।

মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে বসু তাঁর অনুষ্ঠিত যজ্ঞে কোন পশুকে মেধ্যরূপে উৎসর্গ করা নিষিদ্ধ করে দেন। এই নিষেধের ফলে যজ্ঞের পুরোহিত বৃহস্পতি বিশেষ ক্রোধান্বিত হন এবং যজ্ঞস্থল পরিত্যাগ করে চলে যান :

> অদৃশ্যেন হৃতোভাগো দেবেন হরিমেধসা।
> বৃহস্পতিস্ ততঃ ক্রুদ্ধঃ স্রুচম্ উদ্যম্য বেগিতঃ॥ (শান্তি, ৩৩৬।১৩)

বসু-প্রবর্তিত পশুমেধহীন যজ্ঞ সম্পর্কে সবিশেষ অনুসন্ধান করে দেবর্ষি নারদ জানতে পারলেন এই সাধনপ্রকল্প নারায়ণের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল এবং সেই নারায়ণই এই সাধনার উদ্দিষ্ট উপাস্য। নারদ এ-বিষয়ে বিস্তৃত জানার জন্য নারায়ণের নিকটে উপনীত হন এবং এই সাধনক্রম সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়ে, ফিরে এসে সেই তথ্য জগতে প্রচার করেন :

> ইদং মহোপনিষদং চতুর্বেদসমন্বিতম্।
> সাংখ্য যোগকৃতং তেন পংচরাত্রানুশব্দিতম্॥
> নারায়ণমুখোদ্গীতম্ নারদো অশ্রাবয়ৎ পুনঃ।
> ব্রহ্মণো সদনে তাত যথাদৃষ্টং তথা শ্রুতম্॥ (শান্তি, ৩৩৯।১১১-১২)

এই সাধনপথটিকে এখানে একান্তিন অর্থাৎ ভক্তির পথ এবং সত্ত্বগুণ-সমন্বিত বলে সাত্বত আখ্যায়ও অভিহিত করা হয়েছে। পরবর্তী যুগে যে সাধন-পথ 'একায়ণ', সাত্বত, পাঞ্চরাত্র এবং ভাগবত সাধনপথ নামে প্রসারলাভ করেছিল, মহাভারতের এই কাহিনীতে সেই সাধনপথের প্রবর্তনের ইঙ্গিতই নিহিত আছে। এখানে এই সাধনপথকে চতুর্বেদ-সমন্বিত বলে অভিহিত করা হয়ে থাকলেও, চার বেদের কোথাও কিন্তু নারায়ণের কোন উল্লেখ নাই।

নারায়ণ চেতনার উদ্ভব ও প্রসার

মহাভারতের এই কাহিনীতে নারায়ণকে উপাস্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করে যে সাধন-ক্রমের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তাবৎ মহাভারতই সেই নারায়ণ চেতনা দ্বারা গভীরভাবে সমাবৃত বলে গণ্য করা চলে। মহাভারত গ্রন্থের অষ্টাদশ পর্বের প্রত্যেকটি পর্বের প্রারম্ভে নারায়ণের উদ্দেশ্যে নমস্কার নিবেদনের দ্বারাই রচনার আরম্ভ ঘটানো হয়েছে। বস্তুত মহাভারতকে নারায়ণ চেতনার পূর্ণ প্রতিষ্ঠাকল্পে রচিত মহাবেদ বলে গণ্য করা চলে। মহাভারত চেতনায় নারায়ণই পরমতত্ত্ব, পরম উপাস্য, সকল সাধনার সার, সর্বজগৎব্যাপী সকল সৃষ্টির আবরণকারী সকলের অন্তরস্থ সত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। নারায়ণকে সকল সৃষ্টির আদি-রূপে প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে সৃষ্টির আদিতে তাবৎ বিশ্ব জলে আবৃত ছিল। সেই বিশ্বপরিব্যাপ্তকারী জলকে বলা হয়েছে 'নারা'। যেহেতু তিনি সেই আদি বারিরাশি থেকে উদ্ভূত হলেন তাই তাঁর নাম হল 'নারায়ণ'। সৃষ্টির আদিতে তাবৎ বিশ্বপরিব্যাপ্তকারী বারিরাশির বর্ণনা ঋগ্বেদেও সন্নিবদ্ধ আছে দেখা যায় :

> পর দিবা পর এনা পৃথিব্যাপরো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি।
> কং স্বিদ্‌গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে॥
> তমিদ্‌ং গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমাগচ্ছন্ত বিশ্বে।
> অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ॥
>
> (ঋগ্বেদ ১০।৮২।:৫-৬)

আপ বা বারি থেকে বিশ্বের উদ্ভব সম্পর্কে চেতনা মনুতেও বর্ণিত আছে :

> আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপোবৈ নরসূনবঃ
> তা যদস্যায়ণং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥ (মনু ১।১৩০)

মহাভারতে মনুর উক্তিরই প্রায় হুবহু পুনরুল্লেখ পাওয়া যায়। নারায়ণকে সকল সত্তার মূলরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য মহাভারতে আরও একটি আখ্যায়িকার অবতারণা করা হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। একদিন নারদ নারায়ণ সন্দর্শনে বদরিকাশ্রমে সমাগত হন। সেখানে নারায়ণকে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন দেখে, তাঁর মনে মহা বিস্ময়ের উদ্ভব হয়—যিনি নিজেই সমস্ত জগতের ধ্যানের উদ্দিষ্ট তিনি আবার কার ধ্যান করছেন এই কথা ভেবে। ধ্যানাবসানে নারায়ণ নারদের বিস্ময় অপনোদন করলেন এই বলে যে তিনি তাঁর অন্তর্নিহিত তাবৎ বিশ্বসত্তারই ধ্যান করছিলেন। অর্থাৎ তাবৎ বিশ্ব তাঁর অন্তরেই সংস্থিত। মহাভারতে নারায়ণকে এইভাবে এক অভূতপূর্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের অত্যন্ত গভীর কিছু ইঙ্গিত নিহিত আছে বলে মনে হয়।

ঋগ্বেদে দেবতা বা উপাস্যরূপে নারায়ণের কোন উল্লেখ নাই। অবশ্য ঋগ্বেদে সৃষ্টির আদিতে অনন্ত জলরাশির অস্তিত্ব এবং সেই আপ্ বা জল থেকে জগতের উৎপত্তির যে বিবরণ আছে, মহাভারতে বর্ণিত 'অজ' বা জন্মহীন নারায়ণের পরিকল্পনা যে সেই ঋগ্বেদে সন্নিবিষ্ট উপলব্ধি থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই পরিকল্পনাটি বৈদিক সংস্কৃতির প্রবর্তনকাল অপেক্ষাও যে প্রাচীন ছিল, ঘটনার পারম্পর্যের ভিত্তিতে এইধরনের অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। মহাভারতে 'নর' এবং 'নারায়ণ' নামে দুই অতিপ্রাচীন ঋষির উল্লেখ আছে। এঁরা উভয়েই ছিলেন খ্যাতনামা তপস্বী। বদরিকাশ্রমে নারদ এই নারায়ণকেই দেখেছিলেন জগৎসত্তার সঙ্গে অভিন্ন আপন অন্তর্নিহিত সত্তার ধ্যানে সমাহিত। মহাভারতের পূর্বেকার বহু গ্রন্থের মধ্যে শতপথ ব্রাহ্মণেই প্রথম নারায়ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। নারায়ণকে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে ধ্যান বা তপস্যায় নিরতরূপে নয়, যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারীরূপে। শতপথ ব্রাহ্মণেও বর্ণিত হয়েছে যে, যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা এই নারায়ণ একবার সমস্ত জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবার মানসে পঞ্চরাত্র সত্র নামে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। এই যজ্ঞে তিনি নিজেকেই আহুতি প্রদান করেছিলেন, যার ফলে তিনি শুধু শ্রেষ্ঠত্বই অর্জন করেন নাই, সমস্ত জগতেরই তিনি অন্তরাত্মায় পরিণত হন। (শতপথ ব্রাহ্মণ ১২।৩:৪ ; ১৩।৬:১)। শতপথ ব্রাহ্মণে নারায়ণের শ্রেষ্ঠত্বলাভের যেমন উল্লেখ আছে তেমনি বিষ্ণুই যে দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই তথ্যও সন্নিবিষ্ট আছে (তস্মাৎ বিষ্ণুঃ দেবানাম্ শ্রেষ্ঠঃ—

শতপথ ১৪।১।১)। নারায়ণের সঙ্গে বিষ্ণুর এক এবং অভিন্নরূপে বিবেচিত হওয়ার সূত্র এইখানেই নিহিত আছে বলে গণ্য করা যেতে পারে। শতপথের এই বর্ণনায় দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। প্রথম, পঞ্চরাত্র সত্রে নিজেকে আহুতি প্রদান করা। এই আহুতিপ্রদানের দ্বারা জগতের বিভিন্ন সত্তার সঙ্গে একত্ব প্রতিষ্ঠার উপলব্ধি ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তেও লক্ষ্য করা যায়, যেখানে বিরাট সেই পুরুষ তাঁর বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আহুতি প্রদান করে জগতের সকল কিছু সৃষ্টি করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে নারায়ণকে বলা হয়েছে 'পুরুষ-নারায়ণ'। তাঁর এই পুরুষ-নারায়ণ পরিচয়ে, ঋগ্বেদে বর্ণিত পুরুষ যে নারায়ণের সঙ্গে অভিন্ন, সেই তথ্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুরুষসূক্তের ঋষির নামও ছিল নারায়ণ এবং এই পরিচয়ের মধ্যেও পুরুষ এবং নারায়ণ যে এক সেই নির্দেশের ইঙ্গিত নিহিত আছে।

পুরুষ-বিশ্বরূপ চেতনার প্রাচীনত্ব

পুরুষ-তত্ত্বের অন্তর্নিহিত এই গভীর ইঙ্গিতপ্রবণতা এবং প্রাচীনত্বের প্রমাণ ঋগ্বেদের অন্য একটি সূক্তেও সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৩৮-সংখ্যক এই সূক্তটিকে নানা কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। সমগ্র ঋগ্বেদে পুরুষসূক্তে ছাড়া পুরুষ চেতনার উল্লেখ বিরল। তৃতীয় মণ্ডলের এই সূক্তটিতে পুরুষের উল্লেখ আছে সবিতা এবং বিশ্বরূপের সঙ্গে এক এবং অভিন্নরূপে। এই সূক্তের পুরুষ-বিশ্বরূপ নামসম্বলিত অংশটি এইরূপ :

অতিষ্ঠন্তং পরিবিশ্বে অভূষচ্ছিয়ো বসাংনশ্চরতি স্বরোচিঃ।
মহত্তদ্‌বৃষো অসুরস্য নামা বিশ্বরূপো অমৃতানি অস্থৌ॥
অসূতপূর্বো বৃষভো জ্যায়ানিমা অস্য পুরুষঃ সন্তি পূর্বীঃ।
দিবো ন পাতা বিদথস্য ধীভিঃ ক্ষত্রং রাজানো প্রদিবো দধায়ে॥

—এই সূক্তটির অন্তর্নিহিত রহস্য অতি গভীর (ঋগ্বেদ ৩।৩৮:৪-৫), বিশেষ রহস্যপূর্ণ এবং দুজ্ঞে‍র্য় বলে বিবেচিত হয়েছে। এখানে এই পুরুষ-বিশ্বরূপকে বর্ণনা করা হয়েছে সকল-কিছুর স্রষ্টা, কুশলী কারুকৃৎরূপে (প্রথম শ্লোক)। ইচ্ছানুসারে বহুরূপধারণে সক্ষম বৃষভ প্রতীকী এই বিশ্বরূপ এক হয়েও বহু। তিনি একাধারে বৃষ (পিতা) এবং গাভী (মাতা)। মাতা যেমন তাঁর সন্তানদের সর্বদা সংরক্ষণ করেন এই বিশ্বরূপও তেমনি আবৃত করে রেখেছেন সমগ্র সৃষ্টি (অষ্টম

শ্লোক)। গভীর অধ্যাত্মচেতনায় সমৃদ্ধ এই সুক্তটিতে অতি প্রাচীন একটি উপলব্ধির পরিচয় সন্নিবিষ্ট আছে। বৈদিক সমাজ কিন্তু সেই উপলব্ধিকে এবং সেই উপলব্ধিসঞ্জাত 'পুরুষ' এবং 'বিশ্বরূপ'কে দীর্ঘকাল কোন স্বীকৃতি দেয় নাই। ঋগ্বেদে বৈদিক সমাজের উদ্ভবকালে আবির্ভূত ত্বষ্টার বেশ কয়েকবার উল্লেখ দেখা যায়। যাস্ক অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, যাঁরা বেদের সূক্তের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন তাঁরা ত্বষ্টাকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং বৃত্র ও বিশ্বরূপের পিতা বলে মনে করেন। কিন্তু ঋগ্বেদে ত্বষ্টাকে সবিতা এবং বিশ্বরূপের সঙ্গে একত্রে দেবতা আখ্যায়ও অভিহিত করা হয়েছে (দেবস্ ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ—ঋগ্বেদ ৩।৫৫:১৯, ১০।১০:৫)। ত্বষ্টাকে নিয়ে বেদের গবেষকরা বিশেষ সমস্যা অনুভব করেছেন। ম্যাকডোনেল তাঁর পূর্বগামী গবেষক হিলেব্রাণ্ড (Alfred Hillebrandt), কু'ন্ (A. Kuhn), লুডউইগ (Alfred Ludwig), কেইগি (Adolf Kaeigi) ইত্যাদি পণ্ডিতদের বক্তব্য উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন—Tvastri is one of the obscurest members of the Vedic pantheon. The obscurity of the conception is explained by Kaeigi as due to Tvastri, having belonged to an earlier race of gods who were ousted by later ones.[১৭] ইন্দ্রকে ঋগ্বেদে (ত্রিশির) বিশ্বরূপের নিহন্তা বলা হয়েছে। এই বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টৃর এক-সময়ে যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল, কিন্তু ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বরূপের পিতা বলেই ইন্দ্রানুগামী ঋগ্বেদীয় সমাজে ত্বষ্টৃ এবং ত্বষ্টৃর উপাস্য বিশ্বরূপের দেবতা পরিচয় এবং জনপ্রিয়তার বিলোপ ঘটেছিল। কিন্তু ত্বষ্টৃর জনপ্রিয়তার যে পূর্ণ বিলোপ ঘটে নাই, বাজসনেয়ী সংহিতা (২৯।৯), অথর্ববেদ (২।২৬:১, ৬।৭৮:৩), শতপথ ব্রাহ্মণ (৩।৭।৮:১১ ; ৮।৩:১১) ইত্যাদি পরবর্তী যুগের বহু গ্রন্থে রূপস্রষ্টা, বিশ্বস্রষ্টা, পশুদের অধিপতি ইত্যাদি আখ্যায় ত্বষ্টৃর উল্লেখ থেকেও সে তথ্য প্রতিষ্ঠিত করা যায়। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের সঙ্গে সোমের বা সোমযাগে অংশীদারত্ব নিয়ে ত্বষ্টৃর বিরোধের উল্লেখের কথা (ঋ ১।৮০:১৪) পরবর্তী বহু গ্রন্থেও বর্ণিত আছে। (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২।৪।১২:১ ; শতপথ ব্রাহ্মণ ১।৬।৩:৬)। এইসমস্ত বর্ণনায়ই ত্বষ্টৃকে যে তাঁর উপাস্য বিশ্বরূপের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হত এবং ত্বষ্টৃর পুত্র বিশ্বরূপকে উপলক্ষ করেই ইন্দ্রের সঙ্গে ত্বষ্টৃর বিরোধ ঘটেছিল, সেই তথ্যই সন্নিবিষ্ট আছে বলে উপলব্ধি করা যায়। ত্বাষ্ট্র-বিশ্বরূপের কাহিনী

বর্ণনার উপলক্ষে ভাগবতপুরাণে যে বিস্তৃত বর্ণনা আছে সেই বর্ণনায় বিশ্বরূপ নারায়ণের উপাসক ছিলেন বলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে (ভাগবতপুরাণ, ৬।৭-১০)। ভাগবতের এই বর্ণনায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তথ্য নারায়ণকে বাসুদেবের নানা মূর্তির সঙ্গে কালমূর্তি বিশ্বেশ্বরের (অর্থাৎ রুদ্র-শিবের) সঙ্গেও এক এবং অভিন্নরূপে উল্লেখ করা (শ্রীবৎসধামাপররাত্র ঈশঃ প্রত্যূষ ঈশোঽসিধরো জনার্দনঃ/দামোদরোঽব্যাদনুসন্ধ্যং প্রভাতে বিশ্বেশ্বরো ভগবান্ কালমূর্তিঃ—ভাগবতপুরাণ, ৬।৮:২২)। বস্তুত বিশ্বরূপ নামে আখ্যাত দেবতা যে বিশ্বেশ্বর তথা রুদ্র-শিবের সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য হতেন, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে সেই তথ্য প্রতিষ্ঠিত আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় রুদ্রের মহিমা প্রতিষ্ঠা করা (একো হি রুদ্র ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্য ইমাল্লোকানীসত ঈশনিভিঃ—৩।২)। এখানে রুদ্রকে সবিতার (যুঞ্জানং প্রথমং মনস্তত্ত্বায় সবিতা ধিয়ঃ—২।১), বিশ্বরূপের (অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হ্যকর্তা এবং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ—১।৯) এবং সহস্রশীর্ষ পুরুষের (সহস্রশীর্ষপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ—৩।১৪) সঙ্গে এক এবং অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণিত সবিতা, পুরুষ এবং বিশ্বরূপের এই অভিন্নত্ব ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৩৮-সংখ্যক সূক্তের সুস্পষ্ট এবং নিশ্চিত প্রতিধ্বনি বলেই গণ্য করা চলে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের এই প্রতিবেদনের সাংস্কৃতিক মূল্য অপরিসীম। এই উপনিষদে ঋগ্বেদের যুগের আরম্ভেরও পূর্বেকার সবিতা এবং পুরুষের সঙ্গে অভিন্ন বিশ্বরূপ যে রুদ্রের সঙ্গে এক বলে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সেই তথ্য যেমন নির্দিষ্ট আছে, সেই-সঙ্গে কেন 'পুরুষ' এবং 'বিশ্বরূপকে' স্বীকৃতি দিতে ইন্দ্রানুগ বৈদিক সংস্কৃতিতে এত দ্বিধা ছিল সে-কথাও উপলব্ধি করা যায়। পুরুষ যে রুদ্রের সঙ্গে অভিন্নরূপে গণ্য হতেন, ঐতরেয় আরণ্যকের পুরুষ-সহস্রাক্ষ-মহাদেব-রুদ্র এবং পুরুষ-মহাদেব-রুদ্র এই দুই গায়ত্রী মন্ত্র থেকেও উপলব্ধি করা যায় (মহাদেবং সহস্রাক্ষং শিবমাবাহাম্যহম্/তৎ পুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি/তন্ নো রুদ্র প্রচোদয়াৎ—তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১০।৪৩)। তৈত্তিরীয় আরণ্যকেই সর্বপ্রথম নারায়ণ-বাসুদেব-বিষ্ণু এক এবং অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন (১০।৩৪)। বাসুদেব-কৃষ্ণকে নারায়ণের সঙ্গে অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত করায় মহাভারতের স্রষ্টার বিশেষ তৎপরতা ছিল। মহাভারতের নানা অংশে নারায়ণই যে মায়াদেহে বাসুদেবরূপে আবির্ভূত এই তথ্যও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে

পুরুষ-নারায়ণের যে বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে, ঋগ্বেদ তথা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণিত পুরুষের সঙ্গে তার সাদৃশ্য অত্যন্ত নিকট। এখানে হরি এবং পুরুষ আখ্যায় অভিহিত নারায়ণকে বলা হয়েছে—

সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বসম্ভবম্।
বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং প্রভূম্॥
বিশ্বতঃ পরমং নিত্যং বিশ্বং নারায়ণং হরিম্।
বিশ্বমেবেদং পুরুষস্তদ্বিশ্বমুপজীবতি॥ —১০/১১

বিশ্বরূপ নামের প্রত্যক্ষ উল্লেখ না থাকলেও পুরুষ-নারায়ণের বিশ্বরূপ পরিচয়ের ইঙ্গিত এখানে সুস্পষ্ট। আর এই বিশ্বরূপই যে বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, অথর্ববেদের একটি মন্ত্রেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। মন্ত্রটি এইরূপ—অসতি সৎ প্রতিষ্ঠিতং সতিভূতং প্রতিষ্ঠিতম্। তবেতদ্বিষ্ণোঃ বহুধা বীর্যাণি/ত্বং নঃ পৃণীহি পশুভির্বিশ্বরূপৈঃ সুধায়াং মা ধেহি পরমে ব্যোমম্। (অথর্ববেদ, ১৭।১:১৯)। শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লেখ আছে যে পঞ্চরাত্র সত্র অনুষ্ঠান করে নারায়ণ সমস্ত সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন (শতপথ ব্রাহ্মণ। ১৩।৬:১); আবার শতপথ ব্রাহ্মণেই বিষ্ণুকে দেবগণের মধ্যে প্রধান বলা হয়েছে (ঐ, ১৪।১:১)। নারায়ণের পুরুষ পরিচয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্বরূপে'র সঙ্গে অভিন্নত্বের মতোই বিষ্ণুকেও বিশ্বরূপের সঙ্গে অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠা করে অবৈদিক রুদ্র-শিব উপাসকদের সঙ্গে বৈদিক বিষ্ণু উপাসকদের সমন্বয় প্রতিষ্ঠার গভীর তত্ত্ববহ ইঙ্গিত মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের অন্তর্ভুক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, বিশেষ করে অর্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন পর্বাধ্যায়ে নিশ্চিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতীয় জীবনচেতনায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পণ্ডিতমহলে বহুকাল থেকেই এক অনন্যসাধারণ সৃষ্টিরূপে গণ্য হয়ে আসছে। অথর্ববেদ এবং শতপথ ব্রাহ্মণে পুরুষ-বিশ্বরূপ উপলব্ধির মাধ্যমে যে গভীর তত্ত্বচিন্তা এবং সমন্বয় চেতনার উদ্ভব ঘটেছিল ভগবদ্গীতায় তারই পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। বহুবিচ্ছিন্ন সাধনপদ্ধতি এবং দৈবীচেতনাকে একই পরম তত্ত্বের অন্বেষকরূপে প্রতিষ্ঠা করে গীতাগ্রন্থ মানবজীবনের পরম পরিণতির পথের নির্দেশ দিয়েছিল। আর এই পথের নির্দেশকরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণকে। নানা অভীষ্ট সিদ্ধির মানসে মানুষ বহু ভিন্ন ভিন্ন উদ্দিষ্টের উপাসনা করে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিলেন আদিত্য, রুদ্র, বসু ইত্যাদি বৈদিক দেবতার আরাধনা-

কারীদের উপাস্যের মতো রবি, শশি, হস্তী, অশ্ব, দেবতা, অসুর, নাগ, গন্ধর্ব ইত্যাদি বিভিন্ন উপাস্যও মূলত একই সত্তার প্রকাশ এবং এইসকল উপাস্যই সহস্রশীর্ষ পুরুষ-বিশ্বরূপেই সন্নিবদ্ধ। এই দুটি নির্দেশের মধ্যে বিভূতিযোগে সমন্বয় তত্ত্ব এবং বিশ্বরূপ দর্শনে দুই স্বতন্ত্রধারায় প্রবহমান সংস্কৃতিকে পরস্পরের সঙ্গে মৈত্রী এবং উপলব্ধিভিত্তিক ঐক্যে সন্নিবদ্ধ করবার প্রয়াসই সন্নিবিষ্ট রয়েছে। ঋগ্বেদে ত্বষ্টা এবং বিশ্বরূপের উপাস্যরূপে পরিদৃষ্ট পুরুষ-বিশ্বরূপই যে সকল সত্তার সারাৎসার পরম ব্রহ্ম, ভগবদ্গীতায় বাসুদেব-কৃষ্ণের মাধ্যমে এই তত্ত্বেরই প্রতিষ্ঠাসাধন ঘটেছিল। উপনিষদ চেতনার ব্রহ্মোপলব্ধির প্রাথমিক বীজ এই ভগবদ্গীতাতেই সন্নিবিষ্ট ছিল। প্রবল বেদানুগামীদের সমান্তরালে প্রবাহিত রুদ্র-শিব উপাসক জনগোষ্ঠীর নিষ্ঠা এবং চেতনার পরিচয় ছিল লৌকিক আখ্যায়। পাণিনির একটি সূত্রের ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি শিব, বৈশ্রবন, স্কন্ধ-বিশাখ (কুমার-কার্তিকেয়) ইত্যাদি দেবতাকে লৌকিক দেবতা আখ্যায় অভিহিত করেছিলেন (পাণিনি, ৬।৩:২৬, বার্তিক ২)। কোন কোন উপনিষদে নিশ্চিতভাবেই লৌকিক এবং বৈদিক ধারার স্বাতন্ত্র্যের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায় (লৌকিক বৈদিক-মপ্যুপসংহৃত্য—তুরীয়াযাতীতোপনিষদ ; ব্যবহারো লৌকিক বা শাস্ত্রীয়ো বা—অবধূতোপনিষদ, ২২)। গীতা গ্রন্থে লৌকিক এবং বৈদিক দুই ধারার উল্লেখ করে, এই উভয় ধারাতেই পুরুষই যে পরমতত্ত্বরূপে ধার্য আছেন এই যুক্তির উপর উভয় ধারার মৌলিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে (অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ—ভগবদ্গীতা—১৫।১৮)।

মহাভারতের, বিশেষ করে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যেভাবে রুদ্র এবং বিষ্ণুকে একই বিশ্বরূপের সঙ্গে সমীকৃত করা হয়েছে, মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীনতর কোন গ্রন্থে সেই চেতনার তেমন উল্লেখ নাই। সেইসঙ্গে বাসুদেব-কৃষ্ণই যে এই মৌলিক ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সে-তথ্যও মহাভারতেই নিশ্চিতরূপে সন্নিবিষ্ট আছে। দুই পরস্পরবিচ্ছিন্ন বিবদমান সংস্কৃতিধারার অন্তর্নিহিত মৌলিক উপলব্ধিকে উন্মোচিত এবং প্রতিষ্ঠিত করে কৃষ্ণ-বাসুদেব যে-পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন, উপনিষদ সাহিত্যে সেই প্রয়াসেরই প্রসার এবং পরিপূর্ণতা ঘটেছিল। মহাভারতকে 'উপনিষদের পূর্বগামী বলে মন্তব্য করায় আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে। মহাভারত বর্তমান কলেবর লাভ করবার পূর্বেকার মৌলিক রূপ যে উপনিষদ থেকে প্রাচীনতর এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

উপনিষদের পরিবেশে বাসুদেব চেতনার প্রতিষ্ঠা

মহাভারতের উদ্ভব এবং বাসুদেব চেতনার প্রতিষ্ঠা বিস্তৃতিলাভের পর চিন্তা এবং চেতনার ধারা কোন্ পথে প্রবাহিত হয়েছিল, উপনিষদ সাহিত্যে তার পরিচয় বিধৃত আছে। উপনিষদ নামে পরিচিত গ্রন্থের সংখ্যা বহু। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দ্বিশতেরও অধিক উপনিষদ সংগৃহীত হয়ে বোম্বাইয়ের একটি প্রকাশনার দ্বারা মুদ্রিত হয়েছে।* এইসব উপনিষদের মধ্যে প্রখ্যাত জ্ঞানবিগ্রহ শঙ্করাচার্য ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ঐতরেয় এবং তৈত্তিরীয় নামে দশটি মাত্র উপনিষদের টীকা রচনা করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি আরও ছয়টি উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সেগুলিরও গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এইসব উপনিষদেই ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কিত চিন্তা, চেতনা এবং আলোচনায়, ব্রহ্মকে ঋগ্বেদে স্বল্প-উল্লিখিত 'পুরুষ' এবং 'বিশ্বরূপের' সঙ্গে এক ও অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ক্রমে 'বিশ্বরূপের' সঙ্গে রুদ্রেরও স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হল, যে অভিন্নতা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই প্রথম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। শঙ্করাচার্য শ্বেতাশ্বতরের কোন টীকা রচনা করেছিলেন বলে জানা নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বেদের কোন স্বীকৃতি বা রুদ্র ভিন্ন বৈদিক কোন দেবতার তেমন উল্লেখ নাই। অন্যান্য উপনিষদে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রুদ্রের সঙ্গে বিষ্ণুকে এবং এই দুই দেবতার সঙ্গে অন্যান্য দেবতার অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস খুবই বিস্তৃত। ঈশোপনিষদ এই সমন্বয় চেতনার দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এরপরেই উল্লেখ করা যেতে পারে বৃহদারণ্যক উপনিষদের কথা, উপনিষদের কালনির্ণয়ের দিক থেকে যে-উপনিষদটির বেশকিছু গুরুত্ব আছে।

এই উপনিষদের এক অংশে উল্লেখ আছে, বিদেহের অধিপতি জনকের রাজসভায় আলোচনা প্রসঙ্গে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'আপনি বলতে পারেন পরীক্ষিৎদের কি হয়েছে?'—"স ত্বা পৃচ্ছামি যাজ্ঞবল্ক্য ক্ব পরীক্ষিতা অভবন্নিতি।"—উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারীরা যেখানে যায় পরীক্ষিৎরা সেই লোকেই প্রয়াণ করেছেন—"স হোবাচোবাচ বৈ

* দারাশিকোর দ্বারা ফারসি ভাষায় অনুবাদ করা উপনিষদের উপর নির্ভর করে Anquetil du Peron পঞ্চাশটি উপনিষদের লাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। ওয়েবারের নিকট সর্বসাকুল্যে একশ' সাতচল্লিশটি উপনিষদের সন্ধান ছিল। (Weber, A., Hist., p. 155)

সোঽগচ্ছদ্বৈ তে তত্যত্রাশ্বমেধযাজিনো গচ্ছন্তীতি ক্ব ত্বশ্বমেধযাজিনো গচ্ছন্তীতি— ।"[১৮]

ইতিহাসে উপনিষদসমূহের উদ্ভবের কালনির্ণয়ে বৃহদারণ্যকের এই উল্লেখটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে যে, পরীক্ষিতের বংশধর অধিসীম কৃষ্ণের পুত্র নিচক্ষুর রাজত্বকালে পৌরব রাজধানী হস্তিনাপুর গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত হয় এবং নিচক্ষু যমুনাকূলে কৌশাম্বীতে বসতি স্থাপন করেন।[১৯] হস্তিনা-পুরের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘকালের রাজচক্রবর্তিত্বের দাবিদার পুরু-ভরত-বংশীয় পরীক্ষিৎদের প্রাধান্যের বিলুপ্তি ঘটেছিল এবং সেইসঙ্গে একটা যুগ-প্রকল্পেরও অবসান হয়। যাজ্ঞবল্ক্যের পৃষ্ঠপোষক বিদেহরাজ জনক যে এই যুগপরিবর্তনের অনেক পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন, পরীক্ষিৎদের প্রাধান্যের অবসান সম্পর্কিত উল্লেখে সেই তথ্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই যুগপরিবর্তনের পরে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সমাজদেহে স্থৈর্য এবং সংহতি প্রতিষ্ঠার দ্বারা মানসিক চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করবার যে পথনির্দেশ মহাভারতে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল, উপনিষদ-সমূহে সেই চেতনারই ক্রিয়াশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। গঙ্গা উপকূলে বসতি স্থাপনের পরে বৈদিক জনগোষ্ঠীর সমাজ এবং মানস চেতনায় যে-সব পরিবর্তন ঘটেছিল, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদ, ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যক গ্রন্থসমূহে তার পরিচয় বিধৃত আছে। এই সময়ে যজ্ঞের অনুষ্ঠানকে মুখ্য সাধনপ্রক্রিয়ারূপে যেমন বিস্তৃত এবং জটিল করে তোলা হয়েছিল তেমনি সেই যজ্ঞপ্রক্রিয়ার জটিলতা থেকে সহজতর এবং প্রজ্ঞাভিত্তিক সাধনপথ সম্পর্কেও সচেতনতা দেখা দিচ্ছিল। এই সময়েই প্রবল অবৈদিক 'ব্রাত্য' সমাজের প্রভূত জনপ্রিয় 'রুদ্র-শিব'কে বেদানুগামী সমাজে স্বীকৃতি দিতে হয় এবং 'রুদ্র-শিবের' প্রতিকল্প পুরুষ-নারায়ণকেও গ্রহণ করতে হয়। এই 'পুরুষ'ই ভিন্নতর সমাজে বিশ্বরূপ পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মহাভারতের বর্ণনায় উপলব্ধি করা যায় যে ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণ সেই সুপ্রাচীন 'বিশ্বরূপ' চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত করে বেদানুগামীদের থেকে বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সাম্যপ্রতিষ্ঠার সূচনা সৃষ্টি করেছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'বিশ্বরূপ দর্শন' নামে পরিচিত একাদশ অধ্যায়ে সুপ্রাচীন সেই বিশ্বরূপ চেতনারই পুনরুজ্জীবন ঘটানো হয়েছে (নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ)। বিশ্বরূপকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে রুদ্র এবং বিষ্ণুর সঙ্গে এক এবং অভিন্ন বলা হয়ে থাকলেও এই বর্ণনায় বিশ্বরূপকে যেভাবে বিশ্বেশ্বর

আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে সে তথ্যটি অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ। প্রচলিত শাস্ত্র-গ্রন্থাদিতে রুদ্র-শিবকে বিশ্বেশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন বলা হয়ে থাকলেও এখানে উদ্ধৃত বর্ণনায় বিশ্বরূপকে যেভাবে বিশ্বেশ্বর আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে সে তথ্যটি গভীর ইঙ্গিতগর্ভ। প্রচলিত শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে রুদ্র-শিবকেই বিশ্বেশ্বর আখ্যায় অভিহিত করা হয়। এখানে বিশ্বেশ্বর নামে অভিহিত বিশ্বরূপ মূলত যে সেই রুদ্র-শিব উপাসক সমাজেরই উপাস্য বলে গণ্য হয়ে থাকেন সেই তথ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধনের ইঙ্গিতই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের অসুর-বৃষ পরিচয়ে বর্ণিত বিশ্বরূপ চেতনাকে পুনরুজ্জীবিত ও সংপ্রতিষ্ঠিত করে একই মূল জনমণ্ডলী থেকে উদ্ভূত দুই বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রবল বিচ্ছিন্নতা এবং বিরোধের অপসারণ করে ঐক্য এবং সমন্বয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াসই এই বিশ্বরূপ তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য বলে অভিহিত করা যেতে পারে। ভগবদ্গীতার এই বিশ্বরূপ চেতনা ভারতীয় সাংস্কৃতিক উপলব্ধিতে একটি অত্যন্ত গভীর তত্ত্বসমৃদ্ধ সংযোজন বলে গণ্য হওয়া উচিত।

ঋগ্বেদের পরবর্তী সাহিত্যে মহাভারতের পূর্বে 'পুরুষ' চেতনার স্বীকৃতি ঘটে থাকলেও ত্বাষ্ট্র-বিশ্বরূপ উপাসিত বিশ্বরূপের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মহাভারতের উদ্ভবের পরবর্তী পর্যায়ে উপনিষদ সাহিত্যে ক্রমে উপাস্যরূপে পরম-সত্তা ব্রহ্মের সঙ্গে এক এবং অভিন্নরূপে 'পুরুষ' এবং 'বিশ্বরূপের'ও উল্লেখ ঘটতে থাকে। 'বিশ্বরূপ' সম্পর্কে পূর্বে ব্রাহ্মণের যুগেও যে অনীহা এবং স্পর্শকাতরতা ছিল, বৃহদারণ্যকেই প্রথম সেই মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই উপনিষদে উল্লেখ দেখা গেল যে দেবতা এবং অসুরেরা একই প্রজাপতির সন্তান এবং উদ্গীথ অর্থাৎ প্রণব বা 'অউম্' সম্পর্কিত চেতনার উদ্ভব ঘটেছিল প্রথম অসুরদের মধ্যেই। (দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ ততঃ কনীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাস্ত এষু লোকেষ্বস্পর্ধন্ত তে হ দেবা উচুর্হন্তাসুরান্যজ্ঞ উদ্গীথেনাত্যয়া-মেতি—১।৩:১)। এই উপনিষদে নিহিত অনেক গভীর চেতনাই যে অসুরদের নিকট থেকে গৃহীত হয়েছিল এই তথ্যও অতি সুস্পষ্ট। ঋগ্বেদে (৩।৩৮) যে বিশ্ব-রূপকে দৃঢ়ভাবে 'অসুর' আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছিল সেই বিশ্বরূপকে বৃহদারণ্যক বিশেষভাবেই স্বীকৃতি দিয়েছে দেখা যায়। (ঊর্ধ্ববুধ্নস্তস্মিন্যশো নিহিতং বিশ্বরূপমিতি প্রাণা বৈ যশো বিশ্বরূপং—২।২:৩)। অন্যান্য বৈদিক ঋষিদের সঙ্গে এই উপনিষদে একাধিকবার ত্বাষ্ট্র-বিশ্বরূপের উল্লেখকেও উদার

সমন্বয় প্রচেষ্টার নিদর্শন বলেই গণ্য করা যেতে পারে। (ত্বাষ্ট্রো বিশ্বরূপাত্বাষ্ট্রা-দ্বিশ্বরূপস্ত্বাষ্ট্রো—২।৫:৬ ; ৫।৬:২)। এরপরেই উল্লেখ করা যেতে পারে ছান্দোগ্য উপনিষদের কথা, এই উপনিষদেও উদ্‌গীথ নিয়ে দেবাসুর বিরোধের প্রসঙ্গ দিয়ে আরম্ভ (দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিব উভয়ে প্রজাপত্যাস্তদ্ধ দেবা উদ্‌গীথমাজহ্রু-রনেনৈনানভিভবিষ্যাম ইতি—১।২:১)। এখানে পুরুষচেতনা সম্পর্কে আলো-চনা প্রসঙ্গেই ঋষি ঘোর আঙ্গিরসের সঙ্গে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের কথোপকথনের উল্লেখ আছে, প্রাচীন উপনিষদের ক্ষেত্রে যে উল্লেখকে শ্রীকৃষ্ণের প্রথম ইতিহাস-গ্রাহ্য উল্লেখরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয় (তদ্ধৈতদ্‌ঘোর-আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকী-পুত্রায়োক্ত্বোবাচাপিপাস—৩।১৩:৭)। এই উল্লেখের ভিত্তিতে বলা চলে যে অধ্যাত্মচেতনার অনুশীলনের ক্ষেত্রে এখানে কৃষ্ণের স্বীকৃতি নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু এখানে তাঁকে দেবতারূপে স্বীকৃতির কোন উল্লেখ নাই।

সংস্কৃতির বিবর্তনের সাক্ষ্য হিসেবে ছান্দোগ্য উপনিষদকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই উপনিষদে এমন কতকগুলি তথ্যের সমাবেশ আছে যা খুবই ইঙ্গিতগর্ভ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিদেহের অধিপতি জনক ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সম্পর্কিত আলোচনায় যাজ্ঞবল্ক্য এবং অন্যান্য ঋষিদের পৃষ্ঠপোষক এবং নিজে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু। ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত কৈকেয় রাজ্যের অধি-পতি অশ্বপতিকে কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্মজ্ঞানী হিসেবেই উপস্থিত করা হয়েছে। এখানে দেখা যায়, আত্মা এবং ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে অশ্বপতি নিজেই তার ব্যাখ্যা প্রদান করছেন এবং সমস্যার সমাধান করছেন—'বৈশ্বানর' (অগ্নি) অভ্যন্তরস্থিত সত্তাই যে ব্রহ্ম এই অভিমত প্রকাশ করে। (তান্‌হোবাচাশ্বপতির্বৈ ভগবন্তোঽয়ং কৈকেয়ঃ সংপ্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি তং (৫।১১:৪)। এই বৈশ্বানরের বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে ঋষি পৌলুষি প্রাচীন যোগ্যের প্রশ্নের উত্তরে রাজা বললেন, ঐ বৈশ্বানরস্থ আত্মাই 'বিশ্বরূপ' (কং ত্বমাত্মানমুপাস্ত ইতিদিবমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ বিশ্বরূপ আত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাসসে তস্মাত্তব বহু বিশ্বরূপং কুলে দৃশ্যস্তে—৫।১৩:১)।

রাজ্য হিসেবে কৈকেয়ের পরিচয় রামায়ণের যুগ থেকেই প্রচলিত (রামায়ণ ২।১, ২, ৯, ২২)। বৈদিক সাহিত্যে কৈকেয় রাজ্যের উল্লেখ আছে শতপথ ব্রাহ্মণে শাল্বদের সঙ্গে। সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য এবং অধিবাসী-দের সম্পর্কে বেদানুগ সমাজে যে প্রবল বিরাগ ছিল, এ তথ্য নানা বৈদিক গ্রন্থ

থেকে বোঝা যায়। এই বিরাগের উল্লেখ মহাভারতেও আছে। সিন্ধু অঞ্চলে অসংখ্য পুরের অস্তিত্ব সম্পর্কে ঋগ্বেদে যে ব্যাপক উল্লেখ আছে সেইসব তথ্যেই সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের বিশেষ সমৃদ্ধির পরিচয় নিহিত আছে। বিস্তৃত সিন্ধু অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক খনন এবং অন্বেষণের ফলে সেই অঞ্চলের অধিবাসী-দের ঐশ্বর্য-সম্পদ, নৃত্য-গীত, শিল্প-কলা পূর্ত-স্থাপত্য সম্পর্কে যে সমৃদ্ধির পরি-চয় আবিষ্কৃত হয়েছে স্বভাবতই সেই সমৃদ্ধি বেদানুগামীদের প্রভূত ঈর্ষার কারণ ছিল। বৈদিক সংস্কৃতির উদ্ভাবক এবং ধারক ঋষি এবং রাজন্যবর্গকে ব্যবহারিক উপকরণের জন্য সেই সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের উপরই নির্ভর করতে হত। এমনকি পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থ নগর এবং প্রাসাদ নির্মাণে ময়দানবের সাহায্য নিতে হয়েছিল, যে ময়দানবকে ঐন্দ্র-সংস্কৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী সিন্ধু উপত্যকা সম্ভূত 'দানব' পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত স্থাপত্যবিজ্ঞানী বলেই অভিহিত করা হয়। কৈকেয় রাজ্য ঐ সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। যেমন ছিল মদ্র, গান্ধার, মহাবৃষ, মুজবন্ত, বাল্‌হিক, আরট্ট ইত্যাদি নামে পরিচিত রাজ্যসমূহ। ইন্দ্র-মনুর নেতৃত্বে সেই মূল সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এলেও সিন্ধু অঞ্চলের রাজবংশগুলির সঙ্গে বেদানুগামীদের বৈবাহিক আদান-প্রদানে তেমন কোন বাধা ছিল না। পুরুরবার অপ্সরা (গন্ধর্বনারী) উর্বশীর সঙ্গে পরিণয়, যযাতির সঙ্গে অসুর-অধিপতি বৃষপর্বার কন্যার পরিণয়, দশরথের সঙ্গে কৈকেয়ীর বিবাহ, ধৃতরাষ্ট্রের গান্ধার রাজকন্যা এবং পাণ্ডুর মদ্র রাজকন্যার সঙ্গে পরিণয়কে এই যোগাযোগেরই সাক্ষ্য বলে গণ্য করা চলে। মহাভারতে গান্ধার রাজকন্যার যে মহিমময় চরিত্র চিত্রিত আছে তাতে গান্ধার সমাজের সংস্কৃতি যে বিশেষ উচ্চস্তরের ছিল সেই তথ্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভাষা এবং সমাজ সংগঠনেও সিন্ধু অধিবাসীদের সঙ্গে বেদানুগামীদের যথেষ্ট ঐক্য ছিল। কিন্তু অনুষ্ঠানভূয়িষ্ঠ যজ্ঞকেই সাধনপথের একমাত্র অবলম্বনরূপে প্রতিষ্ঠিত করায় অধ্যাত্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রে অবৈদিক সমাজ যতটা এগিয়ে গিয়েছিল বৈদিক সমাজ ততটা অগ্রসর হতে পারে নাই বলেই মনে হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের উপর ভিত্তি করে বলা চলে যে সিন্ধু উপত্যকা আশ্রিত সংস্কৃতি কেবলমাত্র বৈষয়িক ঐশ্বর্য সম্পদেই সমৃদ্ধ ছিল না, আধ্যাত্মিক চেতনা এবং উপলব্ধিতেও তারা যজ্ঞনিষ্ঠ বেদানুগামীদের অপেক্ষা অনেক অগ্রসর ছিল। আধ্যাত্মিক চেতনায় ব্রহ্ম সম্পর্কিত উপলব্ধি, আত্মা এবং ব্রহ্মের একত্ব এবং জগৎস্রষ্টা পুরুষ-বিশ্বরূপ এবং ব্রহ্ম যে এক এবং অভিন্ন এই

তত্ত্বও সেই সিন্ধু অঞ্চলের অধ্যাত্মতত্ত্ববিদদের নিকট থেকেই গৃহীত হয়েছিল, উপনিষদের অভ্যন্তরীণ নানা তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া খুব অযৌক্তিক নয়।

এই ব্রহ্মতত্ত্ব অথর্ব-আঙ্গিরস সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক এবং ঋষিদের দ্বারা পালিত এবং সংরক্ষিত ছিল এবং গুজরাট অঞ্চলের দ্বারকায় উপনিবেশ স্থাপন করবার পরই শ্রীকৃষ্ণ সম্ভবত ঋষি ঘোর-আঙ্গিরসের সংস্পর্শে আসবার সুযোগলাভ করে-ছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখ আছে 'বিশ্বরূপ' পরিচয়ে বিরাট-পুরুষের মূর্তিই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখা অর্জুনকে প্রদর্শন করেছিলেন। (ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্/বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥— ১১।৩৮)। যে অনন্ত শূন্যরূপ 'আপ্' বা বারিরাশিতে এই বিশ্বরূপ সমীকৃত ছিলেন (ঊর্ধ্ববুধ্ন শুস্মিন্যশো নিহিতং বিশ্বরূপমিতি) সেই অনন্তই পরিকল্পিত হয়ে-ছিলেন নারায়ণরূপে যিনি বিস্তৃত জলরাশিতে সহস্রশীর্ষ অনন্তের উপরে শায়িত। শতপথ ব্রাহ্মণে পরিকল্পিত পুরুষ-নারায়ণ, ঋগ্বেদ ও ঐতরেয় আরণ্যকের সহস্রশীর্ষ এবং মহাভারতে বর্ণিত ঋষি মার্কণ্ডেয় দ্বারা পরিদৃষ্ট জলশায়ী সেই নারা-য়ণের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটল 'নারায়ণোপনিষদে', যেখানে সকল সৃষ্টি এবং সকল দেবতার আকররূপে তিনি দেবকীপুত্র কৃষ্ণের সঙ্গে এক ও অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠা-লাভ করলেন। (ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ ব্রহ্মণাঃ পুণ্ডরীকাক্ষো বিষ্ণুরচ্যুতো ইতি)। ছান্দোগ্য উপনিষদে যেমন শ্রীকৃষ্ণকে দেবকীপুত্র পরিচয়ে উপস্থিত করা হয়েছে, এখানেও শ্রীকৃষ্ণকে যে দেবকীপুত্র আখ্যাতেই অভিহিত করা হয়েছে এই বিষয়টি বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। আনকদুন্দুভি নামে পরিচিত বসু-দেবের দেবকী ভিন্ন পৌরবী, রোহিণী, মদিরা, ভদ্রা ইত্যাদি আরও কয়েকটি পত্নী ছিলেন, যাঁদের প্রত্যেকের গর্ভজাত পুত্রেরই 'বাসুদেব' আখ্যায় পরিচিত হওয়ার অধিকার ছিল। কিন্তু বিশ্বপৃথিবীর উদ্ধারকল্পে ভগবান নারায়ণ মাতা দেবকীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবত এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই শ্রীকৃষ্ণের দেবকীপুত্র আখ্যা সবিশেষ প্রচলিত ছিল। গীতার 'বিশ্বরূপ দর্শন' অধ্যায়েও তিনি অর্জুনকে যখন বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেছিলেন, অর্জুন তখন তাঁকে 'কৃষ্ণ' এই নামেই উল্লেখ করেছিলেন লক্ষ্য করা যায়। (হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি—১১।৪১)। বৈদিক সংস্কৃতি নিরপেক্ষ 'বিশ্বরূপের' সঙ্গে অভিন্ন বৈদিক দেবতা বিষ্ণুর সমন্বয়ের প্রবর্তকরূপে শ্রীকৃষ্ণের 'বাসুদেব' পরিচয় প্রতিষ্ঠা-

লাভ করেছিল (নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃপ্রচোদয়াৎ—নারায়ণোপনিষদ—৭)। নারায়ণীয়োপনিষদ পুরুষ-নারায়ণকে নিশ্চিতরূপে শুধু বিশ্বরূপের সঙ্গে এক এবং অভিন্নরূপেই প্রতিষ্ঠা করে নাই, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র ইত্যাদি বিভিন্ন বৈদিক দেবতাও নারায়ণ থেকেই উদ্ভূত তথা নারায়ণের সঙ্গে অভিন্ন এই তথ্যেরও প্রতিষ্ঠা করেছে। (স ব্রহ্মা স শিবঃ স হরিঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষর পরমঃ স্বরাট্—১৩।২)। সেইসঙ্গে রুদ্র এবং বিশ্বরূপও যে অভিন্ন, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণিত সেই তথ্যও এখানে অত্যন্ত নিশ্চয়তার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। (উর্ধ্বরেতং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপায় বৈ নমো নমঃ / সর্বো বৈ রুদ্র-স্তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্তু—১৪।২৩-২৪ ; নমো রুদ্রায় বিষ্ণবে মৃত্যুর্মে পাহি—৭৫)। এখানে আরও বলা হয়েছে যে এই মেদিনী অর্থাৎ পৃথিবী দেবতা, গন্ধর্ব, মনুষ্য, পিতৃ, অসুর ইত্যাদি সর্বভূতেরই মাতা (অদিতির্দেবা গন্ধর্বা মনুষ্যাঃ পিতরোঽ-সুরস্তেষাং সর্বভূতানাং মাতা মেদিনী—২৮)। নারায়ণীয় উপনিষদে সন্নিবিষ্ট এই তথ্যসমূহ সমাজ-বিবর্তনের সাক্ষ্য হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হতে পারে। সমাজের বিবর্তন পথে প্রতিবেশীরূপে বসবাস করেও যারা সংস্কৃতি এবং সাধনপথের ভিত্তিতে পরস্পরের বিচ্ছিন্নতা বজায় রেখেই চলছিল তারা সকলেই যে একই পৃথিবী বা মেদিনী মাতার সন্তান এই মহাসত্যের পেছনে সেই বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ঐক্য এবং সমন্বয়প্রতিষ্ঠার প্রয়াসই যে বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নারায়ণ উপনিষদে সমন্বয়প্রচেষ্টার উপরে যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল, রুদ্র-শিবের সঙ্গে নারায়ণ-বিষ্ণুকে এক এবং অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াসেও এই তথ্য সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। এখানে রুদ্র-শিবের মহিমা-কীর্তনে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণিত রুদ্র-শিব মহিমার প্রতিধ্বনি আছে। এখানে মহেশ্বরকে সর্বজগৎব্যাপ্ত (মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যালয়িনং তু মহেশ্বরম্/তস্যাবয়বভূতৈস্তুব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ—৪।১০ ; জ্ঞাত্বা শিবং সর্বভূতেষু গুঢ়ম্—৪।১৬), সেইসঙ্গে এই রুদ্রই যে সহস্রশীর্ষ পুরুষ (সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ—৩।১৪), সবিতা (২।১) এবং বিশ্বরূপ (অনন্তশ্চাত্মা বিশ্ব-রূপো হ্যকর্তা ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ—১।৯)—এইসব তথ্যের উল্লেখ করে এবং বিশ্বরূপী বিশ্বরূপই যে নারায়ণ এই সিদ্ধান্তের অবতারণা করে রুদ্র-শিব এবং বিষ্ণু-নারায়ণকে এক এবং অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে

(দেবানাং প্রথমং পুরস্তাদ্বিশ্বা ধিয়ো রুদ্রো মহর্ষিঃ—১২।৩ ; সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বসংভূতম / বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং পদম্—১৩।২ ; যচ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপচ্ছন্দোভ্যশ্চন্দাং স্যাবিশেষ—১১।৮)। ইতিপূর্বে ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৩৮ সংখ্যক সূক্তে বিধৃত বিশ্বরূপ পরিকল্পনা সম্পর্কে যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে এখানেও বৃষভরূপী সেই বিশ্বরূপকে পুরুষ এবং সবিতার সঙ্গে উল্লেখ করে নারায়ণই যে সেই বিশ্বরূপ, সুনির্দিষ্টভাবে সেই সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। নারায়ণ উপনিষদে পরিদৃষ্ট এই সমন্বয়-চেতনার প্রতিধ্বনি অন্যান্য বহু উপনিষদেও লক্ষ্য করা যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত বিশ্বরূপ পরিকল্পনাতে যে এই ব্যাপক উপলব্ধির বীজই নিহিত ছিল এ-বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। এই ধারারই পূর্ণ পরিণতি আছে যেখানে শিব এবং বিষ্ণুকেও এক এবং অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে (শিবায় বিষ্ণুরূপায় শিবরূপায় বিষ্ণবে—স্কন্দোপনিষদ-৮)।

বস্তুত যজুর্বেদে 'শতরুদ্রীয়' অধ্যায়ের সংযোগে এই সমন্বয়প্রয়াসের প্রারম্ভিক পর্যায়ের সাক্ষ্য বিধৃত থাকলেও রুদ্রের উপাসকদের যে কিছুমাত্র প্রীতির চোখে দেখা হত না, এ তথ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। শতপথ ব্রাহ্মণে অথর্ববেদের দ্বারা স্বীকৃত ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি তথা সেই জনগোষ্ঠীর উপাস্য রুদ্র-শিবের কিছুপরিমাণে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তা হয়ে থাকলেও রুদ্র-শিবকে অযজ্ঞ সংস্কৃতির প্রতীক বলেই গণ্য করা হত। কৃষ্ণ-বাসুদেবই পুরুষ নারায়ণ এবং রুদ্র-বিশ্বরূপের অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠা দ্বারা দুই পরস্পরবিচ্ছিন্ন সমাজ সাম্য এবং সমন্বয় সাধনের প্রয়াস গ্রহণ করেছিল। যজ্ঞবাদীদের নিকট বিষ্ণু এবং নারায়ণের অভিন্নত্বের স্বীকৃতি এই সমন্বয়প্রয়াসে যথেষ্ট গতির সঞ্চার করেছিল। নারায়ণের উপাসকেরা কৃষ্ণ-বাসুদেবের এই সমন্বয়প্রতিষ্ঠা প্রয়াসকে কি পরিমাণে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, নারায়ণীয় উপনিষদে তারই প্রমাণ বিধৃত আছে। গভীর চেতনা এবং উপলব্ধির পরিচয়বহ এই উপনিষদকে সমন্বয়-প্রয়াসী বাসুদেব-কৃষ্ণের অনুগামীদের শক্তি এবং প্রতিষ্ঠা অর্জনের নিশ্চিত সাক্ষ্যরূপে গণ্য করা যেতে পারে।

সমাজে এই ঐক্য এবং সমন্বয়ের প্রয়াস যখন যথেষ্ট পরিমাণে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠছিল তখনই রক্ষণশীল মণ্ডলীতে এই প্রগতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও যে শক্তি-শালী হয়ে উঠছিল, স্মৃতির বিধানদাতা মনুর নামে প্রচারিত ধর্মশাস্ত্রে তার প্রমাণ বিধৃত আছে। 'ভাগবত' নামে পরিচিত মিলনবাদী বাসুদেব-উপাসক সম্প্রদায়

যেভাবে বিষ্ণুর উপাসনা করে, মনু সেই রীতির বিষ্ণু উপাসনাকে অভিহিত করলেন ভ্রান্ত আখ্যায়। শুধু তাই নয়, ঐ বিষ্ণু-উপাসক সাত্বতদের মনু 'ব্রাত্য' আখ্যায় নিন্দা করতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। সেইসঙ্গে অতীতে ব্রাত্য নামে পরিচিত বিভিন্ন জীবিকা অনুসরণকারীদের মনু সংকর বর্ণোদ্ভূত আখ্যায় সমাজে পতিত করে রাখারও নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। মনুর এই মনোভাব স্বভাবতই সেই বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর শক্তি এবং প্রাধান্য অর্জনের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হয়েছিল এ-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

রক্ষণশীল যজ্ঞানুগামী সমাজে ব্রাত্যজনগোষ্ঠী নামে যাদের অবজ্ঞা করা হত তাদের প্রতি এই প্রবল বিরূপতার উদ্ভব কেন ঘটেছিল, ইতিহাসে তার কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর নয়। ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর উপাস্য রুদ্র-শিবের দ্বারা প্রজাপতি দক্ষের বিপর্যয় কাহিনী অযজ্ঞবাদী সম্প্রদায়সমূহের সামর্থ্যের স্বীকৃতির ইঙ্গিতবহ বলে ধার্য করা যায়। যে অথর্বসংহিতায় রুদ্র-শিবের সঙ্গে অভিন্ন মহাদেবকে 'ব্রাত্য' বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেই সংহিতা মূলত 'ব্রাত্য' জনগোষ্ঠীর দ্বারাই শ্রদ্ধার সঙ্গে সংরক্ষিত ছিল, ঋকৃসংহিতার অনুগামীদের নিকট এই অথর্বসংহিতার বহুকাল কোন মর্যাদা বা স্বীকৃতি ছিল না। রুদ্র-শিব অনুগামী 'ব্রাত্য' নামে আখ্যাত জনগোষ্ঠীর সামর্থ্যের স্বীকৃতির পরই অথর্বসংহিতাকে কিছুপরিমাণে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। শতপথ ব্রাহ্মণেই প্রথম অথর্বাঙ্গিরসের উল্লেখ আছে। অথর্বাঙ্গিরসের সঙ্গে শতপথ ব্রাহ্মণের ত্রয়োদশ কাণ্ডে ইতিহাস-পুরাণের উল্লেখ এবং ঐ ব্রাহ্মণেরই অংশরূপে গণ্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে চতুর্বেদের সঙ্গে ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদির বিস্তৃত উল্লেখ থেকে রক্ষণশীল সমাজে অথর্বসংহিতার স্বীকৃতি যে উদার মনোবৃত্তি সমৃদ্ধ শতপথ ব্রাহ্মণেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল তা বেশ বোঝা যায়।

মহাভারতের বর্ণনায় যজ্ঞপন্থীদের শক্তিক্ষয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সন্নিবিষ্ট আছে লক্ষ্য করা যায়। যজ্ঞানুগামী বেদপন্থী জনগোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় পুরু-ভরত বংশের পারীক্ষিৎদের অবক্ষয়ে বেদ-অনুগামীদের শক্তি যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী, অযজ্ঞবাদীদের মুখপাত্রস্বরূপ মগধ রাজ্যের অভ্যুত্থান এই সময়ে রক্ষণশীল যজ্ঞপন্থীদের পক্ষে প্রবল আশঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছিল। মগধ রাজ্যে শিশুনাগের অভ্যুত্থানে অযজ্ঞবাদী নাগশক্তির প্রাধান্য অর্জনের ইঙ্গিত নিহিত আছে। এই বংশে উদ্ভূত মহাপদ্ম নন্দকে পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে 'শূদ্রগর্ভোদ্ভূত' এবং

'অখিলক্ষত্রান্তকারী' (মহানন্দিনস্তত শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধোঽতিবলো মহাপদ্মনামা নন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিলক্ষত্রান্তকারী ভবিষ্যতি—বিষ্ণুপুরাণ, ৪।২৪:২০)। বিষ্ণুপুরাণে মহাপদ্ম নন্দ সম্পর্কিত এই বর্ণনাকে সবিশেষ ইঙ্গিতগর্ভ বলে গণ্য করা চলে। সুপ্রাচীন অতীতকাল থেকে ইক্ষ্বাকু এবং যযাতির বংশধরেরাই ভারতভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে আধিপত্য ভোগ করছিলেন। এঁরা সকলেই ছিলেন মনু-প্রবর্তিত যজ্ঞীয় সংস্কৃতি, অর্থাৎ বৈদিক সংস্কৃতির ধারক ও সংরক্ষক। শূদ্র আখ্যায় অভিহিত মহাপদ্ম নন্দ যজ্ঞসংস্কৃতির সংরক্ষক ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের উৎসাদন করে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় অধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার ফলে বেদানুগামীদের জীবন এবং সাধনপথে এক মহাবিপর্যয় উপস্থিত হয়েছিল। বিষ্ণুপুরাণেও উল্লেখ আছে যে, মহাপদ্ম নন্দ সারা পৃথিবীব্যাপী (অর্থাৎ সমস্ত ভারতব্যাপী) 'অনুলঙ্ঘিত একচ্ছত্রশাসন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাঁর পরবর্তী রাজন্যবর্গ সবাই ছিলেন শূদ্র (ততঃ প্রভৃতি শূদ্রাভূপালা ভবিষ্যন্তি/সচৈকচ্ছামনুল্লঙ্ঘিতশাসনো মহাপদ্মঃ পৃথিবী ভোক্ষ্যতে)। মহাপদ্মের বংশধর নন্দকে অপসারিত করে মুরা নাম্নী রমণীর গর্ভে উৎপন্ন নন্দেরই ঔরসজাত পুত্র চন্দ্রগুপ্ত গান্ধারসমুদ্ভূত ব্রাহ্মণ কৌটিল্যের সাহায্যে যে-সাম্রাজ্যের আধিপত্য অর্জন করেছিলেন, সেই সাম্রাজ্য মহাপদ্মের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যজ্ঞপন্থীদের এই বিপর্যয়ের সুযোগেই বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি নানা সাধনপথের প্রসার ঘটতে থাকে। শূদ্র নামে অভিহিত জনগোষ্ঠী যে অতীতের ব্রাত্য নামে বর্ণিত রুদ্র-শিব-উপাসক বিভিন্ন উপজীবিকা অনুসরণকারীদের দ্বারাই সংগঠিত ছিল, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যজ্ঞপন্থী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের উৎসাদন ঘটার ফলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ে যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল তারই ফলে অনেক ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ সাধনপথ অবলম্বন করেছিল এবং বৌদ্ধ ও জৈন তত্ত্বের অনুশীলন এইসব ব্রাহ্মণদের দ্বারাই বিশেষ প্রসারলাভ করেছিল। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃতির মৌলিক উপলব্ধি থেকে ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণমাত্রেরই বিচ্যুতি ঘটে নাই। বিশেষ করে এই বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই দেখা যায়, শেষ মৌর্যসম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে তাঁর সেনাপতি পুষ্যমিত্রের সিংহাসন অধিকার। তিব্বতীয় বৌদ্ধ-লামা তারনাথ পুষ্যমিত্রকে ব্রাহ্মণ বলে উল্লেখ করে থাকলেও, পুষ্যমিত্র ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভূত ছিলেন বলেই মনে হয়। পুরাণে প্রদত্ত পুষ্যমিত্রের সেনাপতি আখ্যা অযোধ্যায় প্রাপ্ত একটি শিলালেখতেও সমর্থিত আছে।[২০] এই অনুশাসনে পুষ্যমিত্র দুইটি অশ্বমেধ

যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে। পুষ্যমিত্রের দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকে পণ্ডিতেরা বৌদ্ধ প্রভাবের বিরুদ্ধে বৈদিক-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতিক্রিয়া বলেই ধার্য করেছেন। (Pushyamitra determined to revive and celebrate with appropriate magnificence the antique Vedic rite of the horse sacrifice—*Asvamedha.*—Smith)[২১]

পুষ্যমিত্রের সাধনপথ কি ছিল নিশ্চিত করে সে-কথা বলা সম্ভব নয়। শুঙ্গবংশের নবম বংশধরের নাম ছিল 'ভাগবত'। পুরাণে প্রদত্ত বিস্তৃত বংশতালিকায় শুঙ্গবংশের ভাগবতের পূর্বে কোন রাজন্যের 'ভাগবত' নামে পরিচয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ইতিপূর্বে মধ্যপ্রদেশের বিদিশায় আবিষ্কৃত যবনদূত হেলিয়োডোরের প্রতিষ্ঠিত গরুড়স্তম্ভে ভগবান বাসুদেবের দেবদেব আখ্যায় বর্ণিত প্রশস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। বাসুদেব-সাধনপথের প্রাচীনতম এই প্রত্নতাত্ত্বিক দলিলটিতে যে রাজার নামের উল্লেখ আছে তাঁর পরিচয় ছিল 'ভাগভদ্র' এই নামে। এই ভাগভদ্র যে শুঙ্গবংশীয় নরপতি ছিলেন এবং পুরাণে বর্ণিত 'ভাগবত'ই যে এখানে ভাগভদ্র নামে অভিহিত হয়েছেন এই তথ্য অনেকেই স্বীকার করেছেন।[২২] ভারহুতে বৌদ্ধস্তূপের প্রবেশদ্বারে শুঙ্গদের দান সম্পর্কিত যে লিপি আছে তারই সান্নিধ্যে দুটি গরুড়ধ্বজ-বহনকারীর মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক এইসব তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান হয় যে শুঙ্গরাজারা 'ভাগবতপন্থী' বৈষ্ণব সাধনপথেরই অনুগামী ছিলেন। পুষ্যমিত্রের দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকে বৌদ্ধ (এবং জৈন) সাধনপথের বিরুদ্ধে আরব্ধ ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ার প্রাথমিক অভিব্যক্তি বলে ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ অভিমত প্রকাশ করেছেন (Early state in Brahmanical reaction)।[২৩] সমসাময়িক পরিবেশকে উপযুক্তভাবে বিশ্লেষণ করলে ভাগবতপন্থীদের এই প্রয়াসকে প্রতিক্রিয়া আখ্যায় অভিহিত না করে মহাভারত এবং উপনিষদ চেতনার নির্দেশানুগামী উদার এবং সমন্বয়বাদী 'বাসুদেব' চেতনার অভ্যুত্থান বলেই নির্দিষ্ট করা উচিত। এই বাসুদেব-চেতনানুগামী 'একান্তিক' নারায়ণ-সাত্বত সাধনপথকে যজ্ঞপন্থী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পরিপোষক রক্ষণশীল মানব ধর্মশাস্ত্র কখনই বৈদিক বলে স্বীকার করে নাই। এমনকি শঙ্করাচার্যের নামে প্রচলিত রচনায়ও 'ভাগবত' পন্থাকে অবৈদিক নামেই অভিহিত করা হয়েছিল। পরম বৈষ্ণব রামানুজাচার্যই প্রথম ভাগবত সাধনপথকে পূর্ণ বেদানুমোদিত বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

শুঙ্গ রাজশক্তির অভ্যুত্থানে ভাগবত সাধনপথের যে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল ইতিপূর্বে সে-সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে। ইতিহাসের পথে এই প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতেই প্রথম পরিলক্ষিত হয়। অষ্টাধ্যায়ীর একটি সূত্রে বাসুদেবের উল্লেখসূত্রে বাসুদেব যে পাণিনির যুগেই দেবতারূপে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন তার প্রমাণ সন্নিবিষ্ট আছে। বাসুদেবের এই স্বীকৃতি প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উল্লেখ সম্বলিত যে ছান্দোগ্য উপনিষদে গান্ধার অঞ্চলের পণ্ডিতদের সবিশেষ প্রশংসা আছে, মহাপণ্ডিত কৌটিল্যের উদ্ভব হয়েছিল সেই গান্ধারের রাজধানী তক্ষশিলা থেকেই। অষ্টাধ্যায়ীর ভাষ্যরচয়িতা প্রখ্যাত দার্শনিক পতঞ্জলি কৃষ্ণ-বাসুদেবের দেবতারূপে স্বীকৃতি এবং তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। শুঙ্গ রাজত্বকালে আবির্ভূত পতঞ্জলির দ্বারা কৃষ্ণ-বাসুদেবের স্বীকৃতি সমসাময়িক কালের বিদিশার গরুড়স্তম্ভ এবং চিতোরের ঘোষুণ্ডিতে আবিষ্কৃত, রাজা সর্বতাতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণ বাটক' নামে পরিচিত সংকর্ষণ-বাসুদেবের দেবস্থানের অস্তিত্বের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে সমর্থিত হয়েছে। শুঙ্গবংশের শেষ অধিপতি দেবভূতি ছিলেন প্রভূত কামাতুর এবং বিলাসপরায়ণ। একদিন তাঁর নিজের প্রাসাদে কোন অন্তঃপুরিকার হাতে দেবভূতির নিধন ঘটে। দেবভূতির মৃত্যুর পর বসুদেব নামে তাঁর এক সচিব সিংহাসন অধিকার করে। কাণ্ববংশীয় ব্রাহ্মণ এই বসুদেবের পৌত্রের নাম ছিল 'নারায়ণ'। কাণ্ববংশীয় এই দুই অধিপতির নামের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয় যে, এই রাজবংশও নারায়ণ-বাসুদেব-কেন্দ্রিক 'ভাগবত সাধনপথের'ই অনুগামী ছিল।

ইতিহাসে শুঙ্গ এবং কাণ্ব রাজবংশদ্বয়কে তেমন কোন বৈশিষ্ট্য বা গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শুঙ্গবংশের উত্থানকে অবৈদিক বৌদ্ধ প্রাধান্যের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য শক্তির প্রতিক্রিয়া বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। শুঙ্গবংশের রাজত্ব চলে একশ' বারো বছর, কাণ্বরা রাজত্ব করে পঁয়তাল্লিশ বছর। এই দুই রাজবংশ সাকুল্যে দেড়শ' বছর রাজত্ব করে থাকলেও সংস্কৃতির দিক থেকে এই দেড়শ' বছর ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদ্বন্দ্বী মগধের অভ্যুত্থানে প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতিতে প্রভূত সংকট দেখা দিয়েছিল। মহাপদ্ম নন্দের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এই সংকটকে আরও গুরুতর করে তোলে। সম্রাট অশোকের দ্বারা বৌদ্ধ সংস্কৃতি গ্রহণ এবং সেই সাধনপথের সম্প্রসারণের প্রয়াসে যজ্ঞপন্থী সংস্কৃতির

সঙ্গে সঙ্গে মগধের রাজন্যবর্গের প্রচলিত সাধনপন্থাও প্রবল সংকটের মুখে পতিত হয়। বৌদ্ধ এবং জৈন নিরীশ্বরবাদ বৈদিক এবং লৌকিক উভয় জনগোষ্ঠীর নিকটেই যে বিশেষ অভিপ্রেত ছিল না এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণ নির্দিষ্ট উপলব্ধি বৈদিক এবং লৌকিক নির্বিশেষে সকল প্রচলিত সংস্কৃতির পক্ষে উল্লেখযোগ্য সমন্বয় এবং সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। শুঙ্গ এবং কাণ্ব রাজত্বের এই দেড়শ' বছর কাল ভাগবত সাধনার সম্প্রসারণে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং সাধনপথ অনুগামীদের মধ্যে সহনশীলতার পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কাণ্বদের অপসারিত করে আন্ধ্ররাজবংশ আধিপত্য অর্জন করেছিল। সেই আন্ধ্রবংশ অবৈদিক নাগ সম্প্রদায় সম্ভূত ছিল বলেই গণ্য করা হয়। আন্ধ্রবংশের খ্যাতনামা সম্রাজ্ঞী নাগমনিকাব নানাঘাটে প্রাপ্ত অনুশাসনে বৈদিক ইন্দ্রের সঙ্গে লৌকিক দেবতা চন্দ্র-সূর্যের এবং ভাগবত সংস্কৃতির কেন্দ্রপুরুষ সংকর্ষণ-বাসুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উল্লেখে এই সাম্য চেতনারই প্রতিফলন আছে। (ধংমস নমো ইদস নমো সংকংসন-বাসুদেবান চংদ-সূরানং (মহি) মা (ব) তানং চতুং নং চং লোকপালানং যম-বরুণ-কুবের-বাসবানং নমো)। রাজ্ঞী নাগমনিকার এই লিপিটিকে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল বলে গণ্য করা যেতে পারে। এই লিপিতে যে সহিষ্ণুতা এবং সমন্বয়বোধের পরিচয় আছে সেই সমন্বয় এবং সহাবস্থান ভিত্তিক চেতনার মূল প্রবর্তক হিসেবে 'ভাগবত' সাধনপথের কৃতিত্বই ছিল সমধিক। সেই উপলব্ধিই শেষ পর্যন্ত গুপ্তরাজত্বকালে পরমভাগবত আখ্যাগ্রহণকারী চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা ব্যাপক বিস্তৃতি সাধিত হয়ে এক দীর্ঘস্থায়ী সমন্বয়-সমৃদ্ধ সভ্যতার উদ্ভব এবং প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্মিথ বলেছেন—The memorable horse sacrifice of Pushyamitra marked an early state of the Brahmanical reaction, which was fully developed five centuries later in the time of Samudragupta and his successors.[২৪]

নির্দেশিকা

১. মহাভারত, ৭।৬৮:৩৭৮৭; বায়ুপুরাণ, ৯১।১৩৫; মৎস্যপুরাণ, ৪৯।৫২; বিষ্ণুপুরাণ, ৪।১৯:১০; ভাগবতপুরাণ, ৯।১৯-২০ ইত্যাদিতে সম্রাট ভরতের বিস্তৃত উল্লেখ আছে।

২. মহাভারত, ১।৭৪:৩০০০ ; ৯৪।৩৭০৬ ।
৩. Pargiter, F. E., A.I.H.T., p. 273.
৪. Weber, A., The History of Indian Literature, p. 10.
৪ক. Wilcox, William, Lectures on the old irrigation system of Bengal, (Calcutta University, 1933)
৫. Das, Abinashchandra, Rigvedic Culture, (Calcutta, 1923), p. 3.
৬. See Wadia, D. N., Geology of India, (3rd ed., London, 1953), p. 388.
৭. Weber, A., op cit., p. 38-39.
৮. Wheeler, R. E. M., Ancient India, Vol. 3 (1947), pp. 76f.
৯. যক্ষরাজের মন্দিরের উল্লেখ, বৈন্যগুপ্তের গুণাইগর লিপি, Indian Historical Quarterly, VI, p. 53f. ; ভগবতো ভবস্যাদিদেবস্য সিদ্ধ্যালয়ে সিদ্ধ-গান্ধর্ব-রক্ষোগণৈঃসেবিতে—কদম্বরাজ শক্তিবর্মণের তালগুণ্ডা লিপি, Epigraphia Indica, VIII, p. 31f ইত্যাদি।
১০. Macdonell, A. A., op. cit., p. 13.
১১. Distaste caused by distance.—Weber. A., op. cit., p. 38.
১২. Ibid, p. 110-111.
১৩. শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০।২।২:১ ।
১৪. ঐ, ৬।২।১:৫ ; ৬।২।২:১-৬ ।
১৫. মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৩১ ।
১৬. —This title was afterwards misunderstood as Chaidya Uparichara and Uparichara was taken to mean 'moving' on high. —Pargiter, F. E., op. cit, p. 118 ; মহাভারত, ১।৬৩:২৩৬৭ ।
১৭. Macdonell, A. A., op. cit., p. 117.
১৮. বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৩।৩:১-২ ।
১৯. বিষ্ণুপুরাণ, ৪।২৯ : ৭-৮ ।
২০. কোশলাধিপেন দ্বিরশ্বমেধযাজিনঃ সেনাপতেঃ পুষ্যমিত্রস্য —ধনদেবের অযোধ্যা শিলালিপি, Epigraphia Indica, XX, p. 57.
২১. Simth, V. A., The Early History of India, (4th ed.), p. 216.
২২. ঐ, পৃ. ২১৪ p. 3.
২৩. ঐ, পৃ. ২১৩ ।
২৪. ঐ, পৃ. ২১৩ ।

১৪

বাসুদেব বিগ্রহের পরিপূর্ণ বিকাশ

কৃষ্ণ-বাসুদেব আশ্রিত ভাগবত সাধনার প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারে মগধের শুঙ্গ এবং কাণ্ব রাজবংশের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বর্তমান কালের ভারততত্ত্ববিদেরা অনেকে অনুমান করছেন যে শুঙ্গ আধিপত্যের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্রের দ্বারা ব্যাপক বৌদ্ধ নির্যাতন ঘটেছিল। বৌদ্ধসংস্কৃতির ইতিহাস রচনায় খ্যাতি অর্জনকারী রীজ ডেভিডস্ বৌদ্ধ নির্যাতন সম্পর্কিত অভিযোগকে তেমন আমল দিয়ে না থাকলেও[১] হডসন, সিউয়েল এবং ওয়াটার্স প্রমুখ লেখকেরা বৌদ্ধদের উপর নির্যাতন ঘটেছিল বলে দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করতেন।[২] তিব্বতীয় ইতিহাসলেখক লামা তারনাথের খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত ইতিহাসগ্রন্থে পুষ্যমিত্রের দ্বারা বৌদ্ধনির্যাতনের উল্লেখ আছে।[৩]

শুঙ্গদের দ্বারা আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে বহুদিন মগধে অবৈদিক শক্তির প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। শুঙ্গবংশীয় পুষ্যমিত্র যে-মৌর্যদের অপসারিত করে রাজ্য অধিকার করেছিলেন সেই বংশের সম্রাট অশোক বৌদ্ধ সংস্কৃতির অনুগামী ছিলেন। তাঁর পূর্বগামী অধিপতিদের পুরাণে শূদ্র পরিচয়ে অভিহিত করা হয়েছে। নন্দবংশীয় সম্রাট মহাপদ্ম কর্তৃক বহু ক্ষত্রিয় রাজন্যের উৎখাতসাধন করার যে বিবরণ পুরাণ সাহিত্যে বর্ণিত আছে তা থেকে অনায়াসেই অনুমান করা যায় যে, শুধু মগধে নয়, সারা ভারতব্যাপী বৈদিক সংস্কৃতি এক গভীর সংকটে পতিত হয়েছিল। সেই শূদ্রপ্রাধান্য এবং বৌদ্ধ নাস্তিক্যবাদের অভ্যুত্থানের মুখেই পুষ্য-মিত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল। পুষ্যমিত্রের দ্বারা যজ্ঞসংস্কৃতির পুনঃপ্রবর্তন এবং শুঙ্গদের দ্বারা নারায়ণ-বাসুদেব চেতনার প্রসারসাধনকে বৌদ্ধ প্রাধান্যের বিরুদ্ধে নিছক ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়া হিসেবে অভিহিত না করে জ্ঞান এবং ভক্তিচেতনার আলোকে সমৃদ্ধ এক নূতন সংস্কৃতির অভ্যুত্থানরূপে স্বীকৃতি দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। বস্তুত সংস্কৃতির ইতিহাসে ভাগবত সাধনপথের প্রসারে যে সংহতি এবং নূতন জীবনচর্যার প্রবর্তন ঘটেছিল শুঙ্গ রাজশক্তির প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই সেই চেতনা

ক্রমে সারাভারতে বিস্তৃতিলাভ করতে থাকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নারায়ণ-বাসুদেব অনুগামী ভাগবত সাধনপথকে রক্ষণশীল বেদানুগামীরা দীর্ঘকাল কোন স্বীকৃতি দিতে রাজী ছিলেন না। প্রবল প্রতাপান্বিত গ্রীক অধিপতি মিনেণ্ডারকে পরাজিত করেই সম্ভবত পুষ্যমিত্র তাঁর দুটি অশ্বমেধের একটির অনুষ্ঠান করেছিলেন।[৪] পুষ্যমিত্রের দ্বারা পূর্বে মগধ থেকে পঞ্জাবের জলন্ধর পর্যন্ত বৌদ্ধ শ্রমণদের হত্যা এবং বৌদ্ধ সংঘারামে অগ্নিসংযোগ এবং ধ্বংস করার অভিযোগ আছে দিব্যাবদান গ্রন্থে।[৫] শুঙ্গ রাজত্বকালের যে-সমস্ত প্রত্ন-তাত্ত্বিক উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে দিব্যাবদানের এই অভিযোগের কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। বরং এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেই মনে হয়। সম্রাট অশোক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কিছু শিলাস্তম্ভে স্থাপিত পশুমূর্তির পরবর্তীকালের প্রস্তরভাস্কর্যের ক্ষেত্রে বৌদ্ধশিল্পের প্রাচীনতম যে-সব নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, মধ্যপ্রদেশের ভারহুত এবং সাঁচী, উত্তরপ্রদেশের মথুরা এবং বিহারের বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত সেইসব ভাস্কর্যসমূহকে শুঙ্গ আমলের শিল্পকীর্তির নিদর্শন বলেই নির্ধারিত করা হয়েছে। ভারহুতের স্তূপপ্রাচীরের একটি প্রবেশদ্বারে উৎকীর্ণ লিপিতে উল্লেখ আছে যে ঐ শিলাতোরণ শুঙ্গ রাজত্বকালে ধনভূতি নামে জনৈক ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। (ধনভূতিন কারিতং তোরণাং/সিলাকংমংতো)।[৬] বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সমাগত ভক্তদের দ্বারা ভারহুত এবং সাঁচীর স্তূপের শিলাকর্ম প্রতিষ্ঠা, শুঙ্গরাজারা যদি বৌদ্ধদের উপর নির্যাতনপরায়ণ হতেন তা হলে কখনই সম্ভবপর হত না। বরং বৌদ্ধ সাধনপথ অনুসরণকারীরা এইসময় ইচ্ছামত চলাচলের এবং স্তূপ-সংঘারামাদি প্রতিষ্ঠায় অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করতেন বলেই প্রতীয়মান হয়। বৌদ্ধনির্যাতন সম্পর্কিত অভিযোগ খণ্ডনের জন্য এই প্রমাণের বিস্তৃত উল্লেখ করতে হল এই কারণে যে শুঙ্গরা যে সাধনপথের উপর আনুগত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই "ভাগবত সাধনপথ" অন্য সম্প্রদায়ের দেবতা বা সাধনক্রম সম্পর্কে কিছুমাত্র অসহিষ্ণু বা বিদ্বেষপরায়ণ ছিল না। বস্তুত ভাগবত সাধনার দার্শনিক উপলব্ধিতে পরমতসহিষ্ণুতাই শুধু নয়, ভিন্ন সাধনপথ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীলতাও একটি মৌলিক অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে।[৭] সম্রাট অশোক যেভাবে 'সমাজ' অর্থাৎ উৎসব সমাবেশ, হস্তীদর্শন এবং বিমানদর্শনাদি জনপ্রিয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে নির্দেশ প্রচার করেছিলেন তাতে বৌদ্ধসাধনা দ্বারা প্রভাবিত অশোকের বেদানুগামীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত যজ্ঞক্রিয়া এবং লোক-

সাধারণের আনন্দ-উৎসবের প্রতি গভীর বিরূপতারই পরিচয় পাওয়া যায়।[৮] এই পরমত-বিদ্বেষের অবসান ঘটিয়ে 'ভাগবত' সংস্কৃতি যে নূতন সহিষ্ণুতা, উদারতা এবং সমন্বয় চেতনার প্রবর্তন করেছিল, শুঙ্গরাই ছিলেন সেই নূতন সংস্কৃতির পথিকৃৎ। শুঙ্গ এবং কাণ্বদের রাজত্বকাল স্বল্পস্থায়ী হয়ে থাকলেও তাঁরা সেই 'ভাগবত' সংস্কৃতির প্রবর্তনে যে প্রয়াস নিয়েছিলেন সেই প্রয়াসই ভবিষ্যতে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়ে ভারতের সংস্কৃতিতে এক নূতন দিগন্তের উন্মোচনসাধন করেছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ভাগবত সাধনার প্রসার

বস্তুত এই যুগ থেকেই বাসুদেব চেতনার প্রসারের ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক সমর্থন আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। বিদেশাগত শক এবং কুষাণ অধিপতিরা বহু পরিমাণে ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সন্দেহ নাই। রাজকীয় শক্তি-রূপে অবশ্য তাঁরা ভারতে স্থায়ী অধিকারলাভ করতে পারেন নাই। কিন্তু সেই স্বল্পস্থায়ী আধিপত্যকালেই ভারতীয় সংস্কৃতিধারায় তাঁরা বেশকিছু পরিমাণে প্রভাব সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তক্ষশিলা অঞ্চলে এই বৈদেশিক শাসনকালেই সম্ভবত কুষাণ রাজত্বকালে একটি বাসুদেব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যে মূর্তিটিকে বাসুদেব-বিষ্ণু মূর্তির প্রাচীনতম নিদর্শন বলে গণ্য করা চলে।[৯] অতীতকাল থেকে যে দুইটি সাধনধারার প্রাধান্যের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত আছে—সেই দুইটি পথ সাধারণভাবে বৈদিক এবং লৌকিক বলেই পরিচিত ছিল। এই দুই পথের মধ্যে বৈদিক বা যজ্ঞানুরাগী পথটি যে ক্রমে বিশেষ দুর্বল হয়ে পড়েছিল এই তথ্য ইতিপূর্বে যুক্তি দিয়ে দেখানো হয়েছে। যজ্ঞসংস্কৃতিকে প্রতিহত করে যে লৌকিক ধারা প্রাধান্য অর্জন করেছিল, ভগবান রুদ্র-শিবই ছিলেন সেই সংস্কৃতিতে প্রধান অবলম্বন। যজ্ঞসংস্কৃতির সেই দুর্বলতার যুগে যজ্ঞসংস্কৃতির নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মণদের এক বৃহৎ অংশ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে শক্তিশালী বৌদ্ধ সাধনপথের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, থেরবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের যুগ থেকে এই সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের পরিচয়সূত্রে এই তথ্য উপলব্ধি করা যায়। একদিকে অত্যন্ত বিস্তৃত রুদ্রশিব আশ্রিত লৌকিক সমাজ, অন্য-দিকে প্রসারশীল বৌদ্ধ সংঘের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্রমক্ষীয়মাণ বেদানুগামী সমাজকে আত্মস্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের তাগিদেই-'ভাগবত' সাধনপথের আশ্রয়গ্রহণ

করতে হয়েছিল। শতপথ ব্রাহ্মণের যুগেই বৈদিক সমাজ একদিকে বৈদিক দেবতা বিষ্ণুকে প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠা করে সংস্কারপন্থী নারায়ণ উপাসকদের সান্নিধ্যে আনয়ন করেছিল। ঐ সান্নিধ্যে বা ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় বাসুদেবের মধ্যস্থতাই বিশেষ ক্রিয়াশীল ছিল, ঐতরেয় আরণ্যকে সন্নিবদ্ধ নারায়ণ-বাসুদেব-বিষ্ণু সম্পর্কিত বিবরণ, মহাভারতে বিস্তৃতভাবে বাসুদেব-কৃষ্ণকে নারায়ণের সঙ্গে এক ও অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠা এবং নারায়ণ-বাসুদেব-বিষ্ণুর একত্বসূচক গায়ত্রীর সন্নিবেশ থেকে এই তথ্য নিশ্চিতভাবেই প্রতিষ্ঠা করা যায়। বিষ্ণুর সঙ্গে বাসুদেবের ঐক্যভিত্তিক প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণের মধ্যে প্রাচীনতমরূপে যে লেখটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গণ্য করা চলে সেটি কুরুক্ষেত্রের সন্নিকটবর্তী হরিয়ানার তুষাম গ্রাম থেকে আবিষ্কৃত একটি শিলালেখ।[১০]

তুষামের এই লিপিটি উৎকীর্ণ হয়েছিল বিষ্ণুর প্রীতিকামনায় একটি দেবগৃহ এবং দুটি সরোবর প্রতিষ্ঠার বিবরণকে স্থায়ী করে রাখবার উদ্দেশ্যে। লিপিটিতে প্রতিষ্ঠাকালের নির্দেশক কোন সংবৎ বা দিনাঙ্কের উল্লেখ নাই, যার ফলে লিপিটিতে ব্যবহৃত অক্ষরের গঠনের উপর নির্ভর করে লিপিটিকে গুপ্তরাজত্ব প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বেকার বলে ধার্য করা হয়েছে। লিপিটির প্রধান উল্লেখনীয় অংশের পাঠ এইরূপ—"জিতম্ অভিক্ষণম—এব জাম্ববতীবদনারবিন্দো জিতালিনা—বিষ্ণুণা।" ভগবান বিষ্ণুকে এখানে যেভাবে জাম্ববতীর বদনরূপ অরবিন্দ বা কমলে উপবিষ্ট মক্ষিকারূপে বর্ণনা করা হয়েছে নানা কারণে এই বিবরণটিকে বিশেষ ইঙ্গিতগর্ভ বলে গণ্য করা চলে। বিষ্ণুপুরাণে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত স্যমন্তক মণি সম্পর্কিত উপাখ্যান এবং এই উপাখ্যানে বর্ণিত স্যমন্তক উদ্ধারের পর বাসুদেব-কৃষ্ণের ঋক্ষরাজদুহিতা জাম্ববতীর সঙ্গে পরিণয়েব কাহিনী সর্বজনবিদিত।[১১] বৌদ্ধ জাতকে জাম্ববতীর পরিচয় ছিল চণ্ডালকন্যারূপে। যে-সব বৈপ্লবিক এবং সমাজবহির্ভূত ক্রিয়াকলাপের ফলে শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেবের প্রতি রক্ষণশীল বেদানুগামী সমাজের প্রবল বিরূপতা জন্মেছিল, জাম্ববতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা নিশ্চিতভাবেই তার অন্যতম। জাম্ববতীকে বিবাহ করাতে শ্রীকৃষ্ণের প্রভূত মাহাত্ম্য এবং উদারতার পরিচয় থাকলেও ব্রাহ্মণ্য সমাজ এই পরিণয়সম্ভূত সন্তান সাম্বকে কোন স্বীকৃতি দেয় নাই। তুষামের এই লিপিতে বর্ণিত 'জাম্ববতীবদনারবিন্দে' সন্নিবিষ্ট বিষ্ণু শব্দ যে বাসুদেব-কৃষ্ণেরই পরিচায়ক এই তথ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বিষ্ণুর প্রীত্যর্থে নির্মিত এই দেবস্থানের প্রতিষ্ঠাতার

পিতামহের পরিচয় বর্ণিত আছে 'সাত্বত-যোগাচার্য' আখ্যায়। তুষামের এই লিপিটিতে সাত্বত অর্থাৎ ভাগবত সাধনপথের অন্তর্নিহিত গভীর উদারতা এবং সাম্যবোধের পরিচয়টিকেই বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সাত্বত সাধন-পন্থীদের উপাস্য এই বিষ্ণু-বাসুদেবই যে এ-যুগে নারায়ণের সঙ্গে এক এবং অভিন্ন এই উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এই যুগের বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপকরণে তারও পরিচয় বিধৃত আছে। সম্প্রতি নাগপুরের সন্নিকটবর্তী মণ্ডল নামে একটি গ্রামে আবিষ্কৃত বাকাটকবংশীয় অধিপতি দ্বিতীয় রুদ্রসেনের রাজত্ব-কালের একটি তাম্রশাসনে সাত্বতচরণাশ্রয়ী আখ্যায় অভিহিত এক দম্পতিকে শেষশায়ী নারায়ণের আজ্ঞায় একটি গ্রাম দান করা হয়েছিল এই তথ্যের উল্লেখ আছে।[১২] এই উল্লেখ থেকে শেষশায়ী নারায়ণই যে সাত্বত সাধনপথের উপাস্যরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এই তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে 'সাত্বতচরণাশ্রয়ী' শব্দের সাত্বত যে বস্তুত সাত্বতপতি নামে পরিচিত বাসুদেব-কৃষ্ণ, এখানে এই উপলব্ধিরও পরিচয় পাওয়া যায়। জাম্ববতীর নামের সঙ্গে যুক্ত বিষ্ণু যে বাসুদেব-কৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন এই উপলব্ধি যেমনভাবে তুষামের লিপিটিতে বিধৃত আছে তেমনভাবে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তুষামের এই লিপিটি যে-সময়ে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়, তার প্রায় সমসাময়িককালেই পূর্বভারতে প্রখ্যাত গুপ্তরাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। গুপ্তবংশের প্রাধান্য দ্বিশতবৎসরের অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু এই দ্বিশতবর্ষে ভারতভূমি এবং ভারতীয় সমাজ ঐশ্বর্যসম্পদ এবং সভ্যতা-সংস্কৃতিতে এক অনতিক্রমণীয় সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল বলে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই অভূত-পূর্ব উন্নতির মূলে গুপ্তরাজবংশের সাংস্কৃতিক চেতনা এবং সাধনপথের যে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল ভূমিকা ছিল এ-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

গুপ্তরাজত্বকালে ভাগবত সাধনার প্রতিষ্ঠা এবং প্রসার

গুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম ছিল 'শ্রীগুপ্ত'। 'শ্রী' শব্দের সঙ্গে নারায়ণ-বিষ্ণু উপাসনার যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। এই ভিত্তিতেই অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে, শ্রীগুপ্ত হয়ত বৈষ্ণব সাধনপথেরই অনুগামী ছিলেন। এই বংশের যিনি প্রথম মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন সেই প্রথম চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা প্রচারিত সুবর্ণমুদ্রার পৃষ্ঠভাগে সিংহবাহিনী যে মূর্তির সমাবেশ দেখা যায়, সেই

মূর্তিকে লক্ষ্মী মূর্তি বলেই ধার্য করা হয়েছে। এই দেবীরই ভিন্ন ভিন্ন প্রতিরূপ অন্যান্য গুপ্তরাজন্যবর্গের মুদ্রায়ও দেখা যায়, যা থেকে প্রমাণ হয় এই রাজবংশ সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর উপাসক ছিলেন, বৈষ্ণব সাধনক্রমে যে-লক্ষ্মীকে নারায়ণ-বিষ্ণুর শক্তিরূপে গণ্য করা হয়।

প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী সমুদ্রগুপ্ত গুপ্তরাজশক্তিকে এক বিশাল সাম্রাজ্যের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের মন্ত্রী-স্থানীয় কর্মচারী, কুমারামাত্য হরিষেণ রচিত একটি প্রশস্তি এলাহাবাদে আবিষ্কৃত একটি অশোকস্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ আছে। এই প্রশস্তিতে উত্তরাপথে এবং দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃত দিগ্বিজয়, দেশের প্রত্যন্তস্থিত সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল, শাহীসাহানুশাহী রাজ্য, মালব, যৌধেয় ইত্যাদি স্বশাসিত জনগোষ্ঠী, এমনকি সিংহলাদি দ্বীপের অধিপতিদের দ্বারা আনুগত্য স্বীকার, সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্য, দানধ্যান এবং সঙ্গীত-কাব্য ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রতিভার এক গভীর ব্যঞ্জনাময় বিবরণ সন্নিবিষ্ট আছে।[১৩] সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা সমগ্র ভারতভূমির রাজন্যবর্গের উপর আধিপত্য-স্থাপনে পূর্বে বর্ণিত মগধাধিপতি মহাপদ্ম নন্দের দ্বারা সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজন্যের উৎসাদন এবং এক বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কিছু প্রতিধ্বনি লক্ষ্য না করে পারা যায় না। কিন্তু এই উভয় আধিপত্যের চরিত্রে বেশকিছু বিভিন্নতাও অতি সুস্পষ্ট। মহাপদ্ম নন্দের দ্বারা বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের উচ্ছেদসাধনের পর স্থানীয় অধি-কর্তাদের পরিবর্তে সম্রাটের দ্বারা প্রেরিত রাজপ্রতিনিধিদের বিজিত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের শাসনকার্যে নিযুক্ত করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা সম্ভবত মৌর্য, শুঙ্গ এবং কাণ্ব রাজত্বকাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারতের পরাজিত রাজন্যবর্গকে নিজ নিজ রাজ্যের অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন (সর্ব্ব দক্ষিণাপথরাজ গ্রহণ মোক্ষানুগ্রহ জনিত প্রতাপোন্মিশ্র মহাভাগ্যস্য)। সেইসঙ্গে উত্তর ভারতের যে-সব পরাজিত রাজন্য সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেছিলেন, তাঁদেরও তিনি তাঁর নিজস্ব প্রতিনিধিরূপে শাসনকার্যে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন (অনেকার্যাবর্তরাজ প্রসভোদ্ধরণোদ্ধৃত্ত প্রভাব মহতঃ পরিচারকী-কৃত)। সমুদ্রগুপ্ত প্রবর্তিত ভারত সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার এই নীতিটি ভারতের সংস্কৃতিসম্ভূত গভীর রাজনৈতিক উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে গণ্য করা যেতে পারে। অনুগত নরপতিদের কোন অনিষ্টসাধন না

করে দুষ্টের দমন এবং সাধুর পালনকারী অচিন্ত্যপুরুষ অর্থাৎ বিষ্ণু-ভগবানের মতো মাহাত্ম্যপ্রদর্শনের বর্ণনায় সম্রাটের সেই অচিন্ত্যপুরুষের আদর্শের প্রতি গভীর আনুগত্যের ইঙ্গিত নিহিত আছে। অনেকে এই উক্তি থেকে যেভাবে সম্রাটের নিজেকে অচিন্ত্যপুরুষরূপে প্রচার করবার প্রয়াস বলে ধার্য করতে চেয়েছেন, সে তথ্য সমর্থন করা যায় না। (—প্রমৃষ্টান্য-নরপতি কীর্তেঃ সাদ্ধ-সাধুদয়-প্রলয়-হেতু পুরুষাচিন্ত্যস্য ভক্ত্যাবনতিমাত্র গ্রাহ্য মৃদুহৃদয়স্যানুকম্পাবতো)। সমুদ্র-গুপ্ত তাঁর শাসনকার্যে "গরুড়-প্রতীক" রাজচিহ্নরূপে ব্যবহার করতেন, যে তথ্য থেকে সমুদ্রগুপ্ত যে গরুড়বাহন বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন এই সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধ বলে গণ্য করা চলে (গরুত্মদঙ্ক স্ববিষয়ভুক্তিশাসন)। শুঙ্গ আমলেই গরুড়-প্রতীকী বিষ্ণু যে ভগবান বাসুদেবের সঙ্গে এক বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, হেলিয়োডোরের প্রতিষ্ঠিত বিদিশার গরুড়স্তম্ভে তার প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত আছে। এইসব তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে, সমুদ্রগুপ্ত বাসুদেবাশ্রিত বৈষ্ণব সাধনধারারই অনুগামী ছিলেন এবং তাঁর এই সাফল্যে বাসুদেবাশ্রিত সাধনধারার অভ্যুদয় এবং প্রসার ঘটেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা অনুসৃত বৈষ্ণব সাধনধারার সঙ্গে ভাগবত নামে পরিচিত সাধনধারার কিছু সূক্ষ্ম বিভেদ ছিল। সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রচারিত কিছু মুদ্রায় এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারীদের কিছু কিছু অনুশাসনে এবং তাম্রপট্টলীতে চন্দ্রগুপ্তের নামের পূর্বে "পরমভাগবত" এই আখ্যার সন্নিবেশ থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কাল থেকেই গুপ্তরাজ-পরিবার ভাগবত সাধনপথে আনুগত্য সমর্পণ করেছিল।

দিল্লীর মেহেরৌলিতে অবস্থিত লৌহস্তম্ভে বহুসমরবিজয়ী চন্দ্র নামে যে রাজার উল্লেখ আছে, নানা বাগ্‌বিতণ্ডার পরে সেই চন্দ্রকে এখন গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে অভিন্ন বলেই গণ্য করা হয়েছে।[১৪] লৌহস্তম্ভের লিপিতে উল্লেখ আছে যে এই মহাপরাক্রান্ত অধিপতি (পূর্বে) বঙ্গ এবং (পশ্চিমে) সিন্ধু-নদীর সপ্তপ্রবাহ স্রোতের মুখে অবস্থিত বল্‌হিকাদি জনপদ আপন ভুজবলে জয় করেছিলেন। হরিষেণের এলাহাবাদ লিপিতে উল্লেখ আছে যে পূর্বে সমতট অঞ্চল সমুদ্রগুপ্তের আধিপত্য স্বীকার করে থাকলেও আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছিল। পশ্চিমে সিন্ধু-উপকূলবর্তী রাজ্যগুলিও সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা বিজিত হয় নাই। সুপ্রাচীনকাল থেকে বঙ্গ নামে পরিচিত অঞ্চলই ছিল সমতট। গুণাইঘর

থেকে আবিষ্কৃত বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসন থেকে অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে বৈন্যগুপ্তের দ্বারা শাসিত, তৎকালে নব্যাবকাশিকা নামে পরিচিত এই অঞ্চলই সমুদ্রগুপ্তের সময়ে সমতট নামে অভিহিত ছিল, এবং চন্দ্রগুপ্তই এই অঞ্চলকে প্রথম গুপ্ত আধিপত্যের অধীনে এনেছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের এক-বিংশতিতম রাজ্যাঙ্কে (গুপ্তসংবত ৮১ ; ৪০১ খ্রীস্টাব্দ) মধ্যপ্রদেশের বিখ্যাত প্রত্নক্ষেত্র উদয়গিরিতে উৎকীর্ণ একটি শিলালেখতে উল্লেখ আছে যে, পৃথিবী-জয়ার্থে নির্গত 'রাজাধিরাজ, রাজর্ষি, অচিন্ত্য উজ্জ্বলকর্মা' চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সমাগত পাটলিপুত্র নগরের কবি নামে খ্যাত তাঁর সচিব, সন্ধিবিগ্রাহিক বীরসেন এখানে তাঁর পরম ভক্তির পাত্র ও উপাস্য ভগবান শম্ভুর উদ্দেশ্যে একটি গুহা খনন করিয়ে দিয়েছিলেন।[১৫] (রাজাধিরাজর্ষেরচিন্ত্যোজ্জ্বলকর্ম্মণঃ/পৃথ্বী জয়ার্থেন সহাগতঃ)। এই লিপিতে বর্ণিত চন্দ্রগুপ্তের পৃথিবীজয় রূপ কৃতিত্বের সঙ্গে দিল্লির লৌহস্তম্ভে বর্ণিত রাজা চন্দ্রের অবনীজয়ের কীর্তির নিকট-সাদৃশ্য উভয়ের এক ও অভিন্নত্বের ইঙ্গিতবহ বলে অনুমান করা চলে (জিতাবনিং গতবতঃ কীর্ত্যা স্থিতস্য ক্ষিতৌ)। এই লৌহস্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপিতে রাজা চন্দ্রকে ভগবান বিষ্ণুর প্রতি গভীর আনুগত্যসম্পন্ন বলেই বর্ণনা করা হয়েছে (তেনায়ং প্রণিধায় ভূমি-পতিনা ভাবেন বিষ্ণো মতিং / প্রাংশুর্বিষ্ণুপদে গিরৌ ভগবতো বিষ্ণুর্ধ্বজঃ)। পৃথিবী-বিজয়ের বিবরণ সম্বলিত এই দুই লিপির ভিত্তিতে অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে এই বিজয়াভিযানের অন্তকাল পর্যন্তও চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা 'পরমভাগবত' আখ্যা ব্যবহৃত হয় নাই। চন্দ্রগুপ্তের কিছু রৌপ্যমুদ্রায় ছাড়া তাঁর রাজত্বকালের তেমন কোন লিপি বা লেখতে 'পরমভাগবত' আখ্যায় উল্লেখ পাওয়া যায় না। এইসব রৌপ্যমুদ্রা চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা মালব-জয়ের পর প্রচারিত হয়েছিল। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে উল্লেখ আছে যে মালব জনপদ সমুদ্রগুপ্তের আধিপত্য স্বীকার করত, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সমুদ্রগুপ্তের শাসনাধীন ছিল না। সিন্ধুর সপ্তমুখে অবস্থিত সিন্ধু-সৌবীর রাজ্য, মালবের আকর-অবন্তী ইত্যাদি অঞ্চল গুপ্তদের পূর্বে শকদের অধিকারে ছিল, রুদ্রদামনের জুনাগড় পর্বতলিপিতে তার উল্লেখ আছে।[১৬] চন্দ্রগুপ্ত এই প্রবল পরাক্রমশালী শকদের পরাভূত করেই পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের বিস্তারসাধন করেছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের দুহিতা, বাকাটক অধিপতি দ্বিতীয় রুদ্রসেনের মহিষী প্রভাবতী গুপ্তার পুণায় আবিষ্কৃত তাম্রপট্টলীতে চন্দ্রগুপ্তকে 'পৃথিব্যামপ্রতিরথস্সর্ব

রাজোচ্ছেত্তা' আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে।[১৭] বাকাটক মহিষী প্রভাবতী পিতার প্রাধান্য এবং বীর্যবত্তায় কি পরিমাণ গৌরব অনুভব করতেন, একাধিক লিপিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়।[১৮] এইসব লিপিতেই রাজ্ঞী প্রভাবতী গুপ্তার নিজের পরিচয় সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে চন্দ্রগুপ্তের মহিষী, নাগকুলসম্ভূত কুবেরনাগার কন্যা এবং 'পরম ভগবদ্ভক্ত' এই আখ্যায়। এবং তাঁর পিতা চন্দ্রগুপ্তকে বলা হয়েছে 'পরমভাগবত'। ইতিপূর্বে নাগপুরের সন্নিকটবর্তী মণ্ডল-গ্রামে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় রুদ্রসেনের রাজত্বকালে শেষশায়ী নারায়ণ উপাসক সাত্বতচরণাশ্রয়ী এক দম্পতিকে গ্রামদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রভাবতীদেবীর পুণা তাম্রপট্টলীতে জনৈক ভগবদ্ভক্ত আখ্যায় অভিহিত আচার্য চনালস্বামীকে গ্রামদানের উল্লেখ আছে (ভগবৎ পাদমূলে নিবেদ্য ভগবদ্ভক্তাচার্য চনাল স্বামিনে পূর্বে দত্ত্যা—)। এই দানের অন্যান্য শর্তের মধ্যে প্রদত্ত গ্রাম থেকে মেধ্যরূপে পশু নিয়ে যাওয়া নিষেধ করে একটি শর্ত আরোপ করা হয়েছিল।[১৯] (পরীহারান্বিতরামস্তথ্যথাভট-ছত্র-প্রবেশ্যঃ অ-চারাসন-চর্মাঙ্গার-ক্লিণ্ব-ক্রেণি স্বানকঃ অপারম্পরঃ-অ-পশুমেধ্যঃ) গ্রাম থেকে মেধ্যরূপে ব্যবহারের জন্য পশুসংগ্রহের উপর এই নিষেধাজ্ঞায় ভাগবত সাধনপথে পশুমেধের বিরুদ্ধে মানসিকতারই পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে পশুমেধ সমর্থনযুক্ত বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে ভাগবত সাধনপ্রণালীর একটি মৌলিক বিভেদের পরিচয় সন্নিবিষ্ট আছে।

বাকাটক রাজবংশ মূলত ছিল শৈব। প্রভাবতী নিজে ছিলেন অত্যন্ত ভগবদ্ভক্ত এবং তাঁরই প্রভাবে প্রভাবতীর স্বামী দ্বিতীয় রুদ্রসেন ভাগবত সাধনপথ অবলম্বন করেছিলেন। প্রভাবতীর দ্বিতীয় পুত্র প্রবরসেন থেকে বাকাটক বংশে পুনরায় শৈব সাধনধারারই প্রবর্তন ঘটেছিল। প্রভাবতী তাঁর ভাগবত সাধন-ক্রম যে পিতা পরমভাগবত আখ্যায় অভিহিত চন্দ্রগুপ্তের নিকট থেকেই লাভ করেছিলেন, এ কথা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। প্রবল যুদ্ধবিগ্রহে সাফল্য অর্জনের পরই চন্দ্রগুপ্ত সম্ভবত ভাগবত সাধনার প্রভাবের দ্বারা স্বকীয় জীবন-ধারায় এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসাধন করেছিলেন। উদয়গিরিতে সম্রাটের অমাত্য বীরসেনের লিপিতে তাঁকে যেভাবে অচিন্ত্য, উজ্জ্বলকর্মা, রাজর্ষি আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে তা থেকে এই তথ্য উপলব্ধি করা যায়। বস্তুত সম্রাট অশোক এবং কণিষ্কের দ্বারা উৎসাহিত বৌদ্ধ সাধনপথ ছাড়া হুবিষ্ক

এবং বাসুদেব আদি কুষাণ সম্রাট এবং রুদ্রদামন, জয়দামন আদি শক অধিপতিরা শৈব সাধনধারারই অনুরাগী এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা পরাজিত রাজন্যবর্গের মধ্যে নাগকুলোদ্ভূত গণপতিনাগ, নাগসেন, নন্দী ইত্যাদি বহু রাজন্যই যে শৈব ছিলেন, এ তথ্য সুস্পষ্ট। চন্দ্রগুপ্তের বীরসেন নামে যে অমাত্য উদয়গিরিতে ভগবান শম্ভুর উদ্দেশ্যে গুহা নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন, শুধু তিনিই নন, চন্দ্রগুপ্তের অন্য এক অত্যন্ত প্রভাবশালী অমাত্য শিখরস্বামীও ছিলেন পরম শিবভক্ত।[২০] চতুর্দিকে এই ব্যাপক শৈব সাধনার প্রভাবকালে প্রভূত শৌর্যশালী মহাপরাক্রান্ত চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের ভাগবত সাধনার আশ্রয়গ্রহণ যে সমাজে এক যুগপ্রবর্তনের সূচনা করেছিল, ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনপটে তারই চিত্র সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। শতপথ ব্রাহ্মণের যুগ থেকে বৈদিক সাধন-প্রকল্পকে রক্ষণশীলতার গণ্ডী থেকে বিমুক্ত করে বিস্তৃত, উদার এবং সর্বাত্মকরূপে প্রসারিত করবার যে প্রয়াস আত্মপ্রকাশ করেছিল, 'মহাভারত'-বিধৃত চেতনা যে প্রয়াসকে ভারতের সংখ্যাহীন জনগোষ্ঠীর সমাজমানসে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, গুপ্তরাজত্বকালে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ভাগবত সাধনার আশ্রয়গ্রহণে সেই প্রয়াসই সমাজজীবনে প্রভূত স্বীকৃতিলাভ করে এক নূতন সাংস্কৃতিক সম্পদরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। এই প্রয়াসের অন্তরালে বেদানুগামী বিষ্ণু-চেতনার সঙ্গে পুরুষ-নারায়ণ সম্পর্কিত উপলব্ধির সমন্বয়সাধনের যে প্রয়াস তৈত্তিরীয় সংহিতা এবং নারায়ণোপনিষদে নির্দিষ্ট হয়েছিল, যে প্রয়াস 'মহাভারতে'র মানসলোককে সমুদ্ভাসিত করেছিল, তারই ফলে বৈদিক দেবতা বিষ্ণুর সঙ্গে পুরুষ-নারায়ণের পূর্ণ সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত করে বৈষ্ণব সংস্কৃতি এক অকল্পিত মহিমায় প্রতিষ্ঠালাভ করল। গুপ্তরাজত্বকালেই এই সমন্বয়প্রয়াস যে অত্যন্ত ব্যাপক স্বীকৃতি এবং প্রসারলাভ করেছিল, প্রত্নতাত্ত্বিক নানা উপকরণে তার বহু প্রমাণ সন্নিবিষ্ট আছে।

সাত্বত বৈষ্ণব সাধনার নিদর্শন—লিপি-লেখ এবং শিল্পে

এই বিবর্তন চেতনার অন্বেষণে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রের সন্নিকটবর্তী মান্দাসোরে (প্রাচীন দশপুর) আবিষ্কৃত মালব সংবৎ ৪৬১ অব্দের (খ্রীষ্টীয় ৪০৪) একটি শিলালেখের কথা। সাংস্কৃতিক বিবর্তন চেতনার নিদর্শনরূপে লিপিটির গুরুত্ব সীমাহীন। গভীর অধ্যাত্মচেতনার

উল্লেখে সমৃদ্ধ এই লিপিটিকে সাত্বত বৈষ্ণব সাধনার একটি তুলনাহীন অভিজ্ঞান-পত্র বলে অভিহিত করা চলে।[২১] লিপিটির আরম্ভ এইরূপ :

সিদ্ধম্ / সহস্রশিরসে তস্মৈ পুরুষায়ামিতাত্মনে/
চতুস্‌সমুদ্র-পর্যঙ্কতোয় নিদ্রালবে নমঃ ॥

এখানে বর্ণিত প্রণামের উদ্দিষ্ট দেবতাকে পরিচিত করা হয়েছে চতুস্‌সমুদ্র বিস্তৃত তোয় বা জলরাশিরূপ পর্যঙ্কের উপর শায়িত সহস্রশীর্ষ, অমিতাত্মন পুরুষ আখ্যায়। উদ্দিষ্ট এই দেবতার বর্ণনার সঙ্গে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নারায়ণের বর্ণনার সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট, যেখানে বলা হয়েছে[২২] :

সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বসম্ভবম্।
বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং প্রভুম্ ॥

পুরুষ নারায়ণকে আশ্রয় করে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে গভীর সমন্বয় চেতনার প্রসার ঘটেছিল, নারায়ণকে বিশ্বেশ্বর এবং 'শিবমচ্যুতের' সঙ্গে অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠা করায় সেই প্রয়াসের নিশ্চিত সাক্ষ্য সন্নিবিষ্ট আছে। এখানে বলা হয়েছে :

পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্।
নারায়ণ মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্ ॥

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের এই তত্ত্বচেতনারই পরিপূর্ণ প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় নারায়ণোপনিষদে, যেখানে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সেই উক্তিরই পুনরুল্লেখ দেখা যায়[২৩] :

সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বসম্ভবম্।
বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং পদম্ ॥
পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্।
নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্ ॥

নারায়ণোপনিষদের এই বর্ণনায় নারায়ণকে শুধু পরমেশ্বর আখ্যায় পরিচিত শিবের সঙ্গে অভিন্ন বলা হয় নাই, তাঁকে সকল কিছুর অন্তর্নিহিত পরম স্বরাট, অক্ষর, পরমাত্মা, ব্রহ্মা, শিব, হরি (অর্থাৎ বিষ্ণু) এবং ইন্দ্রের সঙ্গে এক ও অভিন্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। (তস্যা শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিতঃ/স ব্রহ্মা স শিবঃ স হরিঃ সেন্দ্রঃ সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট ॥) নারায়ণ চেতনার এবং সেই চেতনার ভিত্তিতে তাবৎ ব্রহ্মসত্তার মূল ঐক্য সম্পর্কে বিভিন্ন উপনিষদে যে উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায় তারই কিছু নির্যাস বিষ্ণুপুরাণ থেকেও সংকলন করা

যায়। বাসুদেব আখ্যায় প্রতিষ্ঠিত শ্রীহরির মহিমা কীর্তনের ভিত্তিতে 'বিশ্বেশ্বর' পরিচয়ে বর্ণিত হরি আপন রজোগুণ সত্তার মাহাত্ম্যে ব্রহ্মা হয়ে সৃষ্টি করলেন জগৎ, আর তমোগুণাত্মক প্রলয়ঙ্কর রুদ্ররূপে সেই সৃষ্টি ভক্ষণ করে নাগপর্যঙ্কে শয়ান হলেন :

জুষণ রজোগুণং তত্র স্বয়ং বিশ্বেশ্বরো হরিঃ
ব্রহ্মাভূত্বাস্য জগতো বিসৃষ্টৌ সম্প্রবর্ততে॥
তমোদ্রেকী চ কল্পান্তে রুদ্ররূপী জনার্দনঃ
মৈত্রেয়াখিলভূতানি ভক্ষয়ত্যতিদারুণঃ॥
ভক্ষয়িত্বা চ ভূতানি জগত্যেতার্ণ বিকৃতে
নাগপর্যঙ্কশয়নে শেতে চ পরমেশ্বরঃ॥

—বিষ্ণুপুরাণ, ১।২:৬১, ৬৩-৬৪।

নাগপর্যঙ্কশায়ী পরমেশ্বর আখ্যায় অভিহিত এই জগৎকারণ যে স্বয়ং নারায়ণ এই তত্ত্বই এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে। আর ইনিই যে পুরুষ-বিশ্বরূপ এই উপলব্ধিও এখানে নিশ্চিতভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—

পৃথিব্যাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশ এব চ।
সর্বেন্দ্রিয়াস্তঃকরণং পুরুষাখ্যং হি যজ্জগৎ॥
স এব সর্বভূতাত্মা বিশ্বরূপো যতোঽব্যয়ঃ।
স্বর্গাদিকং তু তস্যৈব ভূতস্থমুপকারণম্॥ —বিষ্ণুপুরাণ, ১।৬৮-৬৯।

বস্তুত সর্বাত্মক জগৎকারণ নারায়ণের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এবং কল্পান্তে জগৎ ধ্বংসকারী রুদ্রের সঙ্গে অভিন্নত্ব এবং ইতিপূর্বে বর্ণিত এই পরম সত্তার ঋগ্বেদ-বিধৃত পুরুষ-বিশ্বরূপ উপলব্ধির সঙ্গে একাত্মকত্ব ও অভিন্নতা, সংস্কৃতির বিবর্তনের ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর অভিপ্রকাশরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে।

এখানে বর্ণিত লিপিটির কাব্যগুণও সবিশেষ আকর্ষণীয়। প্রাবৃটে মেঘ সমাগমে মেদিনীর ব্রীহি-যব কাশপুষ্পাদিতে অলঙ্কৃত হয়ে ওঠার বর্ণনার সঙ্গে এই-সকল কিছুর ক্রিয়াশীলতার অন্তর্নিহিত অজ এবং অনন্তরূপী অপ্রমেয় জগদ্বাস 'বাসুদেবে'র উল্লেখ থেকে এই লিপিটিকে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের একটি অত্যন্ত মূল্যবান উপকরণ বলেও আখ্যাত করা চলে।

প্রাবৃটকালে শুভে প্রাপ্তে মনস্তুষ্টি করে নৃণাম্
মহে নৃবৃত্তে শক্রস্য কৃষ্ণস্যানুমতে তদা॥

নিষ্পন্ন ব্রীহি যবসা কাশপুষ্পৈরলংকৃতা
মাভিরম্যধিকং ভাতি মেদিনী শস্য-মালিনী ॥

*　　*　　*

ত্রিদশোদার-ফলদং স্বর্গস্ত্রী চারু পল্লবম্ ॥
বিমানানেক-বিটপং তোয়দাম্বু মধুস্রবম্
বাসুদেবং জগদ্বাসমপ্রমেয়মজং বিভুম্ ॥

সমস্ত জগতের আশ্রয়স্বরূপ বাসুদেবকে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে এক বনস্পতি মহাবৃক্ষের মতো, ত্রিংশৎ সংখ্যক দেবগণ যার ফলস্বরূপ ; এই বৃক্ষের শাখাপল্লব-রূপে বিরাজিত আছেন স্বর্গস্ত্রীগণ, আর এই মহাবৃক্ষ থেকে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে মধুর স্রোতধারা। নানা তত্ত্ব এবং অধ্যাত্মচেতনাকে অবলম্বন করে কবির মানস-লোকে দৃষ্ট এই রূপচিত্রটি নিশ্চিতই এক অবর্ণনীয় ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ।

সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সচিব বীরসেনের উদয়গিরিতে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায় যে ঐ অঞ্চল ৮১তম গুপ্তসংবৎ অর্থাৎ ৪০১ খ্রীস্টাব্দে 'চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল। উদয়গিরির নিকট-সান্নিধ্যে অবস্থিত দশপুর যে ৪৬১ মালব সম্বৎসরে অর্থাৎ ৪০৪ খ্রীস্টাব্দে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রবল বৈদেশিক শত্রু শকদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান করে থাকলেও চন্দ্রগুপ্ত স্থানীয় অধিপতিদের অপসারিত করেন নাই। মান্দাসোরের এই লিপির সংস্থাপক নরবর্মণের পুত্র বিশ্ববর্মণ যে কুমারগুপ্তের আধিপত্য স্বীকার করত, ঐ মান্দাসোরে আবিষ্কৃত ৪৯৩ মালব সংবতের অর্থাৎ ৪৩৬ খ্রীস্টাব্দের বিশ্ববর্মণের নামসম্বলিত শিলালিপিতে তার প্রমাণ আছে। রাজস্থানের গাঙ্গধর নামে একটি গ্রামে নরবর্মণের পুত্র বিশ্ব-বর্মণের একটি শিলালেখতে 'চক্র-গদাধর' বিষ্ণুর মন্দিরের উল্লেখ থেকে মালব অঞ্চলে নারায়ণ-বিষ্ণুর ব্যাপক জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়[২৪] (চক্র-গদা-ধরস্য/ ...... বিষ্ণোস্থানম্ ...... কৈলাস-তুঙ্গ শিখরপ্রতিমস্য যস্য দৃষ্টাকৃতি)। মান্দাসোরে শিলাগাত্রে প্রাপ্ত বিশ্ববর্মণ ও তাঁর পুত্র বন্ধুবর্মণের লিপিতেও শার্ঙ্গী নামে পরিচিত বাসুদেব-বিষ্ণুর কৌস্তুভচিহ্নিত মূর্তি (কৌস্তুভ-মণিনেব শার্ঙ্গিণো বক্ষঃ) এবং উত্তুঙ্গ বৃহৎ মন্দিরের (বিকচ কমল-মালামংস-সক্তা শার্ঙ্গী/ভবনমিদ-মুদারং শাশ্বতস্তাবদস্তু) উল্লেখ আছে।[২৫] কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের অন্য এক প্রান্তে, পূর্বে, বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার অন্তর্গত বৈগ্রামে

আবিষ্কৃত ১২৮ গুপ্তসম্বতের (৪৪৮-৯ খ্রীস্টাব্দ) একটি তাম্রপট্টলীর কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই লিপিতে এখানে ভগবান গোবিন্দস্বামীর একটি দেবকুল অর্থাৎ মন্দিরের অস্তিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৬] বাসুদেব-কৃষ্ণের 'গোবিন্দ' নামে পরিচয় বৈষ্ণবীয় পুরাণগুলিতে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। বৈদিক বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত এই 'গোবিন্দ' চেতনা বাসুদেব-কৃষ্ণের বৃন্দাবন-জীবনের অলৌকিক গোবর্ধনধারণ উপাখ্যানের ভিত্তিতেই জনপ্রিয়তা এবং প্রসারলাভ করেছিল। ভগবান গোবিন্দের সেবাপূজার জন্য প্রতিষ্ঠিত এই দেবকুলের বর্ণনায় পুরাণবিহিত গোপালকৃষ্ণের জনপ্রিয়তার পরিচয় প্রতিষ্ঠিত আছে। কংসনিসূদন গোপালকৃষ্ণের জীবনকাহিনীকে অনেকে খ্রীস্ট-জন্মের পরবর্তী কালে উদ্ভূত বলে মনে করেন। ইতিপূর্বে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে কংসবধের উল্লেখের ভিত্তিতে গোপালরূপী কৃষ্ণের কাহিনী যে খ্রীস্টজন্মের বহু প্রাচীনকাল থেকেই পরিচিত ছিল সে-কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রখ্যাত নাট্যকার ভাসের রচিত 'বালচরিত', কালিদাসের দ্বারা গোপবেশধারী বিষ্ণুর উল্লেখ এবং বালকৃষ্ণের জীবনলীলার রূপায়ণে সৃষ্ট নানা ভাস্কর্যের ভিত্তিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গোবিন্দ নামের ব্যাপক স্বীকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবান বিষ্ণু-কৃষ্ণেব গোবিন্দরূপের আরাধনা যে গুপ্তরাজত্বকালে ভারতভূখণ্ডের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত প্রসারলাভ করেছিল, সৌরাষ্ট্রের জুনাগড়ে আবিস্কৃত স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালের ১৩৬/১৩৭।১৩৮ গুপ্তসংবতের (৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭ খ্রীস্টাব্দের) বিখ্যাত সুদর্শন হ্রদের জীর্ণোদ্ধার সম্পর্কিত লিপি থেকে সে-তথ্য উপলব্ধি করা যায়। (গোবিন্দপদার্পিত জীবিতেন/বিষ্ণোশ্চ পাদকমলে সমবাপ্য তত্র ॥) জুনাগড়ের লিপির প্রারম্ভিক অংশ বিষ্ণুচেতনার উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ। এই লিপিতে দৈত্যরাজ বলিকে দমন করে দেবরাজ ইন্দ্রকে স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী বামনরূপী বিষ্ণুর, এবং লক্ষ্মীর সঙ্গে অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত 'শ্রী' সম্পর্কে উদ্ভূত কাহিনী এবং চেতনার পরিচয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানকার রচনাটির মনো-হারিত্ব অতি অপূর্ব। (সিদ্ধম্/শ্রিয়মভিমতভোগ্যাং নৈককালাপনীতাং/ত্রিদশপতি-সুখার্থং যো বলিরাজহার ॥ কমলনিলয়নায়াঃ শাশ্বতং ধাম লক্ষ্ম্যাঃ/স জয়তি বিজিতার্তির্বিষ্ণুরত্যন্ত জিষ্ণুঃ ॥) বলি সম্পর্কিত উপাখ্যান, 'শ্রী' এবং 'লক্ষ্মী'র বিবরণ এবং গোবিন্দরূপে আখ্যাত গোপালকৃষ্ণ সম্পর্কিত বিবরণ সম্বলিত পুরাণ-কাহিনীগুলি যে গুপ্ত আমলের পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল এইসব তথ্য থেকে সে-

সিদ্ধান্ত নিশ্চিতরূপেই প্রতিষ্ঠা করা যায়।

পুরাণ সাহিত্যে গোপাল-কৃষ্ণকে গোবিন্দ আখ্যায় অভিহিত করে বিষ্ণুর সঙ্গে এক এবং অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়ে থাকলেও বিভিন্ন সাধনধারার সমন্বয় প্রতিষ্ঠা যুগপৎ সাধিত হয় নাই। মহাভারতে গোবিন্দ-চেতনার তেমন স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। ঐতরেয়-আরণ্যকে বা নারায়ণোপনিষদেও গোবিন্দ-চেতনার কোন উল্লেখ নাই। নারায়ণোপনিষদের বেশ কিছু পরবর্তী রচনা বলে নির্ণীত গোপালতাপনোপনিষদেই বিশেষ করে গোপালকৃষ্ণের ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৭] স্কন্দগুপ্তের জুনাগরের এই লিপিতে গোবিন্দের বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্নত্বের স্বীকৃতি নিশ্চিতভাবেই প্রতিষ্ঠিত আছে। ভাগবত সাধনার দুই প্রধান প্রবাহ যে গুপ্তরাজত্বকালেই পূর্ণ সমন্বয়ে মিলিত হয়েছিল এই লিপি থেকে সেই তথ্য নিশ্চিতরূপেই প্রতিষ্ঠা করা যায়।

স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে গুপ্তরাজকুললক্ষ্মী শত্রু আক্রমণে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। এই বিপর্যয় থেকে স্বভুজবিক্রমের সাহায্যে পরিত্রাণলাভের পর সম্রাট স্কন্দগুপ্ত স্বকীয় মাতৃদেবীকে কৃষ্ণজননী দেবকী রূপে কল্পনা করে আপন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন (বিপ্লুতাং বংশলক্ষ্মীং / ভুজবল বিজিতারির্য্যঃ প্রতিষ্ঠাপ্য ভূয়ঃ / জিতমিতি,পরিতোষাং মাতরং সাস্রনেত্রাং/হতরিপুরিব কৃষ্ণো দেবকীমভ্যুপেতঃ ॥)। শ্রীকৃষ্ণচেতনা যে অতি নিবিড়ভাবে গুপ্ত বংশে সন্নিবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, বিহার রাজ্যের বিহারশরিফে আবিষ্কৃত একটি শিলাস্তম্ভেও তার পরিচয় বিধৃত আছে। এই লিপিতে সম্রাটকে পরিচিত করা হয়েছে "নৃচন্দ্র ইন্দ্রানুজ তুল্য বীর্য্যোগুণৈবতুল্য" আখ্যায়। এই ইন্দ্রানুজ যে বাসুদেব-কৃষ্ণ, পুরাণ-বর্ণিত গোবিন্দাভিষেক কাহিনীতে তার উল্লেখ আছে।

বিষ্ণুমহিমা-প্রকীর্তনে রচিত কাব্য পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ করিয়েই স্কন্দগুপ্ত নিরস্ত থাকেন নাই, বীরের উপাস্য শার্ঙ্গীরূপী (শার্ঙ্গ অর্থাৎ ধনু-শর-হস্ত) বিষ্ণুর এক মহিমময় প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করেও স্কন্দগুপ্ত ভগবান বিষ্ণুর প্রতি তাঁর গভীর কৃতজ্ঞতা সম্ভূত আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছিলেন [(কর্তব্যা) প্রতিমা কাচিৎ প্রতিমাং তস্য শার্ঙ্গিণঃ / সুপ্রতীতশ্চকারেমাং (যাবদাচন্দ্রতারকম্) / ইহ চৈনং প্রতিষ্ঠাপ্য সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনঃ ॥]। 'পরমভাগবত' আখ্যায় পরিচিত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অতি গভীর অনুরাগসম্পন্ন স্কন্দগুপ্তই একমাত্র অধিপতি যাঁর নিজের দ্বারা একটি বিষ্ণুমন্দির

প্রতিষ্ঠার পরিচয় ভিটারি শিলাস্তম্ভটিতে সন্নিবিষ্ট পাওয়া যায়। প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের উপর আধিপত্যে অধিষ্ঠিত প্রভূত কীর্তিমান সম্রাট স্কন্দগুপ্তের দ্বারা এই বিষ্ণুমন্দির স্থাপনায় 'ভাগবত সাধনার' এক চূড়ান্তরূপের সন্ধান প্রতিষ্ঠিত আছে।

স্কন্দগুপ্তের অন্যতম উত্তরাধিকারী বুধগুপ্ত তাঁর রাজ্যসীমা অক্ষত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, এই তথ্য সাধারণভাবে স্বীকৃত আছে। তাঁর আধিপত্যকালে ১৬৫ গুপ্তসম্বতে (৪৮৪ খ্রীস্টাব্দ) মধ্যপ্রদেশের সাগরের সন্নিকটবর্তী এরাণে ধন্যবিষ্ণু নামে জনৈক সামন্তনৃপতির দ্বারা জনার্দন অর্থাৎ বাসুদেব-বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে একটি ধ্বজস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল[২৮] (জয়তি বিভুশ্চতুরর্ণব-বিপুল-সলিল-পর্যঙ্ক:/ জগতঃ স্থিত্যুত্পত্তি—ন্যয়াদি হেতুর্গরুড়কেতুঃ ॥)। এই স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপির প্রারম্ভে চতুরার্ণব-শায়ী চতুর্ভুজ যে দেবতার মহিমাকীর্তন করা হয়েছে সেই দেবতাকে যেমন অনায়াসেই নারায়ণ বলে উপলব্ধি করা যায়, তেমনি এখানে তাঁকে গরুড়কেতু আখ্যায় অভিহিত করায়, তিনি যে গরুড়বাহন বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্ন এই তথ্যও নিশ্চিতরূপেই প্রতিষ্ঠিত আছে। পুরুষ-নারায়ণ এবং গরুড়বাহন বিষ্ণুর অভিন্নত্বসূচক উল্লেখ বৈষ্ণব পুরাণগ্রন্থসমূহের পূর্বে যেমন নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায় না, এরাণের এই লিপির পূর্বগামী কোন প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণেও সেই চেতনা নাই। ভাগবত সাধনার বিবর্তনের দিক থেকে এরাণের এই স্তম্ভলিপিটিকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে ধার্য করা চলে। এরাণের লিপিতে উল্লিখিত এই রাজবংশের রাজন্যবর্গের বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় ঐ এরাণেই প্রতিষ্ঠিত অন্য একটি স্তম্ভে, যে শিলাস্তম্ভটি ভগবান নারায়ণের বরাহমূর্তির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (ভগবতো বরাহ মূর্তের্জগত্পরায়ণস্য নারায়ণস্য শিলা-প্রাসাদঃ)।[২৯] ভগবানের বরাহ-নৃসিংহাদি অবতারদের যে নারায়ণের অবতার রূপেই গণ্য করা হত, পুরাণের এই উপলব্ধির সমর্থনে এই শিলালেখটির বিশেষ গুরুত্ব স্বীকার করতে হয়। মধ্যপ্রদেশস্থিত নাগৌধের অন্তর্বর্তী 'কোহ' গ্রামে আবস্থিত ২০৯ গুপ্তসংবতের (৫২৯ খ্রীস্টাব্দের) একটি তাম্রপট্টলীতে ভাগবত সাধনপথে বাসুদেব-চেতনার পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পরিচয় বিধৃত আছে, এই সাধনপথের মূল দ্বাদশাক্ষর "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" মন্ত্রের উল্লেখে।[৩০] সুদূর অতীতে শুঙ্গ রাজত্বকালে বিদেশাগত জনৈক গ্রীক-ভক্তের দ্বারা গরুড়কেতু দেবদেব ভগবান বাসুদেবের উপাসনার প্রথম যে নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার পর দীর্ঘকাল অতীত হয়েছে। এই বিস্তীর্ণ কালপ্রবাহে নারায়ণ-

বিষ্ণু চেতনা ক্রমবিবর্তন পথে বাসুদেব সত্তার সঙ্গে অভিন্নত্ব অর্জন করে সমন্বয়-বাদী সাধনপথের এক পরম মহিমময় নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সাধন-পথে শেষ পর্যন্ত 'বাসুদেব' উপলব্ধিকেই তুলে ধরা হয়েছিল এক উত্তুঙ্গ মহিমায়, অপ্রমেয় নারায়ণ-বিষ্ণু চেতনার অধ্যাত্মস্বরূপের মূর্ত বিগ্রহ রূপে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ও তাঁর পরবর্তী গুপ্তসম্রাটগণের প্রয়াসে এই ভাগবত চেতনা প্রত্যন্ত পূর্বাঞ্চল গৌড়-বঙ্গের সীমা থেকে সুদূর সৌরাষ্ট্রের সাগর উপকূল পর্যন্তই শুধু প্রসারলাভ করে নাই, নাগবংশ-সম্ভূত মাতার গর্ভজাত চন্দ্রগুপ্ত-দুহিতা প্রভাবতী-দেবীর প্রয়াসে এই ভাগবত চেতনা দক্ষিণেও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করেছিল। সমসাময়িক কালে দক্ষিণাঞ্চলে আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত পল্লববংশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যেও যে ভাগবত চেতনা সঞ্চারলাভ করেছিল, পল্লবরাজ স্কন্দবর্মনের রাজত্ব-কালে ঐ রাজপরিবারের চারুদেবীর দ্বারা ভগবান নারায়ণের উদ্দেশ্যে প্রতি-স্থাপিত একটি দেবকুলের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত, গুন্টুর জেলার গুণপদেয় গ্রামে আবিষ্কৃত দানপট্টলীতে সেই তথ্য নিহিত আছে।[৩১] পল্লববংশের স্কন্দবর্মনের পৌত্র সিংহবর্মনের 'ভগবৎপাদানুধ্যাত' এবং 'পরমভাগবত' আখ্যা গ্রহণে গুপ্ত-রাজকুলে প্রচলিত ভগবতানুরাগ-নির্ভর 'পরমভাগবত' পরিচয়ের প্রভাব বিশেষ-ভাবেই লক্ষ করা যায়।

গুপ্তযুগের পরবর্তী রাজন্যবর্গের মধ্যে শৈবসাধনার প্রসার

১৮৮ গুপ্তসম্বতে (খ্রীস্টীয় ৫০৭ অব্দে) সম্পাদিত বাংলাদেশের গুণাইঘরে আবিষ্কৃত মহারাজ বৈণ্যগুপ্তের তাম্রপট্টলীতে বৈণ্যগুপ্তকে 'ভগবন্মহাদেবপাদানুধ্যাত' আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। গুণাইঘর পট্টলীতে উল্লিখিত বৈণ্যগুপ্ত প্রখ্যাত গুপ্তবংশেরই শরিক ছিলেন, প্রচলিত এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে বলা চলে যে, বৈণ্যগুপ্ত গুপ্তরাজবংশে ভাগবত সাধনার পরিবর্তে শৈবসাধন পথের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। গুপ্ত রাজপরিবারে সাধনপথের এই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের পর গুপ্ত রাজবংশের আধিপত্য আর দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। মালবাঞ্চল থেকে উদ্ভূত যশোবর্মনের আক্রমণে গুপ্তপ্রাধান্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এর পর গুপ্তরাজশক্তি আর অধিককাল অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে নাই। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গুপ্তপ্রাধান্যের অবসানের পরে ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যে-সব রাজন্যবর্গের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, তাঁদের প্রায়

সকলেই শৈব সাধনপথের অনুগামী ছিলেন বলে লক্ষ করা যায়। গুপ্তোত্তর যুগে উদ্ভূত প্রভৃত শক্তিধর যশোবর্মন, মৌখরী রাজবংশের রাজন্যবর্গ, গৌড়-বঙ্গের গোপচন্দ্র ও শশাঙ্ক এবং শশাঙ্কের প্রতিদ্বন্দ্বী কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্ধন (বাঁশখেড়ালিপি) শৈব সাধনপথের অনুগামী ছিলেন, তাঁদের অনুশাসনাবলিতে এই তথ্য বিধৃত আছে। হর্ষবর্ধনের রাজত্বের অবসানে ভারত ভূভাগে খণ্ড খণ্ড বহু রাজ্যের উদ্ভব ঘটেছে। সেইসব রাজ্যে বহু ক্ষমতাশালী রাজন্যের আবির্ভাব হয়ে থাকলেও গুপ্তরাজবংশের মতো তেমন বিস্তৃত সাম্রাজ্যের উপর আর কোন রাজবংশ কখনও তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে নাই। আর হর্ষবর্ধনের রাজ্যাবসানের পর প্রধান প্রধান যে-সমস্ত রাজবংশ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং রাজ্যশাসনে সাফল্য অর্জন করেছিল তাদের মধ্যে গৌড়-বঙ্গের বৌদ্ধসাধনপথানুগামী পাল রাজবংশ ভিন্ন দক্ষিণভারত-সমুদ্ভূত প্রতিহার বংশ, দক্ষিণ ভারতের চালুক্য, রাষ্ট্রকূট এবং চোল রাজবংশ, উত্তর এবং মধ্যভারতের গাহড়বাল, জেজাকভুক্তির চাহমান, গুজরাটের শোলাঙ্কি রাজবংশ এবং রাজস্থানের মেবারের বিখ্যাত গুহিলোটবংশের প্রায় সকলেই একান্তভাবে শৈবসাধন পথের অনুগামী ছিল। গৌড়-বঙ্গের নাগবংশীয় অধিপতি জয়নাগ, এবং পরবর্তী যুগের রাজবংশের শ্রীধরণরাত, এবং সেনবংশের লক্ষণসেন, গাহড়বাল বংশের শেষ অধিপতি মহারাজাধিরাজ জয়চন্দ্র ইত্যাদি কচিৎ কদাচিৎ ভাগবত সাধনানুরাগীর আবির্ভাব ঘটে থাকলেও ভাগবত সাধনপথ আর তেমন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে নাই। এই দিক থেকেই বলা চলে যে, ভারতের সাংস্কৃতিক মানসপটের রূপ পরিবর্তনে গুপ্তরাজন্যবর্গ যে ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার তুলনা পাওয়া যায় না। কুরুক্ষেত্র সংগ্রামের পরে প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃতির ক্রম-অবনমন, বিরুদ্ধবাদী লৌকিক সংস্কৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংঘাত এবং বেদ-বিরোধী মাগধ শক্তির অভ্যুত্থান, মহাপদ্ম-নন্দের দ্বারা রক্ষণশীল বৈদিক সংস্কৃতির পরিপোষক ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের উৎসাদনে ভারতব্যাপী রাজন্যমণ্ডলে প্রভূত দুর্বলতা এবং অস্থিরতার সঞ্চার হয়েছিল। এই দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রতিষ্ঠালাভে সক্ষম হয় বেদবিরোধী বৌদ্ধ এবং কিছু পরিমাণে জৈন মননচর্যা; অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার ফলে অনুপ্রবেশের সুযোগ ঘটে বিদেশাগত গ্রীক-শক-কুষাণ ইত্যাদি আক্রমণকারী শক্তির। এই বিপর্যয়কর পরিবেশে ছিন্ন-ভিন্ন ভারতবর্ষকে সংহত এবং সন্নিবদ্ধ করে গুপ্ত রাজবংশ এক

নূতন জীবনপ্রবাহের সৃষ্টি করে ভারত জনগোষ্ঠীতে এক অপ্রমেয় জীবন-চেতনার সঞ্চার করে দিয়েছিল। এই গুপ্তরাজত্বকালেই এক প্রলয়ঙ্কর বিপদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল হুন নামে পরিচিত নির্মম ধ্বংসের প্রতীকরূপে। এই হুনশক্তিরই অন্য একশাখা হুনগোষ্ঠীপতি অ্যাটিলার নেতৃত্বে ইউরোপে প্রবেশ করে ঐশ্বর্য-সম্পদে সমৃদ্ধ বিপুল রোমক সাম্রাজ্যকে ধ্বংসে পরিণত করেছিল। গুপ্তরাজন্য-বর্গের প্রতিঘাতে হুনশক্তির ধ্বংসপ্রবণতা পুনর্জাগ্রত ভারতসংস্কৃতির দ্বারা প্রতিহত হয়ে ভারতীয় রূপ গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল।

পরস্পরে প্রবল বিচ্ছিন্নতার ফলে ছিন্নভিন্ন ভারত যখন ঘোর বিপর্যয়ে নিমগ্ন, সেই গভীর অবলুপ্তি থেকে সমগ্র পরিবেশকে পুনরুত্তোলনের কৃতাটিকে বরাহরূপে ভগবান নারায়ণ-বিষ্ণুর দ্বারা প্রলয়পয়োধিতে নিমজ্জিত পৃথিবীর উদ্ধারের সঙ্গে সহজেই তুলনা করা চলে। বরাহ ভগবানের সেই অলৌকিক কৃত্য সম্পর্কে অনুধ্যান গুপ্তরাজত্বকালে জনমানসকে বিশেষভাবেই অনুপ্রাণিত করেছিল, তার বহু প্রমাণ আছে। গুপ্তসাম্রাজ্যের অধিরাজত্বভুক্ত এরাণের স্থানীয় সামন্ত-অধিপতি মাতৃবিষ্ণু ও তাঁর অনুজ ধন্যবিষ্ণুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গুপ্তসম্বৎ ১৬৫ অব্দে (৪৮৪ খ্রীস্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত বিপুল সলিলপর্যঙ্ক গরুড়কেতু নারায়ণের স্তুতি সম্বলিত একটি স্তম্ভের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ স্তম্ভ প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে, ৫০০ থেকে ৫১৫ খ্রীস্টাব্দের অন্তর্বর্তী কোন সময়ে পূর্বোল্লিখিত ধন্যবিষ্ণু ঐ এরাণেই ভগবান নারায়ণের প্রীত্যর্থে পুনরায় একটি স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কালের এই ব্যবধানে এরাণের বিষ্ণু উপাধিযুক্ত পরিবারকে এক ঘোর বিপর্যয় অতিক্রম করতে হয়েছিল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা মাতৃবিষ্ণুর ইতিমধ্যে দেহাবসান ঘটেছিল আর মহাবিপর্যয়কারী হুন অধিনায়ক তোরমানের দ্বারা ধন্যবিষ্ণুর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ধন্যবিষ্ণুর এই স্তম্ভে সলিলপর্যঙ্ক নারায়ণের স্তুতির পরিবর্তে আত্মপ্রকাশ করেছে পৃথিবী-উদ্ধারকারী বরাহরূপী নারায়ণের স্তুতি—"জয়তি ধরণ্যুদ্ধরণে ঘন-ঘোণাঘাত-ঘূর্ণিত-মহীভৃঃ/দেবো বরাহমূর্তিস্ত্রৈলোক্য—"। "জগৎপারায়ণ নারায়ণের" বরাহরূপের প্রতি এই গভীর আকৃতি যে ধন্যবিষ্ণুর দ্বারা বিপর্যয়কর হুনপ্লাবন থেকে উদ্ধারলাভের জন্যই উৎসারিত হয়েছিল, এ কথা অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। ঋগ্বেদে 'এমুষা' নামে অভিহিত বরাহ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে (পৃঃ ৮৪)। গুপ্তরাজত্বকালে গভীর প্লাবনে নিমজ্জিত পৃথিবীর উদ্ধারকারী বরাহরূপের জনপ্রিয়তার যে বেশ

কিছু ঐতিহাসিক তাৎপর্য ছিল একথা অনায়াসেই অনুমান করা যায়। ভাগবত পুরাণে বরাহরূপধারী নারায়ণের পৃথিবী উদ্ধারের বিস্তৃত বিবরণ আছে (স্বদংষ্ট্রয়োদ্ধৃতমহীং নিমগ্নাং স উত্থিতঃ সংরুরুচে রসায়াঃ / ৩।১৩ : ৩১)। পুরাণের মতে মনুর অনুরোধে যজ্ঞলিঙ্গ বরাহ দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের দ্বারা প্লাবিত (অধিকৃত) পৃথিবীকে উদ্ধার করে সেই পৃথিবীতে দেবতাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বস্তুত বিপুল পরাক্রান্ত বরাহের প্রতি এই গভীর ভক্তির নিবেদনে সমসাময়িক কিছু ঐতিহাসিক পরিস্থিতির বর্তমানতাই যে ক্রিয়াশীল ছিল এই সন্দেহ জাগ্রত হওয়া অযৌক্তিক নয়।

ধন্যবিষ্ণুর এই বরাহস্তুতির পরিপ্রেক্ষিতে এই অঞ্চলের নিকট সান্নিধ্যে অবস্থিত উদয়গিরির পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ পৃথিবী-উদ্ধারকারী বরাহ ভগবানের প্রভূত মহিমময় শিলা-চিত্রের প্রসঙ্গ এখানে স্মরণে না এসে পারে না। বৃহৎ শিলাপৃষ্ঠকে প্রশস্ত পটভূমি রূপে ব্যবহার করে এখানে শিল্পী আপন রূপোপলব্ধির যে পরিচয় রেখে গিয়েছেন, বিপুল শক্তিগর্ভ ভাস্কর্যসৃষ্টির নিদর্শন হিসেবে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ইচ্ছাবিধৃত দেহশক্তির এক বিপুল রূপায়ণ এই বরাহ-মূর্তিকে আকীর্ণ করে রেখেছে। উত্তুঙ্গ গঠনের পরিমিত বিন্যাস, বর্তুল দেহের নিষ্কম্প সংহতি, দংষ্ট্রোধৃত ভূদেবীর কমনীয় দেহলালিত্য, বহু ফণায় শোভিত মস্তক, বদ্ধাঞ্জলী নাগরাজের মূর্তি, সমান্তরাল পটবিন্যাসে স্তুতিপরায়ণ শ্রেণীবদ্ধ দেবতা ও ঋষিদের মূর্তির সন্নিবেশে এখানে প্রভূত ব্যঞ্জনাময় এক মহাদৃশ্যের প্রতি-ফলন রূপায়িত হয়েছে, ইতিহাস পটের এক বিস্ময়কর প্রতীক হিসেবে। (চিত্র ৮)

সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবী উদ্ধারের এই বিপুলায়তন রূপচিত্রটির প্রতীকী ইঙ্গিত ইতিহাসবেত্তাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। মহাকবি ভাস তাঁর রচিত মুদ্রারাক্ষস নাটকে মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের বিজয়কীর্তিকে বরাহের দ্বারা পৃথিবী উদ্ধারের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।[৩২] প্রখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সরণ আগরওয়াল অনুমান করেছিলেন যে উদয়গিরির বরাহমূর্তিটি চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমা-দিত্যের দ্বারা বিস্তৃত রাজ্যজয়ের প্রতীক রূপেই উৎকীর্ণ হয়েছিল। বহিরাগত শক-কুষাণ শক্তির দ্বারা বিপর্যস্ত ছিন্নভিন্ন ভারত ভূখণ্ডকে আপন অপ্রমেয় শৌর্যের দ্বারা সামগ্রিকভাবে উদ্ধারের কৃতিত্ব চন্দ্রগুপ্ত অপেক্ষা সম্রাট সমুদ্রগুপ্তেরই বিশেষভাবে প্রাপ্য। সমুদ্রগুপ্তের উদ্দেশ্যে হরিষেণ-রচিত প্রশস্তিতে সম্রাটকে গরুড়-প্রতীকী-অচিন্ত্য-পুরুষ অর্থাৎ 'পুরুষ-নারায়ণের' অবতার রূপে উপস্থিত করা

হয়েছে, যে প্রশস্তির বর্ণনায় সম্রাটের বিজয়কীর্তিকে পৃথিবী উদ্ধারের সঙ্গে তুলনার আভাস সুস্পষ্ট ('বাহুবীর্য প্রসর ধরণি বন্ধস্য পৃথিব্যামপ্রতিরথস্য।' এবং 'মহারাজাধিরাজ শ্রীসমুদ্রগুপ্তস্য—সর্ব্ব' পৃথিবী বিজয় জনিতোদয় ব্যাপ্ত নিখিলা-বনিতলাং কীর্তি')।[৩৩] অমিতবীর্যবত্তা, অলৌকিক গুণাবলী এবং বিপুল কীর্তির জন্যই সমুদ্রগুপ্তকে নারায়ণ বিষ্ণুর অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, যাঁর তুলনাহীন প্রভাবে ভারত ভূখণ্ডে এক অনন্যপূর্ব সংহতি এবং সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভাগবত সাধনক্রমে দীক্ষিত পুত্র চন্দ্রগুপ্তের দ্বারাই সম্ভবত সমুদ্রগুপ্ত উপাস্য দেবতার অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত নিজে পরম-ভাগবত অর্থাৎ ভগবানের ভক্ত রূপে পরিচয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁকে বরাহরূপে উপাস্যে পরিণত করবার কোন যুক্তি ছিল না। উদয়গিরির মহাবরাহকে এই যুক্তিতে সমুদ্রগুপ্তের প্রতীকরূপেই কল্পনা করা হয়েছিল বলে অনুমান করা সমীচীন।

নারায়ণ-চেতনার গভীরতা এবং বিস্তৃতি সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি এই যুগে শিল্পের ক্ষেত্রেও যে বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, বহু শিল্প-নিদর্শনে তার পরিচয় আছে। এইসব নিদর্শনের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত দেওগড়ের মন্দিরের বাহির্দেশের তিন দেওয়ালে সন্নিবিষ্ট মূর্তিসমূহকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। ভগবান বিষ্ণু-নারায়ণের মূর্তির উদ্ভব এবং বিকাশের ক্ষেত্রে পশ্চিমে তক্ষশিলা এবং পূর্বে হাঁকরাইলের চতুর্ভুজ মূর্তির কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। (চিত্র ৫-৬) নারায়ণ-চেতনা সূত্রেই যে বিষ্ণু-বাসুদেবের চতুর্ভুজ মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছিল, দেওগড়ের মন্দিরপ্রাচীরে সন্নিবিষ্ট উপবেশনরত নর-নারায়ণের মূর্তিদ্বয় থেকে শতপথ ব্রাহ্মণ তথা মহাভারতে বর্ণিত নারায়ণ-চেতনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। লালিত্যপূর্ণ ঘনডৌলের অপূর্ব দেহ-গঠনে সমৃদ্ধ এই মূর্তিদ্বয় যে মহাভারতে বর্ণিত বদরিকাশ্রমে অবস্থিত নারায়ণ এবং নর নামে অভিহিত দুই ঋষির মূর্তি, এ তথ্য ব্যাপক ভাবেই স্বীকৃত হয়েছে। এই মূর্তিদ্বয়ের মধ্যে অন্যতম, দর্শকের বাম দিকে প্রতিষ্ঠিত, গভীর অধ্যাত্মচেতনা সমৃদ্ধ চতুর্ভুজ মূর্তিটিকে নারায়ণের মূর্তি রূপে অনায়াসেই চিহ্নিত করা যায়। বদরিকাতে অবস্থিত ঋষি নারায়ণের চতুর্ভুজ আকৃতির কোন বর্ণনা শতপথ ব্রাহ্মণে নাই। কিন্তু অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে মহর্ষি ভৃগু বদরিকাশ্রমে উপনীত হয়ে চতুর্ভুজ নারায়ণকে লক্ষ্মীদেবী কর্তৃক পদসেবায় রত শয়ান অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন।

বাসুদেব মূর্তির চতুর্ভুজ রূপের পরিকল্পনার উদ্ভব সম্পর্কে নিশ্চিত কোন তথ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অভিজ্ঞ মূর্তিবিজ্ঞান-সন্ধানী পণ্ডিতেরা ভারতীয় দেবমূর্তি পরিকল্পনায় একাধিক মস্তক, একাধিক চক্ষু এবং হাতের সমাবেশকে উদ্দিষ্ট দেবতার অলৌকিকত্ব, শক্তিমত্তা, দৃষ্টির প্রসারতা এবং ভুজবলের অপ্রমেয়তার পরিচায়ক বলেই সিদ্ধান্ত করেছেন। ঋগ্বেদে অনেক দেবতার অসংখ্য চক্ষু এবং হাতের অস্তিত্বের পরিকল্পনা সন্নিবিষ্ট আছে। ঋগ্বেদে পূর্বকাল থেকে প্রচলিত যে-সব অসুর আখ্যায় অভিহিত উপাস্যের উল্লেখ আছে—বরুণ, সবিতৃ, পুষণ, রুদ্র ইত্যাদি সেইসব উপাস্যের ক্ষেত্রে চক্ষুর এবং হস্তের আধিক্যের উল্লেখ দেখা যায়। আদিত্য পরিচয়ে প্রচলিত এইসব উপাস্য ছিলেন মূলত সূর্যেরই প্রকারভেদ। সূর্য থেকে নির্গত অসংখ্য রশ্মিই সেখানে বহু চক্ষু এবং হাত রূপে পরিকল্পিত হয়েছিল।

বৈদিক চেতনার এই পরিপ্রেক্ষিতেই ভক্ত এবং সখা অর্জুনকে ভগবান বাসুদেবের দ্বারা স্বকীয় বিশ্বরূপ প্রদর্শনের বর্ণনার পুনরায় উল্লেখ করা যেতে পারে। ভক্ত অর্জুন পুরুষোত্তম বাসুদেবের ঐশ্বরীয় রূপ সন্দর্শনের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করলে ভগবান বাসুদেব আত্মস্বরূপকে প্রসারিত করে যে আকৃতি প্রদর্শন করেছিলেন, বাসুদেবের আনুকূল্যে দিব্যনয়ন লাভ করে অর্জুন মহিমময় সেই রূপের দর্শনলাভ করেছিলেন। ভগবদ্গীতায় একাদশতম অধ্যায়ে অর্জুনের সম্মুখে অলোকসামান্য বিশ্বরূপ প্রকাশের যে বর্ণনা আছে তার আরম্ভে লক্ষ করা যায় যে অর্জুন প্রথমেই বাসুদেবের কিরীট-শোভিত, গদা এবং চক্রধারী রূপে নিজের প্রকাশ লক্ষ করেন। ক্রমে সেই রূপ থেকে অনেক বাহু, অনেক উদর, অনেক মুখ এবং অনেক নেত্রের প্রকাশ এবং সেই রূপের করালদংষ্ট্রাব্যাদনকারী সর্বান্তক প্রলয়ঙ্কর ক্রিয়াকলাপ সন্দর্শনে মহাভীতিগ্রস্ত হয়ে আকুলভাবে বাসুদেবকে তাঁর সংহৃত, প্রথম দৃষ্ট রূপে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করেছিলেন। এই প্রার্থনায় বিশেষ করেই আবেদন জানান হয় ভগবান বিশ্বরূপের সহস্রবাহু সত্তাকে সম্বরণ করে তাঁর মহনীয় প্রথমে দৃষ্ট, কিরীট-শোভিত, গদা-চক্রধারী চতুর্ভুজ আকৃতি গ্রহণের (অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে / তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তম্ ইচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব / তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে॥)। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পরিবর্তিত এই রূপ ধারণের

প্রথমেই অর্জুন বাসুদেবের আকৃতিতে লক্ষ করেছিলেন কমলাসনস্থ ব্রহ্মাকে, দিব্য উরগের সান্নিধ্যে। অনেকে বলতে চেয়েছেন যে ভগবদ্গীতায় নারায়ণের কোন উল্লেখ নাই এবং গীতার আবির্ভাবকালে ভগবান বাসুদেবের নারায়ণের সঙ্গে একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পুরুষ-বিশ্বরূপের যে রূপ বাসুদেব প্রথম অর্জুনের নিকট প্রকট করেছিলেন, কিরীট-গদা-চক্র-শোভিত সেই রূপ যে নারায়ণেরই রূপ, কমলাসনস্থ ব্রহ্মা এবং দিব্য উরগ অনন্তের উল্লেখের ভিত্তিতে এই তথ্যই নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে বলা চলে। প্রাক্-বৈদিক চেতনা-সম্ভূত সহস্রহস্ত সবিতা-বিশ্বরূপই যে ভগবান বাসুদেব চতুর্ভুজ দেবতারূপে প্রকাশ করেছিলেন, নারায়ণ-বিষ্ণুর চার হাত গ্রহণের রহস্য ভগবদ্গীতার সেই বিশ্বরূপ উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত আছে। শুধু অতিমহিমান্বিত, প্রসন্নবদন নারায়ণ-বিষ্ণুরূপী বাসুদেব মূর্তিতেই নয়, বিশ্বেশ্বর নামে পরিচিত তিনমুখ সম্বলিত মূর্তি,ভগবান রুদ্র শিবের তৃতীয় নয়ন, এবং বিভিন্ন দেবদেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আধিক্যসম্পন্ন মূর্তির দার্শনিক ভিত্তি যেসকল চেতনার মূল রূপে পরিকল্পিত সেই পুরুষ-বিশ্বরূপ চেতনা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ সেই বিশ্বরূপই সকলরূপের মূল। এক মৌলিক সত্তাই যে সকল রূপের উদ্ভবের কারণ, ভারতীয় উপলব্ধিতে এই চেতনা সুপ্রাচীন কাল থেকেই বর্তমান, ঋগ্বেদের একটি মন্ত্র থেকে এই তথ্যটি অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়। এই মন্ত্রে বলা হয়েছে যে একই মৌলিক রূপ থেকেই সকল রূপের উদ্ভব ঘটেছে—রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। তদস্য রূপং পরিচক্ষণায় (ঋগ্বেদ ৬।৪৭ : ১৮)। ঋগ্বেদে উল্লেখ আছে যে বহু-রূপের স্রষ্টা ত্বষ্টৃ নিজেও ইচ্ছামতো রূপ সৃষ্টি বা ধারণ করতে পারতেন। এই সামর্থ্যের ভিত্তিতেই ত্বষ্টৃকে দেবতা রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর বিশ্বরূপ পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইন্দ্রও ইচ্ছানুসারে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারতেন, ঋগ্বেদে এই তথ্যেরও উল্লেখ আছে (রূপং রূপং মঘবো বা ভবীতি—ঋগ্বেদ ৩।৫৩ : ৮ ; ইন্দ্র মায়াভিঃ পুরুরূপো ইয়তো—ঐ ৬।৪৭ : ১৮)। পরবর্তী যুগে বিভিন্ন উপনিষদে ঋগ্বেদে সন্নিবিষ্ট এই চেতনারই প্রতিধ্বনির সমাবেশ দেখা যায়। (অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপং বভূব/একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপং বহিশ্চ ॥)

সকল দৈবী চেতনার মূল একত্ব ঋগ্বেদে বর্ণিত 'একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি' (১।১৬৪ : ৪৬) এইউক্তি থেকেই বিবর্তিত হয়েছে, মূলতপুরুষ-বিশ্বরূপ চেতনাকে

অবলম্বন করে। উপনিষদ এবং পুরাণে এই চেতনাকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রয়াস অত্যন্ত স্পষ্ট। ইতিপূর্বে নারায়ণোপনিষদে সন্নিবিষ্ট এই প্রয়াস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পদ্মপুরাণে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ এই রূপ "যো বিষ্ণু স স্বয়ং ব্রহ্মা যো ব্রহ্মা স স্বয়ং হরঃ/দেবাস্ত্রয়েঽপি যজ্ঞেঽস্মিন্নিজ্যা দেবেষু নিত্যশঃ (পাতালখণ্ড, ৫৯,৩৭)। পদ্মপুরাণ আরও বলছে "আদিত্যং গণনাথঞ্চ দেবী শিবং যথাক্রমম্ নারায়ণ বিশুদ্ধাখ্য"—ইত্যাদি। গুপ্তরাজত্বকালে বিশেষভাবে অনুশীলিত এই সমন্বয় প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি হরি-হর পরিকল্পনা, সূর্য-নারায়ণ পরিকল্পনা ইত্যাদি মিলিত সত্তা সম্পর্কিত রূপের বিকাশে। এই ঐক্য চেতনার এক অতি নিশ্চিত নির্দেশ লক্ষ করা যায় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গণেশ খণ্ডে, যেখানে বলা হয়েছে—"নারায়ণে গণে শিবেঽঅম্বিকা যা ভাস্করে তথা/ভেদাভেদো ন কর্তব্যঃ পঞ্চদেব সমুস্তবে।" সমাজে শান্তিপ্রতিষ্ঠা এবং সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য এই সমন্বয় এবং সাম্য বোধের সবিশেষ প্রয়োজন ছিল। প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির অন্যতম, প্রবল রক্ষণশীল বেদানুগামী সমাজের দুর্বলতা একসময় বিশেষ প্রকট হয়ে উঠেছিল। অবৈদিক 'লোক' শক্তির অভ্যুত্থানকে আর খর্ব বা সংযত করে রাখা সম্ভবপর হচ্ছিল না। সমাজের এই দুর্দিনের পরিপ্রেক্ষিতেই সুপ্রাচীন শতপথ ব্রাহ্মণ, উপনিষদ এবং মহাভারত রচনার কাল থেকে এই সমন্বয় প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে লক্ষ করা যায়।

উদয়গিরি পর্বতপ্রাচীরে সন্নিবিষ্ট পৃথিবী-উদ্ধারকারী মহাবরাহ মূর্তিতে সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা পৃথিবী উদ্ধাররূপঅলৌকিক কৃত্যের প্রতিফলন ছিল বলে যদি স্বীকার করা যায়, তবে পূর্ববর্ণিত দেওগড়ের মন্দিরের অন্য এক প্রাচীরের প্রখ্যাত গজেন্দ্রমোক্ষ কাহিনীর পটবিন্যাসকে এই সাম্যপ্রতিষ্ঠার অন্য একটি উল্লেখযোগ্য প্রতীক বলে ধার্য করা আযৌক্তিক হবে না। এই ভাস্কর্য-ফলকটিতে রূপায়িত আছে দুই প্রবল বিবদমান প্রতিদ্বন্দ্বীর মরণপণ সংগ্রামের বিস্ময়কর এক ভাস্কর্য চিত্র। এই বিবদমান দুই পক্ষের একটি এক পর্বতাকৃতি গজরাজ, অন্যটি বিপুল সামর্থ্যসম্পন্ন এক উরগপ্রধান বা সর্প, যাকে পুরাণে বর্ণনা করা হয়েছে 'গ্রাহ' এই আখ্যায়। ইতিপূর্বে এই কাহিনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে পুরাণে কিভাবে 'গ্রাহ'-গ্রস্ত গজরাজের প্রার্থনায় ভগবান বিষ্ণু-নারায়ণ সেই মহাদ্বন্দ্বের নিবৃত্তিসাধন করে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে-কথার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রভূত নাট্যগুণে সমৃদ্ধ, সবিশেষ গতিপ্রবণ এই দৃশ্যপটটিকে গুপ্তযুগের ভাস্কর্যশৈলীর

অপ্রমেয় দক্ষতার পরিচয়বহ বলে গণ্য করা যেতে পারে। দ্বন্দ্বক্ষেত্রের কিছু উর্ধ্বে রূপায়িত চতুর্ভুজ গরুড়ারূঢ় ভগবান নারায়ণ-বিষ্ণুর দেহে এবং আননে পরম প্রশান্তি। প্রবল আলোড়নে সংক্ষুব্ধ কমল-ক্ষেত্রে ভগবানের উপস্থিতিতে নেমে এসেছে গভীর স্থিরতা, পরিসমাপ্তি ঘটেছে সেই ঘোর দ্বন্দ্বের। গ্রাহ-পাপ-মুক্ত গজরাজ তার তুণ্ড-উত্তোলন করে জানাচ্ছেন বিপদমুক্তি বিধানের জন্য ভগবান নারায়ণ-বিষ্ণুর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। অন্যদিকে বহু-ফণা-শোভিত নাগরাজ তাঁর হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করে প্রার্থনা করছেন ভগবানের আশীর্বাদ। (চিত্র ১০)

দেওগড়ের মন্দিরের এই ভাস্কর্যচিত্রটি যে নারায়ণ মহিমা প্রতিষ্ঠা-কল্পেই রূপায়িত হয়েছিল, মন্দিরের পশ্চাদ্‌বর্তী প্রাচীরে সন্নিবিষ্ট অনন্তশায়ী নারায়ণের মূর্তিটিতে সেই তথ্যের ইঙ্গিতই সুস্পষ্টভাবে বিধৃত আছে। পরম মহিমান্বিত, গভীর আধ্যাত্মিক চেতনার যে পরিচয় ইতিপূর্বে মাণ্ডাশোরের লিপির "সহস্রশিরসে তস্মৈ পুরুষায়ামিতাত্মনে/চতুস্‌সমুদ্র পর্যঙ্কতোয় নিদ্রালবে নমঃ" এই বর্ণনায় লক্ষ করা গিয়েছে—দেওগড়ের এই অপূর্ব রূপচিত্রটিতে তারই এক গভীর মহিমান্বিত প্রতিরূপায়ণ বিধৃত আছে। পর্যঙ্করূপী নাগদেহই অনন্ত সমুদ্র, সহস্রশীর্ষ তার ফণা সমুদ্রের বহুশীর্ষযুক্ত উর্মির প্রতীক। নারায়ণো-পনিষদের "অন্তস্থ পারে ভুবনস্থ মধ্যে নাকস্থ পৃষ্ঠে মহতোমহীয়ান্‌" আখ্যায় বর্ণিত ভগবান নারায়ণকেই এখানে প্রতিমায়িত করা হয়েছে গভীর আবেগ এবং অনুরাগের সঙ্গে। দেওগড় মন্দিরে নারায়ণ-চেতনার এই শিল্পগত অভিরূপায়ণকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নারায়ণ-বাসুদেব-বিষ্ণুর উপনিষদীয় চিন্তা সমুদ্ভূত গভীর অধ্যাত্ম-চেতনার এক পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি বলে অভিহিত করা যেতে পারে (চিত্র ৯)। অনন্তরূপী পালঙ্কের উপরে শায়িত সীমাহীন স্নেহ এবং প্রশান্তির মূর্ত বিগ্রহ ভগবান নারায়ণের মূর্তির উর্ধ্বে ভগবানের নাভিপীঠ থেকে উত্থিত পূর্ণ বিকশিত পদ্মের উপর জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা উপবিষ্ট। ব্রহ্মার দক্ষিণ ভাগে ঐরাবতপৃষ্ঠে দেবরাজ ইন্দ্র এবং ময়ূরারূঢ় দেবসেনাপতি স্কন্দ-কার্তিকেয়; বামে বৃষভারূঢ় মহেশ্বর শিব, সঙ্গে পার্বতী। এই দৃশ্যফলকে মহিমময় নারায়ণের আবেষ্টনীতে লৌকিক জনমণ্ডলীর উপাস্য রুদ্র-শিবের সঙ্গে বেদানুগামী সংস্কৃতির দেবতা ইন্দ্রের সহাবস্থানে, সমন্বয়-চেতনার উপলব্ধি এবং প্রতিরূপায়ণের সাক্ষ্যটি নিশ্চিত-ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতীয় উপলব্ধির বহু বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে দেওগড়ের 'দশাবতার' মন্দির নামে অভিহিত এই মন্দিরে নারায়ণ মহিমার প্রতিষ্ঠাকে

সাংস্কৃতিক সমন্বয়-প্রচেষ্টার দীর্ঘপ্রসারী প্রয়াসের এক অচিন্তনীয় রূপকীর্তি বলে গণ্য করা চলে।

নারায়ণ-বাসুদেব-বিষ্ণু মূর্তিতে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী মূর্তির সমাবেশ রহস্য

দেওগড়ের অনন্তশায়ী চিত্রটিকে জগৎপ্রকৃতিরূপিণী নারীশক্তির প্রতীকরূপে পরিকল্পিত মহালক্ষ্মীর সঙ্গে ভগবান নারায়ণের সংযোগের প্রথম শিল্পগত উপস্থিতি বলে গণ্য করা চলে। জগৎকারণ অনন্তসত্তার ক্রিয়াশীল অভিপ্রকাশকেই প্রকৃতি আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। পরমা শক্তিরূপী 'প্রকৃতি' সম্পর্কিত চেতনা অতি প্রাচীন। শক্তি-সাধনপথ তথা তান্ত্রিক ধারার অনুগামীরা শক্তিরূপিণী প্রকৃতি সম্পর্কে চেতনাকে কালাতীত বলেই গণ্য করে থাকেন। ঋগ্বেদে কিন্তু অতি প্রাচীন বলে পরিকল্পিত এই লক্ষ্মীর কোন উল্লেখ নাই। পরবর্তীকালে লক্ষ্মী এবং 'শ্রী' অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। ঋগ্বেদে 'শ্রী' শব্দের উল্লেখ থাকলেও কোন দেবীর শ্রী-নামে পরিচয় প্রতিষ্ঠিত নাই। 'শ্রী-সূক্ত' নামে পরিচিত ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত কিছু মন্ত্রের সমষ্টিকে ভিত্তি করে শ্রী-লক্ষ্মীকে ঋগ্বেদসম্ভূত রূপে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস হয়েছে। কিন্তু শ্রী-সূক্তের রচনাকাল নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ঋগ্বেদের পরবর্তী বিভিন্ন গ্রন্থে শ্রী এবং লক্ষ্মীকে নিয়ে নানা বিভ্রান্তির উদ্ভব ঘটেছে। যে শতপথ ব্রাহ্মণে নারায়ণ-চেতনার প্রথম উল্লেখ পরিলক্ষিত হয় সেই শতপথ ব্রাহ্মণেই প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রথম দেবী রূপে শ্রী-র উল্লেখ পাওয়া যায় (১১।৪।৩:১) । এখানে বর্ণিত আছে যে প্রজাসৃষ্টির জন্য বহু তপস্যার ফলে শ্রান্ত প্রজাপতির বিশ্রামগ্রহণ কালে শ্রী-র উৎপত্তি ঘটেছিল। বাজসনেয়ী সংহিতায় 'শ্রী' এবং 'লক্ষ্মী' উভয়ের উল্লেখ আছে স্বতন্ত্র দেবী হিসেবে এবং এঁদের বলা হয়েছে আদিত্যের দুই পত্নী (৩১।২২)। বাজসনেয়ী সংহিতা বা শুক্ল যজুর্বেদ এবং অথর্ব সংহিতাকে বোধ হয় একসময়েই বৈদিক গ্রন্থরূপে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছিল, এই তথ্য পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। বাজসনেয়ী সংহিতার মতো অথর্ববেদেও লক্ষ্মীর বর্ণনা আছে, যেখানে নারীর প্রকৃতি-বিচারে লক্ষ্মীর দুই রূপ—পুণ্য লক্ষ্মী এবং পাপী লক্ষ্মীর উল্লেখ পাওয়া যায় (রমন্তাং পুণ্যা লক্ষ্মীর্যাঃ পাপিষ্ঠা অনিনসম—৭।১১৫ : ১)। বাজসনেয়ী সংহিতা এবং অথর্ব বেদে লক্ষ্মী সম্পর্কে উল্লেখের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয় যে, লক্ষ্মী সম্পর্কে

চেতনা বা স্বীকৃতি বৈদিক সমাজে গোড়াতে ছিল না। বৈদিক সংস্কৃতির বিবর্তনপথে নানা অবৈদিক উপলব্ধির মতো লক্ষ্মীকেও কালক্রমে বৈদিক সংস্কৃতিতে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু লক্ষ্মী কখনই তাঁর লৌকিক ভিত্তি থেকে বিচ্যুত হন নাই। বর্তমান কালেও লক্ষ্মী লৌকিক এবং নারী সমাজের প্রধান উপাস্যরূপে অধিষ্ঠিত রয়েছেন দেখা যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে লক্ষ্মীর উদ্ভব সম্পর্কিত কাহিনীতে এই দেবীর মূলসংবেদন সম্পর্কে নিশ্চিত কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। পরবর্তী বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে লক্ষ্মী সম্পর্কে যে-সব বিবরণ আছে সে-সব বিভ্রান্তিকর। লক্ষ্মী-সম্পর্কিত নানা বিবরণের মধ্যে মহাভারতে বর্ণিত একটি কাহিনীকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা চলে। এখানে বর্ণিত আছে যে, লক্ষ্মী মূলত ছিলেন দৈত্য বা দানবদেরই অধিষ্ঠাত্রী। দানবেরা কালক্রমে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং পাপাচারী হয়ে পড়েছিল, যার ফলে লক্ষ্মী আর দানবদের সঙ্গে থাকতে পারেন নাই। তিনি দৈত্যরাজ বলিকে পরিত্যাগ করে দেবরাজ ইন্দ্রের সান্নিধ্যে স্থানগ্রহণ করেন (মহাভারত, ১২।২২৮)। প্রাচীন বৈদিক কোন শাস্ত্রগ্রন্থে লক্ষ্মী সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন উল্লেখের অভাব এবং মহাভারতে বর্ণিত এই কাহিনীতে লক্ষ্মীর মূলত দৈত্যদের অধিষ্ঠাত্রী রূপে উল্লেখের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয় যে, বেদানুগামী জনগোষ্ঠীর সরস্বতী উপকূল পরিত্যাগ করে গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে আত্মপ্রতিষ্ঠা করার পরই প্রতিবেশী রূপে উপনিবিষ্ট সিন্ধু উপকূল থেকে সমাগত জনগোষ্ঠীর নিকট থেকে লক্ষ্মীকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। তার পূর্বে লক্ষ্মীর বেদানুগ সমাজে কোন স্বীকৃতি ছিল না। শতপথ ব্রাহ্মণে অনুরূপ ভাবেই গৃহীত নারায়ণকে অভিহিত করা হয়েছে পুরুষ-নারায়ণ আখ্যায়। বৈদিক এবং বেদানুগামী শাস্ত্রগ্রন্থে লক্ষ্মী সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। পৌরাণিক সাহিত্যেই লক্ষ্মী সম্পর্কে কিছু কিছু বিস্তৃত বিবরণের সমাবেশ আছে। প্রাচীন পুরাণ গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে যে সুদূর অতীতে রুদ্রের সঙ্গে যেমন দক্ষকন্যা সতীর পরিণয় ঘটেছিল তেমনি ভৃগু নামে অন্য এক প্রজাপতির কন্যা লক্ষ্মীর সঙ্গে নারায়ণের পরিণয় ঘটে (শ্রীয়ং চ দেবদেবস্য পত্নী নারায়ণস্য যা—বিষ্ণুপুরাণ, ১।৮:২৫)। দেবতা এবং অসুরে বোধ হয় তখনও বিচ্ছেদ ঘটে নাই। পরবর্তীকালে দেবাসুর সংঘর্ষ ঘটলে ভগবান বিষ্ণুর পরামর্শে দেবাসুরের দ্বারা সমুদ্রমন্থন হয় এবং সমুদ্রোত্থিত লক্ষ্মীদেবী পরম আশ্রয়স্থল ভগবান বিষ্ণুর বক্ষমধ্যে স্থানগ্রহণ

করেন। বিষ্ণুবক্ষলগ্ন লক্ষ্মীদেবীর প্রসন্নতালাভের উদ্দেশ্যে দেবরাজ ইন্দ্র নানাবিধ স্তুতি করলে, লক্ষ্মী প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্রকে আর ত্যাগ করবেন না বলে আশ্বাসপ্রদান করেন। এইভাবে ইন্দ্রের এবং সেইসূত্রে দেবতাদের লক্ষ্মীলাভ ঘটল (শক্রশ্চ ত্রিদশশ্রেষ্ঠঃ পুনঃ শ্রীমানজায়ত)। শ্রী সম্পর্কে উপলব্ধির বিবরণ এই কাহিনীতেই প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়, যা থেকে ঋগ্বেদানুগামী সমাজে গোড়ার দিকে শ্রী সম্পর্কে উপলব্ধির অভাবের কারণ বুঝতে পারা যায়। বৈদিক সাহিত্যেও দেবতা রূপে শ্রী তথা লক্ষ্মীর সম্বন্ধে উল্লেখ শতপথ ব্রাহ্মণের পূর্বে নাই। অথর্ববেদে যে ভাবে নারী চরিত্রের বর্ণনায় পুণ্য লক্ষ্মী এবং পাপী লক্ষ্মীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তা থেকেও অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে, এই চতুর্থ বেদের অনুগামীদের নিকটই লক্ষ্মী বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান রুদ্রের উদ্ভব এবং দক্ষকন্যা সতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করবার বিবরণের সঙ্গে নারায়ণ কর্তৃক লক্ষ্মীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করবার উল্লেখটিকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে গণ্য করা চলে। ইতিপূর্বে বাজসনেয়ী সংহিতা এবং অথর্ববেদে রুদ্রের উল্লেখ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ঋগ্বেদ অনুগামীদের নিকট রুদ্রের যে তেমন জনপ্রিয়তা ছিল না এই তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে রুদ্রকে নিশ্চিতভাবে 'বিশ্বরূপ' আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। পুরুষ-নারায়ণকে যখন ঋগ্বেদানুগামী সমাজে 'বিশ্বরূপ' নামে অভিহিত করে গ্রহণ করা হয়েছিল—নারায়ণের শক্তি, জগন্মাতা-রূপিণী লক্ষ্মীরও তখনই বৈদিক সমাজে স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিষ্ণুপুরাণের পূর্বোক্ত অংশে লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে স্কন্দপুরাণে সন্নিবিষ্ট দেবী ভাগবতের (শ্রীশ্রীচণ্ডীর) লক্ষ্মীর নারায়ণী আখ্যায় সমস্ত দেবতাদের শক্তিরূপে বর্ণিত হওয়ার সঙ্গে যে নিকট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়, তা বিস্ময় উৎপাদনা না করে পারে না। বিষ্ণুপুরাণের এই অংশেই লক্ষ্মীর পরিচয় মূলত নারায়ণের পত্নী রূপে এবং শ্রী এবং লক্ষ্মী বিষ্ণুপুরাণের বর্ণনায় এক ও অভিন্ন। নিশ্চিতভাবে শ্রী এবং লক্ষ্মীর এই অভিন্নত্ব পুরাণ সাহিত্যের পূর্বে কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে এবং নারায়ণোপ-নিষদের পূর্বে কোন উপনিষদ গ্রন্থেও পাওয়া যায় না। নারায়ণোপনিষদে লক্ষ্মীর উল্লেখ এই দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা চলে।

এই উপনিষদে পুরুষের সঙ্গে অভিন্ন রূপে প্রতিষ্ঠিত নারায়ণকে সকল সত্তার আকর রূপে বর্ণনা করে তাঁকে বলা হয়েছে "মহতো মহীয়ান"। সমন্বয়-চিন্তার

তুলনাহীন উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে এই পরম সত্তাকে 'বিশ্বরূপ' আখ্যায় প্রতিষ্ঠিত করার পর মৌলিক এই উপলব্ধির পরিমণ্ডলে সকল বিশ্বকে একীকৃত করার বাণীতে (এষ হি দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্বাঃ পূর্বোহি জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ / —স বিজায়মানঃ স জনিষ্যমানঃ প্রত্যঙ্মুখাস্তিষ্ঠতি বিশ্বতোমুখঃ/বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোহস্ত উত বিশ্বতস্পাৎ / সং বাহুভ্যাং নমতি সংপতত্রৈর্দ্যাবা/ পৃথিবী জনয়ন্দেব একঃ। বেনস্তৎপশ্যন্বিশ্বা ভুবনানি বিদ্বান্যত্র বিশ্বং ভবত্যেক-নীড়ম্॥)। তাবৎ বিশ্বের একত্বসূচক এই উপলব্ধি এক গভীর অধ্যাত্ম-চেতনার পরিচায়ক। এখানে নারায়ণ-উপনিষদে ইন্দ্র, পুষা, বৃহস্পতি, সোম ইত্যাদি বৈদিক দেবতা (স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ) এবং মহাদেব, বক্রতুণ্ড (গণেশ), চক্রতুণ্ড (নন্দী), মহাসেন (কার্তিকেয়), গরুড় ইত্যাদি লৌকিক দেবতাকে একই পুরুষ-নারায়ণের সত্তা থেকে উদ্ভূত রূপে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে দেবী সত্তাকে উপলব্ধিতে এনে সেই দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রসঙ্গে অবতারণা করা হয়েছে সর্বভূতের অধীষ্ঠাত্রী শ্রী-দেবীর (ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রীগম। শ্রীর্মে ভজতু। অলক্ষীর্মে নশ্যতু।)। অলক্ষ্মীর বিনাশেচ্ছার বিপরীতে যে শ্রী-কে আবাহন এবং পূজার কথা এখানে বলা হয়েছে তিনিই যে লক্ষ্মী এই তথ্য স্বতঃপ্রকাশ। এই শ্রী-দেবীকে নিশ্চিতভাবেই লক্ষীরূপে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁর প্রতি পরপর দু'বার শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়েছে যেখানে তাঁকে বলা হয়েছে—"শ্রীশ্চ লক্ষ্মীশ্চ পুষ্টিশ্চ কীর্তি চানৃণ্যতাম্"। আর অলক্ষ্মী সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"ক্ষুৎপিপামলাং জ্যেষ্ঠামলক্ষ্মীর্ণাশয়াম্যহম্"। অলক্ষ্মীরই অপর নাম জ্যেষ্ঠা। এখানে প্রদত্ত লক্ষ্মী এবং অলক্ষ্মী সম্পর্কিত বর্ণনা যেন সঙ্গে সঙ্গেই অথর্ববেদে বর্ণিত পুণ্যলক্ষ্মী এবং পাপী লক্ষ্মীর কথা মনে করিয়ে দেয়। সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর উদ্ভব-কাহিনীতে লক্ষ্মীদেবীর সৃষ্টির উদ্ভবেরও পূর্ব থেকে অনন্ত বারিরাশির সঙ্গে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই অনন্ত বারিরাশির প্রতীক নারায়ণেরই তিনি শক্তি। অনন্তরূপী নারায়ণই যে অন্তহীন মহাসাগর, ভগবদ্গীতায় এই উপলব্ধির উল্লেখ আছে—যেখানে বাসুদেব বলছেন সরসীর মধ্যে তিনি সাগর (সরসামস্মি সাগর)। সরসী এই ভিত্তিতে সাগরের প্রতীক, যার অন্য নাম পুষ্কর বা পুষ্করিণী। রাজস্থানে অবস্থিত মহাতীর্থ পুষ্কর সাগরেরই প্রতীক (মহাভারত ৩।৮২:২০ ; ২।৮৯:১৬)। ভারতের সর্বত্র অসংখ্য পুষ্কর বা পুষ্কল বা পুষ্করিণী সেই সুপ্রাচীন

লক্ষ্মী-নারায়ণ সম্পর্কিত উপলব্ধিরই পরিচয়বহ। পুষ্করিণী-কেন্দ্রিক বহু জনপদ অতীত কাল থেকে পুষ্কলাবতী, পদ্মাবতী বা পোখরণ ইত্যাদি নামে পরিচিত থেকে লক্ষ্মীদেবীর এই ব্যাপক জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য বহন করছে। বাংলা অঞ্চলের মহিলারা যে পুণ্যি-পুকুর ব্রতের অনুষ্ঠান করে থাকেন, সেই ব্রতানুষ্ঠান ধন-ধান্য ও সম্পদ-ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর প্রসন্নতা বিধানের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উত্তর-সৈন্ধব অঞ্চলে অবস্থিত গান্ধারের রাজধানী তক্ষশিলার প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কালে প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ সার জন মার্শাল বেশ কিছু পোড়ামাটিতে তৈরী চতুষ্কোণ আকৃতির উপকরণ আবিষ্কার করেছিলেন। সেই উপকরণগুলির সঙ্গে পুষ্করিণীর নিকট সাদৃশ্য লক্ষ করে তিনি সেগুলির বর্ণনা প্রসঙ্গে বাংলায় প্রচলিত পুণ্যি-পুকুর ব্রতে ব্যবহৃত পুকুরের বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছিলেন। মার্শাল নিজে মহেঞ্জোদড়োতে বিস্তৃত প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য পরিচালন কালে সেখানে নগরকেন্দ্রে একটি চারদিক-বাঁধানো অতি সুন্দর গঠনের পুষ্করিণী আবিষ্কার করেছিলেন, যে পুষ্করিণী ও তৎসন্নিহিত ইটের তৈরী কুঠুরী সম্বলিত সুবৃহৎ পূর্তসমাবেশকে তিনি একটি পবিত্র, মহা স্নানাগার রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত এই স্নানাগারটি সারাবিশ্বের কৌতূহলী জনগণের প্রভূত বিস্ময়ের কারণ বলে গণ্য হয়েছে। নগরের কেন্দ্রস্থলে এই সরোবরের সমাবেশ এবং তার গঠনের মহনীয়তা থেকে অনায়াসেই অনুমান করা চলে যে সিন্ধু-সভ্যতার সেই অত্যুন্নত নগরের সমাজ-জীবনে ঐ পুষ্করিণীর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। মার্শাল তক্ষশিলা থেকে বহুশত যোজন দূরে ভারতের অন্য এক প্রান্তে পুণ্যি-পুকুর ব্রতের সঙ্গে তক্ষশিলায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির তৈরি সেই পুকুরের প্রতিরূপায়ণগুলির সাদৃশ্যের আলোচনা করেছেন, কিন্তু সেই প্রসঙ্গে মহেঞ্জোদড়োতে তাঁর নিজের আবিষ্কৃত মহিমময় স্নানাগারটির কোন উল্লেখ করেন নাই। মার্শাল তক্ষশিলার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের বিস্তৃত প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষণ করে ভীর-মাউণ্ড, সির-কাপ এবং সির-সুখ অঞ্চলে পরপর গড়ে ওঠা তিনটি নগরের ধ্বংসাবশেষের আবরণ উন্মোচন করেছিলেন। এখানে বলা যায়, ইতিহাসের কাহিনীতে খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত গান্ধারের রাজধানীরূপে প্রখ্যাত তক্ষশিলার অস্তিত্বের প্রমাণ আছে। মার্শালের দ্বারা উন্মোচিত প্রত্নগর্ভ অঞ্চলগুলির অতিনিকট সান্নিধ্যে দরাইখোলা গ্রামে সম্প্রতি প্যাকিস্তান প্রত্নতত্ত্ববিভাগ সিন্ধুসভ্যতার বহু নিদর্শন ভূগর্ভ থেকে আবিষ্কার

করেছেন, এ তথ্য ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। তক্ষশিলায় আবিষ্কৃত ঐ প্রতীকী পুষ্করিণীগুলির সঙ্গে মহেঞ্জোদড়োর মহিমান্বিত স্নানাগারটির তত্ত্ব এবং সংস্কৃতিগত যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা সম্ভব, এ কথা অনুমান করা হয়ত খুব অযৌক্তিক হত না।

পাশ্চাত্য-দেশীয় ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিকেরা প্রাগৈতিহাসিক আখ্যায় পরিচিত সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে ঐতিহাসিক যুগের ভারতীয় সভ্যতার কোন সংযোগ থাকার সম্ভাবনাকে কখনই স্বীকৃতি প্রদানে রাজী হন নাই। এই স্পর্শকাতরতার ফলেই সম্ভবত মার্শাল মহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত তথাকথিত স্নানাগারের সঙ্গে তক্ষশিলায় আবিষ্কৃত পোড়ামাটির প্রতীকী পুষ্করিণীর কোন যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ থেকে বিরত ছিলেন। সারা ভারতেই কিন্তু লক্ষ্মী-চেতনার সঙ্গে সরোবর এবং সরোজ পুষ্প অর্থাৎ পদ্মের যোগাযোগ অতি পরিচিত। এই-সব তথ্য থেকে লক্ষ্মী-চেতনার সঙ্গে পুষ্করিণীর যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সেই সিন্ধু-সভ্যতার যুগ থেকেই প্রচলিত রয়েছে এই সিদ্ধান্ত করা কিছুমাত্র অযৌক্তিক নয়। মহেঞ্জোদড়োর প্রত্নানুসন্ধানে সেখান থেকে অসংখ্য পোড়ামাটির পুতুল আবিষ্কৃত হয়েছে। মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পায় আবিষ্কৃত নানা উপকরণে প্রস্তুত পশু এবং মনুষ্যমূর্তির নির্মাণ কৌশল এবং আকৃতির সঙ্গে পরবর্তী যুগের ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত মাটির পুতুল এবং মূর্তিভাস্কর্যের মৌলিক সাদৃশ্যের বর্তমানতা বিশেষভাবেই আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী যুগের মৃত্তিকা এবং প্রস্তরের যে-সব নারীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে প্রাক্-মৌর্য এবং মৌর্য-শুঙ্গ যুগের নারী-মূর্তির সঙ্গে মহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির নারীমূর্তির নিকট সাদৃশ্যের বিষয় শিল্পতত্ত্ববিদেরা আলোচনা করেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই মহেঞ্জোদড়োর সেই মহাস্নানাগারের সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত কিছু পোড়ামাটির পুতুলের অন্যতম দুটি পুতুলের প্রতিচিত্র এখানে মুদ্রিত হল (চিত্র ৩৪)। মূর্তি দুটি প্রায় নিকট সান্নিধ্যে একই সময়ের প্রস্তুত বলে গণ্য। এর একটির আকৃতিতে সমসাময়িক রুচিসম্মত দেহ ও মুখের গঠন এবং অলঙ্কারসজ্জায় বিশেষ যত্ন এবং আভিজাত্য সংযোজনের প্রয়াস অত্যন্ত স্পষ্ট। অন্যটির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এবং মুখাকৃতির বিকৃতি নিশ্চিতই ইচ্ছাকৃত বলে গণ্য হতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলার পল্লী অঞ্চলে কিছুকাল পূর্বেও মেয়েলী ব্রতে ব্যবহারের জন্য মাটিতে তৈরী লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীর মূর্তি নির্মিত হত। প্রথমে গৃহের সীমানার বাইরে অলক্ষ্মীর

পূজা সমাপনের পর সেখানে কুৎসিত আকৃতির অলক্ষ্মী মূর্তিটি পরিত্যাগ করে, পরে গৃহাভ্যন্তরে সুগঠন আকৃতির লক্ষ্মীমূর্তির পূজা করে ব্রত সমাপন করা হত। সাংস্কৃতিক চেতনার সঙ্গে জড়িত নানা অনুষ্ঠানে যে প্রবহমানতা সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ক্রিয়াশীল রয়েছে, সেই প্রবাহপথে অথর্ববেদের পুণ্যলক্ষ্মী-পাপীলক্ষ্মী চেতনা এবং নারায়ণোপনিষদের লক্ষ্মীর প্রতি ভক্তি এবং অলক্ষ্মীর প্রতি অনীহা-প্রকাশক তথ্যের ভিত্তিতে লক্ষ্মী-চেতনাকে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে সিন্ধু অঞ্চলে সমুদ্ভূত সমান্তরালে প্রবাহিত এক অবৈদিক চেতনা থেকেই গৃহীত বলে ধার্য করা চলে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রাচীন গান্ধারের অন্যতর রাজধানী পুষ্কলাবতীর কথা, মধ্যভারতের অন্তর্বর্তী পুরাণে উল্লিখিত নাগদের রাজধানী পদ্মাবতীর কথা, রাজস্থানের পুষ্কর এবং পোখরণ, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়ার অন্তর্বর্তী পোখরণা এবং অন্য বহু স্থানের পোখরা, পুকুরিয়া ইত্যাদি নামের জনবসতিগুলিকেও অনায়াসেই সেই লক্ষ্মী-চেতনার সঙ্গে সংস্পৃক্ত বলে ধার্য করা যেতে পারে।

মূর্তিশিল্পের ক্ষেত্রে দেওগড়ের দশাবতার মন্দিরের অনন্তশায়ী নারায়ণের মূর্তির পদসেবায় রত লক্ষ্মীমূর্তিটিই নারায়ণের সঙ্গে লক্ষ্মীর সংযোগের প্রথম নিদর্শন রূপে গণ্য হতে পারে। পরবর্তী যুগে উপবেশনরত লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণ-মূর্তি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, যার ফলে নারায়ণের সঙ্গে লক্ষ্মীর যে সংযোগ, পুরুষ-নারায়ণের সেই বিশ্বরূপ পরিকল্পনার সঙ্গেই সন্নিবদ্ধ বলে ধার্য করা চলে। লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে লক্ষ্মীর যে প্রণাম-মন্ত্র উচ্চারিত হয় সেই মন্ত্রটি এইরূপ :

বিশ্বরূপস্য ভার্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে
সর্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মী নমোঽস্তুতে ॥

—এই মন্ত্রে সুস্পষ্টভাবেই লক্ষ্মীদেবীকে 'বিশ্বরূপের' শক্তিরূপেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বিশ্বরূপ-চেতনা-সমৃদ্ধ এই নারায়ণ পরিকল্পনা মূলত বৈদিক সমাজ সমুদ্ভূত ছিল না। শতপথ ব্রাহ্মণে এই পুরুষ-চেতনাকে বৈদিক সমাজে সংহত করবার প্রয়াস হয়ে থাকলেও লক্ষ্মী-সমন্বিত এই পুরুষ-নারায়ণ দীর্ঘকাল পূর্ণ স্বীকৃতিলাভ করেন নাই। পরে মহাভারতে ভগবান নারায়ণকে বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে সন্নিবদ্ধ করবার প্রয়াস অত্যন্ত গুরুত্ব অর্জন করেছিল। মহাভারতের প্রারম্ভিক শ্লোকে নারায়ণের সঙ্গে শক্তিরূপে দেবী সরস্বতীর

উল্লেখ এই তথ্যেরই নির্দেশক। মহাভারতে বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে অবৈদিক লোকভিত্তিক নানা দেবদেবীর স্বীকৃতিপ্রদানে মহাভারতের সমাজ-চেতনার প্রসারতা এবং উদারতার পরিচয় সন্নিবিষ্ট আছে। সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর সমুদ্ভব এবং সেই লক্ষ্মীর নারায়ণ-বিষ্ণুর বক্ষলগ্ন হওয়ার কাহিনী মহাভারতে অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু মূলত বৈদিক সংস্কৃতির প্রবাহধারার সংরক্ষক মহাভারত-চেতনায়, বৈদিক সংস্কৃতির অধিষ্ঠাত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত, অম্বিতমে দেবীতমে সরস্বতীকেই ভগবান নারায়ণের শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঋগ্বেদে বা পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে নারায়ণের শক্তিরূপে লক্ষ্মীর যেমন কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে সরস্বতীকেও কোথাও বিষ্ণু বা নারায়ণের শক্তিরূপে উল্লেখ করা হয় নাই। বৈদিক সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বেদানুগামী সমাজে সরস্বতী নদীর প্রভূত মর্যাদা ছিল। এই নদীর উপকূলেই বেদের অধিকাংশ সূক্ত-সমূহ রচিত হয়েছিল। বেদানুগামী জনমণ্ডলীর পরিপোষকরূপে সরস্বতীর এই প্রতিষ্ঠা বৈদিক জনগোষ্ঠীর সরস্বতী উপকূল পরিত্যাগ করে গঙ্গা উপত্যকায় আশ্রয়গ্রহণের পরও বিলুপ্ত হয় নাই। মহাভারত-চেতনা দ্বারা মূল সত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত নারায়ণকে বৈদিক বিষ্ণুর সঙ্গে এক ও অভিন্ন রূপে নির্দিষ্ট করবার কৃতিত্বের অধিকারীরূপে বাসুদেব-কৃষ্ণের ক্রমবর্ধমান প্রভাবই সমাজকে ক্রমে বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত, সংহত এবং মিলিত করার পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল। শিল্পকর্ম ছিল প্রধানত অবৈদিক তক্ষ এবং কুলিক শ্রেণীর আয়ত্তাধীন। বিশ্বরূপ এবং লক্ষ্মী ছিলেন তাদেরই পরম আরাধ্য এবং অনুরাগের পাত্র। বেদানুগামীদের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীর প্রতি গোড়াতে সেই জনগোষ্ঠীর কোন অনুরাগ থাকা সম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। সুপ্রাচীন যুগ থেকে পঙ্কজাবৃত জলাশয়ের আশ্রয়ে বা চতুর্দিগ্‌গজের দ্বারা অভিসিঞ্চিত লক্ষ্মীদেবীমূর্তির সংখ্যাতীত রূপ-কীর্তির সন্ধান থাকলেও বীণা-পুস্তক-হস্তা সরস্বতীমূর্তির বিশেষ কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু সমন্বয়-চেতনা-প্রতিষ্ঠায় যে উপনিষদকে তুলনাহীন বলে গণ্য করা যেতে পারে, সেই নারায়ণোপনিষদেই উপনিষদের মধ্যে প্রথম শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে সরস্বতীকেও বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল দেখা যায়। নানা দেবী ও দেবতার উল্লেখ প্রসঙ্গে সরস্বতীর সম্বন্ধে নারায়ণোপনিষদে বলা হল : "সর্ববর্ণে মহাদেবী সংধ্যাবিদ্যে সরস্বতী"। পূজার মন্ত্র উচ্চারিত হল সরস্বতীর উদ্দেশ্যে :

"দৈবী মেধা সরস্বতী সা মাং মেধা সুরভির্জুষতাং স্বাহা"। এইসঙ্গেই সরস্বতীকে যুক্ত করা হল বিশ্বরূপের সঙ্গে : "আমাং মেধা সুরভির্বিশ্বরূপা হিরণ্যবর্ণা জগতী জগেম্যা"। সরস্বতী 'বিশ্বরূপা' নামে স্বীকৃত হলেন, যে বিশ্বরূপ এই উপনিষদে নারায়ণের সঙ্গে এক এবং অভিন্ন। দেবী সরস্বতীকে যে কালক্রমে পুরুষ-নারায়ণ এবং বিশ্বরূপের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল, পুরাণোক্ত সরস্বতীর প্রণামমন্ত্রেও তার পরিচয় বিধৃত আছে, যেখানে বলা হয়েছে : ওঁ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে / বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে॥ এইভাবে সরস্বতীও লক্ষ্মীর সঙ্গে নারায়ণের শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেন। দীর্ঘ বিচ্ছিন্ন দুই সাংস্কৃতিক প্রবাহ নারায়ণকে আশ্রয় করে এক মহাপ্রবাহে সম্মিলিত হল। ভারতসংস্কৃতিতে সংঘটিত এক মহাবিপ্লব পূর্ণতালাভ করল।

ভারতের জনমানসে উন্নত অধ্যাত্মচিন্তা তথা সাংস্কৃতিক জীবনচর্যা সুপ্রাচীন অতীতকাল থেকে যে ঐশ্বর্যসম্পদ সৃষ্টি করে চলেছে, তার সমীকরণ এবং সংহতি সাধনে ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণ যে উত্তুঙ্গ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তারই এক রূপচিত্র এখানে উপস্থিত করার প্রয়াস করা হয়েছে। চিন্তা এবং চেতনার প্রকরণভেদে নানা বৈপরীত্য—সমাজ এবং জীবনপ্রবাহকে যুগে যুগে নানাভাবে বিপর্যস্ত করেছে, সৃষ্টি করেছে নানা বিভ্রান্তির। সমাজ এবং ব্যক্তিজীবনকে সুসংহত এবং আনন্দগর্ভ পরিপূর্ণতার পথে পরিচালিত করার যে যুক্তি এবং উপলব্ধির নির্দেশ ভাগবতচর্যায় সন্নিহিত আছে, ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণ সম্পর্কিত অন্বেষা এবং তৎসম্ভূত সেই নির্দেশ যুগে যুগে ভারতমানসকে নব নব চিন্তা, চেতনা, ধ্যান ও উপলব্ধির সন্ধান দিয়েছে। জ্ঞান এবং ভক্তির রাজপথে নানা বিচ্ছিন্নতাকে সংহত করে ভারতজন বাসুদেব-কৃষ্ণকে ভিত্তি করে এক মহা অনুভূতির সন্ধান করেছে, আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছে মহিমময় এক আদর্শ জীবনপথের। এই অন্বেষার প্রবাহপথে নানা বিচ্ছিন্নতা সুষ্ঠু জীবনচর্যাকে ব্যাহত করেছিল, সমাজ এবং ব্যক্তিজীবনের স্ফূর্তি এবং পূর্ণতালাভে ঘটাচ্ছিল প্রতিবন্ধকতা। বৈদিক চেতনার দুই সমান্তরাল প্রবাহের প্রতীকী রূপ, ঐশ্বর্য-সম্পদ, পুষ্টি-তুষ্টির বিগ্রহরূপিণী শ্রী-লক্ষ্মী এবং জ্ঞান-প্রজ্ঞা, আত্মসমীক্ষার মূর্ত প্রতিমা, দেবী সরস্বতীকে সমীকৃত করে কিরীট বনমালা কৌস্তুভ শোভিত চক্র-গদাধর বেদের বিষ্ণু এবং ব্রাত্যসমাজ সম্পূজিত রুদ্র-বিশ্বরূপের মিলিত প্রতীক, উত্তুঙ্গ ঐ বাসুদেব-চেতনা বহু দীর্ঘ শতাব্দী ভারত ভূখণ্ডকে সংহত, শোভন এবং

আনন্দনর্ভ চেতনায় সমৃদ্ধ করে রেখেছিল। ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধি ও শক্তি-সামর্থ্যের সেই সম্পদ আজ ভ্রষ্ট হয়ে থাকলেও, ভারতের হৃদয়তন্ত্রে আনন্দের সেই ফল্গুধারা প্রতিনিয়তই প্রবাহিত হচ্ছে, ভারতভূখণ্ডের অন্তর্হৃদয়-বৃন্দাবনে যমুনা-উপকূল থেকে সমুৎসারিত মুরলীধ্বনির সংবাহনে। বিরুদ্ধশক্তিসমূহের দ্বারা সৃষ্ট ঘোর ঝড়-ঝঞ্ঝা বিপর্যয় প্রতিহত করে গোবিন্দরূপী গিরিধর কৃষ্ণ অলক্ষ্যে সাধন করে চলেছেন তাঁর অলৌকিক কৃত্য।

কৃষ্ণ-চেতনার এই মহান ঐতিহ্যের কোন অবক্ষয় নাই।

নির্দেশিকা

১. Rhys Davids, Journal of the Pali Text Society, 1893, pp. 87f.
২. Jour. of the Pali Text Soc., 1896, pp. 107f.
৩. Smith, V. A., Early History of India (4th ed.), p, 213 fn
৪. ঐ, pp. 227f.
৫. দিব্যাবদান, Schiefner-এর অনুবাদ, পৃ. ৮১।
৬. Barua and Sinha, Bharhut Inscriptions, pp. 1f.
৭. ভগবদ্গীতা, ৪/১১।
৮. অশোকের চতুর্থ শিলা অনুশাসন।
৯. A. S. I., A. R., 1935—36, p. 35, pl. XL, a.
১০. Fleet, Corpus Ins. Ind., III, pp. 269-71.
১১. বিষ্ণুপুরাণ ৪।১৩, (স্যমন্তকোপাখ্যান)।
১২. Indian Archaeology, A Review, 1982-83, p. 22.
১৩. Fleet, Corpus, III, pp. 6f.
১৪. ঐ, pp. 111f , Majumdar, R. C., (ed.), The Classical Age (3rd ed., Bombay, 1970), pp. 20f.
১৫. Fleet, Corpus, III, pp. 35f.
১৬. Ep. Ind., VIII, pp. 42f.
১৭. Poona Copper Plate Inscription of Prabhavati Gupta, Ep. Ind , XV, pp. 41f.
১৮. Rithpur Copper Plate, Journal and Proceedings of Asiatic Society of Bengal, XX, p. 68 , Chammak Copper Plate, Fleet, Corpus, III, pp. 236f.
১৯. Ep. Ind., XI, pp. 41f.
২০. উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার করমদণ্ডায় আবিষ্কৃত সম্রাট কুমারগুপ্তের লিপিতে উল্লিখিত—মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তস্য কুমারামাত্য শিখরস্বামী, Ep. Ind., X, p. 71.
২১. Ep. Ind., XII, pp. 320f.

২২. ঐতরেয় আরণ্যক, ১০।১১ অনুবাক।
২৩. নারায়ণোপনিষদ, ১১।৪-৫।
২৪. রাজা বিশ্ববর্মণের গাংধর পর্বতলিপি, Ep. Ind., III, pp. 74f.
২৫. Fleet, Corpus, III, pp. 81f
২৬. Ep, Ind., XXI, pp. 81f.
২৭. স্কন্দগুপ্তের জুনাগড় লিপি, Fleet, Corpus, III, pp. 58f.
২৮ মাতৃবিষ্ণুর এরাণ লিপি, ঐ, pp. 89f.
২৯. ধন্যবিষ্ণুর এরাণ লিপি, ঐ, পৃ. ১৫৯।
৩০. Fleet, Corpus, III, p. 114.
৩১. Indian Antiquary, IX, pp, 100f.
৩২. মুদ্রারাক্ষসম্, ৭।১৮।
৩৩. Fleet, Corpus, III, pp. 6f.

চিত্র-পরিচয়

ভারতীয় শিল্পে কৃষ্ণচেতনার রূপায়ণ অতি বিস্তৃত। সুপ্রাচীনকাল থেকে রূপায়িত যে-সব মূর্তিতে কৃষ্ণচেতনার বিবর্তনের পরিচয় সন্নিবদ্ধ আছে তারই কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপকীর্তির প্রতিলিপি এখানে সংযোজিত হল। এই প্রতিলিপিগুলি 'ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

১. উপবেশনরত যোগীপুরুষ (যোগ-মূর্তি-বিশ্বরূপ)—মহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত চিত্রফলক

বর্তমান পাকিস্তানের সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলে অবস্থিত মহেঞ্জোদড়োতে এই ধরনের যোগীমূর্তি সম্বলিত স্টিয়েটাইটে জমানো কয়েকটি ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে, যার মধ্যে একটি কোণে সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত এই ফলকটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ অবস্থায়ই পাওয়া যায়। ফলকের উপরে সবিশেষ শিল্পগত নিপুণতার সঙ্গে যে-দৃশ্যটি রূপায়িত হয়েছে তাতে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক ইঙ্গিত সন্নিবিষ্ট আছে বলে অনুমান করা যায়। দৃশ্যটির কেন্দ্রে রূপায়িত আছে বজ্রপর্যঙ্ক আসনে উপবিষ্ট পূর্ণ আত্মসমাহিত তপঃক্লিষ্ট এক যোগীমূর্তি। মূর্তির মাথায় দু'দিকে বাঁকানো মহিষের শৃঙ্গশোভিত শিরোভূষণ, বক্ষের উপর কয়েক লহর হার, জানুর উপরে রাখা দুই হাতে শ্রেণীবদ্ধ বলয়, দৃঢ় কটিবন্ধের নিচে ব্রহ্মচর্যের ইঙ্গিতবহ ঊর্ধ্ব মেঢ্র। এই মূর্তির ডানদিকে আছে একটি হাতী এবং একটি বাঘ, বামে একটি গণ্ডার ও একটি বন্য মহিষ। গভীর রহস্যমণ্ডিত এই যোগীমূর্তিটি ঐতিহাসিক এবং শিল্পরসিক মহলে প্রভূত বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। পূর্বতন প্রত্নতত্ত্ব-অধিকর্তা সার জন মার্শাল পশুপরিবৃত এই যোগীমূর্তিটিকে পশুপতি-শিবের আদিম প্রতিকল্প (archetype) বলে ধার্য করেছিলেন। বর্তমান গ্রন্থের আলোচনায় মূর্তিটিকে ঋগ্বেদে বর্ণিত ঋষি বিশ্বরূপের মূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই গ্রন্থে বিশ্বরূপ-চেতনা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে (পৃ ৩৬৮)। সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলে উপনিবিষ্ট জনমণ্ডলী কোন এক সুপ্রাচীনকালে দ্বিধাবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই জনমণ্ডলীর এক অংশ সরস্বতী উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করে স্বতন্ত্র এক সংস্কৃতির প্রবর্তন করে। অন্যদিকে মূল সিন্ধু অববাহিকায়

থেকে যাওয়া জনমণ্ডলী তাদের প্রাচীন সংস্কৃতিরই অনুসরণ করতে থাকে। এই বিচ্ছিন্নতা সংঘটিত হয়েছিল একদিকে ঋগ্বেদে বর্ণিত বৈদিক জনগোষ্ঠীর অধিনায়ক ইন্দ্র ও অন্যদিকে মূল জনমণ্ডলীর নেতৃস্থানীয় অসুর নামে অভিহিত ত্বষ্টৃপুত্র ত্রি-শির বিশ্বরূপের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। এই বিচ্ছিন্নতার উদ্ভবের পরে একদিকে বৈদিক সমাজে ইন্দ্র যেমন উপাস্যে পরিণত হয়েছিলেন তেমনি সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলে বোধ হয় মহাযোগী ত্রি-শির সেই বিশ্বরূপের উপাসনার প্রচলন হয়। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের অষ্টত্রিংশৎ সূক্তে সকল সৃষ্টির কারণস্বরূপ বিশ্বরূপ নামে পরিচিত যে মহাসত্তার উল্লেখ আছে—উপনিষদ-চেতনায় ব্রহ্মনামে পরিচিত সেই বিশ্বরূপই ছিলেন সিন্ধু-সরস্বতী অঞ্চলে উদ্ভূত প্রাচীন সভ্যতার গভীর উপলব্ধিসম্ভূত পরম উপাস্য। এই উপাস্যের নামানুসারেই ত্বষ্টৃর পুত্র বিশ্বরূপ নামে পরিচয়লাভ করেছিলেন। মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেব কর্তৃক সেই অনন্তচেতন বিশ্বরূপকে বেদানুগামী সমাজে বিষ্ণুর সঙ্গে এক এবং অভিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত করার যে বর্ণনা আছে, তাতে সেই প্রাচীন বিচ্ছিন্নতার সমীকরণের প্রয়াস প্রতিষ্ঠিত আছে। বহু-যুগ ব্যাপী ভারতীয় সংস্কৃতিতে যোগতত্ত্বের যে বিবর্তন এবং উপলব্ধি ঘটেছিল, কৃষ্ণ-বাসুদেব-চেতনায় যে উপলব্ধির সম্পূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যোগ-মূর্তি এই বিশ্বরূপ প্রতিমাকে তারই আদিমতম দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপায়ণ বলে নির্দিষ্ট করা চলে।

২. দু'দিকে উপাসনার ভঙ্গীতে দাঁড়ানো, মাথার উপরে নাগফণায় আচ্ছাদিত দুটি মানুষের মাঝখানে যোগসন্নদ্ধ উপবেশনরত মূর্তি—ষ্টিয়েটাইটের ফলক মহেঞ্জোদারো

এই ফলকের যোগীমূর্তিকে বিনাদ্বিধায় উপরে বর্ণিত সম্ভাব্য যোগ-মূর্তি-বিশ্বরূপ বলেই নির্দিষ্ট করা যায়। ভারতের অধিবাসীদের এক বিশিষ্ট অংশ যে নাগ বা সর্পকে নিজেদের বংশপিতা (Totem) রূপে গণ্য করে এসেছে সে-সম্পর্কে সাহিত্য এবং জনশ্রুতিতে বহু প্রমাণ সন্নিবদ্ধ আছে। শিল্পের রূপায়ণে এই ধরনের নাগজাতীয় ব্যক্তিদের মাথার উপরে নাগফণা দেখানো হয়ে থাকে। মহেঞ্জোদড়োর এই ফলকটিতে নাগ-জন-চেতনার প্রাচীনতম নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। সিন্ধুসভ্যতার জনমণ্ডলীর এক বৃহৎ অংশ সম্ভবত নিজেদের নাগবংশসম্ভূত

বলে গণ্য করত। ঋগ্বেদে এই জনমণ্ডলীকেই অহি বা বৃত্র আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। মহাযোগী বিশ্বরূপ যে সেই নাগজনগোষ্ঠীরই উপাস্য ছিলেন, এই ফলকটিতে তারই প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত আছে।

৩-৪. পোড়ামাটির বিভিন্ন আকৃতির দুইটি নারীমূর্তি—মহেঞ্জোদড়ো

এই দুটি মূর্তি মহেঞ্জোদড়োর 'মহাস্নানাগার' নামে পরিচিত সরোবরের নিকট-সান্নিধ্যে পাওয়া গিয়েছিল। মূর্তি দুটি-একই সময়ে এবং একই গঠন-কৌশলে প্রস্তুত। কিন্তু উভয়ের অঙ্গসংস্থান, অলঙ্করণ এবং মুখাকৃতির বৈসাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। মূর্তিদ্বয়ের গঠনের এই বৈসাদৃশ্য একান্তভাবেই ইচ্ছাকৃত বলে অনুমান করা যায়। মূর্তিদ্বয়ের একটির মুখাকৃতি অতি বিকৃত, কান অস্বাভাবিক লম্বা, মাথার মুকুট কুদৃশ্য। অন্য মূর্তিটিতে সন্নিবিষ্ট আছে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে করা অঙ্গসৌষ্ঠব, অলঙ্করণে সৌন্দর্য, মুখমণ্ডলে গভীর প্রসন্নতা। অথর্ববেদে অলক্ষ্মী এবং লক্ষ্মী সম্পর্কে যে উল্লেখ পাওয়া যায়, এই দুই মূর্তিতে সম্ভবত সেই অলক্ষ্মী এবং লক্ষ্মী-চেতনারই আদিম রূপের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

৫. চতুর্ভুজ বাসুদেব-বিষ্ণু মূর্তি—তক্ষশিলা, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী

এপর্যন্ত আবিষ্কৃত বাসুদেব-বিষ্ণু মূর্তির মধ্যে প্রাচীনতম এই মূর্তির হাতে আছে চক্র, শঙ্খ, পদ্ম এবং গদা ; মাথার পিছনে প্রভামণ্ডল। অলঙ্কারের মধ্যে লক্ষণীয় কিরীট-মকুট, কুণ্ডল, হার, উপবীত, বনমালা, বলয় এবং নূপুর। বিষ্ণুমূর্তির প্রথাগত চার হাত, আয়ুধ এবং অলঙ্কার এবং পায়ের তলায় গরুড় থাকলেও, এখানে লক্ষ্মী-সরস্বতী মূর্তির সমাবেশ ঘটে নাই।

৬. বাসুদেব-বিষ্ণু মূর্তি—হাঁকড়াইল, বাংলা দেশ। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী

অপেক্ষাকৃত খর্বাকৃতি এই মূর্তিটির গড়নে কিছু আদিম শিল্পলক্ষণের সন্নিবেশ ও একটি বিশিষ্ট শিল্পধারার পরিচয় আছে। মুখাবয়ব এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গড়নে তক্ষশিলার পূর্ববর্ণিত বিষ্ণুমূর্তির আদল থাকায়, মূর্তিটিকে কুষাণ-আমলের বলে ধার্য করা হয়েছে। প্রায় একই সময়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রাচীনকালে গান্ধার

নামে পরিচিত অঞ্চলের রাজধানী তক্ষশিলা এবং পূর্বপ্রান্তে পুণ্ড্র নামে পরিচিত অঞ্চলের অন্তঃপাতী একটি গ্রাম থেকে আবিষ্কৃত এই মূর্তিদ্বয় থেকে সেই অতীতকালে বাসুদেব-বিষ্ণু উপাসনার ব্যাপক বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

৭. গিরিগোবর্ধনধারী কৃষ্ণমূর্তি, মথুরা, আনুমানিক খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দী

সামান্য ভাঁজ করা ডা'ন পায়ের হাঁটুর উপর ডা'ন হাতের ভার রেখে উপরদিকে তোলা বাম হাতে গিরিগোবর্ধনধারণের অনায়াস ভঙ্গীটি ঘটনার চূড়ান্ত অলৌকিকত্বের ইঙ্গিতবহ। মূর্তির অলঙ্করণে বাসুদেবমূর্তির কিরীট, কুণ্ডল, হার, উপবীত এবং বনমালার সমাবেশ থাকলেও, এই মূর্তি দ্বিভুজ। মূর্তির প্রসন্ন আননে যোগসমাধির ভাবটি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বিশ্বরূপপ্রতীকী চতুর্ভুজ-বাসুদেব মূর্তি যেমন চরম অলৌকিকত্বের ইঙ্গিতবহ, দ্বিভুজ এই গোবিন্দ-কৃষ্ণ মূর্তিটিও তেমনি ইঙ্গিতগর্ভ মনন-কল্পনার এক বিশিষ্ট অভিব্যক্তি।

৮. মধ্যপ্রদেশের ভুপালের সন্নিকটবর্তী উদয়গিরিতে পর্বতগাত্রে খোদিত বরাহমূর্তি, আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী

বরাহের মুখাকৃতি সম্বলিত বিশাল দেহ এই মূর্তির গড়ন মাংসল ও পেলব। সীমাহীন শক্তির ইঙ্গিতে পূর্ণ বরাহমূর্তির সঙ্গে দংষ্ট্রা দ্বারা উত্তোলিত ভূদেবীর দেহলালিত্যের অনুভূতির বৈষম্য প্রদর্শনে শিল্পীর সবিশেষ নিপুণতার পরিচয় আছে। প্রভূত মহিমামণ্ডিত এই বরাহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচেতনারই প্রতীক, দ্বিভুজ মূর্তির আলম্ব বৃহৎ বনমালাতে তারই ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। (পৃঃ ৪০৬)

৯. মধ্যপ্রদেশের দেওগড়ে অবস্থিত দশাবতার মন্দিরের অনন্তশায়ী নারায়ণ, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী

সীমাহীন মহার্ণবের প্রতীক কুণ্ডলীকৃত নাগদেহরূপ পর্যঙ্কে শয়ান নারায়ণের মাথার উপরে ছত্রাকারে উন্মুক্ত অনন্তের বহুফণার আচ্ছাদন। অতি প্রশান্ত যোগনিদ্রাশায়ী নারায়ণের নাভি থেকে উদ্ভূত পদ্মের উপর যোগাসনে উপবিষ্ট ব্রহ্মা; তাঁর ডা'নদিকে ঐরাবতারূঢ় ইন্দ্র এবং ময়ূরবাহন কার্তিকেয় এবং বামে বৃষভারূঢ় শিব এবং পার্বতী। সকল কিছুর মূল অনন্তমূর্তি নারায়ণের চর্তুভুজে

বিশ্বরূপ-চেতনার ইঙ্গিত থাকলেও, শঙ্খচক্রাদি কোন উপকরণ কোন হাতে নাই। দীর্ঘপ্রলম্ব বনমালা গোপাল-কৃষ্ণের দ্যোতক। (পৃ ৪১১)

১০. দেওগড় দশাবতার মন্দিরের অন্য এক্ প্রাচীরের গাত্রের গজেন্দ্র-মোক্ষ-দৃশ্যচিত্র

প্রাচীন নানা গ্রন্থে, বিশেষ করে ভাগবত পুরাণে (৮ : ২-৪) গজেন্দ্র-মোক্ষ-কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অতীতে ত্রিকূট পর্বতের সান্নিধ্যে পদ্মাকীর্ণ এক মহ্যসরোবরে বৃহৎকায় এক গজরাজ বিপুলাকৃতি এক সর্পের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হয়ে পড়েছিল। এই মহাবিপত্তি থেকে পরিত্রাণলাভের মানসে গরুড়ারূঢ় ভগবান নারায়ণ-বিষ্ণুর উদ্দেশে তার গভীর আকুতি শ্রবণে ভগবান বিষ্ণু সেই দ্বন্দ্বক্ষেত্রের উর্ধ্বে নভোমণ্ডলে আবির্ভূত হলেন। গরুড়ের উপস্থিতিতে পরম ভীতিগ্রস্ত হয়ে সেই গ্রাহ গজরাজকে বন্ধনমুক্ত করে দিয়ে নারায়ণের করুণা-প্রার্থনায় ব্রতী হয়।

এই ভাস্কর্য-ফলকের নিম্নাংশে বহুপদ্মসমাকীর্ণ হ্রদে সদ্য গ্রাহ-বন্ধন-মুক্ত গজরাজকে দেখানো হয়েছে উর্ধ্বমুখে শুঁড় তুলে ভগবানের প্রতি আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা থেকে মুক্তিলাভের জন্য কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের ভঙ্গীতে। সম্মুখে অঞ্জলিবদ্ধ গ্রাহ-দম্পতি প্রণামজ্ঞাপনরত। উর্ধ্বে নভোমণ্ডলে অতিপ্রশান্ত যোগ-মূর্তি গরুড়বাহন ভগবান নারায়ণ—যাঁর একান্ত উপস্থিতিতেই পরিসমাপ্তি ঘটেছিল সেই বিপর্যয়কর মহাদ্বন্দ্বের। এই কাহিনীটিতে ভগবান কৃষ্ণ-বাসুদেবের অনুগ্রহে, বহুযুগব্যাপী প্রবহমান, মূলত এক জনগোষ্ঠীর দুই বিবদমান সম্প্রদায়ের বিপর্যয়কর দ্বন্দ্ব-বিচ্ছেদের নিরাকরণের ইঙ্গিত সন্নিবিষ্ট আছে। (পৃ ৪১০)

১১. দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় আবিষ্কৃত খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর বিষ্ণু-বাসুদেব মূর্তি

সমাজ-সমন্বয়ের সন্ধানে বহুযুগব্যাপী যে মননচিন্তার অনুশীলন চলেছিল, কৃষ্ণ-বাসুদেবের এই মূর্তি-পরিকল্পনায় আছে তারই পরিপূর্ণ রূপবিন্যাস। ভাগবত পুরাণের পূর্বোক্ত কাহিনী বর্ণনায় যে ধ্যান সন্নিবিষ্ট আছে, এই মূর্তিতে সেই নারায়ণরূপী বাসুদেবকেই রূপায়িত করা হয়েছে। (শ্রীবৎসং কৌস্তুভ মাল্যং

গদাং কৌমোদকীং মম/সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং সুপর্ণো পতগেশ্বরম্।) এই ধরনের প্রতিমাতেই দুই সংস্কৃতি-প্রবাহের প্রতীক লক্ষ্মী এবং সরস্বতীমূর্তির সমাবেশ লক্ষ করা যায়।

১২. যোগ-মূর্তি বাসুদেব-বিষ্ণু—মথুরা

যোগ-চেতনা বাসুদেব-পরিকল্পনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে যুক্ত। প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থে প্রতিমা-সৃষ্টি সম্পর্কিত বেশ কিছু সূত্র তথা নিয়মপ্রণালী বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সেইসমস্ত নিয়ম স্বীকার করে নিয়েও, শিল্পী তাঁর উপলব্ধি দ্বারা কৃষ্ণবাসুদেবের যে যোগ-মূর্তি প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করেছিলেন, এখানে মুদ্রিত চিত্রটিতে তারই এক অতুলনীয় প্রতিরূপায়ণ পরিলক্ষিত হয়।

নাম সূচী

—

গ্রন্থকার-পরিচিতি

শিল্পতত্ত্ব, ইতিহাস ও প্রত্নবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে পরিচিত—গ্রন্থকারের জন্ম ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে, বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জে। ১৯৩৫-এ তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির শিল্পকলা-বিষয়ক পাঠ্যক্রম নিয়ে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তার কিছুকাল পরে তৎকালীন বাগীশ্বরী অধ্যাপক শহিদ সুহ্‌রাওয়ার্দির গবেষণা-সহায়করূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। গবেষণা-কালের শেষে, তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালায় প্রদর্শক-বক্তারূপে নিযুক্ত করা হয়। এখানে নিযুক্ত-থাকা-কালে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ও পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন; সেই সংগ্রহশালায় পরে তিনি সহকারী কিউরেটর ও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগে আংশিক সময়ের লেকচারার পদেও কাজ করেন। ১৯৪৬-এ তিনি ঐ বিভাগে স্থায়ী লেকচারারের পদে যোগ দেন এবং ঐ বিভাগে কর্মরত থাকা-কালে তিনি পালি, সংস্কৃত, ইসলামিক ইতিহাস ইত্যাদি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত শিল্পকলা বিষয়েও অধ্যাপনা করেন। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত আশুতোষ সংগ্রহশালা ও ঐ সংগ্রহশালা সংশ্লিষ্ট মিউজিওলজি বিভাগের প্রধানরূপে কাজ করেন। ১৯৭৭-এর ডিসেম্বরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রানী বাগীশ্বরী অধ্যাপকের পদ থেকে অবসরগ্রহণ করেন।

ছাত্রজীবনে তিনি প্রখ্যাত রাজনৈতিক ছাত্র-সংগঠন এ. বি. এস. এ.-র সভ্য ছিলেন ও পরে ১৯৪৮ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতার একটি আঞ্চলিক কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-সমিতি সংগঠনে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল এবং ১৯৭৩ পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক ও ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত সহ-সভাপতি ছিলেন।

ভারতে সংগ্রহশালা-উন্নয়ন আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। ১৯৪৪-এ বারাণসীতে যে **Museums Association of India** প্রতিষ্ঠিত হয়, তার সংগঠনে তিনি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের কার্য-প্রণালী রচনা করেন এবং ১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদে বৃত ছিলেন। ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক দ্বারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের

কয়েকজন অধ্যাপককে নিয়ে গঠিত একটি দলের সভ্যরূপে তিনি ১৯৫৭-এ ছয়মাস আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বহু বিশ্ববিদ্যালয় পরিভ্রমণ করেন এবং বিশেষ করে শিল্পকলার অধ্যাপনা-পদ্ধতি পরিদর্শন করেন। সেখানে এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনকালে বেশ কিছুদিন তিনি পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশের প্রধান প্রধান সংগ্রহশালাসমূহের বিন্যাসপদ্ধতি, পরিচালনা এবং শিক্ষণ-ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত তিনি কলিকাতার একটি নামী শিল্পসংস্থা Indian Institute of Arts in Industry ও তৎসংশ্লিষ্ট নকসা ও লোক-শিল্পের বিশেষ সমৃদ্ধ সংগ্রহশালাটির পরিচালক ছিলেন। ১৯৭০-এ তিনি ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক দ্বারা সংগ্রহশালার উন্নয়নকল্পে সংগঠিত একটি উচ্চ ক্ষমতা-সম্পন্ন কমিটির সভ্য নিযুক্ত হন। পশ্চিমবঙ্গের বারাকপুরে অবস্থিত গান্ধী স্মারক সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তিনি এর পরিচালক সমিতির অন্যতম সদস্য। ১৯৬৮-তে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের আনুকূল্যে পোল্যাণ্ড ভ্রমণ করেন।

সম্প্রতি (জানুয়ারি ১৯৮৯) দিল্লীর জাতীয় সংগ্রহশালায় যে National Museum Institute of Art, Conservation and Museology নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা-সম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে, ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রক দ্বারা তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতিতে অন্যতম বিশেষজ্ঞ সভ্যরূপে মনোনীত হয়েছেন।

বিভিন্ন সংবাদপত্র, সাময়িকী ও গবেষণা পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বাংলার ভাস্কর্য (১৯৪৭), ঐ গ্রন্থের পরিবর্ধিত সংস্করণ (১৯৮৬), Art of Asoke (Reprint from Journal of the Department of Letters Calcutta University, 1959), বাংলার লোকশিল্প (১৯৬২), Designs in Traditional Arts of Bengal (1963), Some Aspects of Sun Worship in India (1965), Cultural History of Rajasthan (1983), Howrah in Perspective (1983) ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।